বৈয়াসিক-মহাভারত অবলম্বনে নিত্যানন্দ-স্মৃতিতীর্থ-প্রণীত অপ্রকাশিত নাটক-ত্রয়-সমীক্ষা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের অধীনে পিএইচ্. ডি. উপাধি প্রাপ্তির জন্য

প্রদেয় গবেষণা-সন্দর্ভ

গবেষক

দেবর্ষি ভদ্র

নিবন্ধনক্রম: AOOSA0100718

তত্ত্বাবধায়িকা

ড. শিউলি বসু

অধ্যাপিকা, সংস্কৃত বিভাগ,

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সংস্কৃত বিভাগ

কলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা

২০২৪

Vaiyāsika-Mahābhārata Avalambane Nityānanda-Smṛtitīrtha-Praṇīta Aprakāśita Nāṭaka-traya-samīkṣā

A thesis submitted to the Faculty of of Arts of Jadavpur University in partial fulfilment for the Award of the Degree Ph.D. in Sanskrit

Submitted by

Debarshi Bhadra

Registration No: AOOSA0100718

Under the Supervision of

Dr. Shiuli Basu

Professor, Dept. of Sanskrit,

Jadavpur University

Department of Sanskrit

Faculty of Arts,

Jadavpur University

Kolkata

2024

Certificate

Certified that the Thesis entitled

বৈয়াসিক-মহাভারত অবলম্বনে নিত্যানন্দ-স্মৃতিতীর্থ-প্রণীত অপ্রকাশিত নাটক-ত্রয়-সমীক্ষা **(*Vaiyāsika-Mahābhārata* Avalambane Nityānanda-Smṛtitīrtha-Praṇīta Aprakāśita Nāṭaka-traya-samīkṣā),** submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of **Dr. Shiuli Basu,** Professor, Department of Sanskrit, Jadavpur University and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere / elsewhere.

Countersigned by the Supervisor:

Shiuli Basu

Dated: 06/09/2024.

Professor, Department of Sanskrit
Jadavpur University
Kolkata- 700032

Candidate:

Debarshi Bhadra

Dated: 06.09.2024

"নবজলধরকান্তিঃ পীতবাসা বরেণ্যঃ

সকলভুবনপাতা চক্রহস্তঃ সুবেষঃ।

শরণগতজনানামাশ্রয়ো যঃ কৃপালু

র্বপনয়তু স দুঃখং সর্ব্বতো বো মুরারিঃ।।"

.... *দ্রৌপদীমানরক্ষণ*

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

গবেষণার সহায়কদের মধ্যে যে মানুষটির কাছে আমি চিরঋণী, তিনি আমার গবেষণা-কর্মের তত্ত্বাবধায়িকা অধ্যাপিকা ড. শিউলি বসু মহাশয়া। গবেষণা কার্যে তাঁর মূল্যবান মতামত ও সহযোগিতা ছাড়া এই কাজ সম্ভব ছিল না। তাঁর শান্ত স্বভাব, অনুকূল পরিবেশ আমাকে স্বাধীনভাবে কাজটি করতে শক্তি যুগিয়েছে। ধন্যবাদ জানাই আধ্যাপিকা ড. দেবার্চনা সরকার এবং ড. দীধিতি বিশ্বাস মহাশয়াকে। তাঁদের উপদেশাবলী গবেষণা কার্যে আমাকে ঋদ্ধ করেছে। অধ্যাপিকা রত্না বসু মহাশয়াকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁর রিসার্চ মেথডোলজি বিষয়ে পাঠদান এবং মূল্যবান মতামত গবেষণা কার্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের সকল শিক্ষক ও শিক্ষিকাকে আমি প্রণতি নিবেদন করি। বিভাগীয় গ্রন্থগারিক শ্রুতি মল্লিক ও সহকারী গ্রন্থগারিক নিমাই সরদার মহাশয়ের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই।

বিশেষ ভাবে ড. দেবব্রত মুখোপাধ্যায়কে আমার নমস্কার ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁর অকুণ্ঠ সহযোগিতা না পেলে এই গবেষণা কার্য সম্পন্ন হত না। স্নাতকোত্তর স্তর থেকে তাঁর নিরন্তর উৎসাহ এবং স্নেহ আমাকে এই কাজটি এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। গবেষণার বিষয় নির্বাচন থেকে শুরু করে নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ সমস্থ কিছুতে তাঁর সহযোগিতা আমি পেয়ে এসেছি। কৃতজ্ঞ আমি হাওড়া সংস্কৃত সাহিত্য সমাজের কাছে। এই প্রতিষ্ঠান আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে। রামগোপাল মঞ্চে *জয়দ্রথবধ* নাটক করতে করতে সে বিষয়ে গবেষণার ইচ্ছা এবং সেই পথে এই প্রতিষ্ঠানের অবদান অনস্বীকার্য।

এছাড়া গবেষণার কাজে যাঁদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পাশে পেয়েছি তাঁরা হলেন (প্রয়াত) অধ্যাপিকা ড. অঞ্জলিকা মুখোপাধ্যায়, গবেষক অরূপ ঘোষ, অধ্যাপক সৌম্যজিৎ সেন, অধ্যাপক অভিষেক দাস, অধ্যাপক সুদীপ্ত দাস, অধ্যাপিকা দোয়েল দত্ত, অধ্যাপক সমীপেষু দাস। এঁনাদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।

পরিশেষে আমার পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। তাঁরা এই যাত্রাপথে আমার শক্তি ও স্তম্ভ হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তাঁদের অটল উৎসাহ, ধৈর্য ও ভালোবাসা আমার পাথেয় হয়েছে। আমাকে আমার স্বপ্ন অনুসরণ করতে তাঁরা যে সমস্ত ত্যাগ স্বীকার করেছেন তার জন্য আমি চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব।

ভবিষ্যতেও আপনাদের সহযোগিতা লাভ করব এই প্রত্যাশা করি।

ধন্যবাদান্তে

দেবর্ষি ভদ্র

।। বিষয়ানুক্রমণিকা।।

বিষয় **পৃষ্ঠা**

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ভূমিকা **১-৭**

প্রথম অধ্যায়:

❖ **আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য** **৮-১৪**

১.০ কাব্যভেদ ও নাট্যসাহিত্যের উৎপত্তি ৮

১.১ আধুনিক সংস্কৃত নাটক ৯

দ্বিতীয় অধ্যায়:

❖ **প্রাচীন ও আধুনিক নাট্যকর্মে অবলোকন:** **১৫-২৩**

২.০ *বৈয়াসিক-মহাভারত* ও ভারতীয় নাট্যকর্ম: প্রাচীন সংস্কৃত নাটক ১৫

২.১ আধুনিক-সংস্কৃতসাহিত্যে *বৈয়াসিক-মহাভারত* অবলম্বনে রচিত নাটকের অবলোকন ২০

তৃতীয় অধ্যায়:

❖ **মহাকবি নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়:** **২৪-৫৫**

৩.০ ব্যক্তিজীবন ২৪

৩.১ মহাকবির কর্মজীবন ২৬

৩.২ মহাকবির সারস্বতসমূহকৃতি ২৯

৩.২.১ প্রকাশিত কর্ম ৩৩

৩.২.২ অপ্রকাশিত কর্ম ৫০

চতুর্থ অধ্যায়:

❖ ***জয়দ্রথবধ*-নাট্যকৃতির বিচার-বিমর্শ:** **৫৬-১৪৬**

৪.০ মূল নাটক ৫৬

৪.১ নাটকের বঙ্গানুবাদ ৭৫

৪.২ কাহিনী-নাট্যরূপ-নাট্যনির্মাণকলা-নাট্যতত্ত্বানুসারে বিচার ৯০

৪.২.০ বিষয়বস্তু ৯০

৪.২.১ নামকরণ ৯১

৪.২.২ নান্দী ৯২

৪.২.৩ প্রস্তাবনা ৯৩
৪.২.৪ অর্থপ্রকৃতি ৯৫
৪.২.৫ পঞ্চাবস্থা ৯৭
৪.২.৬ নাট্যবৈশিষ্ট্য ১০১
৪.২.৭ ভরতবাক্য ১১১
৪.৩ চরিত্র বিশ্লেষণ ১১৩
৪.৪ আলঙ্কারিক বিচার ১২৫
৪.৪.০ অলঙ্কার বিচার ১২৫
৪.৪.১ রস বিচার ১৩০
৪.৪.২ ছন্দ বিচার ১৩৩
৪.৪.৩ গুণ-রীতি বিচার ১৩৫

পঞ্চম অধ্যায়:

❖ ***ঘটোৎকচবধ*-নাট্যকর্মের সমীক্ষা:** **১৪৭-২০০**

৫.০ মূল নাটক ১৪৭
৫.১ নাটকের বঙ্গানুবাদ ১৬৭
৫.২ কাহিনী-নাট্যরূপ-মঞ্চনির্মাণকলা-নাট্যতত্ত্বানুসারে বিচার ১৮৭
৫.২.০ বিষয়বস্তু ১৮৭
৫.২.১ নামকরণ ১৮৯
৫.২.২ নান্দী ১৯০
৫.২.৩ প্রস্তাবনা ১৯০
৫.২.৪ অর্থপ্রকৃতি ১৯২
৫.২.৫ পঞ্চাবস্থা ১৯৩
৫.২.৬ নাট্যবৈশিষ্ট্য ১৯৫
৫.২.৭ ভরতবাক্য ১৯৯
৫.৩ চরিত্র বিশ্লেষণ ২০০
৫.৪ আলঙ্কারিক বিচার ২০৭
৫.৪.০ অলঙ্কার বিচার ২০৭
৫.৪.১ রস বিচার ২১০
৫.৪.২ ছন্দ বিচার ২১২
৫.৪.৩ গুণ-রীতি বিচার ২১৫

ষষ্ঠ অধ্যায়:

- ❖ ***দ্রৌপদীমানরক্ষণ*-নাটকের বিশ্লেষণাত্মক সমীক্ষা:** **২২১-২৯৫**

৬.০ মূল নাটক	২২১
৬.১ নাটকের বঙ্গানুবাদ	২৪২
৬.২ কাহিনী-নাট্যরূপ-নাট্যনির্মাণবিধি-নাট্যতত্ত্বানুসারে বিচার	২৬২
৬.২.০ বিষয়বস্তু	২৬২
৬.২.১ নামকরণ	২৬৪
৬.২.২ নান্দী	২৬৫
৬.২.৩ প্রস্তাবনা	২৬৫
৬.২.৪ অর্থপ্রকৃতি	২৬৬
৬.২.৫ পঞ্চাবস্থা	২৬৭
৬.২.৬ নাট্যবৈশিষ্ট্য	২৬৮
৬.২.৭ ভরতবাক্য	২৭১
৬.৩ চরিত্র বিশ্লেষণ	২৭৩
৬.৪ আলঙ্কারিক বিচার	২৮২
৬.৪.০ অলঙ্কার বিচার	২৮২
৬.৪.১ রস বিচার	২৮৪
৬.৪.২ ছন্দ বিচার	২৮৭
৬.৪.৩ গুণ-রীতি বিচার	২৯০
উপসংহার	**২৯৬**
গ্রন্থপঞ্জি	**২৯৮**
পরিশিষ্ট	**৩০৩-৩১৯**
ক. প্রশস্তি বাক্য	৩০৩
খ. হাতে লেখা সূচীপত্রের অংশ এবং প্রকাশিত সূচীপত্র	৩০৬
গ. চিত্রে কবি, সামাজিক, নিত্যানন্দ	৩০৮
ঘ. নিত্যানন্দের হস্তাক্ষরে আলোচ্য নাটকত্রয়ের প্রতিলিপি	৩১৭
ঙ. নিত্যানন্দের অন্যান্য কিছু নাট্যাংশের হস্তাক্ষর প্রতিলিপি	৩১৮

ভূমিকা

ভূমিকা

সংস্কৃতসাহিত্যে কাব্য মূলত দুই প্রকার-- দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্যকাব্য[১]। যা অভিনয়ের যোগ্য, তাকে 'দৃশ্যকাব্য' বলে[২]। 'রূপক' ও 'উপরূপক' ভেদে দৃশ্যকাব্য দ্বিবিধ। রূপকের মধ্যে নাটক অন্যতম। নাটক দৃশ্য ও শ্রব্যকাব্যের সমন্বয়ে রঙ্গমঞ্চের সাহায্যে গতিমান মানবজীবনের প্রতিচ্ছবি সহৃদয়ের সম্মুখে মূর্ত করে তোলে। নাট্যোল্লিখিত কুশীলবগণ তাদের অভিনয়-নৈপুণ্যে নাটকের দেহে প্রাণসঞ্চার করেন, তাকে বাস্তব রূপ ও ঐশ্বর্য দান করেন। আধুনিক সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে যে সমস্ত কিংবদন্তি অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়। তিনি নবদ্বীপ সংস্কৃত কলেজ ও কলকাতা সংস্কৃত কলেজ যা বর্তমানে সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করেন। সংস্কৃত-ভাষায় তিনি প্রচুর নাটক, ছোট-বড় মিলিয়ে **১১৬**টি রূপক রচনা করেছেন। এছাড়াও তিনি সংস্কৃতভাষায় মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য এবং বহু প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁর রচিত মহাকাব্যের সংখ্যা সাতটি, খণ্ডকাব্যের সংখ্যা চব্বিশটি, সংগীত ও প্রবন্ধ অসংখ্য।

গবেষণার বিষয়—নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় *বৈয়াসিক-মহাভারত* অবলম্বনে বারোটি রূপক লিখেছেন। তার মধ্যে দুটি নাটক প্রকাশিত (*কর্ণজীবন ও পরীক্ষিতপরিরক্ষণ)* অবশিষ্ট অপ্রকাশিত, নাটকগুলি হল— *ঘটোৎকচবধ, সর্পযজ্ঞনিবারণ, দ্রৌপদীমানরক্ষণ, পাণ্ডবপরিক্ষণ, সত্যরক্ষণ, জয়দ্রথবধ, শমনবিজয়, ভীষ্মত্বলাভ, অজ্ঞাতবাস, তপোবল*। এর মধ্যে তিনটি নাটক আলোচ্য গবেষণার বিষয়। সেগুলির বিষয়ে সংক্ষিপ্ত তথ্য নিচে প্রদত্ত হল—

প্রণেতা	নাটকের নাম	প্রধান চরিত্র	রচনাকাল	অঙ্কসংখ্যা	হস্তলিখিত পুঁথিতে পৃষ্ঠাসংখ্যা
নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়	*জয়দ্রথবধ*	দ্রৌপদী, কৃষ্ণ, ধৃতরাষ্ট্র, দুঃশাসন	১৩৯৩ বঙ্গাব্দ	৫	৩০
নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়	*ঘটোৎকচবধ*	কর্ণ, কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির	১৩৯৩ বঙ্গাব্দ	৫	৩০
নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়	*দ্রৌপদীমানরক্ষণ*	কৃষ্ণ, অর্জুন, দুর্যোধন, শকুনি	১৩৯৩ বঙ্গাব্দ	৫	৩০

নাটকত্রয় নির্বাচনের কারণ-

প্রকাশিত না হলেও নাটক তিনটির মধ্যে দুটি (*ঘটোৎকচবধ, জয়দ্রথবধ*) হাওড়া সংস্কৃত সাহিত্য সমাজের রামগোপাল মঞ্চে বহুবার অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এর সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত থাকায় এবং পূর্বোক্ত নাটক দুটির মূল সূত্ররূপে *দ্রৌপদীমানরক্ষণ* কে নির্বাচন করা হয়েছে। নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত সমাজ সচেতন ছিলেন, তাই তাঁর নাটকের মধ্যেও তা প্রতিফলিত হয়েছে। উল্লিখিত তিনটি নাটকের চরিত্রগুলি বর্তমান সমাজে বহুভাবে প্রতিফলিত। *বৈয়াসিক-মহাভারত* অবলম্বনে রচিত হলেও নাটকত্রয়ের রচনার ক্ষেত্রে নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় স্বকীয়তা বজায় রেখেছেন এবং চরিত্রের অভিব্যক্তির দিক থেকে নবীনত্ব দেখিয়েছেন।

গবেষণা-পদ্ধতি (Methodology)

ক. *Nityananda when 65* এই পুস্তিকা থেকে প্রথম কবি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।

খ. 20*th Century Sanskrit Literature. A Glimpse into Traditional and Innovation* [৩] *এবং*

আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য ছোটগল্প ও নাটক (১৯১০-২০১০) [৪] এই পুস্তক দুটি থেকে তথ্য সংগ্রহ।

গ. সাক্ষাৎকার: স্বীকৃতনাট্যকারের বংশের স্ত্রী-পুত্রদের সাথে সাক্ষাৎকার তথা নাট্যকারবিষয়ে তথ্য অন্বেষণ।

ঘ. নাট্যকারের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত নাটকের পাণ্ডুলিপি থেকে সূচি প্রস্তুত।

ঙ. গ্রন্থসমীক্ষা: নির্বাচিত নাটকত্রয়ের যথাযথ পাঠ, তার অনুবাদ এবং নাট্যতত্ত্ববিচার।

গবেষণাসন্দর্ভের লক্ষ্য

১. *বৈয়াসিক-মহাভারত* অবলম্বনে রচিত নাট্যকৃতিসমূহের সূচি প্রস্তুত করা।

২. *বৈয়াসিক-মহাভারত* অবলম্বনে রচিত আধুনিক নাটক সম্বন্ধে আলোচনা।

৩. কবির নাট্যসমূহ কতদূর রসোত্তীর্ণ হয়েছে তার বিশ্লেষণ লক্ষণানুসারে নাটকগুলি নাটক-পদবাচ্য কি না, তার বিচার বিশ্লেষণ।

৪. নাট্যকর্মের মধ্যে কবির সমকালের প্রভাব বিশ্লেষণ।

৫. ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার লক্ষণসমূহের বিচার করে নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়ের নাট্যকর্মসমূহের মধ্যে সংগতি ও সমন্বয় কীভাবে হয়েছে তা অনুসন্ধান।

পূর্বকৃত সমীক্ষাকর্মের বিবরণ

নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় সংস্কৃত-ভাষায় প্রচুর নাটক, ছোট-বড় মিলিয়ে ১১৫টি রূপক রচনা করেছেন। এছাড়াও তিনি সংস্কৃতভাষায় মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য এবং বহু প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁর রচিত মহাকাব্যের সংখ্যা এগারোটি, সংস্কৃত শ্লোকমালা শতাধিক, সংগীত ও প্রবন্ধ অসংখ্য। হাওড়া সংস্কৃত সাহিত্য সমাজ থেকে *নাটক-সংগ্রহ, নাট্যসংগ্রহ ২, দৃশ্যকাব্যসঙ্কলন, সংস্কৃত-মৌলিক-রবীন্দ্র-নাটক-সঙ্কলন* ইত্যাদি গ্রন্থে নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কিছু রূপক প্রকাশিত হয়। নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর নাট্যকৃতির উপর প্রথম জানা যায় *Nityananda when 65* নামক পুস্তিকা থেকে। এরপর বিশ্লেষণাত্মক তথ্য জানা যায় *20*th Century Sanskrit Literature. A Glimpse into Traditional and Innovation[৫] *এবং আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য ছোটগল্প ও নাটক* (১৯১০-২০১০)[৬] এই পুস্তক দুটি থেকে। এছাড়া *সমাজ-ভারতী* পত্রিকাতেও কিছু নাট্য প্রকাশিত হয়। নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষের স্মরণে *শতবর্ষে নিত্যানন্দে প্রসূনাঞ্জলি*[৭] নামক একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত নাট্যের উপর শোধ কাজ পাওয়া যায় *An Analysis of the published Sanskrit works of Pandit Nityananda Mukhopadhyay* [৮] এবং *ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম আশ্রয়ী নির্বাচিত সংস্কৃত নাটক: একটি সমীক্ষা* [৯] এখানে নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়ের একটি নাটক বালেশ্বরমহাযুদ্ধ পাওয়া যায়।

নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়ের এখন বহু নাটক, মহাকাব্য, শ্লোকাবলী প্রভৃতি অপ্রকাশিত হয়ে আছে। নির্বাচিত তিনটি নাটক পাণ্ডুলিপি আকারে নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বহু তথ্য তাঁর সাথে কথা বলে জানা গিয়েছে। অপ্রকাশিত সমস্ত পাণ্ডুলিপি নিয়ে একটি সূচি প্রস্তুত করা হয়েছে যা পূর্বকৃত পুস্তকে বা শোধকার্যে পাওয়া যায় না। এই গবেষণা-প্রবন্ধে তাঁর রচিত অপ্রকাশিত নাটকত্রয়ের উপর সমীক্ষাত্মক আলোচনা করা হয়েছে।

গবেষণা-প্রবন্ধে অধ্যায় বিভাজন–

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়:

- **আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য**

    ১.০ কাব্যভেদ ও নাট্যসাহিত্যের উৎপত্তি

    ১.১ আধুনিক সংস্কৃত নাটক

দ্বিতীয় অধ্যায়:

❖ **প্রাচীন ও আধুনিক নাট্যকর্মে অবলোকন:**

২.০ *বৈয়াসিক-মহাভারত* ও ভারতীয় নাট্যকর্ম: প্রাচীন সংস্কৃত নাটক

২.১ আধুনিক-সংস্কৃতসাহিত্যে *বৈয়াসিক-মহাভারত* অবলম্বনে রচিত নাটকের অবলোকন

তৃতীয় অধ্যায়:

❖ **মহাকবি নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়:**

৩.০ ব্যক্তিজীবন

৩.১ মহাকবির কর্মজীবন

৩.২ মহাকবির সারস্বতসমূহকৃতি

৩.২.১ প্রকাশিত কর্ম

৩.২.২ অপ্রকাশিত কর্ম

চতুর্থ অধ্যায়:

❖ ***জয়দ্রথবধ*-নাট্যকৃতির বিচার-বিমর্শ:**

৪.০ মূল নাটক

৪.১ নাটকের বঙ্গানুবাদ

৪.২ কাহিনী-নাট্যরূপ-নাট্যনির্মাণকলা-নাট্যতত্ত্বানুসারে বিচার

৪.৩ চরিত্র বিশ্লেষণ

৪.৪ আলঙ্কারিক বিচার

পঞ্চম অধ্যায়:

❖ ***ঘটোৎকচবধ*-নাট্যকর্মের সমীক্ষা:**

৫.০ মূল নাটক

৫.১ নাটকের বঙ্গানুবাদ

৫.২ কাহিনী-নাট্যরূপ-মঞ্চনির্মাণকলা-নাট্যতত্ত্বানুসারে বিচার

৫.৩ চরিত্র বিশ্লেষণ

৫.৪ আলঙ্কারিক বিচার

ষষ্ঠ অধ্যায়:

- ❖ ***দ্রৌপদীমানরক্ষণ*-নাটকের বিশ্লেষণাত্মক সমীক্ষা:**

৬.০ মূল নাটক

৬.১ নাটকের বঙ্গানুবাদ

৬.২ কাহিনী-নাট্যরূপ-নাট্যনির্মাণবিধি-নাট্যতত্ত্বানুসারে বিচার

৬.৩ চরিত্র বিশ্লেষণ

৬.৪ আলঙ্কারিক বিচার

উপসংহার

গ্রন্থপঞ্জি

পরিশিষ্ট

গবেষণার সীমাবদ্ধতা:

নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় বিরচিত নাটকের সংখ্যা ১১৬টি। গবেষণার বিষয়কে নাতিদীর্ঘ রাখার জন্য আলোচ্য গবেষণা-সন্দর্ভে কেবলমাত্র তিনটি অপ্রকাশিত নাটক গৃহীত হয়েছে। আলঙ্কারিক সমীক্ষার ক্ষেত্রে নাটকগুলিতে প্রযুক্ত ছন্দ, অলঙ্কার, গুণ-রীতি ও রসের আলোচনা করা হয়েছে। অন্যান্য প্রসিদ্ধ মতবাদ যেমন ধ্বনি, বক্রোক্তি, ঔচিত্য ইত্যাদি আলোচনা করা হয়নি। নাটকগুলির ব্যাকরণগত ও ভাষাগত মূল্যায়ন করা হয়নি। নাটক তিনটির Text Editing (সম্পাদনা) করা হয়নি। অপ্রকাশিত নাটকগুলির পাণ্ডুলিপি নিয়ে সূচি প্রস্তুত হলেও নাটকগুলি পড়ে তার বিষয়বস্তু প্রস্তুত করা হয়নি। নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় অন্যত্র নিজের নাম হিসাবে নিত্যানন্দ-স্মৃতিতীর্থ ব্যবহার করেছেন, সেই কারণে জনমানসে তিনি নিত্যানন্দ-স্মৃতিতীর্থ রূপেই পরিচিত। কিন্তু নাটক রচনার ক্ষেত্রে তিনি নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় রূপেই নাম ব্যবহার করেছেন। আবার কোথাও কোথাও নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় (স্মৃতিতীর্থ) হিসাবেও ব্যবহার করেছেন। তাই আলোচ্য গবেষণাসন্দর্ভের শিরোনামে নিত্যানন্দ-স্মৃতিতীর্থ ব্যবহার করা হয়েছে। নাট্যতত্ত্বের আলঙ্কারিক বিচার আলোচ্য প্রথম নাটকের পর্বেই আলোচিত হওয়ায় আলোচ্য দ্বিতীয় ও তৃতীয় নাটকের আলোচনায় লক্ষণ উদ্ধৃত করা হয় নি। নাট্যতত্ত্বের আলঙ্কারিক ব্যাখ্যায় *সাহিত্যদর্পণ*কেই প্রধান অবলম্বন রূপে গ্রহণ করা হয়েছে তার সাথে *নাট্যশাস্ত্র, দশরূপক* এবং আরও কয়েকটি গ্রন্থেরও ব্যবহার করা হয়েছে। নাট্যকার *দ্রৌপদীমানরক্ষণ* নাটকটি পরে রচনা করেন। তার আগেই *জয়দ্রথবধ* ও *ঘটোৎকচবধ* নাটক রচনা করেন। সেই কারণে নাটকের বিষয়বস্তুর ঘটনা অনুসারে

দ্রৌপদীমানরক্ষণ নাটকটি আগে আলোচনা করা যেত, কিন্তু নাট্যকারের রচনাক্রমকে মনে রেখে এই নাটকের আলোচনা পরে করা হয়েছে।

লিখনপ্রণালী ও বানানবিধি:

অপ্রকাশিত নাটকত্রয়ের মূল পাণ্ডুলিপি থেকে প্রতিলিপিকরণ করার সময় কিছু কিছু জায়গায় বর্ণ অস্পষ্ট থাকায় এবং কোন কোন বর্ণ লেখার সময় বাদ যাওয়ায় যে অস্পষ্টতা তৈরি হয়েছিল সেগুলি অর্থবিশ্লেষণের দ্বারা ও আলোচনাচক্রের মাধ্যমে যথার্থ রূপ দেবার চেষ্টা হয়েছে। নির্বাচিত নাটকে নাট্যকার যে বানান ব্যবহার করেছেন তেমনি রাখা হয়েছে কিন্তু নাট্যতত্ত্ব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তা পরিবর্তিত করে অভিধান অনুযায়ী করা হয়েছে। নাটকত্রয়ের অধ্যয়ন করে সেগুলির কাব্যতাত্ত্বিক মূল্যায়ন করা হয়েছে। ছন্দো-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আচার্য গঙ্গাদাস কৃত *ছন্দোমঞ্জরী* গ্রন্থের লক্ষণ গৃহীত হয়েছে। অলঙ্কার, গুণ, রীতি ও রসের ক্ষেত্রে বিশ্বনাথ-কবিরাজ কৃত *সাহিত্যদর্পণের* লক্ষণানুসারে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণা কাজে সমস্ত নাটকের (অপ্রকাশিত সূচী ছাড়া) নাম প্রাতিপদিক আকারে উল্লিখিত হয়েছে।

বাংলা ভাষায় গবেষণা-প্রবন্ধটি লেখার ক্ষেত্রে অভ্র কিবোর্ডে কালপুরুষ ফ্রন্টে লেখা হয়েছে। মূল লেখার ক্ষেত্রে ফন্ট সাইজ ১২ এবং তথ্যসূত্রের ক্ষেত্রে ১১ ব্যবহার করা হয়েছে। নাটক তিনটির পাঠ্য দেবনাগরী হরফে দেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে 'Devanagari Inscript'-এর ১৫ সাইজ ব্যবহার করা হয়েছে। যেখানে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার হয়েছে সেখানে 'Times New Roman'-এর ১২ সাইজ ব্যবহার করা হয়েছে। দুই পঙক্তির মাঝে ১.৫ সেন্টিমিটার ব্যবধান রাখা হয়েছে। গ্রন্থপঞ্জীর ক্ষেত্রে MLA Handbook, 9th Edition এর নিয়মানুসারে লেখা হয়েছে।

উল্লেখপঞ্জি

[১] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা.), *সাহিত্যদর্পণ,* পৃষ্ঠা ২৬১

[২] *তত্রৈব*

[৩] ঋতা চট্টোপাধ্যায়, *২০ সেঞ্চুরি সংস্কৃত লিটরেচার। এ গ্লিম্পস ইন্টু ট্র্যাডিশন এন্ড ইনোভেশন*

[৪] ঋতা চট্টোপাধ্যায়, *আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য: ছোটগল্প ও নাটক (১৯১০-২০১০)*

[৫] ঋতা চট্টোপাধ্যায়, *২০ সেঞ্চুরি সংস্কৃত লিটরেচার। এ গ্লিম্পস ইন্টু ট্র্যাডিশন এন্ড ইনোভেশন*

[৬] ঋতা চট্টোপাধ্যায়, *আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য: ছোটগল্প ও নাটক (১৯১০-২০১০)*

[৭] দেবব্রত মুখোপাধ্যায় (সম্পা), *শতবর্ষে নিত্যানন্দে প্রসূনাঞ্জলি*

[৮] অভিষেক দাস, *এন এনালিসিস অফ দা পাবলিশড সংস্কৃত ওয়রক্স অফ পণ্ডিত নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়*

[৯] মাধুরী ঘোষ, *ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম আশ্রয়ী নির্বাচিত সংস্কৃত নাটক: একটি সমীক্ষা*

প্রথম অধ্যায়:

আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য

প্রথম অধ্যায়

আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য

১.০ কাব্যভেদ ও নাট্যসাহিত্যের উৎপত্তি

কাব্যকে দুটি ভাগে স্বীকার করা হয় দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্যকাব্য – "দৃশ্যশ্রব্যত্বভেদেন পুনঃ কাব্যং দ্বিধা স্মৃতম্"[১]। শ্রব্যকাব্যে শব্দ পড়ে বা শ্রবণ করে পাঠক বা শ্রোতার হৃদয়ে রসের সঞ্চার করা হয়ে থাকে। দৃশ্যকাব্যে শব্দের অতিরিক্ত পাত্রের বেশভূষা, আকৃতি, ভাবভঙ্গী অনুকরণ করে অভিনয়ের দ্বারা দর্শকের চিত্ত আকর্ষণ করা হয়। এইভাবে শ্রবণের মাধ্যমে শ্রব্যকাব্য এবং দর্শনের দ্বারা দৃশ্যকাব্য মানুষের হৃদয়ে রসানন্দের অনুভুতি জাগায়। কর্ণেন্দ্রিয় দ্বারা প্রাপ্ত বস্তুর তুলনায় চোখ দিয়ে দেখা বস্তু বিশেষভাবে আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে থাকে। দৃশ্যকাব্যে রামাদির স্বরূপ নট ইত্যাদির উপর আরোপিত হওয়ার কারণে দৃশ্যকাব্যকে রূপক বলা হয়ে থাকে। *দশরূপকে* বলা হয়েছে নাট্য হল অবস্থার অনুকৃতি। দৃশ্যময়তার জন্য একে রূপ নামে অভিহিত করা হয়। রূপ আরোপিত হয় বলে নাট্যের অপর নাম রূপক – "অবস্থানুকৃতির্নাট্যং রূপং দৃশ্যতযোচ্যতে। রূপকং তৎ সমারোপাৎ"[২]। রূপক দশ প্রকার, তার মধ্যে নাটক অন্যতম। এই দশ প্রকার ভাগের মধ্যে নাটক সর্বশ্রেষ্ঠ কারণ–

> প্রকৃতিত্বাদথান্যেষাং ভূয়োরসপরিগ্রহাৎ।
>
> সম্পূর্ণলক্ষণত্বাচ্ চ পূর্বং নাটকমুচ্যতে।।[৩]

আলংকারিকগণ রূপকের মধ্যে নাটককেই প্রথম ও প্রধান গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন বলেই প্রথম নাটকের লক্ষণ করেছেন এবং অন্যান্য রূপকের লক্ষণ করতে গিয়ে নাটকের থেকে অতিরিক্ত যে বিশেষত্ব উল্লেখ করেছেন। এ থেকে রূপক হেসেবে নাটকের গুরুত্ব অপরিসীম তা বোঝা যায়। ভরত-এর *নাট্যশাস্ত্রে* নাটকের উৎপত্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, জাগতিক মানুষকে অত্যন্ত দুঃখিত দেখে ইন্দ্রাদি দেবগণ ব্রহ্মার কাছে গিয়ে এমন একটি বেদ তৈরির জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, যা উপভোগ করতে পারবে চারটি বর্ণের মানুষ অর্থাৎ যারা ঋগ্বেদাদি পাঠের অধিকারী নয় বা নারী ও শিশু যারা বেদ পড়তে অক্ষম, তারা সবাই উপভোগ করতে পারেন। এই কথা শুনে ব্রহ্মা চারটি বেদের ধ্যান করলেন এবং ঋগ্বেদ থেকে পাঠ্য, সামবেদ থেকে গান, যজুর্বেদ থেকে অভিনয় এবং অথর্ববেদ থেকে রস নিয়ে 'নাট্যবেদ' নামে পঞ্চম বেদ রচনা করলেন। *নাট্যশাস্ত্রে* লেখা আছে–

> জগ্রাহ পাঠ্যমৃগ্বেদাৎ সামভ্যো গীতমেব চ।
>
> যজুর্বেদাদভিনয়ান্ রসনাথর্বণাদপি।[৪]

ব্রহ্মার আদেশে ভরত শিষ্যদের নিয়ে ইন্দ্রধ্বজোৎসবে *দেবাসুরসংগ্রামে* অভিনয় করেন। তারপর ব্রহ্মা *অমৃতমন্থন* ও *ত্রিপুরদাহ* নামক নাটক রচনা করেন। এটা স্পষ্ট যে নাটক সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের উপভোগের জন্য রচিত হয়েছে। আর অভিনয় ও অনুকরণের কারণে এর প্রভাব দর্শকদের ওপর বেশি পড়ে। তাই কাব্যের সকল ধারার মধ্যে নাটককে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয়। এটি প্রমাণ করেছে যে "কাব্যেষু নাটকম্ রম্যম্"। ভরতমুনি বলেছেন যে কলা রূপে নাটকের গুরুত্ব এই কারণে যে এখানে সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান, শিল্প এবং প্রায় সমস্ত কলাবিদ্যার অন্তর্ভুক্তি ঘটে। যদিও নাটক এবং নাট্য এর মধ্যে ভেদ আছে কারণ যেটি মঞ্চে প্রয়োগ করা হয় তাকেই নাট্য রূপে অবিহিত করা হয়। মানুষের সুখ দুঃখ যেকোনো অনুভূতিকেই নাট্যে অভিনয়ের মাধ্যমে ব্যবহার করা হয়। মানুষের সুখ-দুঃখযুক্ত যে স্বভাব তা অঙ্গাদি (অর্থাৎ আঙ্গিক, বাচিক, সাত্ত্বিক ও আহার্য) অভিনয়ের সাথে যুক্ত হয়ে নাট্য নামে অভিহিত হয়–

যোঽয়ং স্বভাবো লোকস্য সুখদুঃখসমন্বিতঃ

সোঽঙ্গাদ্যভিনয়োপেতঃ নাট্যমিত্যভিধীয়তে।।[৫]

নাট্যসাহিত্যের উৎপত্তির কারণ রূপে উল্লেখ করা যেতে পারে ঋগ্বেদে প্রাপ্ত সংবাদসূক্তগুলিকে। যেমন–যম-যমীসূক্ত (১০/১০), পুরূরবা-উর্বশীসূক্ত (১০/১৫), সরমা-পণিসূক্ত (১০/১৮), বিশ্বামিত্র-নদীসূক্ত (৩/৩৩) প্রভৃতি। বিভিন্ন পণ্ডিতের মতে এই সূক্তগুলিতে যে সংলাপ আছে তা সংস্কৃত নাটকের প্রাচীনতম রূপ বলা যেতে পারে। অধ্যাপক মিশেলের মতে পুতুল নাচ থেকে সংস্কৃত নাটকের উদ্ভব হয়েছে। তাঁর মতে পুতুল স্থাপনের জন্য 'সূত্র' ধারণ করতে হয়, তা থেকেই সংস্কৃত নাটকে 'সূত্রধার' ও 'স্থাপক' শব্দদ্বয়ের আগমন। পুতুলনাচের ন্যায় সংস্কৃত নাটকেও সূত্রধার পর্দার অন্তরালে থেকে সমগ্র নাট্যাভিনয়ের পরিচালনা করে থাকে। নাটকের উৎস রূপে অনেক পণ্ডিতেরা ছায়ারূপককে স্বীকার করেছেন। দর্শকেরা রঙ্গমঞ্চের পিছনে নট-নটীর দ্বারা অভিনীত ঘটনা পর্দায় প্রতিবিম্বিত ছায়ারূপ প্রত্যক্ষ করে থাকেন। যেমন ভবভূতির *উত্তররামচরিতের* ছায়াবৃত্তান্ত ছায়ারূপকের উদাহরণ। তাছাড়া সুভট রচিত *দূতাঙ্গদ*, ব্যাস শ্রীরামদেব বিরচিত *রামাভ্যুদয়, সুভদ্রাপরিণয়* ইত্যাদি।

১.১ আধুনিক সংস্কৃত নাটক

আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে কিছু বলার আগে 'আধুনিক' শব্দটি কি তা জানা প্রয়োজন। 'অধুনা ভবঃ' এই অর্থে অধুনা শব্দের উত্তর ঠঞ্ প্রত্যয় যোগে আধুনিক শব্দের উৎপত্তি। এই অধুনা শব্দ থেকে আধুনিক, আধুনিকতা, আধুনিকীকরণ প্রভৃতি শব্দের সৃষ্টি হয়ে থাকে। সামগ্রিকভাবে বিংশ শতাব্দীতে লিখিত সংস্কৃত সাহিত্য বোঝায় অথবা স্বাধীনোত্তর সংস্কৃত সাহিত্যে বিগত দুই শতাব্দীতে রচিত বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যের একটি নিরপেক্ষ বিস্তৃত অধ্যয়ন প্রমাণ করে যে সংস্কৃত রচনায় আধুনিকতার সূচনা হয়েছিল নবজাগরণ-কাল থেকে যা ব্রিটিশ শাসন আমলে সংঘটিত হয়েছিল।

আধুনিক সংস্কৃত নাটকের ভিত্তি হল প্রাচীন সংস্কৃত নাট্য। কোন সময় থেকে সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসের আধুনিক যুগ বিবেচনা করা উচিত সে বিষয়ে বিভিন্ন পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ডক্টর হীরালাল শুক্লের

মতে, ১৯৮৪ সাল সংস্কৃতের নবজাগরণের প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত, কারণ স্যার উইলিয়ম জোন্সের প্রচেষ্টায় কলকাতায় রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি এইসময় প্রতিষ্ঠিত হয়। এইসময়েই *শ্রীমদ্ভগদ্গীতা*, *হিতোপদেশ* এবং *শকুন্তলোপাখ্যানের* ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশিত হয় এবং সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে সংস্কৃতের প্রতি আকর্ষণ বাড়তে থাকে। ১৭৯১ সালে *অভিজ্ঞান-শকুন্তলার* জার্মান ভাষায় অনুবাদ প্রকাশিত হয় যা দেখে জার্মান এর মহাকবি গ্যেটে খুব প্রভাবিত হয়। সংস্কৃত সাহিত্যের আধুনিক যুগকে ড. রাজেন্দ্র মিশ্র *দেববাণী সুবাসের* (প্রথম ভাষ্য) ভূমিকায় পুনর্জাগরণ কাল (১৭৮৪-১৮৮০), স্থাপনা কাল (১৮৮৪-১৯৫০) এবং সমৃদ্ধিকাল (১৯৫০ থেকে এখন অব্দি) ভেদে তিনভাগে ভাগ করেছেন[৬]।

প্রাচীন কাল থেকে সংস্কৃত লেখকরা সমসাময়িক ঘটনার সাথে সর্বদা নিজেদের যোগসূত্র রেখেছেন এবং নতুন উপাদানরূপে তা ব্যবহার করেছেন। যেমন জ্যোতির্বিদ্যার মতো বিষয়গুলিতে গ্রীস এবং রোমের প্রভাব ছিল। মুঘল যুগে সংস্কৃত লেখকরা ফারসি শিখে তৈরি করেন পার্সো-সংস্কৃত অভিধান।

১৭৮৯ সালে সেকালের নিবেদিত প্রাচ্যবিদ স্যার উইলিয়াম জোন্স কর্তৃক মহান সংস্কৃত কবি কালিদাসের অমর নাটকীয় রচনা *অভিজ্ঞান-শকুন্তলার* ইংরেজি অনুবাদ ইউরোপের সাহিত্যক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং কয়েক দশকের মধ্যে শত শত ইউরোপীয় পণ্ডিত হয়ে ওঠেন[৭]।

এইসময় সংস্কৃত সৃজনশীল লেখার নতুন প্রবণতার সূচনা ঘটে, যা আধুনিক সংস্কৃত লেখকদের জন্য একটি মসৃণ পথ তৈরি করেছিল। প্রমুখ কবি ও নাট্যকাররা যেমন ভট্ট মথুরানাথ শাস্ত্রী, মুলাশঙ্কর মাণিক্য, হালা যজ্ঞিক, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, জীবনানন্দ বিদ্যাসাগর, মথুরানাথ দীক্ষিত, নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, পন্ডিত অম্বিকাদত্ত ব্যাস এবং বিদুষী ক্ষমা রাও এই ঐতিহ্যের অধীনে বিকাশ লাভ করেছিলেন।

আধুনিক সময়ে, পাশ্চাত্যের দ্বারা সংস্কৃতের চর্চা দ্বিস্তরীয় প্রভাব ফেলেছিল। প্রথমত, আধুনিক শিক্ষালাভকারী ভারতীয়রা তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের নতুন উপলব্ধিতে জেগে উঠেছিল। অন্যদিকে, পশ্চিমী চিন্তাধারা এবং জীবনধারার প্রভাব ঐতিহ্যগত প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষায় পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার দিকে নিয়ে যায়। কিছু সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে সংস্কৃতের প্রাচীন গভীরতাপূর্ণ অধ্যয়নের সর্বোত্তম দিকগুলিকে আধুনিক সমালোচনামূলক পদ্ধতির সাথে একত্রিত করার জন্য সর্বান্তঃকরণ প্রচেষ্টা করা হয়। যেমন টেপ রেকর্ডার এবং কম্পিউটারের মতো গেজেটগুলির ব্যবহার।

সংস্কৃত সাহিত্যের আধুনিক প্রবণতা উপরি উক্ত কারণেই এসেছে বলে মনে হয়। নতুন আগ্রহ প্রকাশ করা প্রধান রূপগুলি হল সংস্কৃত পত্রিকার সূচনা, পাশ্চাত্য ক্লাসিকের অনুবাদ, ছোটগল্পের বৃদ্ধি, ছোটো কবিতা এবং উপন্যাস ইত্যাদি। দেশের অভ্যন্তরে, সংস্কৃতবিদরা যারা আঞ্চলিক ভাষায় সাম্প্রতিক রচনাগুলি পড়েন বা নিজেদের মাতৃভাষায়ও লিখেছিলেন, তারা আঞ্চলিক ভাষা থেকে প্রাচীন বা সমসাময়িক, আরও উল্লেখযোগ্য রচনাগুলিকে ধ্রুপদী ভাষায় উপস্থাপন করা শুরু করেন।

প্রাচীন ধ্রুপদী কবিদের অনুসরণ করে, *রামায়ণ, মহাভারত,* ব্রতকথার বিষয়বস্তু এবং বুদ্ধের মতো মহাপুরুষদের জীবনী অবলম্বন করে আধুনিক কবিরা তাদের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে গ্রহণ করেছেন এবং পুনর্নির্মাণ করেছেন। সাথে সাথে সমান দক্ষতায় আধুনিক লেখকেরা সমসাময়িক ঘটনাবলী নিয়েও আনন্দের সাথে লিখতে পেরেছেন। উদাহরণস্বরূপ, তামিলনাড়ু থেকে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী (১৮৫৯-১৯১৯) শুধুমাত্র *ভীষ্মবিজয়* (ভীষ্মের জীবনী) এবং *ভারতসংগ্রহ* (*বৈয়াসিক-মহাভারতের* সংক্ষিপ্তসার) গদ্য রচনাই লিখেছিলেন তাই নয়, পাশাপাশি *ভগবতপাদাভ্যুদয়* (আদি শঙ্করের জীবনের উপর) এবং নাটক *দিল্লি-সাম্রাজ্যও* অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। শ্রী লক্ষ্মণ সুরী বিংশ শতাব্দীর শুরুতে দিল্লিতে ঘটে যাওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক ঘটনাকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। এই নাটকটি আধুনিক ধ্যান-ধারণা ও প্রতিষ্ঠান প্রকাশের জন্য সংস্কৃত ভাষা গ্রহণের একটি প্রাথমিক প্রয়াস[৮]।

পন্ডিত এ.গোপাল আয়েঙ্গার রচিত *যদুবৃন্দ-সৌহার্দ* (মাদ্রাজ, ১৯৩৭) কবিতাটি তার প্রিয়জনের জন্য অষ্টম এডওয়ার্ড কর্তৃক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বলিদানের উপর লেখা[৯]। ভয়ঙ্কর প্রথম বিশ্বযুদ্ধও সংস্কৃত কবিদের উপর তার প্রভাব ফেলেছিল। একজন অন্ধ্র কবি তিরুমালা বুক্কাপত্তনম শ্রীনিবাসাচার্য যুদ্ধ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে *আংলো-জার্মানি-যুদ্ধবিবর্ণা* রচনাটি লিখেছেন।

মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহেরু এবং সুভাষ চন্দ্র বসুর মতো মহান নেতাদের দ্বারা জাগ্রত ভারতীয় জাতীয় চেতনা সংবেদনশীল সংস্কৃত লেখকদের প্রভাবিত করেছিল। এই বিষয়ে অনেক ছোট এবং দীর্ঘ কবিতা পাওয়া যায়। সুপরিচিত দার্শনিক ও সমালোচক ড. ডি.এস.শর্মার মহাত্মার রচনার মধ্যে *গান্ধী সূত্র* (মাদ্রাজ, ১৯৩৮, ১৯৪৬) অন্যতম। এই রচনায় লেখক ১০৮টি সূত্রে মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষাকে সমর্থন করেছেন। লেখাটি তিনটি অধ্যায়ে রচিত। প্রথমটি জীবনের সাধারণ নীতিগুলি নিয়ে, দ্বিতীয়টি সত্যাগ্রহ নিয়ে এবং তৃতীয়টি অসহযোগ ও আইন অমান্য নিয়ে[১০]।

প্রফেসর ম্যাক্স মুলার যিনি সংস্কৃতের বিভিন্ন শাখায় তার সমৃদ্ধ অবদানের জন্য সুপরিচিত ছিলেন, তিনি ড. ভবানী শঙ্কর ত্রিবেদী (দিল্লি, ১৯৮১) এর *মোক্ষমুলার-বৈদুশ্যম* নাটকের নায়ক চরিত্র। এটি তিন অঙ্ক বিশিষ্ট একটি নাটক। ম্যাক্স মুলারের জীবনের আকর্ষণীয় ঘটনাগুলিকে তুলে ধরেছে যেমন প্যারিসে স্থিত কলেজ ডি ফ্রান্স -এর অধ্যাপক বার্নউফ -র বক্তৃতা অক্সফোর্ডে স্বামী বিবেকানন্দের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ইত্যাদি। নাটকের শেষের দিকে বিবেকানন্দ ম্যাক্স মুলারকে জিজ্ঞাসা করেন তিনি কখন ভারত সফর করবেন। একটি চলমান উত্তরে, ম্যাক্স মুলার বলেছেন, "আমি তিনটি জিনিস সবচেয়ে পছন্দ করি, বারাণসীতে বাস করা, পবিত্র গঙ্গায় স্নান করা এবং বৈদিক ও দার্শনিক গ্রন্থ অধ্যয়ন করা"[১১]। তিনি অস্থির কণ্ঠে যোগ করেন, "আমি ভারতে গেলে নিশ্চিত যে ইংল্যান্ডে আর ফিরব না। আপনার মতো আমার বন্ধুরা, (অর্থাৎ, বিবেকানন্দ) সেখানেই আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করতে হতে পারে"[১২]।

আধুনিক সংস্কৃত নাটকের সময়কাল নিয়ে অনেকরকম মতভেদ আছে। যেমন কারুর মতে উনিশ শতক কারুর মতে বিংশ শতক আবার কেউ কেউ উনিশ ও বিংশ শতক উভয়কেই আধুনিক সংস্কৃত নাটকের সময়কাল বলা যায়। সেইকারণে নির্দিষ্ট ভাবে আধুনিক সংস্কৃত নাটকের সময়কাল নির্ধারণ করা কঠিন।

ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সংস্কৃত নাটক একটি প্যাটার্নের মধ্যে পড়ে, কারণ নাট্যকাররা প্রাচীন ঋষি ভরত কর্তৃক সংকেতকৃত কিছু নাট্যতাত্ত্বিক রীতি অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু আধুনিক যুগের সংস্কৃত নাট্যকাররা এই খোলস থেকে বেরিয়ে আসার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। নতুন নাটক দিয়ে, এক ধরণের নতুন চেতনা দিয়ে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নাটকে কিছু পরিবর্তন এনেছিলেন। আধুনিক নাট্যকাররা অতীতের সাথে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে অনেক পরিবর্তনকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অনেক পুরানো থিমকে নতুনভাবে ব্যবহার করা শুরু করেছিলেন। সংস্কৃত নাটকগুলি ধীরে ধীরে ক্লেশ, আনন্দ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে সমাজের কাছাকাছি আসতে শুরু করে। আধুনিক নাট্যকাররা অনুসরণ করেছেন মানুষের চরিত্র, আবেগ এবং অনুভূতির স্বাভাবিক বিকাশ। প্রয়োজনীয় কাব্যিক কল্পনা তাদের নাটকে যথাযথ স্থান দখল করেছে।

ভরতবাক্য, নান্দী একসময় নাটকের অপরিহার্য অংশ ছিল, কিন্তু এখন তা বর্জন করা হয়েছে। একটি নতুন প্রবণতা এখন দৃশ্যমান যা প্রস্তাবনাকে অতিরিক্ত কিছু হিসাবে বিবেচনা করে। সংস্কৃত পর্যায় ধীরে ধীরে তার পুরানো বিস্তৃত রূপ থেকে একটি নতুন সরলীকৃত চেহারায় অগ্রসর হচ্ছে।

ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সংস্কৃত নাটক একটি গঠনের মধ্যে পড়ে। কারণ নাট্যকাররা প্রাচীন ঋষি ভরত কর্তৃক সংকেতকৃত কিছু সু-সংজ্ঞায়িত নাট্যতাত্ত্বিক রীতি অনুসরণ করেছিলেন যেমন ভাষার ক্ষেত্রে, প্রকাশ এবং কৌশল সম্পর্কিত। কিন্তু আধুনিক (বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি-যৌক্তিক) যুগের সংস্কৃত নাট্যকাররা এই আবরণ থেকে বেরিয়ে আসার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এক ধরণের নতুন চেতনা দিয়ে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এবং তাঁদের নাটকে কিছু কিছু পরিবর্তন এনেছিলেন। আধুনিক নাট্যকাররা অতীতের সাথে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে অনেক পরিবর্তনকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অনেক পুরানো ভাবনাকে নতুনভাবে ব্যবহার করা শুরু হয় এই সময়ে। সংস্কৃত নাটকগুলি তাঁদের আনন্দ-বেদনা, আশা-আকাঙ্খার মধ্য দিয়ে সমাজের কাছাকাছি আসতে শুরু করে। আধুনিক নাট্যকাররা অনুসরণ করেছেন মানুষের চরিত্র, আবেগ এবং অনুভূতির স্বাভাবিক বিকাশ। প্রয়োজনীয় কাব্যিক কল্পনা তাঁদের নাটকে যথাযথ স্থান দখল করেছে।

শেষের দিকে সংস্কৃত নাট্যকাররা তাদের নাটকে গান করার প্রবণতা দেখিয়েছেন। পুরোনো নাটকে শ্লোক গাওয়া হত কিন্তু এখন কিছু নাটকে দীর্ঘ গান রয়েছে এবং সেগুলি কোন রাগে গাওয়া হবে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এইভাবে আমাদের কাছে বিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত ভেলঙ্কারের *সঙ্গীতসৌভদ্র* এবং *কালিদাসচরিত* - এর মতো সঙ্গীত নাটক রয়েছে। বরোদার পণ্ডিত মূলাশঙ্কর মাণিকলাল যাজ্ঞিক তাঁর তিনটি ঐতিহাসিক নাটক *সংযোগিতাস্বয়ংবর,* (১৯২৮), *ছত্রপতিসাম্রাজ্য* (১৯২৯) এবং *প্রতাপবিজয়* (১৯৩১) এ গান সম্পর্কে প্রযুক্তিগত

বিবরণ দিয়েছেন। গান সম্পর্কে, তাল, অন্তরা, তাদের স্বরলিপি ইত্যাদি আলোচনা করেছেন। জে.বি. চৌধুরীর নাটকে প্রচুর ভক্তিমূলক গান রয়েছে যা চরিত্র ও আকারে প্রায় পুরাতন স্তোত্রের মতই।

থিম অনুসারে আধুনিক সংস্কৃত নাটকগুলি সাতটি প্রধান বিভাগে পড়ে যথা ১. পৌরাণিক এবং কিংবদন্তি নাটক ২. ঐতিহাসিক নাটক ৩. সামাজিক নাটক ৪. রাজনৈতিক নাটক ৫. জীবনী নাটক ৬. হাস্যরসাত্মক নাটক এবং ৭. বিবিধ- নাটক।

কৌশলগতভাবেও কিছু সংস্কৃত নাটক অতীতের সাথে বিরতি দেয়। পাশ্চাত্য নাটকের মতোই নাটকগুলো এখন দৃশ্যে বিভক্ত হয়ে এসেছে। ভারতবাক্য, নান্দী একসময় নাটকের অপরিহার্য অংশ ছিল কিন্তু এখন তা বর্জন করা হয়েছে। একটি নতুন প্রবণতা এখন দৃশ্যমান যা প্রস্তাবনাকে অতিরিক্ত কিছু হিসাবে বিবেচনা করে। সংস্কৃত পর্যায় ধীরে ধীরে তার পুরানো বিস্তৃত রূপ থেকে একটি নতুন সরলীকৃত চেহারায় অগ্রসর হচ্ছে। আধুনিক যুগের ক্রমবর্ধমান ব্যস্ততার কারণে সমস্ত ভাষার নাট্যকাররা দর্শকদের বিনোদন দেওয়ার জন্য ছোট নাটক, বিশেষ করে একটি অভিনীত নাটক লিখতে ঝুঁকছেন।

সেই দিনগুলি চলে গেছে যখন একজন সংস্কৃতবিদ *রামায়ণ, মহাভারত* বা *পুরাণ*-এর দিকে তাকাতেন শুধুমাত্র তাঁর বিষয়বস্তুর জন্য। ঐতিহ্যের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর সৃজনশীল বুদ্ধি দিয়ে তিনি প্রতিনিয়ত নূতন থিমের সন্ধানে থাকেন। ইতিহাসের বিশাল ক্যানভাসে ক্ষণস্থায়ী দৃষ্টি দিলে তার কোনো অভাব ঘটে না। সংস্কৃত পণ্ডিতদের মধ্যে দিনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলিকে তাঁদের থিম হিসাবে গ্রহণ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে যার ফলশ্রুতিতে *কাশ্মীরসন্ধান-সমুদ্যমহ* এবং *হাইদরবাদবিজয়াম্* এর মতো নাটকগুলি পাওয়া যায়। অন্ধ্র পণ্ডিত নির্পাজে ভীম দ্বারা যথাক্রমে কাশ্মীর এবং হায়দ্রাবাদের সমস্যাগুলির উপর এবং কলকাতার পণ্ডিত জে বি চৌধুরীর ভারতের সেচ নীতির উপর নাটক পাওয়া যায়। লিঙ্গ পরিবর্তন সম্পর্কে সংবাদপত্রে পর্যায়ক্রমিক খবরগুলিও সংস্কৃত নাট্যকারের কল্পনাকে প্রভাবিত করেছে। এই বিষয়ে আমাদের কাছে বেনারস পণ্ডিত অম্বিকাদত্ত ব্যাস দ্বারা *সামবতম্, পুরুষ-রমণীয়ম্* এর মতো কয়েকটি খুব আকর্ষণীয় নাটক রয়েছে। *ভারতবিজয়-নাটক* আমাদের কাছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আগমন থেকে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত ভারতের সম্পূর্ণ ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে।

আধুনিক সংস্কৃত নাটকে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যে ভরতের *নাট্যশাস্ত্রের* রীতি নীতিকে অনুসরণ করে বা কখন না করে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র সৃজন। মনে রেখেও তার থেকে বেরিয়ে এসে নতুন দিক দেখানোর চেষ্টা করা। সেখানে ভাষায়, ভাবে, আঙ্গিকে অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই নাটকগুলি একটি নতুন প্রেরণা সঞ্চার করে। আধুনিক সংস্কৃত নাটকের বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে পাশ্চাত্য নাটক এবং বাংলা, হিন্দি প্রভৃতি ভারতীয় ভাষার নাটকের প্রভাব এই নাটকগুলিকে প্রভাবিত করেছে। সেই কারণে নাট্যতত্ত্বের গ্রন্থগুলিতে যে বিধি নিষেধ করা হয়েছে তার ব্যত্যয় লক্ষ্য করা যায়। নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়ের নাটকেও এই নতুন প্রয়াস দেখতে পাওয়া যায়। এভাবে সংস্কৃত নাটকের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের সূচনা দেখা যায়।

উল্লেখপঞ্জি

[১] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *সাহিত্যদর্পণ,* পৃষ্ঠা ২৫

[২] সীতানাথ আচার্য (সম্পা), *দশরূপক,* ১/৭, পৃষ্ঠা ৭

[৩] তদেব, *দশরূপক,* ৩/১, পৃষ্ঠা ২৬৭

[৪] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), *নাট্যশাস্ত্র,* ১/৭, পৃষ্ঠা ৩

[৫] *তদেব,* ১/১২২, পৃষ্ঠা ১৯

[৬] শ্রী বলদেব উপাধ্যায় (সম্পা), *সংস্কৃত বাঙ্ময় কা বৃহদ্ ইতিহাস* (ষষ্ঠ-খণ্ড), পৃষ্ঠা ২৮-২৯

[৭] এস. বি. রঘুনাথাচার্য (সম্পা), *মর্ডান সংস্কৃত লিটেরেচার: ট্রাডিশন এন্ড ইনোভেশন,* পৃষ্ঠা ১১১

[৮] *তদেব,* পৃষ্ঠা 34

[৯] *তদেব,* পৃষ্ঠা 35

[১০] *তদেব,* পৃষ্ঠা 35-36

[১১] *তদেব,* পৃষ্ঠা 36

[১২] *তত্রৈব*

দ্বিতীয় অধ্যায়:

প্রাচীন ও আধুনিক নাট্যকর্মে অবলোকন

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাচীন ও আধুনিক নাট্যকর্মে অবলোকন

২.০ *বৈয়াসিক-মহাভারত* ও ভারতীয় নাট্যকর্ম: প্রাচীন সংস্কৃত নাটক

বৈয়াসিক-মহাভারত অবলম্বনে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। *বৈয়াসিক-মহাভারত* অবলম্বনে দেশে বিদেশে বহু ভাষায় বহু সাহিত্য রচিত হয়েছে এখানে কেবলমাত্র সংস্কৃত ভাষায় রচিত নাটকের উপরেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

❖ ভাস

প্রাক-কালিদাসীয় নাট্যকারগণের মধ্যে ভাস অন্যতম। বিংশ শতকের পূর্বে ভাস সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় টি গণপতি শাস্ত্রী ত্রিবান্দামে পদ্মনাভপুরমের কাছে মনলিক্কর মঠে দুটি পুঁথিতে ১৩টি সংস্কৃত নাটক আবিষ্কার করেন[১]। ভাসের সময়কাল সম্পর্কে পণ্ডিতমহলে মতপার্থক্য রয়েছে। উইন্টারনিৎসের মতে ভাসের আবির্ভাবকাল কালিদাস থেকে শতবৎসর পূর্বে অর্থাৎ খ্রি.পূ. তৃতীয় শতক। অশ্বঘোষ প্রথম শতকের কবি এবং কালিদাসের সময় হল চতুর্থ শতক সুতরাং তার মধ্যবর্তী সময় অর্থাৎ দ্বিতীয় শতক ভাসের আবির্ভাব কাল বলে মনে করা যেতে পারে। ভাসের এই ১৩টি নাটকের মধ্যে ৭টি *বৈয়াসিক-মহাভারত* অবলম্বনে রচিত–

দূতবাক্য– *বৈয়াসিক-মহাভারতে*র উদ্যোগপর্ব অবলম্বনে একাঙ্ক বিশিষ্ট ব্যায়োগ শ্রেণীর নাটক এটি। নাটকটির নায়ক শ্রীকৃষ্ণ। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পূর্বে পাণ্ডবদের দূত রূপে শ্রীকৃষ্ণ কৌরবদের সভায় এসে শান্তিপ্রস্তাব রাখেন। দুর্যোধন সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং যুদ্ধের উদ্যোগ নেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপ ধারণ করলে ধৃতরাষ্ট্র সৌজন্য প্রদর্শন দ্বারা কৃষ্ণের ক্রোধ শান্ত করেন। নাটকে কোন স্ত্রীচরিত্র নেই[২]।

দূতঘটোৎকচ– *বৈয়াসিক-মহাভারতে*র দ্রোণপর্বের কাহিনী অবলম্বনে একাঙ্কের অঙ্ক শ্রেণীর রূপক এটি। নাটকটির নায়ক ঘটোৎকচ। অভিমন্যু চক্রব্যূহ ভেদ করতে কৌরবদের হাতে নিহত হলে পুত্রশোকে অর্জুন প্রতিগ্রহ গ্রহণের সংকল্প করেন এবং যুদ্ধের জন্য উদ্যোগী হন। এমন সময় পাণ্ডবপক্ষ থেকে কৃষ্ণের দূতরূপে ঘটোৎকচ কৌরবসভায় এসে কৌরবপক্ষের বীরগণের আশু বিনাশের কথা জানান। দূতরূপে ঘটোৎকচের বার্তা নিবেদন ও দুর্যোধনের সাথে বাদ-প্রতিবাদ রূপকটির বিষয়বস্তু। নাটক শেষে ভরতবাক্য লক্ষিত হয় না, এখানে তার বদলে ঘটোৎকচের বাক্য লক্ষ্য করা যায়[৩]।

কর্ণভার– একাঙ্ক বিশিষ্ট ব্যায়োগটি *বৈয়াসিক-মহাভারতে*র কর্ণপর্ব অবলম্বন করে রচিত হয়েছে। ব্যায়োগটির নায়ক কর্ণ। বীররসাত্মক কাহিনীটি কর্ণের মহত্ত্বকে গৌরবোজ্জ্বল করে তুলেছে। যুদ্ধে গমনের প্রাক কালে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশী প্রার্থী ইন্দ্রকে কর্ণ তাঁর সহজাত কবচ কুণ্ডলদ্বয় দান করেন। শল্যরাজের কাছে প্রতারণার বিষয়ে অবহিত হয়েও কর্ণ অবিচল ভাবে সত্য ও ত্যাগের মহিমায় মণ্ডিত হয়ে থাকলেন[৪]।

ঊরুভঙ্গ– সংস্কৃত সাহিত্যে একমাত্র বিয়োগাত্মক নাটক এটি। নাটকটির অপর নাম গদাযুদ্ধ। *বৈয়াসিক-মহাভারতে*র শল্যপর্বের কাহিনী অবলম্বনে ব্যায়োগ শ্রেণীর একাঙ্ক নাটক এটি। *মহাভারতে*র ভয়ংকর যুদ্ধের শেষে ভীম ও দুর্যোধন গদাযুদ্ধে লিপ্ত হন। ভীম কর্তৃক অন্যায় ভাবে দুর্যোধনের ঊরুভঙ্গ হয়। গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রশোক, ভগ্ন ঊরুতে দুর্যোধন কর্তৃক শিশুপুত্রের আরোহণের প্রচেষ্টা এবং অন্তিমে সগৌরবে দুর্যোধনের মৃত্যুবরণ এই নাটকের বিষয়বস্তু[৫]।

মধ্যমব্যায়োগ – *বৈয়াসিক-মহাভারতে*র বনপর্ব অবলম্বনে এটি একটি ব্যায়োগ শ্রেণীর একাঙ্ক নাটক। নাটকটির মুখ্য চরিত্র মধ্যম পাণ্ডব ভীম। ঘটোৎকচ একদিন তার মাতার খাদ্যরূপে এক ব্রাহ্মণ সহ তিনপুত্রকে পান। তার মধ্যে এক পুত্রকে দাবী করেন এবং মধ্যম পুত্রকে সম্মত করায়। তারপর ব্রাহ্মণ পুত্রের আসতে বিলম্ব হলে ঘটোৎকচ মধ্যম বলে আহ্বান করতে থাকে। ডাক শুনে মধ্যম পাণ্ডব ভীম উপস্থিত হন এবং তার সাথে যেতে সম্মত হন। সেখানে উপস্থিত হলে হিড়িম্বা ভীমকে চিনতে পারেন এবং পিতাপুত্রের মিলন হয়[৬]।

পঞ্চরাত্র– *বৈয়াসিক-মহাভারতে*র বিরাটপর্বের কাহিনী অবলম্বনে সমবকার শ্রেণীর তিন অঙ্কের নাটক এটি। দ্রোণাচার্য নাটকটির নায়ক। দুর্যোধন কর্তৃক একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান সম্পাদন হলে দ্রোণাচার্য দক্ষিণা স্বরূপ পাণ্ডবদের জন্য অর্ধরাজ্য প্রার্থনা করেন। শকুনির প্রস্তাবমত পাঁচরাত্রির মধ্যে পাণ্ডবদের সংবাদ আনতে পারলে প্রতিশ্রুতি স্বরূপ দ্রোণাচার্যের দক্ষিণা পূরণ হবে। শর্তমতো পাণ্ডবগণের সংবাদ আনয়নের ফলে পাণ্ডবদের অর্ধরাজ্য প্রদান এই নাটকের বিষয়বস্তু[৭]।

বালচরিত – *বৈয়াসিক-মহাভারতে*র হরিবংশকে অবলম্বন করে পাঁচ অঙ্কের নাটক এটি। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যজীবনের বীরত্বই এই নাটকের মূল বিষয়বস্তু। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম থেকে শুরু করে কংসবধ পর্যন্ত বিভিন্ন কাহিনী এই পাঁচটি অঙ্কে বর্ণিত হয়েছে। এখানে রাধা কিম্বা অন্য গোপীগণের কাহিনী পাওয়া যায় না[৮]।

❖ কালিদাস

সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হলেন কালিদাস। কবির কাল সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও বিভিন্ন সিদ্ধান্ত থেকে মনে করা যেতে পারে কবির আবির্ভাব কাল খ্রি.পূ. দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ শতকের মধ্যে[৯]। *বৈয়াসিক-মহাভারত* অবলম্বনে কালিদাসের একটি নাটক পাওয়া যায় *অভিজ্ঞানশকুন্তলা*।

অভিজ্ঞানশকুন্তলা – *পদ্মপুরাণ* ও *বৈয়াসিক-মহাভারতের* আদিপর্ব অবলম্বনে সপ্ত অঙ্কের কালিদাসের অতুলনীয় সাহিত্যসৃষ্টি এই নাটকটি। নাটকটির নায়ক রাজা দুষ্যন্ত ও নায়িকা শকুন্তলা। একদা রাজা দুষ্যন্ত মৃগয়ায় গিয়ে আশ্রমে শকুন্তলাকে দেখে হৃদয়ে প্রেমভাব জেগে ওঠে এবং তিনি গান্ধর্ব মতে শকুন্তলাকে বিবাহ করেন। পরে দুর্বাসার অভিশাপে শকুন্তলাকে ভুলে গিয়ে প্রত্যাখ্যান করেন। অভিজ্ঞানস্বরূপ অঙ্গুরীয়টি পেয়ে অভিশাপ কেটে যায় এবং রাজার স্মৃতি ফিরে আসে। কিছুকাল পর স্বর্গে ইন্দ্রকে সাহায্য করে রাজ্যে ফেরার পথে মারিচাশ্রমে সপুত্র শকুন্তলার সাথে রাজার পুনর্মিলন হয়[১০]।

❖ ভট্টনারায়ণ

শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন ভট্টনারায়ণ। পণ্ডিতগণের মতে আদিশূরের সময়কাল ৭২৬ থেকে ৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ। ভট্টনারায়ণ আদিশূরের সভাসদ ছিলেন। সুতরাং অনুমান করা যায় যে ভট্টনারায়ণের সময়কাল সপ্তম থেকে অষ্টম শতকের মাঝামাঝি[১১]। *বৈয়াসিক-মহাভারত* অবলম্বনে ভট্টনারায়ণের একটি নাটক পাওয়া যায় বেণীসংহার।

বেণীসংহার– *বৈয়াসিক-মহাভারতের* উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও শল্য পর্বের কাহিনী অবলম্বনে ষষ্ঠ অঙ্কের নাটক এটি। নাটকটির নায়ক ভীম এবং নায়িকা দ্রৌপদী। সভামধ্যে দুঃশাসন দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণ করে লাঞ্ছনা করলে ভীম প্রতিজ্ঞা করেন দুঃশাসনকে হত্যা করবেন। ভীম দুঃশাসনকে হত্যা করে সেই রক্তরঞ্জিত হাতে দ্রৌপদীর বেণী বন্ধন করেন এটি নাটকের বিষয়বস্তু[১২]।

❖ রাজশেখর

নবম শতকের শেষ ভাগ এবং দশম শতকের প্রথম ভাগের প্রসিদ্ধ নাট্যকার ছিলেন রাজশেখর। রাজশেখর তাঁর নাটকগুলির প্রস্তাবনায় নিজবংশ পরিচয় দিতে গিয়ে ‘যাযাবরীয়’ আখ্যায় নিজের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি ছিলেন বহুভাষাবিদ, বিদ্বান ও সার্থক কবি[১৩]। বৈয়াসিক-মহাভারত অবলম্বনে রাজশেখর একটি নাটক রচনা করেন সেটি হল বালভারত।

বালভারত – *বৈয়াসিক-মহাভারতের* আদিপর্ব ও সভাপর্ব অবলম্বনে রচিত নাটকটি দুই অঙ্কের অসমাপ্ত রচনা। নাটকটির নায়ক পাণ্ডব ও নায়িকা দ্রৌপদী। রাজা মহীপালের অনুরোধে রাজশেখর এই নাটকটির রচনা শুরু করলেও কোন অজ্ঞাত কারণে অসম্পূর্ণ রয়ে যায়। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভা থেকে শুরু করে পাণ্ডবদের বনগমন পর্যন্ত কাহিনী এখানে বর্ণিত আছে[১৪]।

❖ রামচন্দ্র সূরি

সংস্কৃত সাহিত্যে অন্যান্য কবিদের মতো রামচন্দ্রসূরির জন্মস্থান, বংশ ও সময় সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। জানা যায় যে গুজরাটের রাজা কুমারপাল (১১৪৩-১১৭৩ খ্রীষ্টাব্দ) তাঁর উত্তরাধিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে আচার্য হেমচন্দ্র তাঁর শিষ্যদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় ও প্রতিভাবান শিষ্য রামচন্দ্রকে তাঁর 'পট্টশিষ্য' বলে ঘোষণা করেছিলেন। রামচন্দ্রের নাটক, নাট্যতত্ত্ব ও স্তোত্র সহ প্রায় ৩০টির অধিক গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়[১৫]। *বৈয়াসিক-মহাভারত* অবলম্বনে রামচন্দ্র সূরির একটি নাটক উপলব্ধ হয়, সেটি হল নির্ভয়-ভীম।

নির্ভয়-ভীম–*বৈয়াসিক-মহাভারতের* আদিপর্বে বর্ণিত ভীম ও বকাসুরের কাহিনী অবলম্বনে রচিত এই নাটকটি ব্যায়োগ শ্রেণীর একাঙ্ক রচনা। একচক্র নগরে বক নামক এক রাক্ষস প্রতিদিন নগরের একজন করে ভক্ষণ করত। ঐ নগরে এক ব্রাহ্মণের গৃহে দ্রৌপদীর সঙ্গে বসবাসকালে পাণ্ডবেরা শুনলেন ঐদিন ব্রাহ্মণের পালা। সেই শুনে দ্রৌপদী বাধা দিয়ে পাণ্ডবদের মধ্যে ভীমকে বক রাক্ষসের কাছে পাঠাতে চাইলেন। ভীম সকলের অনুমতি নিয়ে বকাসুরের কাছে উপস্থিত হয়ে তাকে হত্যা করলেন[১৬]।

❖ বৎসরাজ

বৎসরাজ ছিলেন একজন সংস্কৃত নাট্যকার ও কবি। কালিঞ্জরের রাজা পরমার্দিদেবের (১১৬৩-১২০৩) শাসনকালে বৎসরাজ একজন মন্ত্রী ছিলেন। খ্রীস্টীয় ১২-১৩ শতকে *বৈয়াসিক-মহাভারত* অবলম্বনে বৎসরাজ ত্রিপুরদাহ, কিরাতার্জুনীয় ইত্যাদি ছয়টি নাটক রচনা করেন[১৭]।

ত্রিপুরদাহ– *বৈয়াসিক-মহাভারতে*র কর্ণপর্বে বর্ণিত কাহিনী অবলম্বনে চার অঙ্কের নাটকটি ডিম শ্রেণীর রচনা। নারদ ও রাহুর বাগযুদ্ধ থেকে শুরু করে মহাদেবের ত্রিপুরদহন পর্যন্ত বর্ণনা এখানে দেখা গিয়েছে। স্বকল্পনাশক্তিতে মহাভারতীয় কাহিনীর যে নাট্যরূপ দেখিয়েছেন তা কবির নৈপুণ্যতার পরিচয়[১৮]।

কিরাতার্জুনীয়–ভারবির *কিরাতার্জুনীয়* মহাকাব্যকে অনুসরণ করে বৎসরাজ একাঙ্ক ব্যায়োগ রচনা করেন। নাটকের বিষয়বস্তু হল দিব্য অস্ত্র লাভের জন্য অর্জুন মহালয়ে গিয়ে তপস্যা শুরু করেন। স্বর্গের অপ্সরারা ধ্যান ভঙ্গ করতে এলেও একাগ্র চিত্তে ধ্যানে মগ্ন থাকেন। মহাদেব অর্জুনের পরীক্ষা নিতে উপস্থিত হন। তিনি কিরাতের ছদ্মবেশে উপস্থিত হন এবং উভয়ের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। পরিশেষে মহাদেব তাঁর বীরত্বে খুশি হয়ে তাঁকে বরদান করেন[১৯]।

নাটকের নাম	রচয়িতা	অঙ্ক	কাল	চরিত্র
দূতবাক্য	ভাস	১	দ্বিতীয় শতক	কৃষ্ণ, দুর্যোধন, ধৃতরাষ্ট্র
দূতঘটোৎকচ	ভাস	১	দ্বিতীয় শতক	ধৃতরাষ্ট্র, কৃষ্ণ, ঘতোৎকচ, দুর্যোধন
কর্ণভার	ভাস	১	দ্বিতীয় শতক	কর্ণ, শলা, ইন্দ্র, দেবদূত
উরুভঙ্গ	ভাস	১	দ্বিতীয় শতক	কৃষ্ণ, ভীম, দুর্যোধন
মধ্যমব্যায়োগ	ভাস	১	দ্বিতীয় শতক	ভীম, হিরিম্বা, ঘতোৎকচ
পঞ্চরাত্র	ভাস	৩	দ্বিতীয় শতক	ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্যোধন
বালচরিত	ভাস	৫	দ্বিতীয় শতক	শ্রীকৃষ্ণ, কংস
অভিজ্ঞানশকুন্তল	কালিদাস	৭	চতুর্থ শতক	দুষ্যন্ত, শকুন্তলা, মাধব্য, কণ্ব
বেণীসংহার	ভট্টনারায়ণ	৬	সপ্তম শতক	দ্রৌপদী, ভীম, দুর্যোধন
নৈষধানন্দ	ক্ষেমীশ্বর	৭	দশম শতক	নল
বালভারত	রাজশেখর	২	দশম শতক	পাণ্ডব, দুর্যোধন, দুঃশাসন, দ্রৌপদী
সুভদ্রা-ধনঞ্জয়	কুলশেখরবর্মা	৫	একাদশ শতক	অর্জুন, সুভদ্রা
ত্রিপুরদাহ	বৎসরাজ	৪	দ্বাদশ শতক	ত্রিপুরাসুর, শিব
সমুদ্রমন্থন	বৎসরাজ	৩	দ্বাদশ শতক	দেবগণ, অসুরগণ
কিরাতার্জুনীয়	বৎসরাজ	১	দ্বাদশ শতক	মহাদেব, অর্জুন
রুক্মিণীহরণ	বৎসরাজ	৪	দ্বাদশ শতক	কৃষ্ণ, রুক্মিণী
নির্ভয়ভীম	রামচন্দ্রসূরি	১	দ্বাদশ শতক	ভীম, বক রাক্ষস
সুভদ্রাপরিণয়	রামদেবব্যাস	১	১৫শ শতক	সুভদ্রা, অর্জুন
সুভদ্রাহরণ	মাধবভট্ট	১	১৫শ শতক	সুভদ্রা, অর্জুন
বিদগ্ধমাধব	রূপগোস্বামী	৭	১৬শ শতক	
ললিতমাধ	রূপগোস্বামী	১০	১৬শ শতক	
কংসবধ	শেষকৃষ্ণ		১৭শ শতক	কৃষ্ণ, কংস

এই সব নাটকগুলিতে *বৈয়াসিক-মহাভারতে*র ঘটনা গ্রহণ করা হলেও নাট্যকারেরা তাদের স্বকীয়তা প্রকাশ করার জন্য ঘটনার কিছু কিছু পরিবর্তন করেছেন এবং তার ফলেই সংস্কৃত-সাহিত্য-সম্ভার এই সম্পদে সমৃদ্ধ হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় মহাকবি কালিদাসের *অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্* নাটকে *বৈয়াসিক-মহাভারতে*র ঘটনাকে হুবহু অনুসরণ না করে এই মহনীয় নাটকের সৃষ্টি করতে পেরেছেন।

২.১ আধুনিক-সংস্কৃতসাহিত্যে *বৈয়াসিক-মহাভারত* অবলম্বনে রচিত নাটকের অবলোকন

বৈয়াসিক-মহাভারতের স্বর্গারোহণ পর্বে বলা হয়েছে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ পুরুষার্থ চতুষ্টয় বিষয়ে যা এখানে বর্ণিত আছে তা অন্যান্য গ্রন্থে আছে, যে বিষয়ের কথা এখানে বলা হয়নি তা কথাও পাওয়া যাবে না–

ধর্মে চার্থে চ কামে চ মোক্ষে চ ভরতর্ষভ।
যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন তৎক্বচিৎ।।[২০]

বৈয়াসিক-মহাভারত হল ভারতের দুই অভ্রংলিহ মহাকাব্যের মধ্যে অন্যতম। এই মহাকাব্যের কথাকে আশ্রয় করে অসংখ্য রূপক রচিত হয়েছে। প্রাচীনকালের ন্যায় আধুনিককালের কবিরা *বৈয়াসিক-মহাভারতে*র কাহিনী অবলম্বনে বহু কাব্যরত্ন নির্মাণ করেছেন।

মাণবকগৌরব–

সাতটি অঙ্কে রচিত মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্যের নাটক এটি[২১]। *বৈয়াসিক-মহাভারতে*র আদিপর্বস্থ আয়োধধৌম ও তাঁর শিষ্য উপমন্যু, কাত্যায়ন, হারীত, বৈশম্পায়ন প্রভৃতির উপাখ্যান এই নাটকের মূল বিষয়বস্তু। মাণবকগৌরব অর্থাৎ শিষ্যের গৌরব বা গুরুভক্তি। পঞ্চাশের দশকে সম্ভবত ছাত্রসমাজে শৃঙ্খলার অভাব, গুরুর প্রতি অশ্রদ্ধা নাট্যকারকে দগ্ধ করেছিল, তারই ফলশ্রুতি এই নাটকটি। ১৯৫৮ সালে নাটকটি প্রকাশিত হয়।

প্রমদ্বরা–

বৈয়াসিক-মহাভারতে 'রুরু প্রমদদ্বরা' কাহিনী অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। পঞ্চানন রায় এই কাহিনীকে অবলম্বন করে *প্রমদ্বরা* নাটকটি রচনা করেছেন[২২]। নাটকটি ১৯৩৫ সালে লেখা হয়েছে। নাটকটিতে তৎকালীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, নৈতিক অবক্ষয়, দুর্ভিক্ষের হাহাকার প্রভৃতি চিত্র বর্ণিত হয়েছে। অভিরাজ রাজেন্দ্র মিশ্রের একই নামে একটি নাটক পাওয়া যায়।

একলব্য-গুরুদক্ষিণা–

বৈয়াসিক-মহাভারতের আদিপর্বে বর্ণিত দ্রোণাচার্য ও একলব্যের কাহিনী অবলম্বনে দুর্গাপ্রসন্ন বিদ্যাভূষণ *একলব্য-গুরুদক্ষিণা* নাটকটি রচনা করেছেন[২৩]। নাটকটিতে ছটি অংক দেখতে পাওয়া যায়। নাটকটিতে কাহিনী বিন্যাসে তিনটি পর্ব লক্ষ্য করা যায়। প্রথম পর্বে দ্রোণাচার্যের দারিদ্র নিপীড়িত অবস্থার বর্ণনা আছে, দ্বিতীয় পর্বে দ্রোণের দারিদ্র্যাতিশয় বর্ণিত হয়েছে এবং তৃতীয় পর্বে দেখা যায় একলব্য অস্ত্রশিক্ষা লাভের জন্য দ্রোণাচার্যের কাছে আসেন, নীচ জাতি বলে প্রত্যাখ্যান, দ্রোণের মূর্তি নির্মাণ করে তপস্যা বলে একলব্যের ধনুর্বিদ্যা লাভ, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি বিহীন হয়েও দ্রোণাচার্য ও অর্জুনকে পরাস্ত করে একলব্যের জয় বর্ণিত হয়েছে। নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৯৭১ সালে।

গিরিধর-সংবর্ধন –

কৃষ্ণের গিরি গোবর্দ্ধন ধারণের কাহিনী অবলম্বনে শ্রীজীব-ন্যায়তীর্থ *গিরিধর-সংবর্ধন* নামক নাটকটি রচনা করেছেন[২৪]। নাটকটি বীররসাশ্রিত। রাষ্ট্রভাষা সম্মেলনের অধিবেশন উপলক্ষে নাটকটি অভিনীত হয়।

বিড়ম্বনা–

বৈয়াসিক-মহাভারতের 'কর্ণকুন্তী-সংবাদ' অবলম্বনে রামকৃষ্ণ শর্মা রচনা করেন *বিড়ম্বনা* নামক নাটকটি[২৫]। নাটকটিতে ছয়টি অংক দেখতে পাওয়া যায়। কর্ণ এই নাটকের নায়ক। নাটকে দেখা যায় কুন্তী কর্ণের কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি জানান তিনি কেবল পাণ্ডবজননী নন কর্ণেরও জননী। কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত তিনি জানান কীভাবে সূর্যদেবের প্রভাবে জন্ম হয় এবং লোক অপবাদের ভয়ে তিনি কখনও তা প্রকাশ করেন নি। কুন্তী পাণ্ডবপক্ষ যোগের কথা বললে কর্ণ অনিচ্ছা প্রকাশ করেন এবং তার প্রতিজ্ঞার কথা জানান। কুন্তী জানান দাতা কর্ণের কাছ থেকে কেউই প্রত্যাখ্যাত হয় না শুনেছেন। তখন কর্ণ বলেন তাঁর চারপুত্র জীবিত থাকবে কিন্তু কর্ণ ও অর্জুনের মধ্যে কেবল একজন রক্ষা পাবে।

একচক্র–

বৈয়াসিক-মহাভারতের আদিপর্বের বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে এন্ রঙ্গনাথ শর্মা *একচক্র* নামক নাটকটি রচনা করেন[২৬]। নাটকটিতে চারটি অংক দেখতে পাওয়া যায়। নাটকটি ১৯৯০ সালে প্রকাশিত হয়। জতুগৃহ থেকে বেরিয়ে এসে পাণ্ডবেরা ব্যাসদেবের নির্দেশ মতো একচক্র নগরীতে এসে ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ করে এক বিপ্রের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই নগরীর এক পাহাড়ে বকরাক্ষস বাস করতেন। রাজার সঙ্গে বক রাক্ষসের চুক্তি হয়েছিল প্রতিদিন দুটি করে মহিষ ও একজন করে পুরুষকে সে ভক্ষণ করবে। যে গৃহে পান্ডবরা উপস্থিত হয়েছিল সেই বারে তাদের পালা ছিল গৃহে সেই বিপ্রের স্ত্রী কন্যাদের ক্রন্দন শুনে কুন্তী সেখানে এসে উপস্থিত

হন এবং তিনি বলেন তার পুত্র অর্থাৎ ভীম সেই রাক্ষসের কাছে যাবে এই বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে নাটকটি রচিত হয়েছে। নাট্যকার বর্তমান সমাজের সমসাময়িক সমস্যা পরিবার-পরিজনের মধ্যে প্রীতি ভালবাসা সম্পর্ক স্বার্থপরতা ইত্যাদিকে তুলে ধরেছেন এই নাটকে।

নাগ-নিস্তার–

বৈয়াসিক-মহাভারতে বর্ণিত জনমেজয়ের কাহিনী অবলম্বনে শ্রীজীব-ন্যায়তীর্থ নাগনিস্তার নাটকটি রচনা করেন[২৭]। নাটকটিতে ছটি অংক আছে। নাটকটির মূল রস বীর হলেও নাটকটিতে অদ্ভুত রস অঙ্গী রস হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে।

বিদুলাপুত্রী–

বৈয়াসিক-মহাভারতের উদ্যোগ পর্বে বিদুলার উপাখ্যান অবলম্বনে এইচ্ ভি. নাগরাজ রাও *বিদুলাপুত্রী* নামক নাটকটি রচনা করেন[২৮]। তেজস্বিনী ক্ষত্রিয় নারী বিদুলা সৌবীররাজের স্ত্রী ছিলেন। তার পুত্রের নাম ছিল সঞ্জয়। সৌবীররাজের মৃত্যুর পর তার রাজ্য সিন্ধুরাজ কর্তৃক গৃহীত হয়। রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য পুত্র সঞ্জয়কে যুদ্ধার্থে উত্তেজিত ও উৎসাহিত করেন বিদুলা এবং অবশেষে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। বিদুলার উপাখ্যানের মাধ্যমে কবি এখানে সমাজকে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বার্তা তুলে ধরেছেন।

যুগ যুগ ধরে *বৈয়াসিক-মহাভারত*কে অবলম্বন করে বহু নাটক রচিত হলেও আধুনিক কালের নাটকে *বৈয়াসিক-মহাভারত* ছাড়াও বিভিন্ন ভাষায় প্রচলিত *মহাভারতের* প্রভাব পড়েছে। *বৈয়াসিক-মহাভারত*কে অনুসরণ করে প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের প্রভাব ও সামাজিক প্রেক্ষাপট আধুনিক সংস্কৃত নাটককে বিভিন্ন ভাবে প্রভাবিত করেছে। এই প্রভাবে সুফল এবং কুফল দুইই দেখতে পাওয়া যায়।

উল্লেখপঞ্জি

[১] ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃষ্ঠা ৩০৯

[২] তদেব, পৃষ্ঠা ৩১২

[৩] তদেব, পৃষ্ঠা ৩১৩

[৪] তদেব, পৃষ্ঠা ৩১২

[৫] তত্রৈব

[৬] তদেব, পৃষ্ঠা ৩১৪

[৭] তদেব, পৃষ্ঠা ৩১৩

[৮] তত্রৈব

[৯] তদেব, পৃষ্ঠা ১৪৭

[১০] তদেব, পৃষ্ঠা ১৫৩

[১১] তদেব, পৃষ্ঠা ৩৩০

[১২] তদেব, পৃষ্ঠা ৩৩১

[১৩] তদেব, পৃষ্ঠা ৩৩৫

[১৪] তদেব, পৃষ্ঠা ৩৩৭

[১৫] তদেব, পৃষ্ঠা ৩৪৮

[১৬] তত্রৈব

[১৭] তদেব, পৃষ্ঠা ৩৪৭

[১৮] তত্রৈব

[১৯] তত্রৈব

[২০] হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ (সম্পা), *বৈয়াসিক-মহাভারত*, স্বর্গারোহণ পর্ব্ব ৫/৪৯, পৃষ্ঠা ৪২

[২১] ঋতা চট্টোপাধ্যায় (সম্পা), *আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য ১৯১০-২০১০ ছোটগল্প ও নাটক*, পৃষ্ঠা ১৮৪

[২২] তদেব, পৃষ্ঠা ১৭২

[২৩] তদেব, পৃষ্ঠা ১৮০

[২৪] তত্রৈব

[২৫] তদেব, পৃষ্ঠা ১৭৫

[২৬] তদেব, পৃষ্ঠা ১৭৯

[২৭] তদেব, পৃষ্ঠা ১৮০

[২৮] তদেব, পৃষ্ঠা ১৮৩

তৃতীয় অধ্যায়:

মহাকবি নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

মহাকবি নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়

৩.০ ব্যক্তিজীবন

অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত যশোর জেলার এক প্রান্তিক গ্রাম সারুলিয়া। আজও এই গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে নবগঙ্গা। কত শহর গ্রাম গঞ্জ পার করে বয়ে চলেছে, কত মানুষের সুখ দুঃখ হাসি কান্না সাক্ষী। এই সারুলিয়া গ্রামই ছিল নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়ের পৈতৃক বাসস্থান। তাঁর মাতুলালয় ছিল ফরিদপুরে। পিতার নাম ছিল রামগোপাল মুখোপাধ্যায়, মাতার নাম দীনতারিণী দেবী। মুখোপাধ্যায় বংশের অন্যতম ছিলেন হরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সম্পর্কে ইনি রামগোপাল মুখোপাধ্যায়ের প্রপিতামহ। এনার এক পুত্রের কথা জানা যায় যার নাম মধুসূদন মুখোপাধ্যায়। তাঁর ধর্মপত্নী মহেশ্বরী। যজ্ঞেশ্বর এনাদের একমাত্র পুত্র বলে জানা যায়। যজ্ঞেশ্বর ছিলেন নাট্যমোদী। তিনি নাটকের দল তৈরি করে নাটক করে সেই যুগে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় হয়তো সেই ধারা থেকে নাটকের প্রতি আকৃষ্ট হন। যজ্ঞেশ্বরের ধর্মপত্নী হলেন শ্যামাসুন্দরী। তাঁর দশপুত্র, এক কন্যা ছিলেন বলে জানা যায়। তাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র হলেন রামগোপাল –“যজ্ঞেশ্বরাত্মজো দ্বিজঃ রামগোপাল নাম বৈ।”[১]। তিনি ছাত্র অবস্থায় যশোর ছেড়ে হাওড়া চলে আসেন। জানা যায় তিনি বীরেশ্বর তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কাছে অধ্যয়ন করেন এবং পরে তাঁর অনুরোধে সেই চতুষ্পাঠীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। রামগোপাল মুখোপাধ্যায় ব্যাকরণ, কাব্য, পুরাণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রাবীণ ছিলেন। কিন্তু তিনি সেই যুগে স্মৃতি শাস্ত্রে প্রথম সারির অধ্যাপকগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন স্বীয় দক্ষতায়। নিত্যানন্দ হয়ত সেই ঐতিহ্য বজায় রেখে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের পাশাপাশি স্মৃতিশাস্ত্রেও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। রামগোপাল মুখোপাধ্যায়ের ধর্মপত্নী ছিলেন দীনতারিণী দেবী–“তস্য পত্নী চ দীনতারিণী স্নেহময়ী সদা।”[২] তাঁদের ছয় কন্যা কমলা, বিমলা, দুর্গা, অন্নপূর্ণা, গৌরী ও লক্ষ্মী এবং পাঁচ পুত্র বিজয়নাথ, গিরিজানাথ, চিত্তানন্দ, নিত্যানন্দ ও শ্যামসুন্দর। অল্প কয়েক বছর ব্যবধানে রামগোপাল বেশ কয়েকজন পুত্রকন্যাকে (কমলা, বিমলা ও শ্যামসুন্দর) হারিয়ে ছিলেন। ৭২ বছর বয়সে ১৯৪৬ সালে রামগোপাল মুখোপাধ্যায় পরলোক গমন করেন। রামগোপাল মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর আগে তাঁর এক কন্যা ও চার পুত্র জীবিত ছিল। এই পাঁচ জনের মধ্যে নিত্যানন্দই ছিলেন সর্ব কনিষ্ঠ–“তেষামেব কনিষ্ঠঃ সঃ নিত্যানন্দো হি বুদ্ধিমান্”[৩], যদিও তাঁর জন্মের পরে রামগোপালের আরও এক সন্তানের জন্ম হয়, কিন্তু তাঁর অকাল মৃত্যুতে তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম হয় ১৯২৩ সালের ১০ই এপ্রিল। নিত্যানন্দকে তাঁর বাড়ির বড়রা নিতাই বলে আহ্বান করতেন। নিত্যানন্দের বাল্যকালটা খুব সুখপ্রদ ছিল না। তাঁর মাতৃবিয়োগ হয় আঠারো বছর বয়সে এবং পিতৃবিয়োগ হয় চব্বিশ বছর বয়সে। তাঁর শারীরিক অসুস্থতা বার বার তাঁর জীবনতরীকে ডুবিয়ে দিতে চেয়েছে। ঈশ্বরের অপার করুণা পিতামাতার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় নিত্যানন্দ শীঘ্রই স্বাভাবিক

জীবনে ফিরে আসেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন সাত্ত্বিক ও নিষ্ঠাবান। ধর্মীয় নিয়মানুবর্তিতা তাঁর জীবনকে গড়ে তুলেছিলেন নিখুঁত পরিবারের মতো। রামগোপাল তাঁর তিন সন্তানকে ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত করলেও নিত্যানন্দকে একেবারে তাঁর নিজের ভাবাদর্শে গড়ে তুলেছিলেন। সেই কারণেই তাঁর জীবন বৃত্তে পিতার ন্যায় নিত্যপুজা-হোম-যজন-যাজন ও অধ্যাপনার ইত্যাদি এসেছিল–

> পিতুরিচ্ছাবশাত্তেন সামর্থ্যেঽপি বিরাজিতে।
> বিহায়াঙ্গলবিদ্যাস্তু পঠ্যতে সংস্কৃতং মুদা।।[৪]

নিত্যানন্দ পিতার কাছে সংস্কৃত শিক্ষার অধ্যয়ন শুরু করলেও সংস্কৃত কলেজের স্বনামধন্য পণ্ডিতদের কাছে অধ্যয়ন করেন এবং তাদের সান্নিধ্য লাভ করেন। তার ফলে সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ে অবাধ বিচরণ করতে পারতেন। তিনি যে সমস্ত স্বনামধন্য পণ্ডিত মশাইয়ের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম মহামহোপাধ্যায় কালিপদ তর্কাচার্য, ভুপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, নিত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ, অনন্তলাল তর্কতীর্থ এবং অধ্যাপক শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ–

> রামগোপালভূপেন্দ্রো কালীপদশ্চ বিশ্রুতাঃ।
> চিন্নস্বামী-সরোজশ্চ শ্রীজীবোঽনন্ত এব চ।।[৫]

নিত্যানন্দ কাব্য, মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, পুরাণ, প্রাচীন ন্যায়, নব্যস্মৃতি এবং প্রাচীন মুখোপাধ্যায় বিষয়ের উপর উপাধি লাভ করেন–

> ন্যায়-পুরাণশাস্ত্রে চ ব্যাকরণে তথা স্মৃতৌ।
> মীমাংসাং তথা কাব্যে পাণ্ডিত্যমাপ্লুবান্ বুধঃ।।[৬]

স্মৃতি (প্রাচীন ও নব্য) ইত্যাদি বিবিধ শাস্ত্রে অবাধ জ্ঞানের জন্য তিনি বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে স্বর্ণপদক অর্জন করেন–

> প্রাপ্য প্রজ্ঞাং হি শাস্ত্রেষু স্মৃত্যাদিবিবিধেষু চ।
> স্বর্ণরৌপ্যময়ানি বৈ লব্ধানি পদকানি হি।।[৭]

পিতার ইচ্ছানুসারে ১৯৪৪ সালে ২১ বছর বয়সে নারায়ণ ভট্টাচার্যের কন্যা শ্রীমতী জয়ন্তী দেবীর সঙ্গে নিত্যানন্দের বিবাহ সম্পন্ন হয়। নিত্যানন্দের ব্যক্তিগত ও সারস্বতজীবনে সহধর্মিণীর অবদান তিনি স্বীকার করেছেন–

> পত্নী দেবী জয়ন্তী যা সর্বকর্মসু সেবিকা।
> নিত্যানন্দস্য তৃপ্তয়ে দত্তবতী হি জীবনম্।।[৮]

নিত্যানন্দের ছয়পুত্র যথাক্রমে দেবব্রত, শিব, শ্যামাপ্রসাদ, অনন্তপ্রসাদ, বিশ্বজিৎ ও অরিন্দম এবং দুই কন্যা শান্তা ও সুতপা–

ষট্পুত্রাশ্চ তয়োর্যথা কন্যে দ্বে পরমার্থিকে।
তয়োঃ কৃপাবশাদেব লভন্তে সুখসাগরম্।।[৯]

৩.১ মহাকবির কর্মজীবন

তাঁর কর্মময় জীবন আরম্ভ হয়েছিল কোড়ারবাগান চতুষ্পাঠীতে (বর্তমান নাম রামগোপাল চতুষ্পাঠী) পিতা রামগোপাল স্মৃতিরত্নের সহকারী অধ্যাপকরূপে – "রামগোপালসংজ্ঞায়াং চতুষ্পাঠ্যাং নিয়োজিতঃ।"[১০] ঐ চতুষ্পাঠীতেই প্রধান অধ্যাপক হন পিতৃবিয়োগের পর। তারপর ১৯৫৬ সালে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের অধ্যাপক রূপে নিযুক্ত হন নবদ্বীপ রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ে–

নবদ্বীপস্থরাজিতে মহাবিদ্যালয়ে শুভে।
প্রাধ্যাপকপদং প্রাপ্য গতবাংস্তত্র বৈ বুধঃ।।[১১]

সেখানে কয়েক বছর অধ্যাপনার পরে তিনি ১৯৬৬ সালে কলিকাতা সরকারী কলেজে (বর্তমানে সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়) অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন–

লব্ধাধ্যাপককার্যং হি কালিকাতাস্থ রাষ্ট্রীয়ে।
প্রসিদ্ধে সংস্কৃতে চৈব মহাবিদ্যালয়ে শুভে।।[১২]

১৯৮৮ সালে সংস্কৃত কলেজ থেকেই অবসর গ্রহণ করেন। মহাবিদ্যালয়ের কাজ থেকে সরকারী নিয়মে অবসর গ্রহণ করার পর তিনি তৎকালীন অধ্যক্ষ ডঃ দিলীপ কাঞ্জিলাল মহোদয়ের অনুরোধে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক পদে ঐ মহাবিদ্যালয়ের মহাচার্য বিভাগে নিযুক্ত হন। সেখানে কয়েক বছর অধ্যাপনা করেন। অবসরের পর তিনি হাওড়া সংস্কৃত সাহিত্য সমাজ এবং বিজয়কুমার সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়েও অধ্যাপনা করেন বলে জানা যায়। তিনি নিখিলবঙ্গ-সংস্কৃতসেবি-সমিতি, সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ সংস্কৃত শিক্ষা সংসদের প্রতিষ্ঠা ও বঙ্গ বিবুধ জননী সভা (নবদ্বীপ) ইত্যাদি বিভিন্ন সংস্থার কর্মসমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৯৬ সালে ১০ই আগস্ট তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের মৌলিক অবদানের জন্য ভারত সরকার প্রদত্ত রাষ্ট্রপতি পুরষ্কারে সম্মানিত হন–

ভারতসর্বকারস্য রাষ্ট্রপতিমহোদয়ৈঃ।
প্রদত্তশ্চ পুরস্কার আজীবনসুমানিতঃ।।[১৩]

সংগঠক হিসাবে তিনি ছিলেন অসাধারণ। সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন কালে তিনি বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদে সর্বকনিষ্ঠ সদস্যরূপে নির্বাচিত হয়েছিলেন। সদস্যপদে থাকাকালীন তিনি সংস্কৃত সাহিত্য প্রচার ও প্রসার

সম্বন্ধে প্রভূত প্রচেষ্টা করেছিলেন। তারই পরিণতিতে হাওড়া সংস্কৃত সাহিত্য সমাজের উত্তর উত্তর শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং তিনি হাওড়া সংস্কৃত সাহিত্য সমাজের প্রাণপুরুষ হয়ে ওঠেন। তিনি স্মৃতিশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও সাহিত্যে তাঁর অনুরাগ ছিল প্রগাঢ়। এর ফলে সাহিত্যে বিশাল অবদানের কথা জানা যায়। তাঁর গুণাবলীতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন বহু মহাপুরুষ। তাঁর মধ্যে অন্যতম ছিলেন মহাপুরুষ ওঙ্কারনাথ। তিনি ওঙ্কারনাথের স্নেহধন্য ছিলেন। তাঁর ফলে ভারতের নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ও সংস্কৃত ভাষার প্রচার ও প্রসারে তিনি ছিলেন ওঙ্কারনাথের সঙ্গী। ওঙ্কারনাথ ছাড়াও তাঁর সারস্বত জীবনে ও আধ্যাত্মিক জীবনে যে মনীষীদের অবদান চিরস্মরণীয় তাঁদের মধ্যে তৈলঙ্গস্বামী, সর্বানন্দ স্বামী, সাধক বামাখ্যাপা ইত্যাদি খুবই উল্লেখযোগ্য। তিনি ভারতী চতুষ্পাঠী, নবদ্বীপ থেকে মহাকবি উপাধি লাভ করেন। এছাড়াও মহোপাধ্যায় বিবিধ উপাধি অর্জন করেছিলেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে।

এর পাশাপাশি সংস্কৃত শিক্ষার জন্য নানা ভাবে কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। যখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ দীর্ঘদিন টোলের পরীক্ষা বন্ধ রেখেছিল তখন তিনি টোলের শিক্ষাকে চালু রাখার জন্য বিকল্প পরীক্ষার ভাবনা ভেবেছিলেন। শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ সংস্কৃত শিক্ষা সংসদের সম্পাদকরূপে তিনি বিকল্প পরীক্ষার পরিকল্পনা করেন এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এর অনেক আগেই তিনি হাওড়া সংস্কৃত সাহিত্য সমাজের উদ্যোগে বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আধুনিক বিষয়ের সঙ্গে সংস্কৃত রেখে একটি বিকল্প শিক্ষা (বিদ্যাতীর্থ পরীক্ষা) তিনি প্রবর্তন করেন। ১৯৯৬ সালে রাষ্ট্রপতির পুরস্কার পাওয়ার পর তাঁর মনের একটা বড় পরিবর্তন হয়ে যায়। তিনি তাঁর প্রাপ্ত পুরস্কারের প্রতি মর্যাদা রাখতে লেখা নিয়ে ব্যস্ত হন আগের তুলনায়। তিনি অনুভব করতে থাকেন যে সংস্কৃত শিক্ষার জগতে একটা বড় শূন্যতা নেমে আসছে। তিনি সংস্কৃতের শিক্ষক শিক্ষিকাদের শিক্ষার ভিত শক্ত করে তোলার জন্য তাঁদের উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু এই কাজে তেমন সাড়া পান নি। এই সময়ে দেখা যায় যে তাঁর মধ্যে তীব্র হতাশা বৃদ্ধি পায়। সমস্ত জীবন যিনি কোন প্রতিকূলতাকে ভয় পান নি, সেই তিনি ক্রমশঃ নিজেকে প্রত্যাহার করতে থাকেন। এরপর তাঁর পরিবারে একটি অভাবিত বিপর্যয় তাঁকে সাংসারিক ও সামাজিক জীবন থেকে প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য করে। এই অবস্থায় শেষ কয়েক বছর কাটানোর পর ২০০৮ সালে ৪ঠা আগস্ট ৮৫ বছর বয়সে তাঁর অন্তরাত্মা পার্থিব শরীর ত্যাগ করে আমাদের থেকে অনেক দূরে চলে যান। কিন্তু তিনি রয়ে গেলেন তাঁর কাজের মাধ্যমে অমর হয়ে।

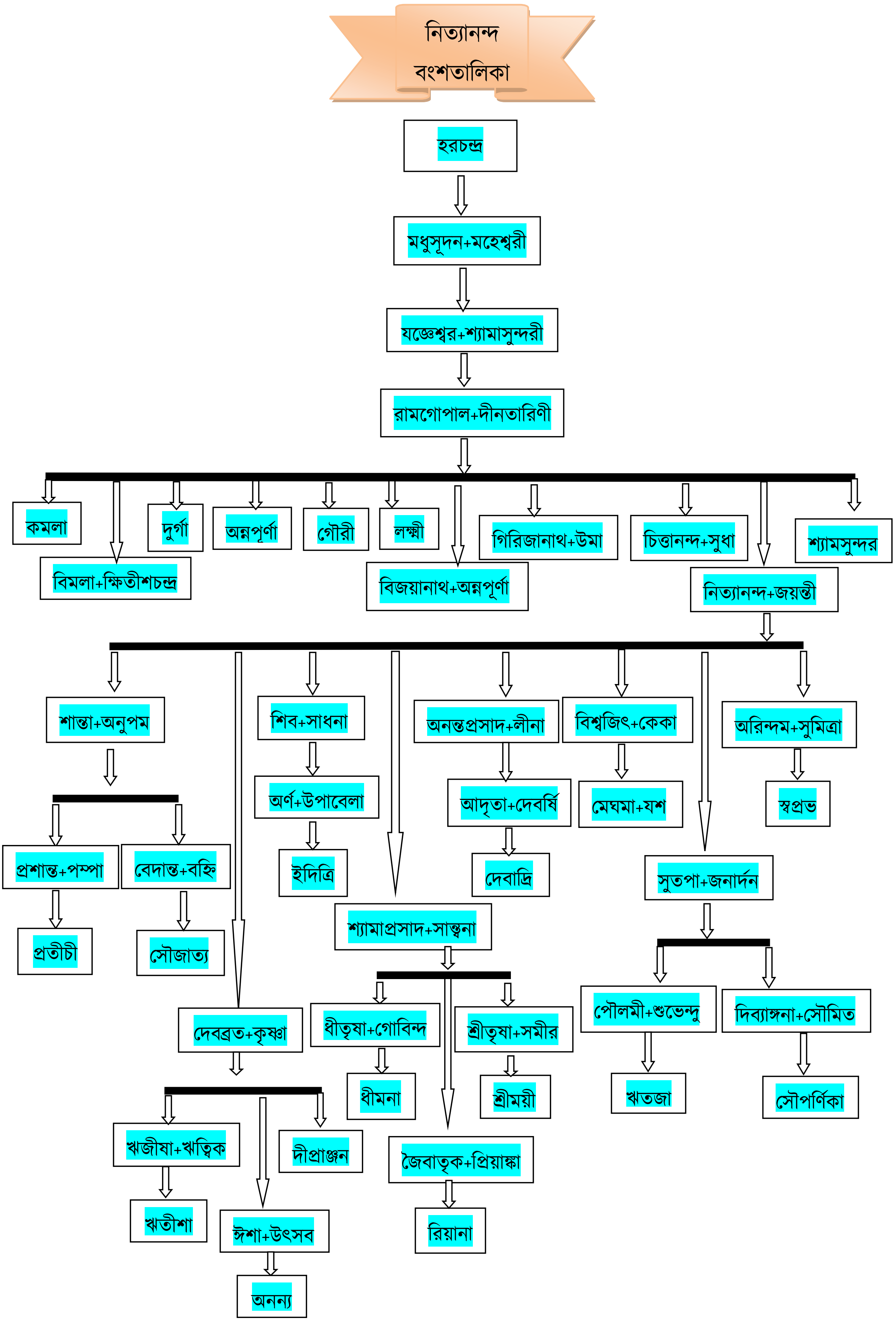
নিত্যানন্দ
বংশতালিকা
হরচন্দ্র
মধুসূদন+মহেশ্বরী
যজ্ঞেশ্বর+শ্যামাসুন্দরী
রামগোপাল+দীনতারিণী
কমলা
দুর্গা
অন্নপূর্ণা
গৌরী
লক্ষ্মী
গিরিজানাথ+উমা
চিত্তানন্দ+সুধা
শ্যামসুন্দর
বিমলা+ক্ষিতীশচন্দ্র
বিজয়ানাথ+অন্নপূর্ণা
নিত্যানন্দ+জয়ন্তী
শান্তা+অনুপম
শিব+সাধনা
অনন্তপ্রসাদ+লীনা
বিশ্বজিৎ+কেকা
অরিন্দম+সুমিত্রা
অর্ণ+উপাবেলা
আদৃতা+দেবর্ষি
মেঘমা+যশ
স্বপ্রভ
প্রশান্ত+পম্পা
বেদান্ত+বহ্নি
ইদিত্রি
দেবাদ্রি
সুতপা+জনার্দন
প্রতীচী
সৌজাত্য
শ্যামাপ্রসাদ+সান্ত্বনা
দেবব্রত+কৃষ্ণা
ধীতৃষা+গোবিন্দ
শ্রীতৃষা+সমীর
পৌলমী+শুভেন্দু
দিব্যাঙ্গনা+সৌমিত
ধীমনা
শ্রীময়ী
ঋতজা
সৌপর্ণিকা
ঋজীষা+ঋত্বিক
দীপ্রাঞ্জন
জৈবাতৃক+প্রিয়াঙ্কা
ঋতীশা
ঈশা+উৎসব
রিয়ানা
অনন্য

৩.২ মহাকবির সারস্বতসমূহকৃতি

নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাজীবন অবলম্বনে *ধর্মসংস্থাপন, বীরবামাচরণ, তৈলঙ্গবন্দন, ভক্তরামপ্রসাদ, শ্রীগদাধরসম্ভব, তর্কাচার্যপ্রবন্দন, কালিদাস, শ্রীসীতারামাবির্ভাব, পাপীতাড়ন* ইত্যাদি ঊনিশটির বেশি, *বৈয়াসিক-মহাভারত* অবলম্বনে *ঘটোত্কচবধ, দ্রৌপদীমানরক্ষণ, জয়দ্রথবধ, কর্ণজীবন, তপোবল, অজ্ঞাতবাস, ভীষ্মত্বলাভ* ইত্যাদি বারোটির বেশি, *রামায়ণ* অবলম্বনে *রামবিবাহ, সীতাহরণ, বালিবধ, রামবনগমন, শ্রীরঘুজন্মবৃত্তান্ত* ইত্যাদি এগারোটির বেশি, *পুরাণাশ্রিত মহিষাসুরলাঞ্ছন, অকালবোধন, মাতৃপূজন, কংসবধ, অভিশাপপ্রদান, গঙ্গাবতরণ, শিবপ্রসাদন, সত্যব্রতধর, রক্তবীজবধ, ধ্রুবপ্রসাদন* ইত্যাদি সতেরোটির বেশি, লৌকিক দেবদেবী কেন্দ্রিক *শনিপ্রভাহ, সর্পাপততারক, সত্যনারায়ণাবির্ভাব* ইত্যাদি ছয়টির বেশি রূপক রচণা করেছেন। তিনি সংস্কৃত-ভাষায় ছোট-বড় মিলিয়ে মোট **১১৬**টি রূপক রচনা করেছেন। এছাড়াও তিনি সংস্কৃতভাষায় মহাকাব্য এবং বহু প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁর রচিত মহাকাব্যের সংখ্যা এগারোটি এবং সংগীত ও প্রবন্ধের সংখ্যা অসংখ্য।

গ্রন্থকার	জন্ম/মৃত্যু	জন্মস্থান	পিতা/মাতা	উপাধি/সম্মান	গ্রন্থনাম
নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়	জন্ম–১৯২৩ মৃত্যু–২০০৮	বাংলাদেশের যশোর (অধুনা)	পিতা– রামগোপাল মুখোপাধ্যায় মাতা– দীনতারিণী দেবী	স্মৃতিপঞ্চানন, মহাকবি, কাব্যবিশারদ ১৯৯৪ সালে তিনি রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পান।	**মহাকাব্য**– *বামাচরণবৈভব, তৈলঙ্গবৈভব, শ্রীসীতারামদাসোঙ্কারনাথায়ন, তর্কনাথবৈভব, সর্বানন্দবৈভব, শ্রীজানকীনাথবন্দন* **নাটক– জীবনীমূলক**– *কালিদাস, বঙ্গকীর্তিবিধান, তপোবৈভব, সীতারামাবির্ভাব, ধর্মসংস্থাপন, তৈলঙ্গবন্দন, বীরবামাচরণ, ভক্তরামপ্রসাদ, শ্রীগদাধরসম্ভব, সিদ্ধসীতারাম, ভক্তহরিদাস, পাপিতারণ, মাতৃদর্শন, শ্রীবোপদেববৃত্তম্, রঘুনন্দনবন্দন, বিদ্যাসাগরবন্দন, জরৎকারুনির্যাণ,*

গ্রন্থকার	জন্ম/মৃত্যু	জন্মস্থান	পিতা/মাতা	উপাধি/সম্মান	গ্রন্থনাম
					তর্করত্নাভিবন্দন, *তর্কাচার্যপ্রবন্দন,* *জানকীনাথবন্দন,* *লোকনাথাভিবন্দন* **কালিদাসকৃত কর্ম অবলম্বনে–** *মেঘদূত, কুমারসম্ভব* **রামায়ণ ভিত্তিক–** *শ্রীবাল্মীকিত্বলাভ, রামবিবাহ, শ্রীরঘুজন্মবৃত্তান্ত, মনঃপ্রসাদন, বালীবধ, ভরতগুণবন্দন, রামানুগামি-লক্ষ্মণ, সীতাহরণ, সীতোদ্ধার, ভার্গবদর্পনাশ, রামবনগমন,* উপাধিলাভম্ **মহাভারত ভিত্তিক–** *কর্ণজীবন, ঘটোৎকচবধ, জয়দ্রথবধ, সর্পযজ্ঞনিবারণ, দ্রৌপদীমানরক্ষণ, পাণ্ডবপরীক্ষণ, সত্যরক্ষণ, শমনবিজয়, ভীষ্মত্বলাভ, অজ্ঞাতবাস, তপোবল, পরীক্ষিতপরিরক্ষণ* **পুরাণ ভিত্তিক–** *মহিষাসুরলাঞ্ছন, অকালবোধন, মাতৃপূজন, রক্তবীজবধ, শুম্ভনিশুম্ভযাতন, সত্যব্রতধর, শিবপ্রসাদন, চণ্ডমুণ্ডবিনাশন,*

গ্রন্থকার	জন্ম/মৃত্যু	জন্মস্থান	পিতা/মাতা	উপাধি/সম্মান	গ্রন্থনাম
					গঙ্গাবতরণ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বলিচ্ছলন, প্রহ্লাদবিনোদন, ধ্রুবপ্রসাদন, অভিশাপপ্রদান, কংসবধ, মধুকৈটভনাশন, সত্যনারায়ণার্চন, রুচিবিবাহ, সুবচনীপ্রপূজনম্, *গঙ্গামাহাত্মকীর্ত্তন, শনিপ্রভাহ* **উপনিষদ ভিত্তিক** – *সত্যকামবৃত্ত, আত্মবিবেকলাভ, পুত্রলাভ* **দেশপ্রেম/জাতীয়তাবোধ মূলক** – *সুশীলবিজয়, আত্মনিবেদন, বালেশ্বরমহা যুদ্ধ, দেশশত্রুনিপাতন, সুভাষবিজয়, দেশবন্ধুপ্রকীর্ত্তন, অমরবীরবৃত্তান্ত* **পূর্বতন রচনা অবলম্বনে** – *মুকুট, সম্পত্তিসমর্পণ, গুপ্তধন, ব্যবধান, সোপানবচন, রাসমণিপুত্র, রহমৎখানবৃত্তান্ত, শ্রীনলিনপরাভব, পুত্রযজ্ঞ, রোগিবান্ধব, পুত্রপ্রত্যাবর্তন, বার্তাগৃহাধ্যক্ষবচ, আনন্দমঠ, প্রতিশোধপরিগ্রহ, সুমতিলাভ, চিকিৎসাসংকট* **প্রশস্তি, ভাষণ ও অভিনন্দনবার্তা** – *গৌরবনন্দন, চৈতন্যশতক, ভক্তিকুসুমাঞ্জলি* (১ ও ২),

গ্রন্থকার	জন্ম/মৃত্যু	জন্মস্থান	পিতা/মাতা	উপাধি/সম্মান	গ্রন্থনাম
					কালিদাসবন্দন, শোকগাথা, ওঙ্কারবন্দন, সীতারামনবক, বিজয়কুমারস্মরণ, জাতীয়পতাকাভিনন্দন, শৈলকুমারস্মরণ, নির্বাণবাণীপ্রসারতু, সত্যানন্দপ্রশস্তি, ওঙ্কারনাথবন্দন, ওঙ্কারনাথশতক, গণেশশতক, শ্রীগুরুবন্দন, শ্রীকৃষ্ণবন্দন, শ্রীপশুপতিনাথবন্দন, তর্কাচার্যপরিচিতি, অভিভাষণ, সভাপতের্ভাষণ ইত্যাদি। **বিবিধ** – *ভাগবতরচনামৃত, গঙ্গামাহাত্মকীর্ত্তন, চন্দ্রমাহাত্মকীর্ত্তন, বিল্বমঙ্গলমঙ্গল, ভর্তৃহরিবৈরাগ্যলাভ, নৃপপুরপ্রবেশ, দেশরক্ষণ, তপোনাশন, বেতালমিলন, ধূর্ত্তছল, ভারবাহিজনার্দন, বিদ্বদ্দম্ভবিনাশন,কৌলীন্যপরীক্ষ, জামাত্র্যভ্যর্থন, বিষয়াকাঙ্ক্ষণ, জননীশ্রাদ্ধবাসর, গুরুশিষ্যসংবাদ, শ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃতম্* (আদ্যলীলামৃতম্), *শ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃতম্* (মধ্যলীলামৃতম্)

৩.২.১ প্রকাশিত নাটক

কালিদাস–

কালিদাসের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনী অবলম্বন করে নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় নাটকটি রচনা করেছেন[১৪]। এটি নাট্যকারের প্রথম রচনা বলে জানা যায়। নাটকটিতে ৮টি দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। **১৯৫৬** সালে নাটকটি প্রকাশিত হয়েছে। নাটকের শুরুতেই দেখতে পাওয়া যায় রাজকুমারীর স্বয়ংবরসভার আয়োজন করা হয়েছে। রাজা ঘোষণা করেছেন তাঁকেই কন্যা সম্প্রদান করবেন যিনি নিজ বিদ্যার দ্বারা রাজকুমারীকে সন্তুষ্ট করতে পারবেন – "তামেব সর্ব্বগুণোপেতাং অতুলরূপময়ীং সর্ব্ববিদ্যাবিভুষিতামাত্মজাং সম্প্রদাস্যতি ভূপস্তস্মৈ, যো বিদ্যয়া তাং তোষযিতুং সমর্থো ভবেৎ।"[১৫] স্বয়ংবরসভাতে পাণিপ্রার্থী হয়ে আগত পণ্ডিত শিবদাস ও বিষ্ণুদাস অপমানিত হয়ে প্রতিশোধ নেবার জন্য মূর্খ কালিদাসকে নিয়ে পুনরায় উপস্থিত হয়। সেখানে রাজকুমারী বিদ্যাবতী কালিদাসকে "অঙ্গুলীমেকাং দর্শয়তি"[১৬] একটি আঙুল দেখান। মূর্খ কালিদাস ভাবেন তার চক্ষুনাশ করতে চাইছেন। তাই তিনি দুটি আঙুল দেখান – "প্রথমমঙ্গুলীমেকং ততোঽঙ্গুলীদ্বয়ঞ্চ দর্শয়তি।"[১৭] বিদ্যাবতীর সংশয় দূর হয় তিনি ভাবেন পরব্রহ্ম এক, দ্বিতীয় নেই কিন্তু জীব ও ব্রহ্ম ভেদে ব্রহ্মকে দ্বিবিধ বলে মনে হয়। রাজকুমারী তুষ্ট হন। এরপর তাদের বিবাহ সম্পন্ন হয়। শয়নকক্ষে কালিদাসের সাথে কথোপকথনে বিদ্যাবতী জানতে পারেন কালিদাস মূর্খ এবং কক্ষ থেকে তাকে বহিষ্কার করেন পদাঘাত করে। পরে দেখা যায় কালিদাস স্ত্রীর থেকে বহিষ্কারের ফলে জীবন ত্যাগ করতে উদ্যত হলে সেই সময় একজন জনৈক ভূমঙ্গল নামক মুনি উপস্থিত হন এবং তিনি বলেন কালিদাস বাগদেবীর কৃপায় বিদ্বানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করবেন। কালিদাস বাগদেবীর আরাধনা শুরু করলেন এবং স্থির করলেন মায়ের দয়া যদি না পান তাহলে তিনি প্রাণ ত্যাগ করবেন। এমন সময় বাগদেবী সেখানে এসে উপস্থিত হন এবং তাকে স্পর্শ করতেই তার মনের সমস্ত অন্ধকার দূর হয়ে যায় হৃদয় আলোয় উদ্ভাসিত হয়। সরস্বতী তাকে বিদ্বান হওয়ার বর দেন–

> অদ্যপ্রভৃতি সর্ব্বত্র পূজিতস্ত্বং ভবিষ্যসি।
>
> ক্ষিতৌ সর্ব্বানি শাস্ত্রাণি বেৎস্যসি মত্প্রসাদতঃ।।
>
> সর্বলোকস্য ভব্যার্থাং যত্যতাং সর্ব্বথং ত্বয়া।
>
> তব প্রাসাদাত্ সর্ব্বেঽত্র কল্যাণং প্রাপ্নুযুর্যথা।।[১৮]

কালিদাস বিদ্বান হয়ে ফিরে এলে বিদ্যাবতী তার নিজের অপরাধ স্বীকার করেন এবং একটি প্রার্থনা করেন "নাথ! মামুদ্দিশ্য প্রথমং যদ্ ভাষিতং তৎ এব আরভ্য বিরচয়তু ভবান্ গ্রন্থম্"[১৯] অর্থাৎ 'অস্তি' 'কশ্চিত্' 'বাগবিশেষঃ' এই তিনটি শব্দের দ্বারা গ্রন্থ রচনা করুন। নাটকটি এখানেই সমাপ্ত হয়।

মহিষাসুরলাঞ্ছন–

মার্কণ্ডেয়পুরাণ অবলম্বনে নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় *মহিষাসুরলাঞ্ছন* নামক নাটকটি রচনা করেন[২০]। নাটকে প্রধান চরিত্র হিসেবে মহিষাসুর, সহায়ক চরিত্র হিসেবে রম্ভাসুর, দেবীদূর্গা প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। নাটকের শুরুতেই দেখা যায় মহিষাসুর দেবীর অত্যন্ত ভক্ত এবং দেবীর সাক্ষাৎকার প্রার্থী। মহিষাসুরের তপস্যায় দেবী সন্তুষ্ট হয়ে বরদান করেন যে জন্মান্তরে দেবীর চরণ যুগল লাভ করবে। পরে দেখা যায় রাজা রম্ভাসুর ভগবান মহাদেবের পুত্রপ্রাপ্তির বরদান গ্রহণ করে মহিষাসুরের জন্ম দেন এবং তাকে রাজ্যভিষেকের জন্য প্রস্তুত করেন। রম্ভাসুর মহিষাসুরকে উপদেশ দেন দেবতারা তাদের কাছ থেকে ছলনা করে স্বর্গরাজ্য থেকে বঞ্চিত করেছে। তাই স্বর্গরাজ্য পুনরুদ্ধার প্রয়োজন, কিন্তু এই কাজের জন্য প্রভূত শক্তির প্রয়োজন। তাই রম্ভাসুর তাকে জানান ভগবান শংকরের তপস্যা করতে। মহাদেব শঙ্করকে তপস্যা দ্বারা সন্তুষ্ট করে, তাঁর আশীর্বাদে স্বর্গরাজ্য কে পুনরুদ্ধার করেন। পরাজিত ইন্দ্র বৃহস্পতির থেকে জানতে পারেন মহিষাসুরের বরদানের কথা এবং তাঁর উপদেশের দেবীর আরাধনা শুরু করেন। দেবী সন্তুষ্ট হয়ে মহিষাসুরের বিপক্ষে যুদ্ধ শুরু করেন এবং অন্তিমে মহিষাসুর মহিষের রূপ নিয়ে দেবীর দিকে অগ্রসর হলে দেবী নিজের চরণ দ্বারা প্রতিহত করেন। মহিষাসুর নিজের ভুল বুঝতে পারেন এবং অজ্ঞানবশত তার এই ভুলের ক্ষমা প্রার্থনা করেন। মহিষাসুরের পরাজয় এই নাটকের মূল বিষয়বস্ত।

মেঘদূত–

কালিদাসের *মেঘদূতের* প্রেক্ষাপট ও কাহিনী অবলম্বনে নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় *মেঘদূত* নাটকটি রচনা করলেও স্বকীয়তা বজায় রেখেছেন। এটি নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম নাটক[২১]। নাটকটি ১৯৬২ সালে রচনা করেছেন এবং প্রকাশিত হয়েছে ২০০৮ সালে ।নাটকটিতে পাঁচটি অঙ্ক দেখতে পাওয়া যায়।নাটকটিতে প্রধান চরিত্র হিসেবে যক্ষ এবং সহায়ক চরিত্র হিসেবে কুবের , মেঘরূপী কৃষ্ণ ইত্যাদিকে দেখতে পাওয়া যায়। শ্লোকের সংখ্যা ৯৩।

কুমারসম্ভব–

কালিদাসের *কুমারসম্ভব* মহাকাব্যকে অবলম্বন করে নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় *কুমারসম্ভব* নাটকটি রচনা করেন[২২]। শিব-পার্বতীর মিলন কাহিনী অবলম্বনে নাটকটি রচিত হয়েছে। নাটকটি ২০০৮ সালে প্রকাশিত হয়। নাটকটিতে ছটি অঙ্ক আছে এবং প্রতিটি অঙ্কে দুটি করে দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। নাটকটিতে ১৯১ টি শ্লোক দেখতে পাওয়া যায়। নাটকটির প্রধান চরিত্র শঙ্কর এবং সহায়ক চরিত্ররূপে ব্রহ্মা-বিষ্ণু, মদন, নারদ, হিমালয়, ইন্দ্র ইত্যাদিকে পাওয়া যায়।

রোগিবান্ধব–

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *রোগীরবন্ধু* নামক হাস্যকৌতুক রচনাকে অবলম্বন করে নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় *রোগিবান্ধব* নামক নাটকটি রচনা করেন।[২৩] নাটকটি ১৯৮৭ সালের রচনা করা হয়। নাটকটিতে পাঁচটি অঙ্ক আছে এবং প্রতিটি অঙ্কে দুটি করে দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। নাটকের প্রধান চরিত্র মনোমোহন। সহায়ক চরিত্র হিসেবে শ্যামসুন্দর, চিকিৎসক চিন্তাহরণ প্রভৃতিকে দেখতে পাওয়া যায়। ভগ্ন স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য অসুস্থ মনোমোহনের বায়ু পরিবর্তনের প্রয়োজন তাই চিকিৎসকের পরামর্শে বৈদ্যনাথধাম যাবার উদ্দেশ্যে রেলগাড়িতে চেপে পড়েন। সেখানে পরিচয় হয় চিন্তাহরন ইত্যাদিদের সাথে এবং উভয়ের কথোপকথনের মাধ্যমে হাস্যরস এই নাটকের মূল বিষয়বস্তু।

শ্রীসত্যকামবৃত্ত–

ছান্দোগ্যোপনিষদে জবালা ও সত্যকামের কাহিনী অবলম্বনে নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় *শ্রীসত্যকামবৃত্ত* নাটকটি রচনা করেছেন[২৪]। নাটকটি ১৯৮৭ সালে রচিত হয় এবং ২০২১ সালে প্রকাশিত হয়। নাটকটিতে পাঁচটি অঙ্ক আছে এবং ৮৫ টি শ্লোক আছে। নাটকটির প্রধান চরিত্র হিসেবে সত্যকাম, সহায়ক চরিত্র হিসেবে গৌতম, জবালা ইত্যাদিকে দেখতে পাওয়া যায়। সত্যকাম অর্থাৎ সত্যই যার তপস্যা বা কামনা। নাটকে সত্যকামের জীবনে বিভিন্ন স্তরের সাধনাই বর্ণিত হয়েছে।

বঙ্গকীর্তিবিধান–

নাটকটি ভূতপূর্ব পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের জীবনের উপর নির্ভর করে রচিত হয়েছে[২৫]। নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় ১৯৮৭ সালে নাটকটি রচনা করেন। নাটকটিতে পাঁচটি অঙ্ক আছে এবং প্রতিটি অঙ্কে দুটি করে দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। নাটকটিতে প্রধান চরিত্র রূপে বিধানচন্দ্র রায় কে বর্ণনা করা হয়েছে, সহায়ক চরিত্র রূপে জওহরলাল নেহেরু, মহাত্মাগান্ধী ইত্যাদিকে দেখতে পাওয়া যায়। ‘দৃশ্যকাব্যসঙ্কলনম্’ গ্রন্থটিতে বঙ্গকীর্তিবিধান নাটকটি স্থান পেয়েছে। জাহ্নবী পত্রিকায় নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয়। নাটকটি প্রকাশিত হয় ২০০৯ সালে।

বিষয়কাঙ্ক্ষন–

তৎকালীন ঘটনা অবলম্বনে নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় *বিষয়কাঙ্ক্ষন* নামক নাটকটি রচনা করেন[২৬]। নাটকটিতে পাঁচটি অঙ্ক আছে এবং প্রতিটি অঙ্কে দুটি করে দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। নাটকটি ১৯৮৭ সালে রচনা করা হয়েছে এবং ২০০৯ সালে নাটকটি প্রকাশিত হয়। বিষয় সম্পত্তির আকাঙ্ক্ষায় মানুষ কতটা নীচবৃত্তি অবলম্বন করতে পারে সেই বিষয়কে অবলম্বন করে আধুনিক কালের সমস্যাকে এই নাটকটির মাধ্যমে তুলে ধরেছেন

কবি। নাটকটির প্রধান চরিত্ররূপে গবেশ এবং সহায়ক চরিত্ররূপে হরিধন, মহেন্দ্র ইত্যাদি কে দেখতে পাওয়া যায়।

আনন্দমঠ–

বঙ্কিমচন্দ্রের *আনন্দমঠ* নামক উপন্যাসকে অবলম্বন করে নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় *আনন্দমঠ* নামক নাটকটি রচনা করেন[২৭]। নাটকটিতে ছয়টি অঙ্ক আছে এবং প্রতিটি অঙ্কে দুটি করে দৃশ্য আছে। নাটকটি ২০০৯ সালে প্রকাশিত হয়। নাটকটিতে প্রধান চরিত্র হিসেবে সত্যানন্দকে দেখতে পাওয়া যায় এবং সহায়ক চরিত্র হিসেবে ভবানন্দ, জীবনানন্দ, ধীরানন্দ ইত্যাদিকে দেখতে পাওয়া যায়।

শ্রীনলিনপরাভব–

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *ফেল* এই ছোটগল্প অবলম্বনে নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় *শ্রীনলিনপরাভাব* নাটকটি রচনা করেন[২৮]। নাটকটিতে পাঁচটি অঙ্ক আছে এবং ১৩ টি শ্লোক পাওয়া যায়। ১৯৮৬ সালে নাটকটি রচনা করা হয়েছে এবং ২০১২ সালে নাটকটি প্রকাশিত হয়। নাটকটির প্রধান চরিত্র হিসেবে নলিনকে দেখতে পাওয়া যায় এবং সহায়ক চরিত্র হিসেবে নবগোপাল, ননীগোপাল, নন্দ প্রভৃতিকে দেখতে পাওয়া যায়। নন্দকে ঈর্ষা করে নলিনের জয়ী হবার চেষ্টা এবং পরিণতিতে তার করুণ অবস্থা নাটকের প্রধান বিষয়বস্তু। নাটকটিতে প্রতিটি অঙ্কে দুটি করে দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়।

সম্পত্তিসমর্পণ–

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *সম্পত্তিসমর্পণ* নামক রচনাকে অবলম্বন করে নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় ১৯৭৮ সালে *সম্পত্তিসমর্পণ* নামক নাটকটি রচনা করেন[২৯]। ১৯৭৮ সালে নাটকটি প্রকাশিত হয়। নাটকটি প্রধান চরিত্র যজ্ঞনাথ, সহায়ক চরিত্র হিসেবে বৃন্দাবন, নিতাই পাল ইত্যাদিকে দেখতে পাওয়া যায়। নাটকে যজ্ঞনাথ তার বংশের কোন উত্তর-পুরুষের জন্য সঞ্চিত সম্পদকে জখ্ করে রাখতে চেয়েছিলেন। সেই জন্য তিনি নির্বাচন করেছিলেন নিতাই পাল নামক এক বালককে। কিন্তু নিতাই পালই তার পৌত্র গোকুলচন্দ্র, এই বৃত্তান্ত যখন তিনি জানতে পারেন তখন অনেক দেরি হয়ে যায়। সম্পত্তিকে সমর্পণ করার বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে নাটকটির রচিত হয়েছে।

বার্তাগৃহাধ্যক্ষবচ–

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *পোস্টমাস্টার* গল্পের অনুকরণে নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় *বার্তাগৃহাধ্যক্ষবচ* নামক নাটকটি রচনা করেছেন[৩০]। এটি ১৯৮৭ সালে রচিত হয় এবং ২০১২ সালে প্রকাশিত হয়। নাটকটিতে পাঁচটি অঙ্ক আছে। প্রথমাঙ্কে তিনটি দৃশ্য এবং বাকি অঙ্কে দুটি করে দৃশ্য পাওয়া যায়। নাটকটিতে ১৭ টি শ্লোক

আছে। নাটকটির প্রধান চরিত্র নবীন এবং সহায়ক চরিত্র হিসেবে পত্রবাহক, বৈদ্য, রত্না ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। কর্মসূত্রে শহরের ছেলে গ্রামে গিয়ে তার কি আবস্থা হয়েছিল সেটিই এই নাটকের প্রধান বিষয়বস্তু।

তপোবৈভব–

তপোবৈভব নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়ের মৌলিক রচনা। নাটকটি নাট্যকারের পিতা রামগোপাল স্মৃতিরত্নের জীবনী অবলম্বনে রচিত। নাটকটি ১৯৬৮ সালে রচনা করা হয়। প্রকাশিত হয় নাটকটি ১৯৭২ শালে। নাটকটিতে পাঁচটি অঙ্ক আছে[৩১]। প্রধান চরিত্র হিসেবে রামগোপাল, সহায়ক চরিত্র হিসেবে বীরেশ্বর, তর্কালঙ্কার, অমূল্য, নারী চরিত্র হিসেবে দীনতারিণী দেবী ইত্যাদির পরিচয় পাওয়া যায়। 'তপঃ' শব্দের অর্থ তপস্যা এবং 'বৈভব' শব্দের অর্থ সম্পদ। তপস্যাই যার সম্পদ এমন অর্থ বোঝায়। নাটকে দেখা যায় রামগোপাল স্মৃতিরত্ন কিভাবে সাধনার দ্বারা ক্ষুদ্র গৃহ কোণের সঙ্কীর্ণতাকে অতিক্রম করে জনকল্যাণের কাজে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন।

পুত্রপ্রত্যাবর্তন–

রবীন্দ্রনাথের *খোকাবাবুর-প্রত্যাবর্তন* নামক ছোটগল্পকে অবলম্বন করে নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় *পুত্রপ্রত্যাবর্তন* নামক নাটকটি রচনা করেছেন[৩২]। নাটকটি ১৯৮৭ সালে রচিত হয়েছে এবং ২০১২ সালে নাটকটি প্রকাশিত হয়। নাটকটিতে পাঁচটি অঙ্ক আছে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়াঙ্কে দুটি করে দৃশ্য, চতুর্থাঙ্কে তিনটি দৃশ্য এবং পঞ্চমাঙ্কে ছয়টি দৃশ্য পাওয়া যায়। নাটকটির প্রধান চরিত্ররূপে রাইচরণকে দেখতে পাওয়া যায়। সহায়ক চরিত্র হিসেবে নিবারণ ,অনুকূল প্রভৃতিকে দেখতে পাওয়া যায়। রাইচরণের দোষে তার প্রভুর পুত্র সমাধি লাভ করায়, প্রভুর দুঃখ দূর করার জন্য সে নিজ পুত্রকে দান করেন এটিই নাটকের মূল বিষয়বস্তু।

ব্যর্থজীবন–

বৈয়াসিক-মহাভারত অবলম্বনে নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় বারোটি নাটক রচনা করেন। তার মধ্যে অন্যতম নাটক *ব্যর্থজীবন* [৩৩]। নাটকটির শেষে কবি নাটকের নাম *ব্যর্থজীবন* না ব্যবহার করে *কর্ণজীবন* ব্যবহার করেছেন। ১৯৮৬ সালে নাটকটি রচনা করা হয় এবং প্রকাশিত হয় ২০০৯ শালে। নাটকটিতে প্রধান চরিত্র রূপে কর্ণকে, সহায়ক চরিত্র রূপে ভার্গব, দ্রোণাচার্য, দুর্যোধন, কৃষ্ণ ইত্যাদিকে দেখতে পাওয়া যায়। কর্ণের জীবনকে অবলম্বন করে নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় পাঁচটি অঙ্কে নাটকটি রচনা করেন। কর্ণের জন্ম, মাতা কর্তৃক লোক অপবাদের ভয়ে ভাসিয়ে দেওয়া, রাধার গ্রহণ, ভার্গবের আশ্রমে গমন, পরিচয় গোপন করে কর্ণের অস্ত্রশিক্ষা, পরশুরামের অভিশাপ, দুর্যোধনের অঙ্গরাজ্য দান, দ্রৌপদীর স্বয়ংবরসভাতে কর্ণের অপমান, ব্রাহ্মণরূপে কৃষ্ণের আগমন ও দানবীরত্বের পরীক্ষা নেওয়া, ব্রাহ্মণরূপে ইন্দ্রের আগমন ও কবচকুণ্ডল গ্রহণ ইত্যাদি ঘটনার মধ্য দিয়ে কর্ণের জীবন বৃত্তান্ত ফুটিয়ে তুলেছেন।

সীতারামাবির্ভাব–

সীতারাম দাসের আবির্ভাব এবং তার কৈশোর কাল অবলম্বনে নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় পাঁচ অঙ্কের এই নাটকটি রচনা করেছেন[৩৪]। নাটকটির রচনাকাল ১৯৮৪ সাল। নাটকের প্রধান চরিত্র হিসেবে প্রবোধচন্দ্র এবং সহায়ক চরিত্র রূপে শ্যামলাল, গুণধর ইত্যাদিকে দেখতে পাওয়া যায়। নাটকটিতে ১০৩ টি শ্লোক আছে।

ধ্রুবপ্রসাদন–

বিষ্ণুপুরাণের প্রথমাংশের একাদশ অধ্যায় ধ্রুবোপাখ্যান অবলম্বনে নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় *ধ্রুবপ্রসাদন* নাটকটি রচনা করেন[৩৫]। নাটকটিতে সাতটি অঙ্ক আছে এবং প্রতিটি অঙ্কে দুটি করে দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় নাটকটি ১৯৭৩ সালে রচনা করা হয়েছে এবং ২০০৬ সালে নাটকটি প্রকাশিত হয়। ধ্রুব কর্তৃক ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রাপ্তি নাটকটির মূল বিষয়বস্তু। নাটকটি প্রধান চরিত্র ধ্রুব এবং সহায়ক চরিত্ররূপে উত্তানপাদ, নারদ, নারায়ণ ইত্যাদিকে দেখতে পাওয়া যায়। নাটকটিতে ১২১ টি শ্লোক আছে।

গুপ্তধন–

নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়ের *গুপ্তধন* নাটকটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোট গল্প *গুপ্তধন* রচনাকে অবলম্বন করে লেখা হয়েছে[৩৬]। নাটকটিতে পাঁচটি অঙ্ক দেখতে পাওয়া যায়। নাটকটিতে প্রধান চরিত্র মৃত্যুঞ্জয় এবং সহায়ক চরিত্র হিসেবে শঙ্কর, হরিহর, শ্যামাপদ, জনৈক সাধু ইত্যাদিকে দেখতে পাওয়া যায়। ধন শব্দের মানে এখানে অর্থ নয়, পরমার্থের কথা বলা হয়েছে। নাটকটি ২০১২ সালে প্রকাশিত হয়।

রাসমণিপুত্র–

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোট গল্প *রাসমণি-পুত্রকে* অবলম্বন করে নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় *রাসমণিপুত্র* নাটকটি রচনা করেছেন[৩৭]। নাটকটিতে সাতটি অঙ্ক দেখতে পাওয়া যায় । নাটকটির প্রধান চরিত্র কালিপদ এবং সহায়ক চরিত্ররূপে ভবানীচরণ, অধ্যক্ষ, শ্যামাচরণ, শৈলেন্দ্র, রাসমণি প্রভৃতিকে দেখতে পাওয়া যায়। রাসমণি ভবানীচরণের একমাত্র পুত্র কালিপদর জীবনের করুণ কাহিনী নাটকের মূল বিষয়বস্তু। নাটকটিতে ষষ্ঠ অঙ্কে চারটি দৃশ্য, সপ্তমাঙ্কে তিনটি দৃশ্য এবং বাকি অঙ্কগুলিতে দুটি করে দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়।

শ্রীবাল্মীকিত্বলাভ–

কৃত্তিবাসী *রামায়ণ* অবলম্বন করে নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় ১৯৮৭ সালে *শ্রীবাল্মীকিত্বলাভ* নাটকটি রচনা করেন[৩৮]। নাটকটি ২০০৯ সালে প্রকাশিত হয়। নাটকটিতে প্রধান চরিত্র হিসেবে রত্নাকরকে দেখতে পাওয়া যায় এবং সহায়ক চরিত্র হিসেবে ব্রহ্মা, নারদ, প্রথম দস্যু, দ্বিতীয় দস্যু ইত্যাদিকে দেখতে পাওয়া যায়।

নাটকটিতে পাঁচটি অঙ্ক আছে এবং প্রতিটি অঙ্কে দুটি করে দৃশ্য আছে। দস্যু রত্নাকরের বাল্মীকি মুনিতে পরিণত হবার কাহিনী এই নাটকের মূল বিষয়বস্তু।

পুত্রযজ্ঞ–

নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় বিরচিত *পুত্রযজ্ঞ* নাটকটির উৎস হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *পুত্রযজ্ঞ* [৩৯]। নাটকের প্রধান চরিত্র হিসেবে বৈদ্যনাথকে দেখতে পাওয়া যায় এবং সহায়ক চরিত্র হিসেবে নগেন্দ্র, দৈবারিক, মনোরঞ্জন, বিনোদিনী প্রকৃতিকে দেখতে পাওয়া যায়। এখানে যোগ্য শব্দের অর্থ বলিদান। বৈদ্যনাথ পুত্রেষ্টি যজ্ঞের মাধ্যমে পুত্র লাভের আশায় প্রথমা পত্নীর পুত্র মনোরঞ্জনকে বলিদান দিয়ে ফেলবে এটি এই নাটকের মূল বিষয়বস্তু নাটকটিতে পাঁচটি অঙ্ক আছে। ১৯৮৭ সালে নাটকটি রচনা করা হয় এবং ২০১২ সালে নাটকটি প্রকাশিত হয় নাটকটিতে ১৭টি শ্লোক দেখতে পাওয়া যায়। নাটকটিতে পঞ্চমাঙ্কে চারটি দৃশ্য এবং বাকি অঙ্কে দুটি করে দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়।

বিল্বমঙ্গলমঙ্গল–

সাধক বিল্বমঙ্গলের জীবনী অবলম্বনে নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় ১৯৮৮ সালে *বিল্বমঙ্গলমঙ্গল* নামক নাটকটি রচনা করেন। নাটকটিতে পাঁচটি অঙ্ক আছে। প্রতিটি অঙ্কে দুটি করে দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। নাটকে প্রধান চরিত্র হিসাবে বিল্বমঙ্গল, সহায়ক চরিত্র হিসেবে শ্রীকৃষ্ণ, বিল্বমঙ্গলের ভ্রাতা, বিল্বমঙ্গলের ভ্রাতার বন্ধু চিন্তামণি ইত্যাদির পরিচয় পাই। বিল্বমঙ্গল নাটকে তার ভ্রাতা ও ভ্রাতার বন্ধু কুমার্গে নিয়ে যাবার জন্য কুৎসিত পরিকল্পনা করেছিলেন। পিতা ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেন। অন্তিমে বিল্বমঙ্গল বিবেক দংশনে জর্জরিত হয়ে কাঁটার দ্বারা নিজেই নিজের দুচোখ নষ্ট করেন। নাটকে দেখা যায় কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হয়ে বিল্বমঙ্গল বৃন্দাবন যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। শ্রীকৃষ্ণ বালক বেশে উপস্থিত হয়ে তাকে হাত ধরে বৃন্দাবন নিয়ে যান। শ্রীকৃষ্ণ তার ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে দর্শনও দেন শেষে।

রহমতখানবৃত্তান্ত–

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোট গল্প *কাবুলিওয়ালা* অবলম্বনে নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় *রহমতখানবৃত্তান্ত* নাটকটি রচনা করেছেন[৪০]। নাটকটিতে মিনির নাম পরিবর্তন করে রমা রাখা হয়েছে। নাটকটির প্রধান চরিত্র হিসেবে রহমত খান, সহায়ক চরিত্র হিসেবে অমলেশ, রমা, রমার মা ইত্যাদিকে দেখতে পাওয়া যায়। নাটকটিতে পাঁচটি অঙ্ক আছে এবং প্রতিটি অঙ্কে দুটি করে দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। নাটকটি ১৯৮৬ সালের রচনা করা হয়েছে এবং প্রকাশিত হয় ২০০৯ সালে। ব্যবসার উদ্দেশ্যে কলকাতায় আসা রহমত খান এবং রমার বন্ধুত্বকে কেন্দ্র করে নাটকের বিষয়বস্তুটি উপস্থাবিত হয়েছে।

রামবিবাহ–

বাল্মীকির *রামায়ণ* অবলম্বনে নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় *রামবিবাহ* নাটকটি রচনা করেছেন[৪১]। নাটকটিতে প্রধান চরিত্র রূপে রামচন্দ্রকে এবং সহায়ক চরিত্ররূপে দশরথ, বিশ্বামিত্র, কৌশল্যা, তাড়কা, মারীচ প্রভৃতিকে দেখতে পাওয়া যায়। নাটকটিতে ১০৭টি শ্লোক আছে। নাটকটি রচনা করা হয় ১৯৮৭ সালে এবং প্রকাশিত হয় ২০২০ সালে।

মধুকৈটভানাশন–

মার্কণ্ডেয়-পুরাণ অবলম্বনে নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় *মধুকৈটভনাশন* নাটকটি রচনা করেছেন[৪২]। নাটকটিতে পাঁচটি অঙ্ক দেখতে পাওয়া যায়। প্রথম থেকে চতুর্থ অঙ্কে দুটি করে দৃশ্য এবং পঞ্চম অঙ্কে তিনটি দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। নাটকটি ১৯৮৭ সালে রচিত হয় এবং ২০২১ সালে প্রকাশিত হয়। নাটকটিতে প্রধান চরিত্র রূপে মহাশক্তিকে দেখতে পাওয়া যায়। সহায়ক চরিত্র রূপে নারায়ণ, কমলা, ব্রহ্মা, মধু, কৈটভ প্রভৃতিকে দেখতে পাওয়া যায়। নাটকটিতে ১০২টি শ্লোক পাওয়া যায়।

রঘুনন্দনবন্দন–

নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় *রঘুনন্দনবন্দন* নাটকটি রঘুনন্দনের জীবন ও কীর্তি অবলম্বনে রচনা করেছেন। নাটকটি ১৯৮৭ সালে রচিত হয় এবং প্রকাশিত হয় ২০১৮-২০ সালে। নাটকটিতে পাঁচটি অঙ্ক দেখতে পাওয়া যায়। প্রথম থেকে চতুর্থ অঙ্কে দুটি করে দৃশ্য এবং পঞ্চম অঙ্কে তিনটি দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। নাটকটিতে প্রধান চরিত্র রূপে রঘুনন্দন এবং সহায়ক চরিত্র রূপে হরিহর, জ্যোতির্বিদ প্রভৃতিকে দেখা যায়। নাটকটির শ্লোক সংখ্যা ৭৩টি।

কংসবধ–

১৯৮৭ সালে পুরাণ অবলম্বনে নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় কংসবধ নাটকটি রচনা করেছেন[৪৩]। নাটকটিতে প্রধান চরিত্রে কৃষ্ণকে দেখতে পাওয়া যায় এবং সহায়ক চরিত্র রূপে কংস, বাসুদেব, ঘাতক, যশোদা, বলরাম ও অক্রূরকে দেখা গিয়েছে। নাটকটি প্রকাশিত হয় ২০২১ সালে। নাটকটিতে ৮৯টি শ্লোক দেখা যায়। নাটকটিতে পাঁচটি অঙ্ক এবং প্রতিটি অঙ্কে দুটি করে দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়।

নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রধানত অধ্যাপনাকে জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করলেও তাঁর সামাজিক-কৃতি বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। এরই মধ্যে তাঁর বিশাল সারস্বত-কর্মকাণ্ড আধুনিক সমাজকে রোমাঞ্চিত করে। বিষয়ের বৈচিত্রে, বিষয়ের বাহুল্যে এবং বিষয়ের স্বকীয়তায় তাঁর এই কর্মকাণ্ড সংস্কৃত-সাহিত্য-সম্ভারে বিশাল অবদানরূপে পরিগৃহীত হয়।

নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থের প্রকাশিত রচনা সমূহ

- **দৃশ্যকাব্য**

  - **জীবনীমূলক**

নাটকের নাম	উৎস	রচনাকাল	প্রকাশকাল	প্রধান চরিত্র	অঙ্কসংখ্যা	শ্লোকসংখ্যা
কালিদাস	কালিদাসের ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনী		১৯৫৬	**প্রধান চরিত্র**–কালিদাস **সহায়ক চরিত্র** –শিবদাস, বিষ্ণুদাস, ভূমঙ্গল, বিদ্যাবতী মধুমালা, দেবী সরস্বতী, পুরুষ, কঞ্চুকী	৮টি দৃশ্য	৫৫
বঙ্গকীর্তিবিধান	বিধানচন্দ্র রায়ের জীবনকাহিনি	১৯৮৮	২০০৯	**প্রধান চরিত্র**–বিধানচন্দ্র রায় **সহায়ক চরিত্র** – বন্ধু, জওহরলাল নেহেরু, মহাত্মাগান্ধী, অতুল্য, হরেন্দ্র, প্রথম নাগরিক, দ্বিতীয় নাগরিক	পঞ্চমাঙ্ক (প্রতি অঙ্কে দুটি করে দৃশ্য)	৯৯
তপোবৈভব	নাট্যকারের পিতা রামগোপাল স্মৃতিরত্নের জীবনী	১৯৬৮	১৯৭২	**প্রধান চরিত্র** –রামগোপাল **সহায়ক চরিত্র** –যজ্ঞেশ্বর, তর্কালঙ্কার, অমূল্য, উমাচরণ, শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ স্বামী, যামিনী, যদুনাথ, রাখালদাস, দীনতারিণী দেবী, অমূল্য, উমাচরণ এবং পরিচারিকা	পঞ্চমাঙ্ক	৭৩
শ্রীসীতারামাবির্ভাব	সীতারামদাসের আবির্ভাব এবং তাঁর	১৯৮৪		**প্রধান চরিত্র** –প্রবোধচন্দ্র **সহায়ক চরিত্র** –	পঞ্চমাঙ্ক (প্রথম, দ্বিতীয়,	১০৩

নাটকের নাম	উৎস	রচনাকাল	প্রকাশকাল	প্রধান চরিত্র	অঙ্কসংখ্যা	শ্লোকসংখ্যা
	কৈশোরকাল			শ্যামলাল, গুণধর, নারায়ণ, নারদ, প্রাণহরি, প্রাণকৃষ্ণ, যাদব, দাশরথি, বঙ্কিমচন্দ্র, কলিরাজ, অবিবেক, কাম, দম্ভ, বিবেক, ব্যভিচার, লোভ, অনন্দমূর্ত্তি, অনন্দমূর্ত্তি প্রভৃতি সাধুগণ, হরেকৃষ্ণ, বিমলেন্দু, জ্ঞানপ্রকাশ, ভিক্ষুক, কর্মহীন যুবক, অসিত, বিকাশ	তৃতীয় অঙ্কে দুটি দৃশ্য এবং চতুর্থ, পঞ্চম অঙ্কে তিনটি করে দৃশ্য)	
বিল্বমঙ্গলমঙ্গল	সাধক বিল্বমঙ্গলের জীবনী	১৯৮৮		**প্রধান চরিত্র**–বিল্বমঙ্গল **সহায়ক চরিত্র**–শ্রীকৃষ্ণ, বিল্বমঙ্গলের ভ্রাতা, বিল্বমঙ্গলের ভ্রাতার বন্ধু, চিন্তামণি চিন্তামণির সখী, শ্রেষ্ঠীপত্নী	পঞ্চমাঙ্ক (প্রতি অঙ্কে দুটি করে দৃশ্য)	৫৬
সাধকরামপ্রসাদ বা ভক্তরামপ্রসাদ	সাধক রামপ্রসাদের জীবনী	১৯৮৬	২০২২-২৩	**প্রধান চরিত্র**–রামপ্রসাদ **সহায়ক চরিত্র** – সিদ্ধেশ্বরী, নরহরি, ভজহরি, অছিগোস্বামী, সর্বমঙ্গলা, জগদীশ্বরী, কালিকা (দেবী), দুর্গাচরণ, আগমবাগীশ	পঞ্চমাঙ্ক (প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চম অঙ্কে দুটি করে এবং চতুর্থ অঙ্কে চারটি দৃশ্য)	৬১

নাটকের নাম	উৎস	রচনাকাল	প্রকাশকাল	প্রধান চরিত্র	অঙ্কসংখ্যা	শ্লোকসংখ্যা
রঘুনন্দনবন্দন	রঘুনন্দনের জীবন ও কীর্তি	১৯৮৭	২০১৮-২০	**প্রধান চরিত্র**–রঘুনন্দন **সহায়ক চরিত্র** – হরিহর, জ্যোতির্বিদ, নাগরিক যুগল, পণ্ডিতগণ, গ্রামবাসী যুগল, আকাশবাণী,	পঞ্চমাঙ্ক (প্রথম থেকে চতুর্থ অঙ্ক পর্যন্ত দুটি করে, পঞ্চম অঙ্কে তিনটি দৃশ্য)	৭৩

➢ **কালিদাসকৃত রচনা অবলম্বনে**

নাটকের নাম	উৎস	রচনাকাল	প্রকাশকাল	প্রধান চরিত্র	অঙ্কসংখ্যা	শ্লোকসংখ্যা
কুমারসম্ভব	কালিদাসের *কুমারসম্ভব* মহাকাব্য		২০০৮	**প্রধান চরিত্র**–শঙ্কর **সহায়ক চরিত্র** – ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মদন, বসন্ত, দক্ষ, ঋত্বিক, নান্দী নারদ, হিমালয়, ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতা, বিদূষক, বৈতালিক, শমন, পার্বতী, সতী, রুদ্র, রতি, , মধু, সখী	ষষ্ঠাঙ্ক (প্রতি অঙ্কে দুটি করে দৃশ্য)	১৯১
মেঘদূত	কালিদাসের মেঘদূত	১৯৬২	২০০৮	**প্রধান চরিত্র**–যক্ষ **সহায়ক চরিত্র** – কুবের, মেঘরূপীকৃষ্ণ, যক্ষপত্নী, গানরত স্ত্রী ও পুরুষ	পঞ্চমাঙ্ক	৯৩

➢ **পুরাণ ভিত্তিক**

নাটকের নাম	উৎস	রচনাকাল	প্রকাশকাল	প্রধান চরিত্র	অঙ্কসংখ্যা	শ্লোকসংখ্যা
ধ্রুবপ্রসাদন	*বিষ্ণুপুরাণের* প্রথমাংশের একাদশ অধ্যায়ের *ধ্রুবোপাখ্যান*	১৯৭৩	২০০৬–২০০৭	**প্রধান চরিত্র**–ধ্রুব **সহায়ক চরিত্র** – উত্তানপাদ, নারদ, নারায়ণ, প্রথম ও দ্বিতীয় মুনিবালক, দৌবারিক, সুনীতি, সুরুচি, বিদূষক, প্রথম ও দ্বিতীয় নগরবাসী, বৈতালিক, মহামাত্য	সপ্তমাঙ্ক (প্রতি অঙ্কে দুটি করে দৃশ্য)	১২১
মহিষাসুরলাঞ্ছন	মার্কণ্ডেয় পুরাণ		১৯৮২	**প্রধান চরিত্র** – মহিষাসুর, দেবী **সহায়ক চরিত্র** – ব্রহ্মা, সুন্দ, উপসুন্দ, রম্ভাসুর, সোমাচার্য, সভাসদ, মহামাত্য, ইন্দ্র, বরুণ, বৈতালিক, বহ্নি, দূত, বৃহস্পতি		১৪৮
কংসবধ	পুরাণ	১৯৮৭	২০২১	**প্রধান চরিত্র**– কৃষ্ণ **সহায়ক চরিত্র**– কংস, বসুদেব, ঘাতক, যশোদা, বলরাম, অক্রূর, গোপ ১, গোপ ২, দূত, চাণূর, মুষ্টিক, রামকৃষ্ণ, উগ্রসেন	পঞ্চমাঙ্ক (প্রতি অঙ্কে দুটি করে দৃশ্য)	৮৯
মধুকৈটভনাশন	মার্কণ্ডেয়-পুরাণ	১৯৮৭	২০২১	**প্রধান চরিত্র**–মহাশক্তি **সহায়ক চরিত্র** – নারায়ণ, কমলা, ব্রহ্মা, মধু, কৈটভ, শক্তি	পঞ্চমাঙ্ক (প্রথম থেকে চতুর্থ অঙ্কে দুটি করে, পঞ্চম অঙ্কে তিনটি করে দৃশ্য)	১০২

নাটকের নাম	উৎস	রচনাকাল	প্রকাশকাল	প্রধান চরিত্র	অঙ্কসংখ্যা	শ্লোকসংখ্যা
গুরুশিষ্যসংবাদ	শাস্ত্রবিষয়ক		২০২০	গুরু ও শিষ্য	একাঙ্ক	৪০
রক্তবীজবধ	পুরান	১৯৮৭	শুম্ভ, দূত, নিশুম্ভ, রক্তবীজ, ইন্দ্র, ব্রহ্মা, শঙ্কর, দেবী, শিবদূতী, চামুণ্ডা	নারী ৩ পুরুষ ১২	পঞ্চমাঙ্ক	১১৭

➢ **পূর্বতন রচনা অবলম্বনে**

নাটকের নাম	উৎস	রচনাকাল	প্রকাশকাল	প্রধান চরিত্র	অঙ্কসংখ্যা	শ্লোকসংখ্যা
আনন্দমঠ	বঙ্কিম চন্দ্রের *আনন্দমঠ* নামক উপন্যাস	১৯৮৮	২০০৯	**প্রধান চরিত্র**–সত্যানন্দ **সহায়ক চরিত্র** – ভবানন্দ, জীবানন্দ, ধীরানন্দ, জ্ঞানানন্দ, মহেন্দ্র, কল্যাণী ও শান্তি	ষষ্ঠাঙ্ক (প্রতি অঙ্কে দুটি করে দৃশ্য)	৯৮
পুত্রপ্রত্যাবর্তন	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন*	১৯৮৭	২০১১	**প্রধান চরিত্র**–রাইচরণ **সহায়ক চরিত্র** – নিবারণ, অনুকূল, মনোরমা, শ্যামলী, বধূমাতা, মোহন	পঞ্চমাঙ্ক (প্রথম থেকে তৃতীয় অঙ্কে দুটি করে, চতুর্থ অঙ্কে তিনটি, পঞ্চম অঙ্কে ছয়টি করে দৃশ্য)	৯
বার্তাগৃহাধ্যক্ষবচ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *পোস্টমাস্টার*	১৯৮৭	২০১১	**প্রধান চরিত্র**–নবীন **সহায়ক চরিত্র**–পত্রবাহক, বৈদ্য, রত্না	পঞ্চমাঙ্ক (প্রতিটি অঙ্কে দুটি করে দৃশ্য)	১৭

নাটকের নাম	উৎস	রচনাকাল	প্রকাশকাল	প্রধান চরিত্র	অঙ্কসংখ্যা	শ্লোকসংখ্যা
রাসমণিপুত্রনাটক	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *রাসমণির পুত্র*	১৯৮৬	২০১১	**প্রধান চরিত্র**–কালীপদ **সহায়ক চরিত্র** – রাসমণি, ভবানীচরণ, লুটবিহারী, অধ্যক্ষ, চিকিৎসক, বগলাচরণ, শ্যামাচরণ, শৈলেন্দ্র ও পারিষদবৃন্দ, ব্রজসুন্দন্ পারিষদ যুগল,	সপ্তমাঙ্ক (প্রথম থেকে পঞ্চম অঙ্কে দুটি করে, ষষ্ঠ অঙ্কে চারটি, সপ্তম অঙ্কে তিনটি দৃশ্য)	৭
শ্রীনলিনপরাভব	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *ফেল*	১৯৮৬	২০১১	**প্রধান চরিত্র**–নলিন **সহায়ক চরিত্র** – নবগোপাল, ননীগোপাল, নন্দ, পারিষদ, বন্ধু	পঞ্চমাঙ্ক (প্রথম থেকে চতুর্থ অঙ্কে দুটি, পঞ্চম অঙ্কে একটি দৃশ্য)	১৩
পুত্রযজ্ঞ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *পুত্রযজ্ঞ*	১৯৮৭	২০১১	**প্রধান চরিত্র**–বৈদ্যনাথ **সহায়ক চরিত্র** – নগেন্দ্র, জ্যোতির্বিদ, দৈবারিক, কর্মাধ্যক্ষ, মনোরঞ্জন, বিনোদিনী, পিতৃস্বসা(পিসি), কুসুম-কলিকা, পরিচারিকা, শিশু	পঞ্চমাঙ্ক (প্রথম থেকে চতুর্থ অঙ্কে দুটি, পঞ্চম অঙ্কে চারটি দৃশ্য)	১৭
রহমতখানবৃত্তান্ত	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *কাবুলিওয়ালা*	১৯৮৬	২০০৯	**প্রধান চরিত্র**–রহমৎ খান **সহায়ক চরিত্র** – অমলেশ, অমলেশ পত্নী, বিচারক, বিচারক সহায়ক, নাগরিকগণ, রমা, সর্বকারী-ব্যবহারজীব	পঞ্চমাঙ্ক (প্রতি অঙ্কে দুটি করে দৃশ্য)	১০
রোগিবান্ধব	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *রোগীরবন্ধু*	১৯৮৭		**প্রধান চরিত্র**–মনোমোহন **সহায়ক চরিত্র** – শ্যামসুন্দর, চিকিৎসক, বাহক, চিন্তাহরণ	পঞ্চমাঙ্ক (প্রতি অঙ্কে দুটি করে দৃশ্য)	৭
গুপ্তধন	রবীন্দ্রনাথ	১৯৮৭	২০১২	**প্রধান চরিত্র**–মৃত্যুঞ্জয়	পঞ্চমাঙ্ক	৮০

নাটকের নাম	উৎস	রচনাকাল	প্রকাশকাল	প্রধান চরিত্র	অঙ্কসংখ্যা	শ্লোকসংখ্যা
	ঠাকুরের ছোটোগল্প *গুপ্তধন*			**সহায়ক চরিত্র** – শঙ্কর, হরিহর, শ্যামাপদ, জনৈক সাধু, স্বরূপানন্দ, ভক্তবৃন্দ, মৃত্যুঞ্জয়, ভিক্ষুক		
সম্পত্তিসমর্পণ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প *সম্পত্তিসমর্পণ*	১৯৭৮		**প্রধান চরিত্র**–যজ্ঞনাথ **সহায়ক চরিত্র** – বৃন্দাবন, নিতাই পাল, ঋণী, গোকুল, বৈদ্য, হারাধন, গ্রামবাসী যুগল	একাদশদৃশ্য	২০

➢ **সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে**

নাটকের নাম	উৎস	রচনাকাল	প্রকাশকাল	প্রধান চরিত্র	অঙ্ক	শ্লোকসংখ্যা
বিষয়কাঞ্চণ	সমসাময়িক ঘটনা	১৯৮৮	২০০৯	**প্রধান চরিত্র**–গবেশ **সহায়ক চরিত্র** – হরিধন, মহেন্দ্র, প্রথম ও দ্বিতীয় নগরপাল, নগরপালাধ্যক্ষ, সভাপতি, অধীর, ভৃত্য, সদস্যগণ, পারিষদ	পঞ্চমাঙ্ক (প্রতি অঙ্কে দুটি করে দৃশ্য)	58
জননীশ্রাদ্ধবাসর	সমসাময়িক ঘটনা	১৯৮৭		শিক্ষামন্ত্রী, সচিব, অধ্যাপক, নগরপাল,পন্ডিতগণ, মুখ্যমন্ত্রী, উপশিক্ষাসচিব	পঞ্চমাঙ্ক	৬৬

➢ রামায়ণ ভিত্তিক

নাটকের নাম	উৎস	রচনাকাল	প্রকাশকাল	প্রধান চরিত্র	অঙ্ক	শ্লোকসংখ্যা
শ্রীবাল্মীকিত্বলাভ	কৃত্তিবাসী রামায়ণ	১৯৮৭	২০০৯	**প্রধান চরিত্র** – রত্নাকর **সহায়ক চরিত্র** – ব্রহ্মা, নারদ, প্রথম দস্যু, দ্বিতীয় দস্যু, প্রথম ধনী ও দ্বিতীয় ধনী	পঞ্চমাঙ্ক (প্রতি অঙ্কে দুটি করে দৃশ্য)	৬৯
রামবিবাহ	রামায়ণ	১৯৮৭	২০২০	**প্রধান চরিত্র** – রামচন্দ্র **সহায়ক চরিত্র** – দশরথ, বিশ্বামিত্র, কৌশল্যা, তাড়কা, মারীচ, লক্ষ্মণ, মুনি, অহল্যা, জনক	পঞ্চমাঙ্ক (প্রতি অঙ্কে দুটি করে দৃশ্য)	১০৭

➢ *বৈয়াসিক– মহাভারত* অবলম্বনে

নাটকের নাম	উৎস	রচনাকাল	প্রকাশকাল	প্রধান চরিত্র	অঙ্ক	শ্লোকসংখ্যা
কর্মজীবন (*ব্যর্থজীবন*)	*বৈয়াসিক– মহাভারত*	১৯৮৬	২০০৯	**প্রধান চরিত্র**–কর্ণ **সহায়ক চরিত্র**–ভার্গব, দ্রোণাচার্য, দুর্যোধন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, কৃষ্ণ, ইন্দ্র, অর্জুন, শল্য, কুন্তী, দ্রৌপাদী	পঞ্চমাঙ্ক (প্রতি অঙ্কে দুটি করে দৃশ্য)	৫২
পরীক্ষিতপরিরক্ষণ	বৈয়াসিক- মহাভারত	১৯৮৭	২০২২	অশ্বত্থামা, যুধিষ্ঠির, ভীম, কৃষ্ণ, অর্জুন, মহাদেব, দুর্যোধন, প্রহরী, দৌবারিক	পঞ্চমাঙ্ক	৯০

➢ উপনিষদ ভিত্তিক

নাটকের নাম	উৎস	রচনাকাল	প্রকাশকাল	প্রধান চরিত্র	অঙ্কসংখ্যা	শ্লোকসংখ্যা
শ্রীসত্যকামবৃত্ত	*ছান্দোগ্যোপনিষদ*	১৯৮৭	২০২১	**প্রধান চরিত্র** – সত্যকাম **সহায়ক চরিত্র** – গোতম, জবালা, বহ্নি, হংস, বায়ু, মদগু	পঞ্চমাঙ্ক (প্রথম থেকে তৃতীয় অঙ্কে দুটি করে, চতুর্থ অঙ্কে চারটি, পঞ্চম অঙ্কে একটি করে দৃশ্য)	৮৫
আত্মবিবেকলাভ	কঠোপনিষদ	১৯৮৭	২০২০	**প্রধান চরিত্র** – নচিকেতা **সহায়ক চরিত্র** – বাজশ্রবা, যম, দৌবারিক, যাজ্ঞিক, চিত্রগুপ্ত	পঞ্চমাঙ্ক (প্রতি অঙ্কে দুটি করে দৃশ্য)	৬৮

৩.২.২ অপ্রকাশিত নাটক

ক্রমিক সংখ্যা	নাটকের নাম	উপজীব্য গ্রন্থ/বিষয়	অঙ্ক সংখ্যা	নারী চরিত্র	পুরুষ চরিত্র	রচনাকাল	শ্লোক	মন্তব্য
১	*প্রহ্লাদবিনোদনম্*	পুরাণ	৫	৪	১৭			অপ্রকাশিত
২	*ব্যবধানম্*	রবীন্দ্রনাথ	৮		৯	১৯৭১	৮	অপ্রকাশিত
৩	*সুভাষবিজয়ম্*	স্বাধীনতা আন্দোলন	৫		১৫	১৯৭৬	১৫১	অপ্রকাশিত
৪	*তপোবলম্*	বৈয়াসিক-মহাভারত	৫		১০		১৮৭	অপ্রকাশিত
৫	*ধর্ম্মসংস্থাপনম্*	শঙ্করাচার্য্য জীবনী		১	২০		১০০	অপ্রকাশিত
৬	*মনঃপ্রসাদনম্*	পুরাণ	৫		১৩		১১৩	অপ্রকাশিত
৭	*তৈলঙ্গবন্দনম্*	জীবনী	৬	৩	১৮		৮৩	অপ্রকাশিত
৮	*বীরবামাচরনম্*	জীবনী		৩	১৭		৬০	অপ্রকাশিত
৯	*শিবপ্রসাদলাভম্*	পুরাণ	৫	১	১১	১৯৮৫	৭৬	অপ্রকাশিত
১০	*শ্রীকৃষ্ণাবির্ভারবম্*	পুরাণ	৫	-	১৮	১৯৮৫	১০৯	অপ্রকাশিত
১১	*সোপানবচনম্*	রবীন্দ্রনাথ	৫	১	৬	১৯৮৫	১৬	অপ্রকাশিত
১২	*ঘটোৎকচবধম্*	বৈয়াসিক-মহাভারত	৫	-	১৩	১৯৮৬	৭৭	অপ্রকাশিত
১৩	*জয়দ্রথবধম্*	বৈয়াসিক-মহাভারত	৫	-	১২	১৯৮৬	৭৫	অপ্রকাশিত
১৪	*রামবনগমনম্*	রামায়ণ	৫	৫	২২	১৯৮৬	৭৬	অপ্রকাশিত
১৫	*তপোনাশনম্*	শিশুনাটকম্	৫	১	১২	১৯৮৬	১২	অপ্রকাশিত
১৬	*বেতালমিলনম্*	শিশুনাটকম্	৫	-	১৪	১৯৮৬	১৪	অপ্রকাশিত
১৭	*ধূর্ত্তচ্ছলম্*	শিশুনাটকম্	৫	-	৮	১৯৮৬	৮	অপ্রকাশিত
১৮	*শনৈশ্চরার্চনম্*	পুরাণ	৫	১	১০	১৯৮৬	১০	অপ্রকাশিত
১৯	*মাতৃপূজনম্*	পুরাণ	৫	১	১০	১৯৮৬	১০	অপ্রকাশিত

ক্রমিক সংখ্যা	নাটকের নাম	উপজীব্য গ্রন্থ/বিষয়	অঙ্ক সংখ্যা	নারী চরিত্র	পুরুষ চরিত্র	রচনাকাল	শ্লোক	মন্তব্য
২০	*জরৎকারুনির্মাণম্*	জীবনী	৫	১	১১	১৯৮৬	১১	অপ্রকাশিত
২১	*রুচিবিবাহম্*	পুরাণ	৫	-	১১	১৯৮৬	১১	অপ্রকাশিত
২২	*অভিশাপপ্রদানম্*	পুরাণ	৫	-	৮	১৯৮৬	৮	অপ্রকাশিত
২৩	*সর্পযজ্ঞনিবারণ*	বৈয়াসিক-মহাভারত	৫	-	১৭	১৯৮৬	১৭	অপ্রকাশিত
২৪	*সুবচনীপ্রপূজনম্*	পুরাণ	৫	২	১১	১৯৮৬	৬	অপ্রকাশিত
২৫	*শুম্ভনিশুম্ভঘাতনম্*	পুরাণ	৫	৩	১০	১৯৮৬	১০৪	অপ্রকাশিত
২৬	*চণ্ডমুণ্ডবিনাশনম*	পুরাণ	৫	২	১১	১৯৮৬	৭৭	অপ্রকাশিত
২৭	*গঙ্গাবতরনম্*	পুরাণ	৫	১	১৯	১৯৮৬	৯২	অপ্রকাশিত
২৮	*উপাধিলাভম্*	রামায়ণ	৫	২	৭	১৯৮৬	২	অপ্রকাশিত
২৯	*গঙ্গামাহাত্ম্যকীর্ত্তনম্*	পুরাণ	৫		১৩	১৯৮৬	২৯	অপ্রকাশিত
৩০	*বলিচ্ছলনম্*	পুরাণ	৫		১৮	১৯৮৬	৮৫	অপ্রকাশিত
৩১	*দেশরক্ষণম্*	শিশুনাটক	৫		১৮	১৯৮৬	৭৯	অপ্রকাশিত
৩২	*দ্রৌপদীমানরক্ষণম্*	বৈয়াসিক-মহাভারত	৫	৩	১৩	১৯৮৬	৭৭	অপ্রকাশিত
৩৩	*পাণ্ডবপরিরক্ষণম্*	বৈয়াসিক-মহাভারত	৫	১	১৩	১৯৮৬	৮০	অপ্রকাশিত
৩৪	*শ্রীবোপদেববৃত্তম্*	জীবনী	৫	২	৭	১৯৮৬	৮৭	অপ্রকাশিত
৩৫	*দেশশত্রুনিপাতনম্*	স্বাধীনতা আন্দোলন	৫		১৯	১৯৮৭	৬০	অপ্রকাশিত
৩৬	*বালিবধম্*	রামায়ণ	৫		৮	১৯৮৭	১২২	অপ্রকাশিত
৩৭	*সত্যরক্ষণম্*	বৈয়াসিক-মহাভারত	৫	৩	১০	১৯৮৭	৭২	অপ্রকাশিত
৩৮	*সত্যব্রতধরম্*	বৈয়াসিক-মহাভারত	৫		৭	১৯৮৭	৬৭	অপ্রকাশিত
৩৯	*শনিপ্রভাবম্*	পুরাণ	৫	৫	১৪	১৯৮৭	৯৮	অপ্রকাশিত
৪০	*শমনবিজয়ম্*	বৈয়াসিক-	৫	২	১১	১৯৮৭	৮৯	অপ্রকাশিত

ক্রমিক সংখ্যা	নাটকের নাম	উপজীব্য গ্রন্থ/বিষয়	অঙ্ক সংখ্যা	নারী চরিত্র	পুরুষ চরিত্র	রচনাকাল	শ্লোক	মন্তব্য
		মহাভারত						
৪১	*প্রতিশোধপরিগ্রহম্*	বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়	৬	৩	৫	১৯৮৭	৬১	অপ্রকাশিত
৪২	*বিদ্যাসাগরবন্দনম্*	জীবনী	৫	১	১৫	১৯৮৭	৪৫	অপ্রকাশিত
৪৩	*ভারবাহিজনার্দনম্*	প্রচলিত নাটক	৫	১	৭	১৯৮৭	১০৭	অপ্রকাশিত
৪৪	*বিদ্বদ্দম্ভবিনাশনম্*	প্রচলিত নাটক	৫	১	৯	১৯৮৭	৮৫	অপ্রকাশিত
৪৫	*শ্রীরঘুজন্মবৃত্তান্তম্*	রামায়ণ	৫	৪	১৩	১৯৮৭	১১৯	অপ্রকাশিত
৪৬	*শ্রীজানকীনাথবন্দনম্*	জীবনী	৫		১৪	১৯৮৭	১১২	অপ্রকাশিত
৪৭	*তর্কাচার্যপ্রবন্দনম্*	জীবনী	৫		১২	১৯৮৭	৯৩	অপ্রকাশিত
৪৮	*তর্করত্নাভিবন্দনম্*	জীবনী	৫		১০	১৯৮৭	১১১	অপ্রকাশিত
৪৯	*ভরতগুণবন্দনম্*	রামায়ণ	৫	১	১৫	১৯৮৭	১২৪	অপ্রকাশিত
৫০	*রামানুগামি-লক্ষ্মণম্*	রামায়ণ	৫	৪	১১	১৯৮৭	৭৮	অপ্রকাশিত
৫১	*সীতোদ্ধারম্*	রামায়ণ	৬	১	১৫	১৯৮৭	১৩৫	অপ্রকাশিত
৫২	*শ্রীগদাধরসম্ভবম্*	জীবনী	৫	৩	১০	১৯৮৭	৮৯	অপ্রকাশিত
৫৩	*কৌলীন্যপরিরক্ষণম্* (অসম্পূর্ণ)	প্রাচীন কুপ্রথা						অপ্রকাশিত
৫৪	*মাতৃদর্শনম্*	জীবনী	৭	১	২৩	১৯৮৮	১০০	অপ্রকাশিত
৫৫	*পুত্রলাভ*	উপনিষদ	৫	১	১৮	১৯৮৯	১০৮	অপ্রকাশিত
৫৬	*লোকনাথাভিবন্দনম্*	জীবনী	৫		১৩	১৯৯১		অপ্রকাশিত
৫৭	*শ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃতম্* (আদ্যলীলামৃতম্)	শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনলীলা	৬	৩	১৫	১৯৯৩	৯০	অপ্রকাশিত
৫৮	*শ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃতম্* (মধ্যলীলামৃতম্)	শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনলীলা	৫	৪	১২	১৯৯৪	১২১	অপ্রকাশিত
৫৯	*প্রতিজ্ঞাকরণম্*		৫		১৪	১৯৯৬	১০১	অপ্রকাশিত
৬০	*সিদ্ধসীতারাম*	জীবনী	৫		১৬		১৩৭	অপ্রকাশিত
৬১	*ভার্গবদর্পনাশনম্*	রামায়ণ	৫	১	১৫	১৯৮৭	৯৪	অপ্রকাশিত
৬২	*মাতৃহননম্*	সমসাময়িক	৫	০	১২	১৯৮৭	৬৯	অপ্রকাশিত

ক্রমিক সংখ্যা	নাটকের নাম	উপজীব্য গ্রন্থ/বিষয়	অঙ্ক সংখ্যা	নারী চরিত্র	পুরুষ চরিত্র	রচনাকাল	শ্লোক	মন্তব্য
		ঘটনা						
৬৩	*বালেশ্বরমহাযুদ্ধ*	স্বাধীনতা আন্দোলন	৫			১৯৮৭	৫২	অপ্রকাশিত
৬৪	*অকালবোধন*	রামায়ণ	৫	১	১৪	১৯৮৬	১৪৫	অপ্রকাশিত
৬৫	*সত্যনারায়ণার্চ্চন*	পুরাণ	৬	৩	১২	১৯৮৬	৪৫	অপ্রকাশিত
৬৬	*শ্রীগুরুপূজনম্*		৫	০	১১	২০০০	২৫	অপ্রকাশিত
৬৭	*পাপিতারণ*	চৈতন্যচরিতামৃত	৫		৯		৭৫	অপ্রকাশিত

*** নিম্নলিখিত নাটকের বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি**

চিকিৎসাসঙ্কটম্, অজ্ঞাতবাসম্, ভীষ্মত্বলাভম্, জামাত্র্যভ্যর্থনম্, দেশবন্ধুপ্রকীর্ত্তনম্, সীতাহরণম্, সুমতিলাভম্, সর্ব্বাপত্তারকম্, ভাগবদ্বচনামৃতম্, ভক্তহরিদাসম্, আত্মনিবেদন, সুশীলজীবনম্, নৃপপুরপ্রবেশম্, ভর্তৃহরিবৈরাগ্যলাভম্, অমরবীরবৃত্তান্ত, মুকুটম্ (অসম্পূর্ণ)

উল্লেখপঞ্জি

[১] দেবব্রত মুখোপাধ্যায় (সম্পা), *শতবর্ষে নিত্যানন্দে প্রসূনাঞ্জলি*, শ্লোক ১, পৃষ্ঠা ৫১

[২] তত্রৈব

[৩] *তদেব*, শ্লোক ২, পৃষ্ঠা ৫১

[৪] *তদেব*, শ্লোক ৬, পৃষ্ঠা ৫১

[৫] *তদেব*, শ্লোক ৭, পৃষ্ঠা ৫১

[৬] *তদেব*, শ্লোক ৯, পৃষ্ঠা ৫২

[৭] *তদেব*, শ্লোক ১০, পৃষ্ঠা ৫২

[৮] *তদেব*, শ্লোক ৬৪, পৃষ্ঠা ৫৬

[৯] *তদেব*, শ্লোক ৬৬, পৃষ্ঠা ৫৬

[১০] *তদেব*, শ্লোক ১২, পৃষ্ঠা ৫২

[১১] *তদেব*, শ্লোক ১৪, পৃষ্ঠা ৫২

[১২] *তদেব*, শ্লোক ৩০, পৃষ্ঠা ৫৩

[১৩] *তদেব*, শ্লোক ৪৯, পৃষ্ঠা ৫৫

[১৪] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *কালিদাস*

[১৫] *তদেব*, পৃষ্ঠা ৪

[১৬] *তদেব*, পৃষ্ঠা ১৫

[১৭] *তদেব*, পৃষ্ঠা ১৬

[১৮] *তদেব*, সপ্তম দৃশ্য, শ্লোক ৪৮-৪৯, পৃষ্ঠা ২৭

[১৯] *তদেব*, পৃষ্ঠা ২৯

[২০] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *মহিষাসুর লাঞ্ছন*

[২১] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *নাটক-সংগ্রহ*, পৃষ্ঠা ৮৯

[২২] *তদেব*, পৃষ্ঠা ১

[২৩] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্র: চিন্তাসঙ্কলন*

[২৪] দেবব্রত মুখোপাধ্যায় (সম্পা), *নাট্যসংগ্রহ* ২, পৃষ্ঠা ২১

[২৫] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *দৃশ্যকাব্যসঙ্কলন*, পৃষ্ঠা ৪৬

[২৬] *তদেব*, পৃষ্ঠা ৯১

[২৭] *তদেব*, পৃষ্ঠা ৬৬

[২৮] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *সংস্কৃত-মৌলিক-রবীন্দ্র-নাটক-সঙ্কলন*, পৃষ্ঠা ৬০

[২৯] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *সম্পত্তি-সমর্পণ*

[৩০] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *সংস্কৃত-মৌলিক-রবীন্দ্র-নাটক-সঙ্কলন*, পৃষ্ঠা ১৯

[৩১] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *তপোবৈভব*

[৩২] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *সংস্কৃত-মৌলিক-রবীন্দ্র-নাটক-সঙ্কলন*, পৃষ্ঠা ১

[৩৩] দেবব্রত মুখোপাধ্যায় (সম্পা), *সমাজ ভারতী*, পৃষ্ঠা ১

[৩৪] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *শ্রীসীতারামাবির্ভাব*

[৩৫] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *নাটক-সংগ্রহ*, পৃষ্ঠা ৫৩

[৩৬] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *গুপ্তধনম্*

[৩৭] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *সংস্কৃত-মৌলিক-রবীন্দ্র-নাটক-সঙ্কলন*, পৃষ্ঠা ৩৪

[৩৮] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *দৃশ্যকাব্যসঙ্কলন*, পৃষ্ঠা ৯

[৩৯] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *সংস্কৃত-মৌলিক-রবীন্দ্র-নাটক-সঙ্কলন*, পৃষ্ঠা ৭০

[৪০] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *দৃশ্যকাব্যসঙ্কলন*, পৃষ্ঠা ২৪

[৪১] দেবব্রত মুখোপাধ্যায় (সম্পা), *নাট্যসংগ্রহ* ২, পৃষ্ঠা ৩৬

[৪২] *তদেব*, পৃষ্ঠা ৫৬

[৪৩] *তদেব*, পৃষ্ঠা ৭১

চতুর্থ অধ্যায়:

জয়দ্রথবধ-নাট্যকৃতির বিচার-বিমর্শ

চতুর্থ অধ্যায়

জয়দ্রথবধ-নাট্যকৃতির বিচার-বিমর্শ

এই অধ্যায়ে নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় বিরচিত অপ্রকাশিত *জয়দ্রথবধ* নাটক, তার বঙ্গানুবাদ, তার নাট্যতত্ত্ব বিচার, চরিত্র বিচার এবং আলংকারিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৪.০ মূল নাটক

श्रीनित्यानन्दमुखोपाध्यायरचितं *जयद्रथवधनाटक*

प्रथमाङ्के प्रथमदृश्यम् – तोरणम्

नान्दी

निखिलधरणिवन्धुः पालको यो धरण्याः
सृजति हरति विश्वं धारयत्यत्र देवः।
गुणचयरहितोऽपि क्षेमहेतोर्गुणी च
त्ववतु भुवि स विष्णुः सर्व्वदा वः कृपालुः॥१॥

सूत्रधारः – (प्रविश्य) नमामि भारतं वर्षं देवलीलालयं परम्।
धर्म्मः सनातनो यत्र मूर्त्त एव विराजते॥२॥
विष्णुरूपधरं देवं वेदव्यासं नमाम्यहम्।
वेदविभागकर्त्तारं पुराणकारकं प्रभुम्॥३॥
आर्य्यमिश्रानहं वन्दे सम्मानितान् समागतान्।
सभामेताञ्च वन्देऽहं विद्बज्जनसमाश्रिताम्॥४॥

अलमतिप्रसङ्गेन। आदिष्टोऽस्मि पारिषदैः अद्यास्मिन् महोत्सवे भवतां प्रीतये किमपि नाटयितव्यमिति। तद्यावत् पारिपार्श्विकमाह्वयामि। मारिष! प्रविश रङ्गस्थलम्।

पारिपार्श्विकः – (प्रविश्य) भाव! एषोऽहमागतोऽस्मि।

सूत्रधारः – मारिष! अद्यास्मिन् महोत्सवे समागतानामार्य्यमिश्राणां विनोदनाय किमपि नाटयितव्यम्। तन्निरूप्यतां नाटकम्।

पारिपार्श्विकः – अत्र चिन्तायाः कोऽवकाशः?

उत्सवे ये समायाता भारतीया न संशयः।
स्वादर्शे संस्कृतौ चापि श्रद्धावन्तः सदैव ते॥५॥

सूत्रधारः- तेन किम्?

पारिपार्श्विकः – यत्नेन तेन सर्व्वेण सर्व्वेषां प्रीतये तथा।
पारिषदैः प्रयुज्येत नाटकं भारताश्रितम्॥६॥

सूत्रधारः – नाटकस्य नामोल्लिख्यताम्।

पारिपार्श्विकः – रामगोपालपुत्रेण नित्यानन्देन शर्म्मणा।
नाटकं रचितं यत्नाद् "जयद्रथवधं" नवम्॥७॥

सूत्रधारः – भवतु, तर्हि तस्यैव प्रयोगाय उद्योगः क्रियताम्।

पारिपार्श्विकः – अहं पारिषदान् विज्ञाप्य नाटकारम्भाय उद्योगपरो भवामि। त्वमपि आर्य्य मिश्रान् विज्ञाप्य रङ्गस्थलं सुसज्जितं कुरु।

सूत्रधारः – एषोऽहं तथैव करोमि। भो भो आर्य्यमिश्र!
श्रृण्वन्तु श्रृण्वन्तु भवन्तः। अद्यास्मिन् महोत्सवे समागतानां भवन्तां चित्तविनोदनाय किमपि नाम नाटकं नाटयितव्यम्। अत्र नवरचित जयद्रथवधनाटकस्य प्रयोगाय प्रस्तूयते पारिपार्श्विकेन। अत्र भवतां सम्मतिरस्तिचेत्। अवधानं दीयतां भवद्भिः। (श्रूतिमभिनीय) किं कथयन्ति भवन्तः। भवतां सर्व्वथा सम्मतिरस्तीति। तर्हि कृपया अवधीयतां भवद्भिः। (श्रुतिमभिनीय) अरे!
(नेपथ्ये कोलाहलः) किञ्चिद् प्रेक्ष्यतां यावत् पश्यामि

नेपथ्ये अर्जुनः - अद्यैव तावत् विनिपातयामि।

सूत्रधारः – आं ज्ञातम्।

अभिमन्युवधाज्जातशोकेनैव धनञ्जयः।
प्रतिशोधं ग्रहीतुं हि प्रतिज्ञां कुरुते स्वयम्॥८॥

तत्पारिपार्श्विक! परिशेषे किं वा भवति तत्परिज्ञानाय मनो मे भृशं चञ्चलम्। तद् आगच्छ तूर्ण्य

पारिपार्श्विकः- वाढम्।

(निष्क्रान्तौ)

प्रथमाङ्के द्वितीयदृश्यम्

अर्ज्जुनः – अद्यैव तावद् विनिपातयामि
सूर्य्यास्तयानस्य च मध्यतोहि।
जयद्रथं दुष्टकृतिं वलेन
नोचेत् स्वयं मृत्युमहं वृणोमि ॥९॥

कृष्णः – धनञ्जय! स्थिरोभव। अधीरो मा भव। शोकं त्यज।
नियतेर्लङ्घने को वा समर्थो भुवनत्रये।
एवं विचिन्तयन् पार्थ शोकं त्यक्त्वा स्थिरो भव ॥१०॥

अर्ज्जुनः – वासुदेव! कथं विस्मरामि प्राणारामं प्राणाधिकं नयनमनिमभिमन्युम्।
अभिमन्युर्भवेनास्ति यदोदेति च मानसे।
तदा शोकेन मे कृष्ण हृदयं हि विदीर्य्यते ॥११॥

कृष्णः – धनञ्जय! धर्म्मराजस्य कथां विचिन्तय।
अनुशोचनया राजा विदीर्य्यते सदैव सः।
सर्व्वेषामशुभानाञ्च हेतु स्वं मन्यते पुनः ॥१२॥
त्वं यदि एवमधैर्य्यो भवेः तर्हि तवावस्थामवलोक्य।
धर्म्मराजो निश्चितमेव आत्महत्यया जीवनस्य समाप्तिं घटयेत्।

अर्ज्जुनः – एवमाशङ्का अवश्यमेव वर्त्तते। किन्तु किं करोमि। तवोपदेशं संस्मरन्नापि कथमपि आत्मानं वोधयितुं नैव पारयामि।
कीदृग् ज्वाला भवति हृदये वोधने नो समर्थः
शोकैस्तापै र्विरहदहनैः सर्व्वतोऽहं विदीर्णः।

शान्तिर्णास्ते मनसि मम भोः लेशातोऽद्येह काचित्
कस्मिन् स्थाने गमनविधिना चित्तमधियदोऽपगच्छेत् ॥१३॥

कृष्णः – धनञ्जय! क्षत्रियत्वम्। क्षत्रियस्य शोकप्रकाशस्तु नाश्रुवारिणा प्रतिशोधग्रहणेणैव।

येषां प्रचेष्टया युद्धेऽभिमन्युर्निहतेः शिशुः।
तेषां शोणितधारेण तर्पणं क्रियतां रणे ॥१४॥
नेत्रवारिप्रपातेन मृतात्मा क्लिश्यते भृशम्।
शत्रुशोणितपातेन मृतात्मा तृप्यते परम् ॥१५॥

धनञ्जय! उत्तिष्ठ। शोकनिर्युक्तः प्रतिज्ञापूरणाय उद्योगी भव।

अर्ज्जुनः – सत्यमेव। रोदनस्य नास्ति अवशेषः।

अभिमन्योः शिशोर्घाते ये चांश भागिनो रणे।
तेषां मृत्युं विधायैव पुत्रतृप्तिं करोम्यहम् ॥१६॥
जयद्रथं मृत्युगृहं प्रवेश्य
सर्व्वांश्च शत्रुन् समरे निपात्य।
अकौरवं भूमितलं विधाय
पुत्रस्य तृप्तिं धरणौ करोमि ॥१७॥

कृष्णः – धनञ्जय! चल धर्म्मराजसमीपं गच्छामः। न जाने साम्प्रतं धर्म्मराजस्य कीदृशी अवस्था।

अर्ज्जुनः - जनार्द्दन! कथम् अग्रजसमीपे गमिष्यामि। यदा मां पृच्छेः तदा किमुत्तरं दास्यामि। वासुदेव! त्वमेव गच्छ। नाहं गमिष्यामि।

कृष्णः – धनञ्जय! धर्म्मराजस्य अवस्थाविवेचनेन लेशतोऽपि कालक्षेपः कथमपि नैव कार्य्यः। तस्य परिसान्त्वनं अविलम्वितम् अवश्यमेव करणीयम्। अस्माकं विलम्वेन स भूयोऽधिकतया व्याकुलो भविष्यति। अतएव श्रीघ्रं चल।

अर्ज्जुनः – का गतिः। चल।

(निष्क्रान्तौ)

द्वितीयाङ्के प्रथमदृश्यम्

धृतराष्ट्रगेहम्

धृतराष्ट्रः – कस्त्वम्?

दूर्य्योधनः – तात! दूर्य्योधनोऽहमभिवादये।

धृतराष्ट्रः – कथं सहसा अभिवादनाय समागतोऽसि?

दूर्य्योधनः – विजयलाभानन्तरं ताताभिवादनमेव युक्तमिति विविच्य भवन्तमभिवादयितुमागतोऽस्मि।

धृतराष्ट्रः – किं विजितवान् अत्र त्वम्? अथ कं विजितवान् भीमसेनम्?

दूर्य्योधनः – नहि।

धृतराष्ट्रः – तर्हि वासुदेवसारथिं धनञ्जयम्?

दूर्य्योधनः – नहि नहि।

धृतराष्ट्रः – तर्हि पाण्डवेषु अन्यं कञ्चन?

दूर्य्योधनः – नहि नहि तथापि न।

धृतराष्ट्रः – तर्हि कं विजित्य मामभिवादयितुमागतोऽसि

दूर्य्योधनः– धनञ्जयसुतो वीरो भागिनेय यदोः पतेः।
नयनं पाण्डवानाञ्चाभिमन्युघातितो वलात्।।१८।।

धृतराष्ट्रः – सुयोधन! एतद् वक्तुं न लज्जसे।

यो वालको कौरववंश स्यकेतुः
प्रियो यदूनां हि तथा कुरुणाम्।
विराटवंशस्य तथा प्रियोऽसौ
निपातितो दुष्टरणे विवोधैः॥१९॥

अपि च

मृत्युश्च मूल्यं व्यरच स्तमेव
वंशस्य नाशस्म च हेतुरेकः।

वालं निहत्यापि विलज्ज एव
जयीति मत्वेह समागतोऽसि ॥२० ॥

दूर्य्योधनः – तात! कथमेवं तिरस्करोषि?

धृतराष्ट्रः – न जानीषे त्वम्?

वालमेकं निहत्यैव स्ववंशपातनं स्वयम्।
सन्निकटे समाहीतं चिन्त्यते न त्वया कथम् ॥२१ ॥

अद्यैव तावत् सुत शोक दीप्तिः
कुर्व्वन्ति युद्धन्त्वतिभीषणं भोः।
न निष्कृतिः स्यादिह कस्यचिच्च
युद्धस्य शेषो भविता किलाद्य ॥२२ ॥

दूर्य्योधनः – दुर्व्वलान् कथमस्मान् वा तातो जानाति कातरः।
अस्माभिः सङ्घवद्धैश्च किं न कर्त्तुं प्रकाव्यते ॥२३ ॥
अद्यैव सप्तभिवीरैवेष्टयित्वा महावीरः।
अभिमन्युर्महायुद्धे महावलो निपातितः ॥२४ ॥

धृतराष्ट्रः – किं सप्तभिर्व्वेष्टयित्वावालोऽभिमन्युर्निपातितः।

दूर्य्योधनः – अथ किम्।

जयद्रथो महावीर एक एव च पान्डवान्
वारयामास वीर्य्येण शक्तिस्तेषां कुतो गता ॥२५ ॥

धृतराष्ट्रः – किं जयद्रथ एक एव पान्डवान् वारयामास? हा धिक् कष्टम्।

दुःशला नाम या कन्या मम प्राणाधिकप्रिया।
सा वैधव्यं गताद्यैव भ्रातृणां वः प्रसादतः ॥२६ ॥

दूर्य्योधनः – कथमेवं व्रवीति तातः?

धृतराष्ट्रः – धनञ्जयपरेणैव जयद्रथो निपातितः।
भविष्यति ध्रुवं युद्धे संशयो नास्ति कश्चन ॥२७ ॥

दूर्य्योधनः – अद्य सूर्य्यास्तगमनां प्राक् जयद्रथ निधनासमथ्ये
धनञ्जयो मृत्युं वृणुयादिति प्रतिज्ञापि कृता तेन।

	तत एव भवदाशीर्व्वादग्रहणाय आगतोऽस्मि।
धृतराष्ट्रः –	हा धिक्! जयद्रथो निहत एव। सञ्जय! मां दुःशलासमीपं नय।

(निष्क्रान्तः)

द्वितीयाङ्के द्वितीयदृश्यम्

युधिष्ठिरशिविरम्

युधिष्ठिरः –	वासुदेव! त्वम् आगतोऽसि कुत्र अतिष्ठत् त्वम् अस्माभिः सकातरम् आहुतः अपि नागतोऽसि?
कृष्णः –	धर्म्मराज! संशप्तक नीतौ आवां वहुदूरं गतौ। तेनैव भवतामाह्वानं श्रोतुं नैव समर्थौ।
युधिष्ठिरः –	पापिष्ठोऽहमेव अभिमन्योर्वधे एक एव हेतुः अहमेव मृत्युगहवरं वलं प्रवेशयम्। वासुदेव! मया किं कृतम्? कथं सुभद्राजननीसमीपे गमिष्यामि? किं वा कथयिष्यामि ताम्?
कृष्णः –	धर्म्मराज! भवानेव यदि एव कातरो भवेत् तर्हि धनञ्जयस्य अवस्था कीदृशी स्यात्? कथं स धैर्य्यं धर्त्तुं समर्थो भवेत्?
युधिष्ठिरः –	नहि नहि वासुदेव! नाहं धैर्य्यच्युतो भविष्यामि धैर्य्यधारणं मया अवश्यमेव कार्य्यम्। अन्यथा को वा उपायोऽस्ति?
कृष्णः –	धर्म्मराज! श्रुता भवता धनञ्जयस्य प्रतिज्ञा?
युधिष्ठिरः –	किं धनञ्चयेन प्रतिज्ञा कृता?
कृष्णः –	अति भयङ्करी प्रतिज्ञा कृता।
युधिष्ठिरः –	का सा प्रतिज्ञा?
कृष्णः –	अद्य सूर्य्यास्तगमनात् प्राक् जयद्रथं हनिष्यति असामर्थ्ये स्वयमेव मृत्युं वृणुयात्।
युधिष्ठिरः –	किमेवं प्रतिज्ञा तेन कृता? कथमस्याः परिपूर्त्तिः सम्भवेत्?

वेष्टयित्वा वलैः सर्व्वै रक्षिष्यन्ति जयद्रथं
छुरिकायाः प्रवेश्यस्य सम्भवो न भवेद् यथा ॥२८॥

वासुदेव! कथं न वारितस्त्वया?

कृष्णः – वारणस्यावकाशो हि लेशातोऽपि
न तत्र च श्रुत्वा वधनिमित्तं स
प्रतिज्ञामकरोत् क्षणात् अधुना तु
अस्माभिर्निश्चेष्टैर्नैवभवितव्यम् ॥२९॥
युद्धस्यास्य फलेनैव सकलं समरे पुणः
जयः पराजयो वापि भविष्यत्येव निश्चितम् ॥३०॥

युधिष्ठिरः – तत्तु मया सम्यगेव अवधार्य्यते। किन्तु किं क्रियेताधुना।

कृष्णः – क्लैव्यं शोकं परित्यज्य चोत्थाय वलदर्पितैः।
योद्धव्यं सङ्ववद्धैश्च सर्व्वैरेव प्रयत्नतः ॥३१॥
आचार्य्यस्यच्छलं सर्व्वं विनाश्य वुद्धिपूर्व्वकं।
जयद्रथविनाशाय चेष्टितव्यं प्रयत्नतः ॥३२॥

युधिष्ठिरः – निर्द्देशो दीयते कृष्ण यथा त्वया तथा वयम्।
प्राणात्ययेऽपि यत्नेन करिष्यामो हि सर्व्वतः ॥३३॥

कृष्णः – तर्हि भीमादीन् सर्व्वान् आहूय परामृश्य च युद्धनीतिः स्तिरीकर्त्तव्या।

युधिष्ठिरः – एवमेव क्रियताम्।

कृष्णः – भवता मुख्या सर्व्वे आहूय अत्र मिलिताः क्रियन्ताम्। अहमपि सुभद्रां सान्त्वयित्वा अधुनैव प्रत्यागच्छामि। धर्म्मराज! किन्तु सावधानेन सव्वं कर्त्तव्यं एतत्तु विशेषेण स्मर्तव्यम् आस्माकं प्रचेष्टाया उपरि धनञ्जयस्य जीवनं मरणं वा अवस्थितम्। अतएव आस्माकं परामर्शस्य गोप्यता यथा सुरक्षिता स्यात् तत्र विशेषेण अवधानं देयम्।

युधिष्ठिरः – वासुदेव! तव निर्द्देशो यथायथं प्रतिपाल्येत मया।

कृष्णः – तर्हि गच्छामि। (निष्क्रान्तः)

युधिष्ठिरः – मधुसूदन! न ज्ञायते कस्ते अभिप्रायः। कुत्र वा नेष्यसि अस्मान्। यथा ते रोचते तथैवास्तु। भवतु निर्द्देशपालनाय यतिष्ये। (निष्क्रान्तः)

तृतीयाङ्के प्रथमदृश्यम्

दुर्य्योधनशिविरम्

दूर्य्योधनः – मातुल! अभिमन्युवधेन तातः अतीव क्रुद्धः विरक्ताः च

शकुनिः – कथमिव?

दूर्य्योधनः – मया अभिवादनं कृतम्। तेन आशीर्व्वचनमपि न प्रयुक्तम्।

शकुनिः – जराया एवमेव परिणतिः।

दूर्य्योधनः – अर्ज्जुनेन जयद्रथो निहत एवेति मत्वा वयमतीव तिरष्कृताश्च तेन।

शकुनिः – जयद्रथस्य हनने कस्य सामर्थ्यमस्ति?

इन्द्रो वा वरुणो वापि चन्द्रो वा पवनोऽथवा।
एको वा मिलिता वापि नैव शक्ताः कदाचन ॥३४॥
अभिमन्युर्यथावद्धो व्युहमध्ये निपातितः।
अर्जुनाऽपि तथाद्यैव भविष्यति निपातितः ॥३५॥

दूर्य्योधनः – किन्तु यथायथं यत्न आधेयः। नोचेद् विपत्तिः उपस्थिता भवेत्।

शकुनिः – कथं चिन्तयसि दुर्य्योधन!

युद्धस्यान्तदिनं चाद्यनिश्चित्यैवस्थिरो भव।
धनञ्जयस्म रक्षायां कृष्णोऽपि नहि सक्षमः ॥३६॥

दूर्य्योधनः – किन्तु केनोपायेन तत् सम्भविष्यति?

युद्धेयुः पाण्डवा युद्धे सर्व्वोपायेन यत्नतः।
कुटवुद्धिस्तथा चास्ते कंसारिर्यदुनन्दनः ॥३७॥

शकुनिः – शकुनिः सौवलश्चास्ते तस्य वुद्धेर्विघातने।
परीक्षा चोभयोरद्य कूटवुद्धे र्भविष्यति ॥३८॥

दूर्य्योधनः – नाहं जानामि किं मनसि कृत्वा त्वमेवं निश्चिन्तो भूत्वा तिष्ठसि।

शकुनिः – नाहं लेशतोऽपि निश्चिन्तः। किन्तु चिन्तायाः वहिः प्रकाशनेन किं फलम्? मनसैव सर्व्वं विचार्य्य मनस्येव संरक्ष्य सर्व्वं करणीयम्। तेनैव मन्त्रस्य सिद्धिरन्यस्यथा वैकल्यमेव।

दूर्य्योधनः – भवतु क्रमशो ज्ञास्यामि।

शकुनिः – अधुना आचार्य्य-समीपं चल।

दूर्य्योधनः – तत्र गमनेन किं फलं स्यात्?

शकुनिः – तत्रैव ज्ञास्यसि।

दूर्य्योधनः – चल।

(प्रस्थितौ)

तृतीयाङ्के द्वितीयदृश्यम्

जयद्रथः – कौरवराज! कथं चिन्तयसि?

किं सिंहराजं हरिणः कदाचिद्
भोक्तुं समर्थो वहुचेष्टयापि।
नभस्तलात् किं ग्रहराज भानु
मधस्तले कोऽपि च पातयेयुः ॥३९॥
जयामि युद्धे स्ववलेन पार्थं
तं रक्षितुं कोऽपि भवेशक्तः
सत्ये हि निष्टा यदि तस्य सत्यं
श्वएव मृत्युर्भविताध्रूवो हि ॥४०॥

शकुनिः – जयद्रथ नासौ शिशुरभिमन्युस्ते प्रतिद्वन्द्वी।

शिवादस्त्रमावाप्तोऽसौ पुरन्दरात् तथैव च
दैवास्त्रैर्मानुषास्त्रैश्च सर्व्वतः परिशोभि ॥४१॥

रक्षको भीमसेनोऽस्य तथापरे च पाण्डवाः
धृष्टद्युम्नदयश्चान्ये महावीराश्च रक्षकाः ॥४२ ॥

अपि च

कंसारिः कूटवुद्धिः स वासुदेवो ह्य मित्र हा।
सारथीरक्षकश्चासौवुद्धिदातास्य वान्धवः ॥४३ ॥
सर्व्वस्योपरि स्मर्यतां द्रौपदीहरणदिवासवार्त्ता।
अपमानोदिने तस्मिन् कीदृक् कृतोहि पाण्डवैः।
विशेषतश्च भीमेन स्मरणीयः सदा त्वया ॥४४ ॥

जयद्रथः – स्मरामि सर्व्वम्।

तस्यापमानस्य मायाद्य शोधो
गृह्येत पाण्डोस्तनयान् विनाश्य।
निष्पाण्डवं भूतलमद्य तावत्
क्रियेत सद्यः स्ववलेन वीर ॥४५ ॥

शकुनिः – महावले महारथे त्वयि एतत् सर्व्वमेव युज्यते। किन्तु सावधानेन सर्व्वं कर्त्तव्यम्।

अविमृष्य कृतं कार्य्यं नहि हिताय कल्प्यते।
तस्मात् सर्व्वं विचार्य्यैव कार्य्यं कर्म्म प्रयत्नतः ॥४६ ॥

अतएव अद्य यथा वयं व्रूमः तथैव त्वया कस्यम्। नान्यथा कथमपि क्रियताम्।

दूर्य्योधनः – हं जयद्रथ! यद् वयं कुर्म्मः तत् सर्व्वं तव कल्याणाय।

उपेक्षणीयो नहि शत्रुरेव
हीनोऽपि कश्चिच्च धरातलेऽस्मिन्।
अयञ्चशत्रुर्वहुशक्तियुक्तः
प्रख्यातवीरो महनीयकीर्त्तिः ॥४७ ॥

अतएव अद्य अस्माभिः सर्व्वैरप्रमत्तैर्भवितव्यम्। आचार्य्येण मातुलेन वा यथैवोपदिश्येत तथैव वयं कुर्म्मः।

जयद्रथः – यथा भवतामभिप्रायः।

दूर्य्योधनः – प्रियायाः स्वसुरेकस्याः भर्त्तासि त्वं प्रियोत्तमः।
अशिवेन शिवेनाद्य भगिन्याश्च शिवाशिवम्॥४८॥
तातोऽपि चिन्तान्विता एव तुभ्यं
कन्या प्रिया प्राणसमा तथास्य।
तस्माच्च ते रक्षणमेव कार्य्यं
सर्व्वप्रयत्नात् सततं धरण्याम्॥४९॥

शकुनिः – जयद्रथ! वत्स! आगच्छ अस्माभिः सह।

जयद्रथः – अथ किं चलामि।

(निष्क्रान्ताः सर्व्वे)

चतुर्थाङ्के प्रथमदृश्यम्

युधिष्ठिरः – वासुदेव! घटोत्कचवधेन भृशं व्यथितो विषण्णश्च भीमसेनः किन्तु त्वयि किञ्चित् भावान्तरं नैव परिलक्ष्यते?

कृष्णः – घटोत्कचवधोऽपि अस्माकं सर्व्वतो महादुःखस्य हेतुर्णास्ति तत्र कश्चित् संशयः। किन्तु तथापि कथं मयि नास्ति दुःखप्रकाश इति पृच्छ्यते भवता धर्म्मराजेन। श्रुयताम्
घटोत्कचवधार्थाय कौरवाणास्तु तद्गतम्।
पराजयोह्यनेनैव तेषान्तु भविता ध्रुवम्॥५०॥

युधिष्ठिरः – किमुररीकृत्य त्वयैवमुच्यते?

कृष्णः – कर्णस्य परमं चास्त्रमेकपुरुषनाशकम्।
पुरन्दरप्रदत्तन्तु चासीद् भीतिकरं युधि॥५१॥
तस्मिन् स्थिते रणे चास्मिन् मृत्युः पार्थस्य निश्चितः।
वारणे नहि सामर्थं लेशतोऽपि च विद्यते॥५२॥

तेनैव घटोत्कचवधे मनसि यथा दुःखं तथा धनञ्जयप्राणरक्षासम्भावना लाभाद् हर्षहयुगवद् मम मनसि समुदेति। धर्म्मराज! तेनैव दुःखस्य प्रकाशो नैव घटते।

युधिष्ठिरः – आं सम्यक् स्मारितम्

कवचं कुण्डले हृत्वा पश्चात्तप्तः पुरन्दरः।
अमोघमस्त्रमेकं स स कर्णायादान्महावलम्॥५३॥
घटोत्कचवलेनैतै र्नस्थिरोः कौरणैस्तदा।
अस्त्रस्यास्य प्रयोगो हि कर्णेन कारितस्तदा॥५४॥

कृष्णः – पार्थस्य प्राणरक्षाद्य तथा कर्णनिपातनम्।
व्यवस्थितं रणे चास्मिन् घटोत्कचेन सर्व्वतः॥५५॥

युधिष्ठिरः – वासुदेव! श्रुतं व्यूहमध्ये जयद्रथं आवृत्य संगोप्य रक्षिष्यन्तीति सङ्कल्पितं कौरवपक्षैस्तथा युद्धव्यापारेण व्यापृतमर्ज्जुनमन्यत्र नेष्यन्ति। अतएव वासुदेव! अस्माभिः किं क्रियेत तदपि निर्द्दिश्यताम्।

कृष्णः – अर्जुन प्रतिपक्षिणां वधाय तथा व्यूहतो जयद्रथं वहिष्कृत्य समानयनाय सर्व्वथा यतितव्यम्।

युधिष्ठिरः – सर्व्वथा चेष्टिष्यते तव वाक्य पालनाय।
धर्म्मराज! वयं पार्थसमीपमेव गमिष्यामः।

युधिष्ठिरः – चल वासुदेव! तथैवास्तु।

(प्रस्थितौ)

चतुर्थाङ्के द्वितीयदृश्यम्

द्रोणः – दुर्य्योधन! व्यूहमध्ये अतीव गुप्तस्थाने महावीरैर्वेष्टयित्वा जयद्रथो रक्षितः। द्वारेष्वपि महान्तो वीरा नियोजिताः। यथा कोऽपि द्वारमतिक्रमितुं नैव समर्थो भवेत्।

शकुनिः – आचार्य्य! अनेनैव कार्य्यसिद्धिर्नैव भविता। अर्ज्जुनो दूरं नेतव्यः। नोचेद्

व्यूहप्रवेशे अर्ज्जुनं वारयितुं कोऽपि नैव समर्थो भवेत्।

द्रोणः – तदपि मया चिन्तितम्। तदर्थं संसप्तकाः नियुक्ताः। अभिमन्युवधदिने यथा तैरर्ज्जुनो दूरं नीतः अद्यापि तथैव क्रियेत।

शकुनिः – तर्हि सुष्ठ्वेव कृतं भवता। दुर्य्योधन! अस्माभिरपि सर्व्वत आचार्य्यस्य रक्षणव्यवस्था करणीया।

दूर्य्योधनः – अथ किम्। वयं सर्व्वथा आचार्य्यं रक्षिष्यामः।

द्रोणः – सर्व्वैः सावधानैः व्यूहस्य सर्व्वाणि द्वाराणि रक्षणीयानि।

पाण्डवानां यथा व्यूहे प्रवेशो न च कस्याचित्।
तथा सदा प्रचेष्टा हि युस्माभिः क्रियतां वलात् ॥५६॥

शकुनिः – कथं विचिन्त्यते आचार्य्येण?

अर्ज्जुनेन विना तत्र पाण्डवेषु च कश्चन।
व्यूहभेदं न जानाति प्रमाणितं तु पूर्व्वतः ॥५७॥

द्रोणः – हं अभिमन्युवधदिने एव सर्व्वैस्तत् प्रत्यक्षीकृतम्।
शकुने! श्रुयतां यदा जयद्रथवधे पाण्डवा असमर्था भवेयुस्तदा कौरवप्रधानस्य वधाय वेष्टेरन्। अतएव

दुर्य्योधनस्य केशाग्रं स्प्रष्टुं कश्चिद् न सक्षमः।
भविष्यति तथा कुर्युः सर्व्व एव प्रयत्नतः ॥५८॥
रक्षिते कौरवाधीशे सर्व्वे च रक्षिताः खलु।
शीर्षच्छेदे तु वृक्षस्य रक्षणं भविता कथम् ॥५९॥

शकुनिः – आचार्य्य! भवदादेशः सर्व्वप्रयत्नेन अस्माभिः प्रतिपाल्येत।

दूर्य्योधनः – मातुल! तर्हि स्वस्वकार्य्य परिपालनाय वयं गच्छामः।

शकुनिः – अथ किम्। दुर्य्योधन! सर्व्वा व्यवस्थैव निश्छिद्रा कृता।
एवम् अनायासेन अर्ज्जुनस्य निपातनं सम्भवेत् चिन्तितुमपि समर्थो नासम्। घटोत्कचवधाय कर्णस्य शत्रुप्रदत्तास्त्रव्ययेन अर्ज्जुनवधकृते महती चिन्ता आसीत्। चक्रिणा कृष्णेण अर्ज्जुनरक्षार्थं कीदृशो व्यवस्थाः कृताः किन्तु सर्व्वा एव व्यर्थतया परिणताः।

द्रोणः – शकुने! अधुनैव उल्लासो नैव कार्य्यः। कंसजरासन्धवधहेतोः चक्रिणो वासुदेवस्य वुद्धेः पारं गन्तुं को वा समर्थो भवेत्। तस्मात् अधुनैव उल्लासो नैव समीचीनः।

दूर्य्योधनः – सम्यगाह आचार्य्यः।

फललाभस्य पूर्व्वास्मिन्नुल्लासो नोचित क्वचित्।
विपर्य्यये तु सर्व्वैर्हि परिहासः करिष्यते॥६०॥
फललाभाय यत्नेन चेष्ट्यतां सर्व्वशक्तितः।
जयद्रथे रक्षितेऽद्य सर्व्वरक्षा भविष्यति॥६१॥

शकुनिः – तथैवास्तु। आचार्य्य! गच्छामो वयम्।

द्रोणः – तथास्तु।

(सर्व्वे निष्क्रान्ताः)

पञ्चमाङ्के प्रथमदृश्यम्

युधिष्ठिरः – भीमसेन! धनञ्जयस्य कोऽपि संवाद एव नोपलभ्यते किं क्रियेत?

भीमः – अग्रज! अनुसान्धानेनापि किमपि ज्ञातुं नैव शक्यते

युधिष्ठिरः – मध्याह्नकाल आगतप्रायः। किं भविष्यति? जयद्रथस्यापि संवादं न प्राप्नोमि।

भीमः – आचार्य्येण व्यूहमध्ये संगोप्य रक्षितो जयद्रथः इति श्रुतमस्माभिः।

युधिष्ठिरः – वयमेव व्यूहं भित्वा जयद्रथं हनिष्यामः।

भीमः – व्यूहाग्रे अग्रसरणे एव वयम् असमर्थाः, भेदस्तु दूरत एवा तिष्ठति।

युधिष्ठिरः – शीघ्रं अर्ज्जुनस्य संवादो ज्ञायताम्।

भीमः – यथादिशति अग्रजः। (निष्क्रान्तः)

युधिष्ठिरः – हा धिक्। किमद्य मम कृते धनञ्जयोऽपि प्राणान् जह्यात्। किमस्य

प्रतिविधानं करोमि। हा विधे कथमिदं स्वजनविघाति समरं त्वया आरोपितमस्मासु!

भीमः – (प्रविश्य) अग्रज! अग्रज! धनञ्जयस्य संवादः परिज्ञातः।

युधिष्ठिरः – कथय कथय। कः संवादः?

भीमः – युद्धच्छलेन संशप्तकैर्धनञ्जयो दूरं नीतः।

युधिष्ठिरः – ततस्ततः?

भीमः – संशप्तकान् विनाश्य अधुना व्यूहमध्ये प्राविशद् धनञ्जयः।

युधिष्ठिरः – व्यूहमध्ये धनञ्जयः प्रविष्टः?

भीमः – अथ किम्।

युधिष्ठिरः – तर्हि चल। धनञ्जय-साहाय्याय वयमपि व्यूहमध्ये प्रविशामः।

भीमः – आगच्छतु। यथासाध्यं चेष्टिष्यते।

(निष्क्रान्तौ)

पञ्चमाङ्के द्वितीयदृश्यम्

कृष्णः – धनञ्जय! व्यूहस्य अभ्यन्तरे प्रवेष्टव्यम्। आचार्य्येण संगोप्य लुक्कायितो रक्षितो जयद्रथः। अतएव

प्रविश्याभ्यन्तरे पार्थ सर्व्वे वीरा महावलाः।
अविचार्य्यैव हन्यन्तां भवेयुराकुला यथा॥६२॥

अर्ज्जुनः – वेष्टयितुं प्रचेष्टन्ते मामेते मूढवुद्धयः।
अभिमन्युञ्च मां वालं सत्वैवं क्रियते त्विमैः॥६३॥
निमेषेण हनिष्यामि सर्व्वान् मूढधियो जनान्।
योद्धृहीनं करिष्यामि कौरवं रनसेव हि॥६४॥
मम पुत्रस्य हन्तारं पापिष्ठं तं जयद्रथम्।
केनोपायेन को रक्षेत् पश्याम्यद्य वलेन तत्॥६५॥

कृष्णः – श्रुतं मया, आचार्य्यशकुनी परामृश्य जयद्रथं लुक्कायितम् अरक्षताम्।

अर्ज्जुनः – इन्द्रो वा वरुणो वायुः कुवेरः शमनस्तथा।
सूर्य्याचन्द्रमसौ रक्षेण ते न सक्षमस्तथा॥६६॥
निम्ने वा चोर्द्ध देशेऽथ यस्मिन् देशेऽपि कुत्तचित्।
तस्मादेव समानीय हनिष्यामि जयद्रथम्॥६७॥

कृष्णः – धनञ्जय! कः संशयः? को न जानाति ते पराक्रमम्।
को वा युद्धे समक्षन्ते स्थातुं भवति सक्षमः।
वैरट युद्धवार्त्तां किं विस्मरन्ति हि कौरवाः॥६८॥
तथापि यत्न आधेयः कालो गच्छति सत्वरम्।
अपराह्नः समायातः कालक्षेपो न युज्यते॥६९॥

अर्ज्जुनः – तव निर्द्देशमेव पालयामि शरक्षेपेण सर्व्वान् जर्ज्जरीकृत्य अभ्यन्तरं प्रविशामि। (वाणान् क्षिपति)

कृष्णः – (स्वगतम्) कालोऽतिक्रामति एव। जयद्रथस्य सन्धानं कथमपि नोपलभ्यते। अतएव अधुना विचारणाया नास्ति अवकाशः। सम्प्रति सुदर्शनेन सूर्य्यमाच्छयामि। येन सूर्य्योऽस्तं गत इति मन्यमानाः जयद्रथरक्षणे उदासीना भवेयुः कौरवाः।

(तथा कुरुते)

(नेपथ्ये महान् उल्लासः। जयद्रथेन सह दुर्य्योधनादीनां प्रवेशः)

शकुनिः – सत्यप्रतिज्ञ! प्रतिज्ञां रक्षा कथं विलम्बसे?

कृष्णः – मातुल! कथं चिन्तयसि? अर्ज्जुनः सत्यप्रतिज्ञ एव। प्रतिज्ञामवश्यमेव रक्षिष्यति। तत्र कः संशय। धनञ्जय! तवाग्रे तव पुत्रघाती जयद्रथः समुपस्थितः। कथमधुनापि विलम्वसे? शीघ्रं निपातय पापिष्ठम्।

अर्ज्जुनः – वासुदेव! कथं प्रतिज्ञालङ्घनं करोमि।

कृष्णः – आः कथं विलम्वसे? शीघ्रं निपातय पापिष्ठम्।

अर्ज्जुनः – सूर्ये अस्तं गते कथं जयद्रथं हनिष्यामि?

कृष्णः – आः कथं सूर्य्यः अस्तं गमिष्यति? पश्य (सूदर्शनम् अपसारयति)

शकुनिः – आः कूटयुद्धे! चक्रिन्! अद्य त्वया पराभूतेवुतोऽस्मि। सर्व्वे वीराः। आचार्य्य सन्नद्धा भवन्तः जयद्रथं रक्षितुं चेष्टन्ताम्

अर्ज्जुनः – चेष्टान्तां सर्व्वे।

सिंहगह्वरमध्ये तु प्रविष्टं मृगशावकम्।
रक्षितुं कः समर्थोऽत्र भविता भुवनत्रये॥७०॥

जयद्रथ! पापिष्ठ! पुत्रघातिन्! अद्य स्वकर्म्मफलमप्नुहि।

अपराधेन शून्यं तमभिमन्युं शिशुं भुवि
निष्पापं सरलं हत्वा तस्य फलमवाप्नुहि॥७१॥

दूर्य्योधनः – आचार्य्य! मातुल! कर्ण! सर्व्वे सन्नद्धा रक्षन्तु जयद्रथम्।

अर्ज्जुनः – सुयोधन! अर्ज्जुननेत्रदेशप्रविष्टं जयद्रथं रक्षितुं कोऽपि न समर्थो भवेत्। अधुनैव पश्य। (इति शरं क्षिपति। शरविद्धो जयद्रथो निहतश्च। तं नीत्व दुर्य्योधनादयः अपक्रान्ताः युधिष्ठिर भीमसेनौ प्रविशतः)

युधिष्ठिरः – धनञ्जय! वासुदेव! क्व वर्त्तसे क्व वर्त्तसे?

कृष्णः – धर्म्मराज! कथं चिन्तयसि।

प्रतिज्ञोत्तीर्ण एषोऽसौ धनञ्जयोऽवतिष्ठते।
तनयघात शोधं धनञ्जयोऽग्रहीद् वलात्॥७२॥

युधिष्ठिरः – धनञ्जय! धनञ्जय! त्वं प्रतिज्ञोत्तीर्णोऽसि? एहि भ्रातः! आलिङ्गनं देहि।

अर्ज्जुनः – अग्रज! अत्रापि नास्ति मे किमपि कृतित्वम् एतदपि साधवप्रसादादेव समभवत्।

युधिष्ठिरः – कथमिव?

अर्ज्जुनः – अन्विष्यापि न लब्धोऽसौ व्यूहमध्ये जयद्रथः।
कृष्णवुद्ध्या तु संलब्धो दुरात्मा पापकृद्रतः॥७३॥

युधिष्ठिरः – कथमिव?

अर्ज्जुनः – चक्रेणाच्छादितः सूर्य्यस्तेनैते विभ्रमं गताः।

सन्ध्यागतेति मत्वैव प्रहृष्टास्ते समागताः ॥७४॥

युधिष्ठिरः – आं तेनैव कौरवशिविरे महान् उल्लासशब्द आकर्णितोऽस्माभिः। वासुदेव! जनार्दन! तव प्रसादेनैव अद्य अस्माकं प्राणाधिको धनञ्जयः प्रतिज्ञोत्तीर्णः अस्माभिः विलोक्यतो।

कृष्णः – धर्म्मराज! धर्म्माश्रितानां रक्षणायैव मे समागतः। अतएव धर्म्माश्रितानां मच्छरणातानां युष्माकं रक्षणमेव व्रतम्। मदीयव्रतपालनायैव एतत् सर्व्वं कृतं क्रियते, करिष्यते च। अत्र नास्ति कश्चिद् विशेषः। धर्म्मराज! अतः परं किन्ते प्रियमुपहरामि।

युधिष्ठिरः – वासुदेव! जनार्दन! धर्म्ममूर्त्ते! अतःपरमपि प्रार्थना? तथापीदमास्तु।

सत्योधर्म्मः प्रचलतु सदा सर्व्वविश्वे समन्तात्
हिंसाद्वेषः सकलभूवनात् दूरमेव प्रयातु।
शुद्धज्ञानाद् निखिलमनुजाः शान्तिपूर्णा भवन्तु
दैवीवाणी नियतमिह सा दिव्यभासा विभातु ॥७५॥

इति भरद्वाजगोत्रोद्भव रामगोपालस्मृतिरत्नात्मजश्रीनित्यानन्दमुखोपाध्यायविरचितं जयद्रथवधनाटकम् १३९३ वङ्गाब्दीयसौराषारस्य द्वितायदिवसे समाप्तम्। एकत्रिंशत्संख्यकनाटकस्मिन्।

৪.১ নাটকের বঙ্গানুবাদ

শ্রী নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়

রচিত নাটক

জয়দ্রথবধ

প্রথমাঙ্কের প্রথমদৃশ্য–তোরণম্

নান্দী

সেই বিষ্ণুদেব পৃথিবীর বন্ধু। যিনি পৃথিবীর পালক, এই বিশ্বকে যিনি সৃজন করেন, হরণ করেন, ধারণ করেন। তিনি গুণহীন আবার গুণবান। সেই কৃপালু বিষ্ণু তোমাদের সর্বদা রক্ষা করুক। (১)

সূত্রধার : (প্রবেশ করে) দেবলীলাময় ভারতবর্ষকে প্রণাম জানাই যেখানে সনাতন ধর্ম সর্বদা মূর্ত বিরাজ করে। (২)

বেদবিভাগের কর্তা পুরা প্রভু বিষ্ণুরূপধারী দেব বেদব্যাসকে নমস্কার। (৩)

সম্মানিত সম্মিলিত আর্য্যমিশ্রদের আমি বন্দনা করি। বিদ্বদজন-সমাশ্রিত এই সভাকে বন্দন করি। (৪)

বিস্তারিত বলার দরকার নেই। উপস্থিত এই পরিষদকর্তৃক আদিষ্ট হয়েছি এই মহোত্সবে আপনাদের প্রীতির জন্য কোন নাটক করার জন্য। সেইজন্যই পারিপার্শ্বিককে আহ্বান করি। হে বন্ধু! রঙ্গস্থলে প্রবেশ কর।

পারিপার্শ্বিক : (প্রবেশ করে) বন্ধু! এই আমি উপস্থিত হয়েছি।

সূত্রধার : হে বন্ধু! আজ এই মহোৎসবে উপস্থিত আর্য্যমিশ্রদের বিনোদনের জন্য নাটক করা কর্তব্য। সেই নাটক নিরূপণ কর।

পারিপার্শ্বিক : এখানে চিন্তার কি অবকাশ?

উৎসবে যাঁরা এসেছেন তাঁরা ভারতীয় এতে কোন সংশয় নেই নিজেদের আদর্শে ও সংস্কৃতিতে সর্বদা শ্রদ্ধাবান। (৫)

সূত্রধার : তাতে কি?

পারিপার্শ্বিক : তাহলে সমস্ত যত্নের দ্বারা সকলের প্রীতির জন্য পারিষদ কর্তৃক ভারতকে অবলম্বন করে নাটক প্রয়োগ করা উচিত। (৬)

সূত্রধার : নাটকের নাম উল্লেখ কর।

পারিপার্শ্বিক : রামগোপালপুত্র নিত্যানন্দশর্ম্মার রচিত নূতন নাটক জয়দ্রথবধম্। (৭)

সূত্রধার : ঠিক আছে, তাহলে তার প্রয়োগের উদ্যোগ কর।

পারিপার্শ্বিক : আমি পারিষদগণকে জানিয়ে নাটক আরম্ভের উদ্যোগ করছি। তুমিও আর্য্যমিশ্রদের জানিয়ে রঙ্গস্থল সুসজ্জিত কর।

সূত্রধার : এই আমি করছি। হে আর্য্যমিশ্রগণ শুনুন আপনারা শুনুন। আজ এই মহোত্সবে উপস্থিত আপনাদের চিত্তবিনোদনের জন্য কোন এক নাটক উপস্থাপন করা উচিত। আজ পারিপার্শ্বিকের দ্বারা নবরচিত জয়দ্রথবধনাটক প্রস্তুত করা হয়েছে, আপনাদের সম্মতি আছে কি? আপনারা মনোযোগ দিন। (শোনার অভিনয় করে) কি বললেন আপনারা। আপনাদের সর্বপ্রকার সম্মতি আছে। কৃপয়া আপনারা অবধান করুন (শোনার অভিনয় করে) আরে! (নেপথ্যে কোলাহল) কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন দেখছি।

ভিতরে,

অর্জুন : আজই বিনিপাত করব।

সূত্রধার : হ্যাঁ জেনেছি,

অভিমন্যুবধজাত শোকের জন্য অর্জুন প্রতিশোধ গ্রহণের প্রতিজ্ঞা করছে। (৮) তাহলে হে পারিপার্শ্বিক, শেষে কি ঘটবে তার জন্য আমার মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। (তাড়াতাড়ি চল)

পারিপার্শ্বিক : আচ্ছা।

(নিষ্ক্রান্ত)

প্রথমাঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য

অর্জুন : আজ সূর্যাস্তের মধ্যে দুষ্টকর্মা জয়দ্রথকে বলের দ্বারা বিনিপাত করব, না হলে নিজেই মৃত্যুকে বরণ করব। (৯)

কৃষ্ণ : ধনঞ্জয়! স্থির হও, অস্থির হয়ো না, শোককে ত্যাগ কর।

ভুবনত্রয়ে নিয়তি লঙ্ঘন করাই বা কার সামর্থ্য আছে? এই রকম চিন্তা করে

পার্থ নিজের শোক ত্যাগ করে স্থির হও। (১০)

অর্জুন : বাসুদেব! প্রাণপ্রিয় প্রাণের অধিক নয়নমণি অভিমন্যুকে কীভাবে ভুলে যাব। অভিমন্যু নেই এই কথা যখন আমার মনে উদয় হচ্ছে হে কৃষ্ণ শোকের দ্বারা আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে। (১১)

কৃষ্ণ : ধনঞ্জয়! ধর্মরাজের কথা চিন্তা কর। অনুশোচনার জন্য রাজা সবসময় বিদীর্ণ হচ্ছেন। সমস্ত কিছু অশুভের কারণ নিজেকেই মনে করছেন। (১২)
তুমি যদি এইরকম অধৈর্য্য হও তাহলে তোমার এমন অবস্থা দেখে ধর্মরাজ নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করে জীবনের সমাপ্তি ঘটাবেন।

অর্জুন : এইরকম আশঙ্কা নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু কি করব। তোমার উপদেশ স্মরণ করেও কেন কোন প্রকারেও নিজেকে বোঝাতে পারছি না।
কিরূপ জ্বালা হচ্ছে হৃদয়ে শোকতাপে ও বিরহ জ্বালায় সর্বপ্রকারে বিদীর্ণ হচ্ছি। এখানে আমার মনে লেশ মাত্র শান্তি নেই কোন জায়গায় গেলে মনের দুঃখ দূর হবে। (১৩)

কৃষ্ণ : ধনঞ্জয়! ক্ষত্রিয় তুমি। ক্ষত্রিয়ের শোক প্রকাশ অশ্রু ব্যয়ের দ্বারা নয়, প্রতিশোধ গ্রহণের দ্বারাই হয়। যাদের প্রচেষ্টায় যুদ্ধে অভিমন্যু নিহত হয়েছে তাদের রক্তধারার দ্বারা যুদ্ধস্থলে তর্পণ কর। (১৪)
চোখের জল মৃত আত্মাকে কষ্ট দেয়, শত্রুর রক্তপাতে মৃতাত্মা তৃপ্তি পায়। (১৫)
ধনঞ্জয়! ওঠো। শোক নির্মুক্ত কর, প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্য উদ্যোগী হও।

অর্জুন : সত্যই, রোদনের কোন শেষ নেই। শিশু অভিমন্যুর মৃত্যুতে যারা ভাগীদার তাদের যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু বিধান করেই পুত্রকে তৃপ্ত করব। (১৬)
সমস্ত শত্রুকে পরাজিত করে যুদ্ধক্ষেত্রে জয়দ্রথকে মৃত্যুগৃহে প্রবেশ করিয়ে ভূমিতলকে কৌরবশূন্য করে পৃথিবীতে পুত্রের তৃপ্তি সাধন করব। (১৭)

কৃষ্ণ : ধনঞ্জয়! চল। ধর্মরাজের কাছে যাই। কি জানি ধর্মরাজের এখন কি অবস্থা।

অর্জুন : জনার্দ্দন! কি করে অগ্রজের কাছে যাব। যখন আমাকে জানতে চাইবেন আমি কি উত্তর দেব। বাসুদেব তুমিই যাও। আমি যাব না।

কৃষ্ণ : ধনঞ্জয়! ধর্মরাজের অবস্থা চিন্তা বিবেচনা করে একটুও সময় নষ্ট করা উচিত নয়। তার প্রতি সান্ত্বনা দেওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। আমাদের বিলম্বে তিনি নিশ্চয়ই খুব ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। অতএব শীঘ্র চল।

অর্জুন : কি উপায়। চল।

(নিষ্ক্রান্ত)

দ্বিতীয়াঙ্কে প্রথমদৃশ্য ধৃতরাষ্ট্রগৃহ

ধৃতরাষ্ট্র : কে তুমি?

দুর্য্যোধন : পিতা! দুর্য্যোধন আমি অভিবাদন করছি।

ধৃতরাষ্ট্র : কেন হঠাত্ অভিবাদনের জন্য উপস্থিত হয়েছে?

দুর্য্যোধন : বিজয়লাভের পর পিতাকে অভিবাদন করা উচিত এই মনে করে আমি উপস্থিত হয়েছি।

ধৃতরাষ্ট্র : কি জয়লাভ করেছ তুমি? কাকেই বা জয়লাভ করেছ? ভীমসেনকে?

দুর্য্যোধন : না।

ধৃতরাষ্ট্র : তাহলে বাসুদেবের মিত্র ধনঞ্জয়?

দুর্য্যোধন : না না।

ধৃতরাষ্ট্র : তাহলে পাণ্ডবদের মধ্যে অন্য কেউ?

দুর্য্যোধন : না না তাও না।

ধৃতরাষ্ট্র : তাহলে কি জয়লাভ করে আমাকে অভিবাদন করতে এসেছো।

দুর্য্যোধন : ধনঞ্জয়ের বীর পুত্র যদুপতির ভাগ্নে পাণ্ডবদের নয়ন স্বরূপ অভিমন্যু বলপূর্বক নিহত হয়েছে। (১৮)

ধৃতরাষ্ট্র : সুযোধন! এটা বলতে লজ্জা হল না।

যে বালক কৌরববংশকেতু, যদুগণের তথা কুরুগণের প্রিয় তেমন বিরাটবংশের প্রিয় নির্বোধগণের দ্বারা দুষ্টযুদ্ধে নিপাতিত হয়েছে সে। (১৯)

আরোও,

মৃত্যুর মূল রচনা করে তুমি বংশ ন্যাশের হেতু। বালককে হত্যা করে নির্লজ্জ জয় করেছি এই মনে করে এখানে এসেছো। (২০)

দুর্য্যোধন : পিতা! কেন তুমি তিরষ্কার করছো?

ধৃতরাষ্ট্র : তুমি কি জানো না?

একটি বালককে হত্যা করে স্ববংশের ধ্বংসকে সামনে নিয়ে এসেছ এটা কেন তুমি চিন্তা করছ না। (২১)

আজই তাহলে পুত্র শোকে দীপ্ত অতিভীষণ যুদ্ধ করবে এখানে কারোরই নিষ্কৃতি নেই আজই যুদ্ধের শেষ হবে। (২২)

দুর্য্যোধন : হে তাত! আমাদের দুর্বল ভেবে এমন কাতর কেন হচ্ছ। আমরা

সঙ্ঘবদ্ধভাবে কি না করতে পারি। (২৩)
আজই সাত বীরের দ্বারা বেষ্টন করে (ঘিরে) মহাবীর মহাবল অভিমন্যু মহাযুদ্ধে নিপাতিত হয়েছে। (২৪)

ধৃতরাষ্ট্র : কি, সাতবীরের দ্বারা বেষ্টন করে বালক অভিমন্যু নিপাত হয়েছে।

দুর্য্যোধন : হ্যাঁ।
জয়দ্রথ মহাবীর একাই সমস্ত পাণ্ডবদের বীর্যের দ্বারা আটকে ছিলেন, শক্তি তাদের কোথায় গেল? (২৫)

ধৃতরাষ্ট্র : কি জয়দ্রথ একাই পাণ্ডবদের আটকেছে? হায় কষ্ট
দুঃশলা নামে যে কন্যা আমার প্রাণের থেকেও প্রিয়, তোমাদের
ভাইদের আনন্দের জন্য সে বিধবা হল। (২৬)

দুর্য্যোধন : কেন এরকম বলছো তাত?

ধৃতরাষ্ট্র : ধনঞ্জয়ের দ্বারা যুদ্ধে জয়দ্রথ বধ হবে এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই। (২৭)

দুর্য্যোধন : আজ সূর্যাস্তগমনের পূর্বে জয়দ্রথকে নিধনে অসমর্থ হলে ধনঞ্জয় মৃত্যু গ্রহণ করবে সে প্রতিজ্ঞা করেছে। সেইজন্য আপনার আশীর্বাদের উদ্দেশ্যে এসেছি।

ধৃতরাষ্ট্র : হায়! জয়দ্রথ নিহত হল। সঞ্জয়! আমাকে দুঃশলার কাছে নিয়ে চল।

(বাহির)

দ্বিতীয়াঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য- যুধিষ্ঠির শিবির

যুধিষ্ঠির : বাসুদেব! তুমি এসেছো। কোথায় ছিলে? সকাতরে আহ্বান থাকা সত্ত্বেও তুমি আসনি।

কৃষ্ণ : ধর্মরাজ সঞ্জয়কে নিয়ে আমরা দুজন বহুদুরে গিয়েছিলাম। সেইজন্য আপনার আহ্বান শুনতে সমর্থ হই নি।

যুধিষ্ঠির : আমি পাপিষ্ঠ, অভিমন্যুর বধে আমি একমাত্র কারণ, বালকটিকে মৃত্যুগহ্বরে প্রবেশ করিয়েছি। (বাসুদেব) আমি এ কি করলাম? সুভদ্রা মায়ের কাছে কীভাবে যাব? কি বা বলব তাকে?

কৃষ্ণ : ধর্ম্মরাজ! আপনি যদি এরকম কাতর হন তাহলে ধনঞ্জয়ের কীরকম অবস্থা হবে? কীভাবে সে ধৈর্য্য ধরতে সমর্থ হবে?

যুধিষ্ঠির : না না বাসুদেব! ধৈর্য্যচ্যুত হব না, ধৈর্য্য ধরে থাকাই আমার কাজ। অন্যথা কি বা উপায় আছে?

কৃষ্ণ : ধর্ম্মরাজ! ধনঞ্জয়ের প্রতিজ্ঞা কি শুনেছেন?

যুধিষ্ঠির : কি? ধনঞ্জয় প্রতিজ্ঞা করেছে?

কৃষ্ণ : অতি ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা করেছে।

যুধিষ্ঠির : কি সেই প্রতিজ্ঞা?

কৃষ্ণ : আজ সূর্যাস্ত হবার পূর্বে জয়দ্রথকে নিহত করবে, অসমর্থ হলে নিজে মৃত্যুগ্রহণ করবে।

যুধিষ্ঠির : কি? এইরূপ প্রতিজ্ঞা সে করেছে? কীভাবে সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হবে?
সকলে জয়দ্রথকে সমস্ত বলের দ্বারা ঘিরে রক্ষা করছে যেখানে সূচেরও প্রবেশ সম্ভব নয়। (২৮)
বাসুদেব! কেন তুমি নিষেধ কর নি?

কৃষ্ণ : সেখানে নিষেধের অবকাশ লেশমাত্রও ছিল না, শুনেই সে তত্ক্ষণাত্ প্রতিজ্ঞা করেছে। (২৯)
এখন আমাদের নিশ্চেষ্ট হওয়া উচিত নয়।
এই যুদ্ধের ফলের দ্বারাই সমস্ত যুদ্ধের জয় পরাজয় নিশ্চিত হবে। (৩০)

যুধিষ্ঠির : তা আমি সম্যকভাবে অনুধাবন করতে পারি। কিন্তু এখন কি করব?

কৃষ্ণ : শোক পরিত্যাগ করে বলের দ্বারা উঠে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে সবাইকে যুদ্ধের জন্য যত্নের দ্বারা প্রস্তুত হতে হবে। (৩১)
আচার্যের সমস্ত ছলকে বুদ্ধির দ্বারা বিনাশ করে জয়দ্রথের বিনাশের জন্য সবাইকে প্রস্তুত হতে হবে। (৩২)

যুধিষ্ঠির : কৃষ্ণ! নির্দেশ দান কর যেমন তুমি বলবে প্রাণ গেলেও সেইরূপ সব করব। (৩৩)

কৃষ্ণ : তাহলে ভীমদের সবাইকে ডাক পরামর্শ করে যুদ্ধনীতি স্থির করতে হবে।

যুধিষ্ঠির : এইরকমই করব।

কৃষ্ণ : মুখ্য সবাইকে ডেকে এখানে মিলিত কর। আমিও সুভদ্রাকে সান্ত্বনা দিয়ে এখনই ফিরে আসছি। ধর্ম্মরাজ! কিন্তু সাবধানে সমস্ত কর, এটা আমাদের সবাইকে মনে রাখতে হবে আমাদের প্রচেষ্টার উপরই ধনঞ্জয়ের জীবন মরণ নির্ভর করছে। অতএব আমাদের পরামর্শের গোপনতা যেন সুরক্ষিত থাকে সেই ব্যাপারে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

যুধিষ্ঠির : বাসুদেব! তোমার নির্দেশ যথাযথ প্রতিপালন করব আমি।

কৃষ্ণ : তাহলে যাই (প্রস্থান)

যুধিষ্ঠির : মধুসূদন! কি জানি কি তার অভিপ্রায়। কোথায় বা নিয়ে যাবে আমাদের। যা তিনি চাইবেন তাই হবে। আমিতো নির্দেশ পালন করব।

(প্রস্থান)

তৃতীয়াঙ্কে প্রথমদৃশ্য–দুর্য্যোধন শিবির

দুর্য্যোধন : মাতুল! অভিমন্যুর বধে তাত অতীব ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত।

শকুনি : কীরকম?

দুর্য্যোধন : আমি আভিবাদন করলাম। তিনি আশীর্বাদও করলেন না।

শকুনি : জ্বরার এই রকমই পরিণতি হয়।

দুর্য্যোধন : অর্জুন জয়দ্রথকে নিহত করবে এই ভেবে আমাকে অতীব তিরস্কার করলেন তিনি।

শকুনি : জয়দ্রথকে নিহত করার সামর্থ কার আছে?
ইন্দ্র বা বরুণ বা চন্দ্র বা পবন একজন বা মিলিত হলেও কখনও পারবে না।(৩৪)
অভিমন্যুকে ব্যুহমধ্যে আবদ্ধ করে যেরকম নিহত করেছি অর্জুনকেও সেভাবেই নিহত করব। (৩৫)

দুর্য্যোধন : কিন্তু যথাযথ যত্ন নেওয়া উচিত। না হলে বিপদ উপস্থিত হতে পারে।

শকুনি : কেন চিন্তা করছ দুর্য্যোধন!
আজই যুদ্ধের শেষদিন এটা নিশ্চিত হয়ে স্থির হও ধনঞ্জয়ের রক্ষা কৃষ্ণও করতে পারবে না। (৩৬)

দুর্য্যোধন : কিন্তু কী উপায়ে তা সম্ভব হবে?
যুদ্ধে পাণ্ডবরা সমস্ত উপায়ে যত্ন সহকারে যুদ্ধ করবে এবং কূটবুদ্ধি সম্পন্ন কংসারি যদুনন্দনও সেখানে আছে। (৩৭)

শকুনি : শকুনি সুবলপুত্র তোমাদের সাথে আছে তার বুদ্ধি নষ্ট করতে। তাদের উভয়ের কূটবুদ্ধির পরীক্ষা হবে। (৩৮)

দুর্য্যোধন : জানি না কি মনে করে তুমি নিশ্চিত হয়ে আছো।

শকুনি : আমি লেশমাত্র নিশ্চিন্ত নই।
কিন্তু চিন্তার বহিঃপ্রকাশের কি ফল? মনন করেই সব সংরক্ষণ করা কর্তব্য।
তার যদি অন্য কিছু কর মন্ত্রসিদ্ধি বিফল হবে।

দুর্য্যোধন : হ্যাঁ, ক্রমশ জানছি।

শকুনি : এখন আচার্যের কাছে চল।

দুর্য্যোধন : সেখানে গিয়ে কি ফল হবে?

শকুনি : সেখানেই জানতে পারবে।

দুর্য্যোধন : চল।

(বাহির)

তৃতীয়াঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য

জয়দ্রথ : কৌরবরাজ! কেন চিন্তা করছো?
হরিণ কি সিংহরাজকে বহু চেষ্টার মাধ্যমে কখনও ভক্ষণ করতে পারে? আকাশ থেকে কি গ্রহরাজ ভানুকে কেউ নিচে নামিয়ে আনতে পারে? (৩৯)
যুদ্ধে নিজের বলের দ্বারাই পার্থকে জয় লাভ করব, তাকে রক্ষা করতে কেউ সমর্থ হবে না।
যদি তোমার সত্যই সত্যতে নিষ্ঠা থাকে তাহলে আগামীকাল নিশ্চিত মৃত্যু হবে। (৪০)

শকুনি : জয়দ্রথ! এই শিশু অভিমন্যু তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী নয়।
শিবের থেকে অস্ত্র প্রাপ্ত হয়েছে ইন্দ্রের থেকেও দৈব অস্ত্র মানুষাস্ত্রের দ্বারা সর্বপ্রকারে পরিশোভিত। (৪১)
ভীম এর রক্ষক তারপর অন্য পাণ্ডবরা ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবীরও এর রক্ষক। (৪২)
আরোও,
কংসের শত্রু কংসারি কূটবুদ্ধি বাসুদেব এর মিত্র, সারথী, রক্ষক, বন্ধু ও বুদ্ধিদাতা। (৪৩)
তার থেকেও বড় মনে কর দ্রৌপদীহরণের দিনের কথা।
সেই অপমানের দিনে পাণ্ডবদের দ্বারা কীরকম অপমান করেছিল বিশেষত ভীম, মনে রেখ সবসময় তুমি। (৪৪)

জয়দ্রথ : মনে আছে সব।

সেই অপমানের শোধ আজ আমি নেব, পাণ্ডব-তনয়দের হত্যা করে, আজই নিজের বলের দ্বারা ভূ-লোক পাণ্ডবশূন্য করব হে বীর। (৪৫)

শকুনি : মহাবলে মহাযুদ্ধে তুমি এটা সবসময় পালন কর কিন্তু সাবধানে সব করা উচিত।

হটকারী কাজ হিতের কল্পনা করেনা সেইজন্য সব বিচার করেই কাজকর্ম করা উচিত। (৪৬)

অতএব আজ যা আমরা বলব তাই তোমার করা উচিত, অন্যথা কোন ভাবেই করবে না।

দুর্য্যোধন : হ্যাঁ জয়দ্রথ! যা আমরা করব তা সবটাই তোমার কল্যাণের জন্য।

কোন শত্রুকেই উপেক্ষা করা উচিত নয়, এই ধরাতলে কেউ হীন হলেও করা উচিত নয়। এই শত্রু বহু শক্তিযুক্ত প্রখ্যাত বীর অনেক কীর্তি যুক্ত। (৪৭)

অতএব আজ আমাদের সকলের অপ্রমত্ত হওয়া উচিত। আচার্য্য বা মাতুলেরা যেরকম উপদেশ দেবেন সেরকমই আমরা করব।

জয়দ্রথ : যেমন আপনার অভিপ্রায়।

দুর্য্যোধন : আমার একমাত্র প্রিয় ভগ্নীর তুমি স্বামী। তোমার মঙ্গল এবং অমঙ্গলের দ্বারা আজ আমার ভগিনীর মঙ্গল অমঙ্গল। (৪৮)

পিতাও তোমার জন্য চিন্তান্বিত। প্রিয় কন্যা তার প্রাণসম, সেইজন্য সবরকম প্রযত্নের দ্বারা তোমার রক্ষা করাই আমার কাজ। (৪৯)

শকুনি : জয়দ্রথ! বত্‌স! এস আমার সাথে।

জয়দ্রথ : আর কি? চল।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থাঙ্কে প্রথমদৃশ্য

যুধিষ্ঠির : বাসুদেব! ঘটোত্‌কচবধে ভীষণ ব্যথিত ও বিষণ্ণ ভীমসেন। কিন্তু তোমার মধ্যে ভাবান্তর পরিলক্ষণ করা যাচ্ছে না?

কৃষ্ণ : ঘটোত্‌কচবধও আমাদের সর্বপ্রকার দুঃখের কারণ, এতে কোনোরকম সংশয় নেই কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার মধ্যে কেন কোন প্রকাশ নেই এইরকম প্রশ্ন করছেন

ধর্ম্মরাজ। শুনুন-
ঘটোত্‌কচবধের জন্য কৌরবদের যা করতে হয়েছে এর দ্বারাই তাদের পরাজয় নিশ্চিত হবে। (৫০)

যুধিষ্ঠির : কি বিবেচনা করে তুমি এমন বললে?

কৃষ্ণ : ইন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত এক পুরুষ হত্যাকারী পরম অস্ত্র যেটি কর্ণের ছিল সেটি যুদ্ধে খুবই ভয়ের কারণ ছিল। (৫১)
সেটি থাকলে যুদ্ধক্ষেত্রে পার্থের মৃত্যু নিশ্চিত হত, সেটিকে বারণে লেশমাত্র সামর্থ ছিল না। (৫২)
সেইজন্য ঘটোত্‌কচবধে মনে যেমন দুঃখ তেমনি ধনঞ্জয়ের প্রাণরক্ষার সম্ভবনা সৃষ্টি হওয়ায় আমার মন আনন্দ লাভ করেছে। তাই ধর্মরাজ! দুঃখের প্রকাশ ঘটেনি।

যুধিষ্ঠির : হ্যাঁ, ঠিক মনে করিয়ে দিয়েছেন।
কবচ কুণ্ডল হরণ করে পরে অনুতপ্ত ইন্দ্র কর্ণকে মহাবলশালী একটি অমোঘ অস্ত্র দিয়েছিলেন (৫৩)
ঘটোত্‌কচ বলের দ্বারা কৌরব তখন স্থির ছিল না এই অস্ত্রের প্রয়োগ কর্ণকে দিয়ে করিয়েছিল। (৫৪)

কৃষ্ণ : পার্থের প্রাণরক্ষা এবং কর্ণের নিপাতন এই যুদ্ধের ঘটোত্‌কচের দ্বারাই ঠিক হয়েছে। (৫৫)

যুধিষ্ঠির : বাসুদেব! শুনলাম ব্যূহমধ্যে জয়দ্রথকে আবৃত্ত করে রক্ষা করার সংকল্প করেছে কৌরবপক্ষ এবং যুদ্ধ কাজে ব্যাপৃত অর্জুনকে অন্যত্র নিয়ে যাবে। অতএব বাসুদেব! আমাদের কি করা উচিত তাও নির্দেশ দাও।

কৃষ্ণ : অর্জুনের প্রতিপক্ষদের বধ করে ব্যূহ থেকে জয়দ্রথকে বার করে আনবার জন্য সর্বপ্রকারে চেষ্টা করতে হবে।

যুধিষ্ঠির : সবসময় চেষ্টা করা হবে তোমার বাক্য পালনের জন্য।

কৃষ্ণ : ধর্ম্মরাজ! আমরা পার্থের কাছে যাব।

যুধিষ্ঠির : চল বাসুদেব! তাই হোক।

(প্রস্থান)

চতুর্থাঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য

দ্রোণাচার্য্য : দুর্যোধন! ব্যূহমধ্যে অতীব গুপ্তস্থানে মহাবীরের দ্বারা বেষ্টন করে জয়দ্রথ রক্ষিত আছে। দ্বারেও মহাবীরদের নিয়োগ করা হয়েছে। যাতে কেউই দ্বার অতিক্রম করতে সমর্থ না হয়।

শকুনি : আচার্য্য! এরকম ভাবে কার্য্যসিদ্ধি হবে না। অর্জুনকে দূরে নিয়ে যেতে হবে, না হলে ব্যূহপ্রবেশে অর্জুনকে বাধা দিতে কেউই সমর্থ হবে না।

দ্রোণাচার্য্য : তাও আমি চিন্তা করেছি। সেইজন্য সংসপ্তকদের নিযুক্ত করেছি। অভিমন্যুবধের দিনে যেমন তারা অর্জুনকে দূরে নিয়ে গিয়েছিল, আজও সেইরকম করা হবে।

শকুনি : তাহলে আপনি ঠিকই করেছেন। আমাদের সকলের আচার্য্যের রক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত।

দুর্য্যোধন : অবশ্যই। আমরা সবসময় আচার্য্যকে রক্ষা করব।

দ্রোণাচার্য্য : সবারই সাবধানে ব্যূহের সমস্ত দ্বার রক্ষা করা উচিত। পাণ্ডবেরা যেন ব্যূহে প্রবেশ না করে সেইদিকে সবসময় প্রচেষ্টা করতে হবে বলের দ্বারা তোমাদের। (৫৬)

শকুনি : কেন আচার্যের চিন্তা করছেন?
অর্জুন ছাড়া পাণ্ডবদের মধ্যে কেউই ব্যূহভেদ করতে জানে না তা পূর্বেই প্রমাণিত। (৫৭)

দ্রোণাচার্য্য : হ্যাঁ, অভিমন্যুবধের দিনে সবকিছু দেখছি। শকুনি! শোন যখন জয়দ্রথবধে পাণ্ডবেরা অসমর্থ হবে তখন কৌরব প্রধানের বধের জন্য চেষ্টা করবে। অতএব
দুর্যোধনের কেশাগ্র যেন কেউ স্পর্শ করতে না পারে ভবিষ্যতে সেরকম যত্নকরে প্রচেষ্টা করা উচিত। (৫৮)
কৌরবাদি রক্ষিত হলে সকলেই রক্ষিত হবে। শীর্ষ ছেদ যদি করা হয় তাহলে বৃক্ষকে কে রক্ষা করতে পারে। (৫৯)

শকুনি : আচার্য্য! আপনার আদেশ সমস্ত প্রকারে আমাদের দ্বারা প্রতিপালন করা হবে।

দুর্য্যোধন : মাতুল! তাহলে নিজ নিজ কাজ প্রতিপালনের জন্য আমরা যাই।

শকুনি : হ্যাঁ। দুর্য্যোধন! সমস্ত ব্যবস্থাই নিশ্চিত করা হয়েছে। এরকম অনায়াসে অর্জুনের

নিপাতন সম্ভব তা চিন্তা করতেও পারছিলাম না। ঘটোত্কচবধে কর্ণের ইন্দ্র প্রদত্ত অস্ত্রব্যয়ের দ্বারা অর্জুনবধের জন্য মহৎ চিন্তা ছিল। চক্রী কৃষ্ণের দ্বারা অর্জুন রক্ষার্থে কীরূপ ব্যবস্থা হয়েছে, কিন্তু তা সবই ব্যর্থরূপে পরিণত হবে।

দ্রোণাচার্য্য : শকুনি! এখনই উল্লাসে লাভ নেই। কংস জরাসন্ধ বধের জন্য চক্রী বাসুদেবের বুদ্ধির কাছে কে ই বা সমর্থ হয়েছে। সেইজন্য এখনই উল্লাস সমীচীন নয়।

দুর্য্যোধন : সঠিক বলেছেন আচার্য্য।

ফললাভের পূর্বে উল্লাস কখনও কর না, বিফল হলে সবাই পরিহাস করবে। (৬০)

ফললাভের জন্য সর্বশক্তি দিয়ে যত্নের সাথে চেষ্টা করতে হবে। জয়দ্রথ রক্ষা পেলে সর্বরক্ষা হবে। (৬১)

শকুনি : তাই হোক। আচার্য্য! আমরা যাই।

দ্রোণাচার্য্য : তাই হোক।

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চমাঙ্কে প্রথমদৃশ্য

যুধিষ্ঠির : ভীমসেন! ধনঞ্জয়ের কোন সংবাদও পেলাম না কি করা যায়?

ভীম : অগ্রজ! অনুসন্ধানের দ্বারা কিছু জানতে সম্ভব হলাম না।

যুধিষ্ঠির : মধ্যাহ্ন কাল প্রায় এসে গেল। কি হবে? জয়দ্রথের সংবাদ পেলাম না।

ভীম : আচার্য্যের দ্বারা ব্যূহমধ্যে জয়দ্রথকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে এইরকম শুনেছি আমরা।

যুধিষ্ঠির : আমরাও ব্যূহ ভেদকরে জয়দ্রথকে নিহত করব।

ভীম : ব্যূহাগ্রের সামনে যেতেই আমরা অসমর্থ, ভেদ করা তো দূরের কথা।

যুধিষ্ঠির : শীঘ্র অর্জুনের সংবাদ নিয়ে এস।

ভীম : যা আদেশ করেন অগ্রজ! (বাহির)

যুধিষ্ঠির : হায়! কেন আমার জন্যও ধনঞ্জয় প্রাণ দিচ্ছে, এর কি প্রতিবিধান করি। হে ভগবান! কেনই স্বজন হারানো যুদ্ধ আমাদের উপর আরোপিত করেছ।

ভীম : (প্রবেশ করে) অগ্রজ! অগ্রজ! ধনঞ্জয়ের সংবাদ পেয়েছি।

যুধিষ্ঠির : বল বল কি সংবাদ?

ভীম : যুদ্ধের ছলনা করে সংশপ্তকরা ধনঞ্জয়কে দূরে নিয়ে গিয়েছে।

যুধিষ্ঠির : তারপর, তারপর।

ভীম : সংশপ্তকদের বিনাশ করে এখন ব্যূহমধ্যে ধনঞ্জয় প্রবেশ করেছে।

যুধিষ্ঠির : ব্যূহমধ্যে ধনঞ্জয় প্রবেশ করেছে?

ভীম : হ্যাঁ।

যুধিষ্ঠির : তাহলে চল। ধনঞ্জয়ের সাহায্যের জন্য আমরাও ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করি।

ভীম : আসুন। যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

(প্রস্থান)

পঞ্চমাঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য

কৃষ্ণ : ধনঞ্জয়! ব্যূহের অভ্যন্তরে প্রবেশ কর। আচার্য্য গোপন ভাবে জয়দ্রথকে লুকিয়ে রেখেছেন এবং রক্ষা করছেন। অতএব
হে পার্থ অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সমস্ত মহাবল বীরদের কোন বিচার ছারাই হত্যা কর যেন তারা আকুল হয়। (৬২)

অর্জুন : এই মূঢ়বুদ্ধিগণ আমাকে বেষ্টন করতে চেষ্টা করছে অভুমন্যুর ন্যায় আমাকে বালক মনে করে এরকম করছে। (৬৩)
নিমেষে হত্যা করব সমস্ত মূঢ়বুদ্ধি মানুষদের বলের দ্বারা, যোদ্ধাহীন করব কৌরবদের যুদ্ধকে। (৬৪)
আমার পুত্রের হত্যাকারী পাপিষ্ঠ সেই জয়দ্রথকে কি উপায়ে কোন বলের দ্বারা কে রক্ষা করতে সমর্থ হবে দেখব। (৬৫)

কৃষ্ণ : শুনলাম, আচার্য্য ও শকুনি পরামর্শ করে জয়দ্রথকে লুকিয়ে রক্ষা করছে।

অর্জুন : ইন্দ্র বা বরুণ বা বায়ু কুবের বা যম সূর্য চন্দ্র কেউই রক্ষা করতে সক্ষম হবে না। (৬৬)
নিম্নদেশে বা উর্দ্ধদেশে যে দেশেই হোক এখানেই এনে হত্যা করব জয়দ্রথকে। (৬৭)

কৃষ্ণ : ধনঞ্জয়! কিসের সংশয়? কে জানে না তোমার পরাক্রম। তিমি থাকলে কে ই বা যুদ্ধে সক্ষম থাকে। বৈরাট যুদ্ধের কথা কি ভুলে গেল কৌরবরা। (৬৮)
তবুও যত্ন নেওয়া উচিত সময় চলে যাচ্ছে বিকেল হয়ে এলো (৬৯)

অর্জুন : তোমার নির্দেশই পালন করব। তীরের আঘাতেই সবাইকে জর্জরীত করে ভিতরে প্রবেশ করব। (বাণ নিক্ষেপ করে)

কৃষ্ণ : (মনে মনে) কাল অতিক্রম করছে। জয়দ্রথের সন্ধান কেন পাওয়া গেল না। অতএব এখন বিচারনের অবকাশ নেই। এখন সুদর্শনের দ্বারা সূর্যকে আবরণ করি। যাতে সূর্য অস্ত গিয়েছে এই ভেবে জয়দ্রথরক্ষণে উদাসীন হয় কৌরবরা। (তাই করে)

(নেপথ্যে মহান উল্লাস! জয়দ্রথের সাথে দুর্য্যোধনদের প্রবেশ)

শকুনি : সত্যপ্রতিজ্ঞ! প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর, কেন বিলম্ব করছ।

কৃষ্ণ : মাতুল! কেন চিন্তা করছ? অর্জুন সত্য প্রতিজ্ঞা করেছে। প্রতিজ্ঞা অবশ্যই রক্ষা হবে। তাতে কি সংশয়। ধনঞ্জয়! তোমার সামনে তোমার তোমার পুত্রঘাতী জয়দ্রথ উপস্থিত। কেন এখনও বিলম্ব করছ? শীঘ্র নিপাত কর পাপিষ্ঠকে।

অর্জুন : বাসুদেব! কীভাবে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করব?

কৃষ্ণ : আঃ কেন বিলম্ব করছ? শীঘ্র নিপাত কর পাপিষ্ঠকে।

অর্জুন : সূর্য অস্ত গিয়েছে কীভাবে জয়দ্রথকে হত্যা করব?

কৃষ্ণ : আঃ কোথায় সূর্য অস্ত গিয়েছে? দেখ (সুদর্শন অপসারিত করে)

শকুনি : আঃ কুটবুদ্ধে! চক্রী! আজ তোমার দ্বারা পরাজিত হলাম আমি। সমস্ত বীর! আচার্য্য! একসাথে হয়ে জয়দ্রথকে রক্ষার চেষ্টা কর।

অর্জুন : চেষ্টা কর সবাই।

সিংহ-গহ্বর মধ্যে প্রবিষ্ট মৃগশাবক রক্ষা করতে এ ভুবনত্রয়ে কে সমর্থ হবে। (৭০)

জয়দ্রথ! পাপিষ্ঠ! পুত্রঘাতিন! আজ নিজকর্মের ফল ভোগ কর। অপরাধ শূন্য শিশু অভিমন্যুকে সেই নিস্পাপ হত্যা করে তার ফল পাও। (৭১)

দুর্য্যোধন : আচার্য্য! মাতুল! কর্ণ! সবাই মিলিত হয়ে রক্ষা কর জয়দ্রথকে।

অর্জুন : সুযোধন! অর্জুনের চোখের সামনে এসে পড়েছে জয়দ্রথ, রক্ষা করতে কেউ সমর্থ হবে না। এখনি দেখ বাণ নিক্ষেপ করে। (শরবিদ্ধ জয়দ্রথ নিহত। তাকে নিয়ে দুর্য্যোধনেরা চলে গেল, যুধিষ্ঠির ভীমসেনেরা প্রবেশ করল।)

যুধিষ্ঠির : ধনঞ্জয়! বাসুদেব! কোথায় আছ।

কৃষ্ণ : ধর্মরাজ! কেন চিন্তা করছ।

প্রতিজ্ঞা উত্তীর্ণ করে এই তো ধনঞ্জয় রয়েছে, পুত্রহত্যার প্রতিশোধ ধনঞ্জয় গ্রহণ করেছে বলের দ্বারা। (৭২)

যুধিষ্ঠির : ধনঞ্জয়! ধনঞ্জয়! তুমি প্রতিজ্ঞা থেকে উত্তীর্ণ হয়েছ, এসো ভাই! আলিঙ্গন দাও।

অর্জুন : অগ্রজ! এখানে আমার কোন কৃতিত্ব নেই, এই মাধবের অনুগ্রহের জন্যই সম্ভব হয়েছে।

যুধিষ্ঠির : কীভাবে?

অর্জুন : অন্বেষণ করেও পাইনি এই ব্যূহমধ্যে জয়দ্রথকে কৃষ্ণবুদ্ধির দ্বারাই সেই পাপকর্মে রত দুরাত্মাকে পেয়েছি। (৭৩)

যুধিষ্ঠির : কীভাবে?

অর্জুন : চক্রের দ্বারা অচ্ছাদিত করে সূর্যকে তাদের বিভ্রম করে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে এই ভেবে সমাগত হয়েছে। (৭৪)

যুধিষ্ঠির : হ্যাঁ সেইজন্য কৌরবশিবিরে মহান উল্লাস শব্দ শুনতে পেলাম আমরা। বাসুদেব! জনার্দন! তোমার অনুগ্রহের জন্যই আজ আমাদের প্রাণের অধিক ধনঞ্জয় প্রতিজ্ঞা উত্তীর্ণ করেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি।।

কৃষ্ণ : ধর্ম্মরাজ! ধর্ম্ম আশ্রিতদের রক্ষার জন্য আমার সমাগম। অতএব ধর্ম্মাশ্রিতদের আমার শরণাগত তোমাদের রক্ষা করাই ব্রত। নিজের ব্রতপালনের জন্যই এই সব কাজ করেছি এবং পরেও করব। এ এমন কিছু না। ধর্ম্মরাজ! এরপর কি প্রিয় কাজ করব।

যুধিষ্ঠির : বাসুদেব! জনার্দন! ধর্ম্মমর্ত্ত! এরপরেও প্রার্থনা? তাই এইরকমই হোক। সত্যধর্ম্ম প্রচলিত হোক সবসময় সর্ববিশ্বে, হিংসা দ্বেষ দূরীভূত হোক সমস্ত পৃথিবী থেকে। শুদ্ধজ্ঞানের জন্য সমস্ত মানুষ শান্তিপূর্ণ হোক, দৈবীবাণী নিয়ত বজায় থাকুক, সংস্কৃত শোভিত হোক। (৭৫)

ইতি ভরদ্বাজগোত্রোদ্ভব রামগোপালস্মৃতিরত্নের পুত্র নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় বিরচিত *‘জয়দ্রথবধ’* নামক নাটক ১৩৯৩ বঙ্গাব্দে আষাঢ়ের দ্বিতীয় দিবসে সমাপ্ত হয়েছে।

৩১ সংখ্যক নাটক এটি।

৪.২ কাহিনী-নাট্যরূপ-নাট্যনির্মাণকলা-নাট্যতত্ত্বানুসারে বিচার:

যে কোন নাটকসমীক্ষার ক্ষেত্রে নাট্যতত্ত্ব-সমীক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। 'নাট্যতত্ত্ব' বলতে এখানে প্রাচীন নাট্যতত্ত্ব বোঝানো হয়েছে, প্রাচীন নাট্যতত্ত্ব কীভাবে আধুনিক কবিদের লেখনীতে অনুস্যূত হয়েছে, সেটি বিচার্য বিষয়।

❖ ৪.২.০ বিষয়বস্তু:

বৈয়াসিক-মহাভারত অবলম্বনে নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় বারোটি নাটক রচনা করেন তার মধ্যে অধিকাংশ এখন অপ্রকাশিত। এই অপ্রকাশিত নাটকের মধ্যে *জয়দ্রথবধ* নাটকটি অন্যতম। ১৩৯৩ বঙ্গাব্দে *জয়দ্রথবধ* নাটকটি নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় রচনা করেন। *বৈয়াসিক-মহাভারতে*র দ্রোণপর্বের ৭৪তম অধ্যায় থেকে শুরু করে ১৩৪তম অধ্যায় পর্যন্ত বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় বিরচিত *জয়দ্রথবধ* নাটকটি। অভিমন্যুবধজাত শোকের দ্বারা অর্জুনের প্রতিশোধ গ্রহণের প্রতিজ্ঞার মধ্য দিয়ে নাটকটির সুত্রপাত ঘটে–

> অদ্যৈব তাবদ্ বিনিপাতয়ামি
> সূর্য্যাস্তযানস্য চ মধ্যতোহি
> জয়দ্রথং দুষ্টকৃতিং বলেন
> নোচেত্ স্বয়ং মৃত্যুমহং বৃণোমি।।[১]

কৃষ্ণ অর্জুনকে শোক ত্যাগ করে স্থির হতে বলেন। তিনি বলেন ক্ষত্রিয়ের শোক প্রকাশ অশ্রু ব্যায়ের দ্বারা নয় প্রতিশোধ গ্রহণের দ্বারাই হয়। নাটকের দ্বিতীয়াঙ্কে ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধনের সংলাপ দেখতে পাওয়া যায়। ধৃতরাষ্ট্র সমস্ত ঘটনা শুনে দুর্যোধনকে তিরস্কার করেন এবং বলেন একটি বালককে হত্যা করে স্ববংশের ধ্বংসকে সামনে নিয়ে এসেছ তুমি–

> বালমেকং নিহত্যৈব স্ববংশপালনং স্বয়ম্
> সন্নিকটে সমানীতং চিন্ত্যতেন ত্বয়া কথম্।।[২]

অন্যদিকে তৃতীয়াঙ্কে দেখা যায়, কূটবুদ্ধি শকুনি অর্জুনের প্রতিজ্ঞার কথা শুনে নিজেদের জয় সুনিশ্চিত ভেবে নেন এবং জয়দ্রথরক্ষার্থে পরিকল্পনা শুরু করেন। চতুর্থাঙ্কে দেখা যায় কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে নিশ্চিন্ত থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন কারণ ইন্দ্রপ্রদত্ত অস্ত্র পূর্বেই ব্যবহৃত হয়েছে । অন্যদিকে শকুনির পরামর্শে জয়দ্রথ ব্যূহমধ্যে মহাবীরের দ্বারা রক্ষিত আছে জানা যায় এবং কীভাবে তাঁরা অর্জুনকে বাধা দেবেন সেই পরিকল্পনাও এখানে আলোচিত হয়েছে। পঞ্চমাঙ্কে মধ্যাহ্নকাল অতিক্রান্ত হয়ে যায় কিন্তু জয়দ্রথের অনুসন্ধান পাণ্ডবেরা পায় না, কারণ ব্যুহভেদ করতেই তাঁরা অসমর্থ। কৃষ্ণের সাথে অর্জুন সংশপ্তকদের হত্যা করে ব্যুহমধ্যে প্রবেশ করেন কিন্তু ব্যূহমধ্যে

কৌরবরা কোথায় জয়দ্রথকে লুকিয়ে রেখেছে তা অনুসন্ধান পাননা। তাই কৃষ্ণ মনে মনে ভাবেন সুদর্শন চক্রের দ্বারা সূর্যকে যদি আবরণ করেন তাহলে সূর্যাস্ত হয়েছে এই ভেবে জয়দ্রথ রক্ষণে উদাসীন হয়ে পড়বে কৌরবরা এবং তাই করেন। সূর্যাস্ত হয়েছে এইভেবে জয়ধ্বনি উল্লাসের দ্বারা ব্যূহমধ্য থেকে দুর্যোধনের সঙ্গে প্রবেশ করেন জয়দ্রথ এবং সেইসময়ই কৃষ্ণ সুদর্শন চক্র অপসারিত করে নেন। বুঝতে পারেন সবটাই কৃষ্ণের পরিকল্পনা। জয়দ্রথকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন কৌরবরা কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়, জয়দ্রথকে শরবিদ্ধ করে নিহত করেন অর্জুন এখানেই নাটকের সমাপ্তি ঘটে। নাটকটিতে পাঁচটি অঙ্ক আছে এবং প্রতিটি অঙ্কে দুটি করে দৃশ্য আছে।

নাটকের নাম	**প্রণেতা**	**উৎস**	**রচনাকাল**	**প্রধান চরিত্র**	**হস্তলিখিত পুঁথিতে পৃষ্ঠাসংখ্যা**	**অঙ্ক সংখ্যা**	**দৃশ্য**	**শ্লোকসংখ্যা**
জয়দ্রথবধ	নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়	*বৈয়াসিক-মহাভারতের* দ্রোণপর্ব	১৩৯৩ বঙ্গাব্দ	কৃষ্ণ, ধৃতরাষ্ট্র, অর্জুন, দুর্য্যোধন, যুধিষ্ঠির, শকুনি, জয়দ্রথ, দ্রোণাচার্য, ভীম	৩০	প্রথম-অঙ্ক	প্রথম দৃশ্য	৮
							দ্বিতীয় দৃশ্য	৯
						দ্বিতীয়-অঙ্ক	প্রথম দৃশ্য	১০
							দ্বিতীয় দৃশ্য	৬
						তৃতীয়-অঙ্ক	প্রথম দৃশ্য	৫
							দ্বিতীয় দৃশ্য	১১
						চতুর্থ-অঙ্ক	প্রথম দৃশ্য	৬
							দ্বিতীয় দৃশ্য	৬
						পঞ্চম-অঙ্ক	প্রথম দৃশ্য	শ্লোকহীন
							দ্বিতীয় দৃশ্য	১৪
							মোট শ্লোকসংখ্যা–	৭৫

৪.২.১ নামকরণ:

নাটকের অন্তর্নিহিত বিষয়ের প্রকাশ নাটকের নামকরণ থেকেই বোঝা যায় অর্থাৎ নাটকের নামকরণ থেকেই পাঠক বা দর্শক বুঝে নেবে নাটকের বিষয়বস্তু কি। বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁর *সাহিত্যদর্পণ* গ্রন্থের ষষ্ঠ-পরিচ্ছেদে

নাটকের নামকরণ প্রসঙ্গে বলেছেন – "নাম কার্য্যং নাটকস্য গর্ভিতার্থপ্রকাশকম্"[৩]। *বৈয়াসিক-মহাভারত* অবলম্বনে নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়ের *জয়দ্রথবধ* নাটকের সূত্রপাত ঘটে পুত্র অভিমন্যুর বধজাত শোকে অর্জুনের প্রতিজ্ঞার মাধ্যমে। প্রতিজ্ঞায় অর্জুন জানান সূর্যাস্তের মধ্যেই জয়দ্রথকে বধ করবেন না হয় নিজেই আত্মহনন করবেন। এই প্রতিজ্ঞাকে কেন্দ্র করেই নাটকের ঘটনা এগোতে থাকে, অন্তিমে কৃষ্ণের সাহায্যে প্রতিজ্ঞা পূরণ হয় এবং অর্জুন জয়দ্রথকে বধ করেন। তাই 'জয়দ্রথস্য বধম্' অর্থাৎ বিষয়বস্তুর দিকে তাকিয়ে নাটকের নামকরণ কাহিনী অনুসারে হয়েছে বলেই মনে হয়।

❖ ৪.২.২ নান্দী

রঙ্গানুষ্ঠানের পূর্বে পূর্বরঙ্গের স্থান[৪]। বিশ্বনাথের মতে নাট্যবস্তুর প্রারম্ভে নাট্য অভিনয়ের বিঘ্নের প্রতীকারের জন্য নটগণ যে অনুষ্ঠান করেন তাই পূর্বরঙ্গ–

যন্নাট্যবস্তুনঃ পূর্বং রঙ্গবিঘ্নোপশান্তয়ে।

কুশীলবাঃ প্রকুর্বন্তি পূর্বরঙ্গঃ স উচ্যতে।।[৫]

আচার্য ভরতের মতে পূর্বরঙ্গের সংখ্যা উনিশ বা কুড়ি। তার মধ্যে দ্বাদশ সংখ্যক অঙ্গটি হল নান্দী। পূর্বরঙ্গের অবশ্যকৃত্য অঙ্গ হল নান্দী। নান্দী পাঠ করা হয় অভিনয় নির্বিঘ্নে পরিচালনা ও পরিসমাপ্তির জন্য। এই কারণে পূর্বরঙ্গে অন্য কোন অনুষ্ঠান হোক বা না হোক নান্দীর অনুষ্ঠান অবশ্যই কর্তব্য–

প্রত্যাহারাদিকান্যঙ্গান্যস্য ভূযাংসি যদ্যপি

তথাপ্যবশ্যং কর্তব্যা নান্দী বিঘ্নোপশান্তযে।।[৬]

অর্থাৎ, নাটকে পূর্বরঙ্গের অনেক অঙ্গ থাকলেও বিঘ্নশান্তির জন্য নান্দী পাঠ অবশ্য করনীয়। *নাট্যশাস্ত্রের* মতে নান্দীর আগে পূর্বরঙ্গের বহির্গত অনুষ্ঠানগুলি গীতবিধি, ধ্রুবাগান ইত্যাদি সম্পন্ন হয়। তারপর সুত্রধার মধ্যম স্বরে নান্দী পাঠ করবেন – "সূত্রধারঃ পঠেন্নান্দীং স্বরমাশ্রিতঃ."[৭] নন্দ্ ধাতুর অচ্ প্রত্যয়ে 'নন্দ' শব্দের উত্তরে প্রজ্ঞাদিত্বাত্ স্বার্থে অণ্ প্রত্যয়ে স্ত্রীলিঙ্গে নান্দী পদটি সিদ্ধ হয়। যার অর্থ আহ্লাদ বা আনন্দদায়িনী। নান্দীর লক্ষণ করতে গিয়ে *নাট্যশাস্ত্রে* বলা হয়েছে–

আশীর্বচনসংযুক্তা নিত্য যস্মাৎ প্রবর্ততে।

দেবদ্বিজনৃপাদীনাং তস্মান্ নান্দীতি সংজ্ঞিতা।।[৮]

অর্থাৎ, দেবতা, ব্রাহ্মণ ও রাজা প্রভৃতির আশীর্বাদযুক্ত বাক্যকেই নান্দী বলা হয়। *নাট্যপ্রদীপে* বলা হয়েছে–

নন্দন্তি কাব্যানি কবীন্দ্রবর্গাঃ কুশীলবাঃ পরিষদাশ্চ সন্তঃ।

যস্মাদলং সজ্জনসিন্ধুহংসী তস্মাদিয়ং সা কথিতেহ নান্দী।।[৯]

নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে "পদৈর্দ্বাদশভিরষ্টাভির্বাপ্যলঙ্কৃতাম্"[১০] অর্থাৎ নান্দীতে আট বা বারোটি পদ থাকবে। এখানে পদ কথার অর্থ *নাট্যপ্রদীপে* বলা হয়েছে–

শ্লোকপাদঃ পদং কেচিৎসুপ্তিঙন্তমথাপরে।

পরেঽবান্তরবাক্যৈং চ পদমাহুর্বিশারদঃ।।[১১]

অর্থাৎ, স্থানবিশেষে সুবন্ত-তিঙন্ত, স্থানবিশেষে শ্লোকের এক-চতুর্থাংশ এবং লক্ষণানুসারে অবান্তর বাক্য যে কোন অর্থই হতে পারে। *সাহিত্যদর্পণে* বলা হয়েছে–

মাঙ্গল্যশঙ্খচন্দ্রাজকোককৈরবংশসিনো।

পদৈর্যুক্তা দ্বাদশভিরষ্টাভির্বা পদৈরুত।।[১২]

অর্থাৎ, মঙ্গলসূচক শঙ্খ, চন্দ্র, পদ্ম, চক্রবাক, শ্বেতপদ্ম ইত্যাদি শব্দের উপস্থিতি, বারোটি ধাতু বা শব্দবিভক্তিযুক্ত পদের অথবা আট বা ততোধিক পাদের (শ্লোকের এক চতুর্থাংশ) পরিসরে গ্রন্থনা নান্দীর বৈশিষ্ট হবে।

নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় বিরচিত *জয়দ্রথবধ* নাটকের প্রথমাঙ্কের প্রথম দৃশ্যের শুরুতে নান্দী বর্ণিত হয়েছে–

নিখিলধরণিবন্ধুঃ পালকো যো ধরণ্যাঃ

সৃজতি হরতি বিশ্বং ধারয়ত্যত্র দেবঃ।

গুণচয়রহিতোঽপি ক্ষেমহেতোর্গুণী ব

ত্ববতু ভুবি স বিষ্ণুঃ সর্ব্বদা বঃ কৃপালুঃ।।[১৩]

অর্থাৎ, সেই বিষ্ণুদেব পৃথিবীর বন্ধু। যিনি পৃথিবীর পালক, এই বিশ্বকে যিনি সৃজন করেন, হরণ করেন, ধারণ করেন। তিনি গুণহীন আবার গুণবান। সেই কৃপালু বিষ্ণু তোমাদের সর্বদা রক্ষা করুক। *নাট্যশাস্ত্রের* লক্ষণানুসারে এখানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিপালক বিষ্ণুর আশীর্বাদ প্রার্থনা করে নান্দীর সৃজন করা হয়েছে। এখানে নান্দী সুপ্ বিভক্তি ও তিঙ্ বিভক্তিযুক্ত পদের মাধ্যমেই হয়েছে। *নাট্যশাস্ত্রের* লক্ষণানুসারে দ্বাদশাধিক পদের ব্যবহার করা হয়েছে। 'নিখিলধরণিবন্ধুঃ', 'পালক' ইত্যাদি দ্বাদশাধিক পদ এখানে দেখতে পাওয়া যায়। এই নান্দী শ্লোকে বিষ্ণুকে নিখিল ধরণীর পালক ইত্যাদি যে বিশেষণ গুলির ব্যবহার করা হয়েছে তা এই নাটকের সঙ্গে অত্যন্ত সঙ্গতিপূর্ণ কারণ এই নাটকে বিষ্ণু অর্থাৎ এখানে শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বকে অমঙ্গল থেকে রক্ষা করার জন্য এবং তার মঙ্গলের জন্য যে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তা যেন এই নান্দী শ্লোকে পরিস্ফুট হয়েছে।

❖ ৪.২.৩ প্রস্তাবনা–

যে বাগ্-ব্যাপার সংস্কৃতবহুল এবং নটগণ যা ব্যবহার করেন তা ভারতী বৃত্তি–"ভারতী সংস্কৃতপ্রায়ো ব্যাগ্ব্যাপারো নরাশ্রয়ঃ।"[১৪] বৃত্তিতে বলা হয়েছে সংস্কৃতবহুল ও বাক্যপ্রধান অভিনয় হল ভারতী–"সংস্কৃতবহুলো বাক্প্রধানো ব্যাপারো ভারতী।"[১৫] নাটকীয় কোন ভূমিকা ছাড়াই মঞ্চে উপস্থিত 'ভরত' নামে পরিচিত অভিনেতাদের সাথে সংশ্লিষ্ট বলে বৃত্তিটির নাম ভারতী বৃত্তি। *নাট্যশাস্ত্রে* ভারতী বৃত্তির লক্ষণ করতে গিয়ে বলা হয়েছে–

যা বাক্প্রধানা পুরুষপ্রযোজ্যা।

স্ত্রীবর্জিতা সংস্কৃতপাঠ্যযুক্তা।।

স্বনামধেয়ৈর্ভরতৈঃ প্রযুক্তা।

সা ভারতী নাম ভবেত্তু বৃত্তিঃ।।[১৬]

প্ররোচনা, বীথী, প্রহসন ও আমুখ এই চারটি ভারতীবৃত্তির অঙ্গ বলে কল্পিত হয়–"তস্যাঃ প্ররোচনা বীথী তথা প্রহসনামুখে।"[১৭] আমুখ ভারতী বৃত্তির সর্বপ্রধান অঙ্গ। নাট্যকার ও নাট্যবিষয়ের প্রস্তাব থাকার জন্য একে প্রস্তাবনাও বলা হয়ে থাকে। প্রস্তাবয়তি প্রকৃতবিষয়মুখাপয়তি ইতি প্রস্থাবনা। স্থাপক এখানে নাট্যের বিষয় আস্থাপন করার জন্য এর অপর নাম স্থাপনা[১৮]। এখানে নাট্যবস্তু, ইতিবৃত্তে কার্যের বীজ, ইতিবৃত্তের সূত্র বা পাত্রপ্রবেশ সূচনা ঘটে–"সূচয়েদ্বস্তু বীজং বা মুখং পাত্রমথাপি বা।"[১৯] বিশ্বনাথ-কবিরাজের মতে সূত্রধারসদৃশ স্থাপকের সাথে নটী বিদূষক বা পারিপার্শ্বিক যেখানে নিজ নিজ কর্তব্য অবলম্বনে প্রাসঙ্গিক নানা বাক্য ব্যবহার করে তাকেই আমুখ বা প্রস্তাবনা বলা হয়[২০]। আলোচ্য নাটকটির প্রস্তাবনা আমুখ শ্রেণীর। ভরতাচার্যের মতে–

নটী বিদূষকো বাপি পারিপার্শ্বিক এব বা।

সুত্রধারেণ সহিতাঃ সংলাপং যত্র কুর্বতে।।

চিত্রৈর্বাক্যৈঃ স্বকার্য্যোত্থৈর্বীথ্যঙ্গৈরন্যথাপি বা।

আমুখং তত্তু বিজ্ঞেয়ং বুধৈঃ প্রস্তাবনাপি বা।।[২১]

নাট্যশাস্ত্রে উদ্ঘাত্যক, কথোদ্ঘাত, প্রয়োগাতিশয়, প্রবৃত্তক ও অবলগিত এই পাঁচটি আমুখের অঙ্গ বলা হয়েছে–

উদ্ঘাত্যকঃ কথোদ্ঘাতঃ প্রয়োগাতিশয়স্তথা

প্রবৃত্তকাবলগিতে আমুখাঙ্গানি পঞ্চবৈ।।[২২]

নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় বিরচিত *জয়দ্রথবধ* নাটকের প্রথম অঙ্কে প্রস্তাবনা লক্ষিত হয়। নান্দীর সমাপ্তির পরই সুত্রধার মঞ্চে প্রবেশ করেন এবং পারিপার্শ্বিককে রঙ্গমঞ্চে আহ্বান করেন। সুত্রধার ও পারিপার্শ্বিকের কথোপকথনের মাধ্যমে নাট্যকারের পরিচয়, নাটকের নাম ইত্যাদি উপস্থাপিত হয়েছে এখানে। প্রথমাঙ্কের শেষের দিকে আর্য্যমিশ্রদের নাটক উপস্থাপনের অনুমতি নেওয়ার পরই নেপথ্যে শোনা যায়– (অর্জুন) "অদ্যৈব তাবত্ বিনিপাতয়ামি।"[২৩] সূত্রধার তা শুনে বলেন 'অভিমন্যুবধজাত শোকের জন্য অর্জুন প্রতিশোধ গ্রহণের প্রতিজ্ঞা করছেন। তাহলে হে পারিপার্শ্বিক, শেষে কি ঘটবে তার জন্য আমার মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে (তাড়াতাড়ি চল)'[২৪]। দ্বিতীয় দৃশ্যের শুরু তেই অর্জুনের প্রবেশ ঘটে প্রতিজ্ঞার মাধ্যমে। তাই এখানে কথোদ্ঘাত শ্রেণীর প্রস্তাবনা হয়েছে বলে মনে হয়। কথোদ্ঘাত প্রস্তাবনার লক্ষণ প্রসঙ্গে *নাট্যশাস্ত্র*কার ভরতাচার্য বলেছেন যখন কোনো পাত্র সূত্রধারের বাক্য বা বাক্যার্থ গ্রহণ করে প্রবেশ করে, তখন তাকে কথোদ্ঘাত প্রস্তাবনা বলা হয়–

সূত্রধারস্য বাক্যং বা যত্র বাক্যার্থমেব বা।

গৃহীত্বা প্রবিশেত্ পাত্রং কথোদ্ঘাতঃ স কীর্তিতঃ।।[২৫]

❖ ৪.২.৪ অর্থপ্রকৃতি

অর্থপ্রকৃতির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল – ‘প্রক্রিয়তে প্রয়োজনং সাধ্যতে আভিরিতি প্রকৃতয়ঃ, অর্থস্য প্রকৃতয় ইতি অর্থপ্রকৃতয়ঃ’। নাটকের প্রধান প্রয়োজন সিদ্ধির হেতু হল অর্থপ্রকৃতি। টীকাকার ধনিকের মতে অর্থপ্রকৃতি হল– “প্রয়োজনসিদ্ধিহেতবঃ।”[২৬] *নাট্যশাস্ত্রে* বীজ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী, কার্য এই পাঁচটি ভেদের কথা বলেছেন–

বীজং বিন্দুঃ পতাকা চ প্রকরী কার্যমেব চ।

অর্থপ্রকৃতয়ঃ পঞ্চ জ্ঞাত্বা যোজ্যা যথাবিধি।।[২৭]

*দশরূপক*কার অর্থপ্রকৃতির ভেদ নিয়ে বলেছেন–

বীজবিন্দুপতাকাখ্যপ্রকরীকার্যলক্ষণাঃ।

অর্থপ্রকৃতয়ঃ পঞ্চ তা এতাঃ পরিকীর্তিতাঃ।।[২৮]

সাহিত্যদর্পণে বিশ্বনাথ কবিরাজ হুবহু *নাট্যশাস্ত্র*কেই উদ্ধৃত করে অর্থপ্রকৃতির পাঁচটি প্রকারভেদ নির্দেশ করেছেন[২৯]।

বীজের লক্ষণ করতে গিয়ে *নাট্যশাস্ত্রে* বলা হয়েছে–

অল্পমাত্রং সমুৎসৃষ্টং বহুধা যৎপ্রসর্পতি।

ফলাবসানং যচ্চৈব বীজং তদভিধিয়তে।।[৩০]

অর্থাৎ, যা অল্পমাত্র সমুৎসৃষ্ট হয়ে বহুপ্রকারে প্রসারিত হয় এবং ফললাভে পর্যবসিত হয়, তা বীজ নামে অভিহিত হয়। বিশ্বনাথ কবিরাজ বলেছেন–

স্বল্পমাত্রং সমুদ্দিষ্টং বহুধা যদ্বিসর্পতি

ফলস্য প্রথমো হেতুর্বীজং তদভিধীয়তে।।[৩১]

অর্থাৎ, কোন ঘটনা নাটকের প্রথমে স্বল্পভাবে প্রদর্শিত হয়ে পরে নানা প্রকার অপ্রধান ঘটনার প্রভাবে ক্রমশ বিস্তৃত হয়ে যখন নায়কের মুখ্য উদ্দেশ্যের প্রধান কারণ তখন নাটকীয় পরিভাষায় বলে বীজ। *দশরূপকার* ধনঞ্জয়ের মতে–“স্বল্পোদ্দিষ্টস্তু তদ্ধেতুর্বীজং বিস্তার্যনেকধা”[৩২]। ধনিক বৃত্তিতে বলেছেন–“স্তোকদ্দিষ্টস্তু কার্যসাধকঃ পুরস্তাদনেকপ্রকারং বিস্তারী হেতুবিশেষো বীজবদ্ বীজম্”[৩৩]। স্বল্পভাবে নির্দিষ্ট কার্যসাধক পরে বহুভাবে বিস্তৃত বীজের ন্যায় হেতুবিশেষকে বীজ বলা হয়।

জয়দ্রথবধ নাটকে প্রথমাঙ্কের দ্বিতীয়দৃশ্যে দেখা যায় পুত্র অভিমন্যুর প্রাণঘাতী জয়দ্রথের নিধনকে কেন্দ্র করে কৃষ্ণের সাথে অর্জুনের কথোপকথন। অর্জুন বলেন–

অদ্যৈব তাবদ্ বিনিপাতয়ামি

সূর্য্যাস্তযানস্য চ মধ্যতোহি

জয়দ্রথং দুষ্টকৃতিং বলেন

নোচেত্ স্বয়ং মৃত্যুমহং বৃণোমি।।[৩৪]

অর্থাৎ, আজ সূর্যাস্তের মধ্যে দুষ্টকর্মা জয়দ্রথকে বলের দ্বারা বিণিপাত করবে, না হলে নিজেই মৃত্যুকে বরণ করবে। নাটকে এই ঘটনা প্রথমে স্বল্পভাবে বীজ আকারে প্রকাশ হয়ে পরে নানা প্রকার ঘটনার মধ্য দিয়ে বিস্তৃত হয়ে অন্তিমে ফলপ্রাপ্তি ঘটেছে।

অবান্তর বীজের অপর নাম বিন্দু। নাটকের বিষয়বস্তু কোন কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে তাকে পুনরায় ফিরিয়ে এনে নাট্যবৃত্তকে অগ্রগতির দিকে যা নিয়ে যায়, তাকে বিন্দু বলা হয়। *নাট্যশাস্ত্রে* বলা হয়েছে–

প্রয়োজনানাং বিচ্ছেদে যদবিচ্ছেদকারণম্।

যাবৎসমাপ্তির্বন্ধস্য স বিন্দুরিতি সংজ্ঞিতঃ।।[৩৫]

অর্থাৎ, প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন হলে যা নাট্যের সমাপ্তি পর্যন্ত অবিচ্ছেদের কারণ হয়, তা বিন্দু নামে কথিত। ধনঞ্জয়ের মতে বিন্দু হল অবান্তর অর্থের বিচ্ছেদ ঘটার পর তাকে অবিচ্ছিন্ন রাখার যে কারণ–"অবান্তরার্থবিচ্ছেদে বিন্দুরচ্ছেদকারণম্"[৩৬]। *সাহিত্যদর্পণ*কার ধনঞ্জয়ের অনুরূপ লক্ষণ করেছেন[৩৭]।

জয়দ্রথবধ নাটকে প্রথমাঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করার পর অর্জুন পুত্রশোকে অত্যন্ত কাতর হয়ে পরে। অর্জুন বলেন অভিমন্যু নেই একথা মনে উদয় হলেই শোকের দ্বারা হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে[৩৮]। এই সময় কৃষ্ণের সাথে তার কথোপকথন অবান্তর বৃত্ত। কিছু পরে কৃষ্ণ বলেন ক্ষত্রিয় তুমি। ক্ষত্রিয়ের শোক প্রকাশ অশ্রু ব্যয়ের দ্বারা নয়, প্রতিশোধ গ্রহণের দ্বারাই হয়–"ক্ষত্রিয়ত্বম্। ক্ষত্রিয়স্য শোকপ্রকাশস্তু নাশ্রুবারিণা প্রতিশোধগ্রহণেনৈব।"[৩৯] কৃষ্ণের এই উক্তির দ্বারা নাট্যবৃত্তের ধারা রক্ষিত হয়। তাই এখানে বিন্দু বর্ণিত হয়েছে বলে মনে হয়।

পতাকার লক্ষণ করতে গিয়ে ভরতাচার্য বলেছেন–

যদ্বৃত্তং হি পরার্থং স্যাৎ প্রধানস্যোপকারকম্।

প্রধানবচ্চ কল্প্যতে সা পতাকেতি কীর্তিতা।।[৪০]

অর্থাৎ, যে বিষয় অপর বিষয়ের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত এবং প্রধান অর্থাৎ আধিকারিক ইতিবৃত্তের উপকারক ও প্রধান বিষয়ের ন্যায় পরিকল্পিত হয়, তা পতাকা নামে অভিহিত। *দশরূপকে* প্রাসঙ্গিক বৃত্তকে দুইভাগে ভাগ করা হয়–"প্রাসঙ্গিকমপি পতাকাপ্রকরীভেদাদ্ দ্বিবিধম্"[৪১]। অর্থাৎ, প্রাসঙ্গিক বৃত্তও পতাকা ও প্রকরীভেদে দুইপ্রকার। পতাকার লক্ষণ করতে গিয়ে ধনঞ্জয় বলেছেন – "সানুবন্ধং পতাকাখ্যং প্রকরী চ প্রদেশভাক্।"[৪২] যে বস্তু অনুবন্ধযুক্ত অর্থাৎ আধিকারিক বস্তুর সাথে বহুদূর বিস্তৃত তাকে পতাকা বলা হয়। *সাহিত্যদর্পণে* বিশ্বনাথ কবিরাজ পতাকার লক্ষণ করতে গিয়ে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বলেছেন–"ব্যাপি প্রাসঙ্গিকং বৃত্তং পতাকেত্যভিধীয়তে"[৪৩] অর্থাৎ, নাট্যের শেষ পর্যন্ত স্থায়ী যে প্রাসঙ্গিক চরিত্র বৃত্তান্ত থাকে তাকে পতাকা বলে। পতাকা নায়কের নিজস্ব কোন ভিন্ন ফল হয় না, প্রধান নায়কের ফল সিদ্ধির জন্যই তার প্রচেষ্টা।

জয়দ্রথবধ নাটকের শুরুতে অর্জুনের প্রতিজ্ঞা থেকে শুরু করে, অর্জুনের শোক দূর করে প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্য উৎসাহিত করা, যুদ্ধের জন্য পরিকল্পনা করা, অন্তিমে সুদর্শন চক্রের দ্বারা সূর্যাস্ত হবার ভ্রান্তি তৈরি করে অর্জুনের প্রতিশোধ গ্রহণে সহায়তা পর্যন্ত সঙ্গী ছিলেন কৃষ্ণ। তাই এই বৃত্তান্তকে পতাকা এবং কৃষ্ণকে পতাকা নায়ক বলা যায়।

কার্যের লক্ষণ প্রসঙ্গে ভরতাচার্য বলেছেন–

যদাধিকারিকং বস্তু সম্যক্ প্রাজ্ঞৈঃ প্রযুজ্যতে।

তদর্থো যঃ সমারম্ভস্তৎকার্যং সমুদাহৃতম্।।[৪৪]

অর্থাৎ, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ কর্তৃক যে আধিকারিক বস্তু যথাযথভাবে প্রযুক্ত হয় তার জন্য সমারম্ভকে কার্য বলা হয়। নাটকের ফলসিদ্ধির উপায়কে অর্থপ্রকৃতি বলা হলেও *সাহিত্যদর্পণে* কার্য ও ফল সমার্থক গণ্য করেই তার স্বরূপ নির্ণয় করা হয়েছে। বীজে যার সূত্রপাত কার্যে তার সমাপ্তি। *সাহিত্যদর্পণ*কার বলেছেন–

অপেক্ষিতন্তু যৎ সাধ্যমারাম্ভো যন্নিবন্ধনঃ।

সমাপনন্তু যৎসিদ্ধৌ তৎ কার্যমিতি সম্মতম্।।[৪৫]

অর্থাৎ, যে কার্য আকাঙ্ক্ষিত কিন্তু প্রাসঙ্গিক নয় যার উদ্দেশ্যে ব্যাপারগুলো প্রারব্ধ হয়ে থাকে এবং যার সিদ্ধির জন্য কার্যে সামগ্রী আয়োজিত হয় তাকে কার্য বলে। দশরূপকে ধর্ম, অর্থ ও কামকে ত্রিবর্গ ফল বলা হয়েছে– "কার্যং ত্রিবর্গস্তচ্ছুদ্ধমেকানেকানুবন্ধি চ।"[৪৬]

জয়দ্রথবধ নাটকে পুত্র অভিমন্যুর প্রাণঘাতী জয়দ্রথের নিধনকে কেন্দ্র করে কৃষ্ণের সাথে অর্জুনের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে নাটকের মুখ্যফল ফুটে উঠেছে। অভিমন্যুর মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণই নাটকের মুখ্য বা প্রধান ফল যা দ্বিতীয়াঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে অর্জুনের প্রতিজ্ঞার মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। অন্তিমে কৃষ্ণের সাহায্যে অর্জুনের দ্বারা জয়দ্রথের বধের মাধ্যমে মুখ্য ফললাভ ঘটে।

এই নাটকে প্রকরী লক্ষ্য করা যায় না।

❖ ৪.২.৫ পঞ্চাবস্থা

রূপকে নায়কাদিকে ফললাভের জন্য প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যেতে হয়। নায়কাদির এই সংগ্রামকে কার্যাবস্থা বলা হয়। এই কার্যাবস্থা নাটককে গতি এনে দেয়। আচার্য ভরত কার্যের পাঁচটি অবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন–

সংসাধ্যে ফলযোগে তু ব্যাপারঃ সাধকস্য যঃ।

তস্যানুপূর্বা বিজ্ঞেয়াঃ পঞ্চাবস্থাঃ প্রযোক্তৃভিঃ।।[৪৭]

অর্থাৎ, নাটকে ফললাভে উৎসাহী যে চেষ্টা তাকে প্রযোক্তৃগণ কর্তৃক ক্রমশ পাঁচটি অবস্থা যুক্ত করা উচিত। *সাহিত্যদর্পণে* বিশ্বনাথ-কবিরাজ পাঁচটি অবস্থার কথা বলেছেন–

অবস্থাঃ পঞ্চ কার্যস্য প্রারব্ধস্য ফলার্থিভিঃ।

আরম্ভযত্নপ্রাপ্ত্যাশানিয়তাপ্তিফলাগমাঃ।।[৪৮]

অর্থাৎ, ফলকামী ব্যক্তির আরব্ধ কার্যের পাঁচটি অবস্থা–আরম্ভ, যত্ন, প্রাপ্ত্যাশা, নিয়তাপ্তি ও ফলাগম। আরম্ভ হল নাটকীয় গতির প্রথম অবস্থা। ভরত আরম্ভের লক্ষণ করতে গিয়ে বলেছেন–

ঔৎসুক্যমাত্রবন্ধস্তু যদ্বীজস্য নিবধ্যতে।

মহতঃ ফলযোগস্য স ফলারম্ভ ইষ্যতে।।[৪৯]

অর্থাৎ, মহাফললাভের বীজ সম্বন্ধে শুধু ঔৎসুক্য যে জন্মায় তা আরম্ভ বলে কথিত। এই অবস্থায় নাটকীয় বীজ উপ্ত হয় এবং ফললাভের জন্য নায়কাদির সাধারণ ঔৎসুক্য বা অভিলাষ জন্মায়। *দশরূপকে* আরম্ভের লক্ষণে বলা হয়েছে–

"ঔৎসুক্যমাত্রমারম্ভঃ ফললাভায় ভুয়সে।"[৫০] আমি এরূপ কাজ সম্পাদন করব এই অধ্যবসায়কে আরম্ভ বলে। পরবর্তীকালে *সাহিত্যদর্পণে*ও অনুরূপ বলা হয়েছে–"ভবেদারম্ভ ঔৎসুক্য যন্মুখ্যফলসিদ্ধয়ে।"[৫১]

জয়দ্রথবধ নাটকে প্রথমাঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে অর্জুন ও কৃষ্ণের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে আরম্ভ নামক অবস্থা ফুটে উঠেছে। পুত্র অভিমন্যুর মৃত্যুতে অর্জুন অত্যন্ত ভেঙে পরেন। কৃষ্ণ তাকে বলেন–"ক্ষত্রিয়ত্বম্। ক্ষত্রিয়স্য শোকপ্রকাশস্তু নাশ্রুবারিণা প্রতিশোধগ্রহণেনৈব"[৫২] অর্থাৎ, ধনঞ্জয়! ক্ষত্রিয় তুমি, ক্ষত্রিয়ের শোক প্রকাশ অশ্রু ব্যয়ের দ্বারা নয় প্রতিশোধ গ্রহণের দ্বারাই। সুতরাং শোক দূর কর, প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্য উদ্যোগী হও। অর্জুন তখন বলেন–

জযদ্রথং মৃত্যুগৃহং প্রবেশ্য

সর্ব্বাংস শত্রুন্ সমরে নিপাত্য

অকৌরবং ভূমিতলং বিধায়

পুত্রস্য তৃপ্তিং ধরণৌ করোমি।।[৫৩]

অর্থাৎ, সমস্ত শত্রুকে পরাজিত করে যুদ্ধক্ষেত্রে জয়দ্রথকে মৃত্যুগৃহে প্রবেশ করিয়ে ভূমিতলকে কৌরবশূন্য করে পৃথিবীতে পুত্রের তৃপ্তি সাধন করবে। নাটকের প্রধান ফল পুত্রঘাতী জয়দ্রথের বধ, সেই ফললাভের জন্য এখানে ঔৎসুক্য বা অভিলাষ প্রকাশিত হয়েছে।

প্রযত্ন হল নাটকীয় গতির দ্বিতীয় অবস্থা। প্রযত্নের লক্ষণ করতে গিয়ে *নাট্যশাস্ত্রে* বলা হয়েছে–

অপশ্যতঃ ফলপ্রাপ্তিং ব্যাপারো যঃ ফলং প্রতি।

পদং চৌৎসুক্যগমনং স প্রযত্নঃ প্রকীর্তিতঃ।।[৫৪]

অর্থাৎ, ফললাভ না দেখে ফললাভের উদ্দেশ্যে যে চেষ্টা এবং ঔৎসুক্যজনক কাজ, তা প্রযত্ন নামে অভিহিত। *দশরূপকে* বলা হয়েছে – “প্রযত্নস্তু তদপ্রাপ্তৌ ব্যাপারোঽতিত্বরান্বিতঃ”[৫৫] অর্থাৎ, ফলের অপ্রাপ্তিতে ফললাভের জন্য ত্বরান্বিত ব্যাপার প্রযত্ন। ধনিক ফলপ্রাপ্তির জন্য উপায় যোজনাকে প্রযত্ন বলেছেন – “তস্য ফলস্যাপ্রাপ্তাবুপায়যোজনাদিরূপশ্চেষ্টাবিশেষঃ প্রযত্নঃ।”[৫৬] *সাহিত্যদর্পণ*কারের মতে – “প্রযত্নস্তু ফলাবাপ্তৌ ব্যাপারোঽতিত্বরান্বিত”[৫৭] অর্থাৎ লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য ঔৎসুক্যপ্রণোদিত চেষ্টা।

জয়দ্রথবধ নাটকের দ্বিতীয়াঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের কথোপকথন দেখা যায়। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে অর্জুনের প্রতিজ্ঞার কথা জানায়। যুধিষ্ঠিরকে শোকাহত দেখে কৃষ্ণ বলেন–

> ক্লৈব্যং শোকং পরিত্যজ্য চোত্থায় বলদর্পিতৈঃ
> যোদ্ধব্যং সঙ্ঘবদ্ধৈশ্চ সর্ব্বৈরেক প্রযত্নতঃ।।[৫৮]

শোক পরিত্যাগ করে বলের দ্বারা উঠে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে সবাইকে যুদ্ধের জন্য যত্নের দ্বারা প্রস্তুত হতে হবে। আরও বলেন–

> আচার্য্যস্যচ্ছলং সর্ব্বং বিনাশ্য বুদ্ধিপূর্ব্বকং।
> জযদ্রথবিনাশায় চেষ্টিতব্যং প্রযত্নতঃ।।[৫৯]

আচার্যের সমস্ত ছলকে বুদ্ধির দ্বারা বিনাশ করে জয়দ্রথের বিনাশের জন্য সবাইকে প্রস্তুত হতে হবে। ভীমাদি সবাইকে ডেকে পরামর্শ করে যুদ্ধনীতি স্থির করতে হবে। এখানে ফললাভের উদ্দেশ্যে চেষ্টা প্রকাশিত হয়েছে।

প্রাপ্ত্যাশা হল নাটকীয় গতির তৃতীয় অবস্থা। *নাট্যশাস্ত্রে* প্রাপ্ত্যাশাকে প্রাপ্তিসম্ভব বলেছেন। লক্ষণ করতে গিয়ে ভরতাচার্য বলেছেন–

> ঈষৎপ্রাপ্তিশ্চ যা কাচিদ্ অর্থস্য পরিকল্পতে।
> ভাবমাত্রেণ স জ্ঞেয়ো বিধিজ্ঞৈঃ প্রাপ্তিসম্ভবঃ।।[৬০]

অর্থাৎ, শুধু ভাবের দ্বারা উদিষ্ট বিষয়ের যে কিঞ্চিৎ প্রাপ্তি পরিকল্পিত হয়, তা বিধিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রপ্তিসম্ভব নামে জানে। *দশরূপকে* বলা হয়েছে – “উপায়াপায়শঙ্কাভ্যাং প্রাপ্ত্যাশা প্রাপ্তিসম্ভবঃ”[৬১]। অর্থাৎ, উপায় এবং অপায়ের (বাধার) শঙ্কার দ্বারা ফলপ্রাপ্তির সম্ভবনাকে প্রাপ্ত্যাশা বলে। ধনিক বৃত্তিতে একই কথা পরিস্ফুট হয়েছে – “উপায়স্যাপায়শঙ্কায়াশ্চ ভাবাদনির্ধারিতৈকান্তা ফলপ্রাপ্তিঃ প্রাপ্ত্যাশা।”[৬২] *সাহিত্যদর্পণে*ও অনুরূপ বলা হয়েছে[৬৩]। আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে জর্জরিত এই অবস্থার নাম প্রাপ্ত্যাশা।

জয়দ্রথবধ নাটকে পঞ্চমাঙ্কের প্রথম দৃশ্যের শুরুতেই দেখা যায় মধাহ্ন কাল প্রায় আগত জয়দ্রথের সংবাদ এখন পাওয়া যায় নি। জয়দ্রথকে ব্যূহমধ্যে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। ভীম জানায় ব্যূহাগ্রের সামনে যেতেই অসমর্থ তারা ভেদ করা তো দূরের কথা। অর্জুন ছাড়া পাণ্ডবদের মধ্যে কেউই ব্যূহভেদ করতে জানে না তা পূর্বেই

প্রমানিত[৬৪]। কিন্তু জানা যায় অর্জুনকে যুদ্ধের ছলনায় সংশপ্তকরা দূরে নিয়ে গেছেন – "যুদ্ধচ্ছলেন সংশপ্তকৈর্ধনঞ্জয়ো দুরং নীতঃ।"[৬৫] ফলে নাটকের ফললাভে এখানে বিঘ্নের আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে যা প্রাপ্ত্যাশা নামক অবস্থার উদাহরণ।

নিয়তাপ্তি হল নাটকীয় গতির চতুর্থ অবস্থা। *নাট্যশাস্ত্রে* নিয়তাপ্তির লক্ষণে বলা হয়েছে–

নিয়তাং চ ফলপ্রাপ্তিং যত্র ভাবেন পশ্যতি।

নিয়তাং তাং ফলপ্রাপ্তিং সগুণাং পরিচক্ষতে।।[৬৬]

যেখানে ভাবের দ্বারা নিশ্চিত ফলপ্রাপ্তি দেখা যায়, গুণযুক্ত সেই প্রাপ্তিকে নিয়তা ফলপ্রাপ্তি বলে। ধনঞ্জয়ের *দশরূপকে* বলা হয়েছে–"অপায়াভাবতঃ প্রাপ্তির্নিয়তাপ্তিঃ সুনিশ্চিতা।"[৬৭] *সাহিত্যদর্পণে* অনুরূপ ভাবে বলা হয়েছে –"অপায়াভাবতঃ প্রাপ্তির্নিয়তাপ্তিস্তু নিশ্চিতা।"[৬৮] অপায় অর্থাৎ প্রতিবন্ধকের যথোচিত প্রতীকারের দ্বারা ফলসিদ্ধির নিশ্চয়াবস্থার নাম নিয়তাপ্তি।

জয়দ্রথবধ নাটকের পঞ্চমাঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা যায় কাল প্রায় শেষ হতে চলেছে কিন্তু জয়দ্রথের সন্ধান তখনও পাওয়া যায় নি। সেই জন্য কৃষ্ণ মনে মনে বলেন– "কালোঽতিক্রামতি এব। জযদ্রথস্য সন্ধানং কথমপি নোপলভ্যতে। অতএব অধুনাচ্ছাদ সুদর্শনেন সূর্য্যামাচ্ছয়ামি। যেন সূর্য্যোঽস্তং গত ইতি মন্যমানাঃ জযদ্রথরক্ষণে উদাসীনা ভবেয়ুঃ কৌরবাঃ"[৬৯] একথা ভেবে সুদর্শন চক্রের দ্বারা সূর্য্যকে আচ্ছাদন করতেই নেপথ্য থেকে উল্লাস ভেসে আসে। কৌরবদের মনে হয় সূর্যাস্ত হয়েছে প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হল না তাই জয়দ্রথকে ব্যূহ থেকে বেড়িয়ে আসার আহ্বান জানায়। কৃষ্ণ তখনই সুদর্শন চক্র অপসারিত করে নেয়। বিঘ্ন দূর হয় এবং নিশ্চিত ফলপ্রাপ্তি সূচিত হয়। এটাই চতুর্থ অবস্থা নিয়তাপ্তির উদাহরণ।

নাটকীয় ক্রিয়ার পঞ্চম এবং অন্তিম অবস্থার নাম ফলাগম বা ফলপ্রাপ্তি বা ফলযোগ। *নাট্যশাস্ত্রে* এর লক্ষণ করতে গিয়ে বলেছেন–

অভিপ্রেতং সমগ্রং চ প্রতিরূপং ক্রিয়াফলম্।

যদ্ দৃশ্যতে নিবৃত্তে তু ফলযোগঃ স উচ্যতে।।[৭০]

অর্থাৎ, নাট্যগ্রন্থের নিবৃত্ত হলে ক্রিয়ার সমস্ত অভিপ্রেত ও উপযুক্ত ফললাভ হয়, তাকে ফলযোগ বলে। *দশরূপকে* বলা হয়েছে সমগ্র ফলসম্পত্তি লাভকে বলা হয় ফলযোগ বা ফলাগম–"সমগ্রফলসম্পত্তিঃ ফলযোগা যথোদিতঃ"[৭১]। বিশ্বনাথ-কবিরাজের মতে সামগ্রিক ফললাভ অর্থাৎ মূল লক্ষ্য সিদ্ধি এখানে সম্পূর্ণ হয়–"সাবস্থা ফলযোগঃ স্যাদ্যঃ সমগ্রফলোদয়ঃ।"[৭২]

জয়দ্রথবধ নাটকের পঞ্চমাঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে কৃষ্ণ সুদর্শন চক্র অপসারিত করলে সকলে বুঝতে পারেন সূর্যাস্ত এখানো হয়নি। কৌরবরা সকলে মিলে জয়দ্রথকে রক্ষা করার চেষ্টা করলেও অর্জুনের শরে বিদ্ধ হয়ে জয়দ্রথের মৃত্যু ঘটে। অর্থাৎ নাটকের প্রধান যে ফল তা প্রাপ্তি হয় যা পঞ্চম অবস্থা।

❖ ৪.২.৬ নাট্যবৈশিষ্ট্য:

বিশ্বনাথ-কবিরাজ বিরচিত *সাহিত্যদর্পণ* গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে দৃশ্য ও শ্রব্য ভেদে কাব্যকে দুইভাগে বিভক্ত করেছেন[৭৩]। দৃশ্যকাব্য রূপক উপরূপক ভেদে দ্বিবিধ। রূপক শ্রেণীর দৃশ্যকাব্যগুলিকে আবার দশভাগে ভাগ করা হয়[৭৪], তারমধ্যে অন্যতম হল নাটক। *বৈয়াসিক-মহাভারত* অবলম্বনে বিরচিত নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়ের নাটকগুলির মধ্যে অন্যতম নাটক হল *জয়দ্রথবধ*। *জয়দ্রথবধ* নাটকের প্রারম্ভেই সূত্রধার ও পারিপার্শ্বিকের কথোপকথনে দেখা যায়–

রামগোপালপুত্রেণ নিত্যানন্দেন শর্ম্মনা

নাটকং রচিতং যত্নাদ্ জযদ্রথবধং নবম্।[৭৫]

'নাটকম্' শব্দটির ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তিনি বুঝিয়েছেন *জয়দ্রথবধ* একটি নাটক, কিন্তু নাট্যতত্ত্ব অনুসারে *জয়দ্রথবধ* কতটা সার্থক তা বিচার্য বিষয়।

বিশ্বনাথ-কবিরাজ নাটকের লক্ষণ করতে গিয়ে শুরুতেই বলেছেন–"নাটকং খ্যাতবৃত্তং স্যাত্।[৭৬]" বৃত্তিতে বলেছেন – "খ্যাতং রামায়ণাদিপ্রসিদ্ধ বৃত্তম্।"[৭৭] কুসুমপ্রতিমা টীকায় মহামহোপাধ্যায় হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ 'খ্যাতবৃত্ত' সম্পর্কে বলেছেন–"খ্যাতবৃত্তং লোকেষু বিখ্যাতবৃত্তান্তম্"[৭৮] অর্থাৎ নাটক হবে খ্যাতবৃত্ত। বৃত্ত শব্দের অর্থ বৃত্তান্ত বা ঘটনা। নাটকের বিষয়বস্তু বা ঘটনা রামায়ণ, মহাভারত বা পুরাণ অবলম্বনে হবে। এক কথায় নাটকের বিষয়বস্তু বিখ্যাত ঘটনা অবলম্বনে হবে। নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় বিরচিত *জয়দ্রথবধ* নাটকটি *বৈয়াসিক-মহাভারত* অবলম্বনে রচিত। *বৈয়াসিক-মহাভারতের* দ্রোণপর্বের ৭৪তম অধ্যায় থেকে শুরু করে ১৩৪তম অধ্যায় পর্যন্ত বর্ণিত বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে নাটকটি। সুতরাং নাটকটি 'খ্যাতবৃত্ত'ই বলে মনে হয়।

বিশ্বনাথ-কবিরাজ নাটকের লক্ষণ করতে গিয়ে বলেছেন- "পঞ্চসন্ধি সমন্বিতম্"[৭৯] অর্থাত্ নাটকের বিষয়বস্তু পাঁচটি পর্বে বিভক্ত, যথাক্রমে–মুখসন্ধি, প্রতিমুখসন্ধি, গর্ভসন্ধি, বিমর্ষসন্ধি ও নির্বহন সন্ধি। *নাট্যশাস্ত্রে* সন্ধির লক্ষণ করতে গিয়ে বলেছেন–

ইতিবৃত্তং তু কাব্যস্য শরীরং পরিকীর্তিতম্।

পঞ্চভিঃ সন্ধিভিস্তস্য বিভাগাঃ সংপ্রকল্পিতঃ।।[৮০]

অর্থাৎ, দৃশ্যকাব্যের ইতিবৃত্ত তার শরীর বলে কথিত হয়। পাঁচটি সন্ধি দ্বারা তার বিভাগ করা হয়। *সাহিত্যদর্পণ*কার সন্ধির লক্ষণ করতে গিয়ে বলেছেন–"অন্তরৈকার্থসম্বন্ধঃ সন্ধিরেকান্বয়ে সতি"[৮১] অর্থাৎ, মুখ্য

প্রয়োজনের সাথে সম্বন্ধযুক্ত নাটকীয় কথাবস্তুর অবান্তর বা গৌণ এক একটি প্রয়োজনের সম্বন্ধকে সন্ধি বলে। বৃত্তিতে বলা হয়েছে – "একেন প্রয়োজনেনিন্বিতানাং কথাংশানামবান্তরৈকপ্রয়োজনসম্বন্ধঃ সন্ধিঃ।"[৮২] অর্থাৎ, নাটকের চরম যে ফল তাকে মুখ্য বা প্রধান ফল বলে। এই মুখ্য ফল সাধন করাই হল নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য। এই মুখ্য ফলের সাথে বিভিন্ন অঙ্গীভূত কথাবস্তু অন্বিত থাকে। ঐ অঙ্গীভূত কথাবস্তুর সঙ্গে নাটকের অঙ্গীভূত গৌণ প্রয়োজন সাধক একটি অংশের সম্বন্ধকে সন্ধি বলা হয়। মুখসন্ধির লক্ষণ করতে গিয়ে *নাট্যশাস্ত্র*কার বলেছেন–

যত্র বীজসমুৎপত্তির্নানার্থরসসম্ভবা।

কাব্যে শরীরানুগতং তন্মুখং পরিকীর্তিতম্।।[৮৩]

অর্থাৎ, দৃশ্যকাব্যে যেখানে বিবিধ বিষয় ও রস থেকে উদ্ভূত বীজোৎপত্তি হয়, তা শরীরআনুগামী মুখ নামে কথিত। ধনঞ্জয় *দশরূপ*কে মুখসন্ধির লক্ষণ করে বলেছেন – "মুখং বীজসমুৎপত্তির্নানার্থরসসম্ভ বা।"[৮৪] অর্থাৎ যেখানে অনেক অর্থ ও রসসমন্বিত বীজের উৎপত্তি হয় তাকে মুখসন্ধি বলে। বিশ্বনাথ-কবিরাজ বলেছেন–

যত্র বীজসমুৎপত্তির্নানার্থরসসম্ভবা

প্রারম্ভেন সমাযুক্তা তন্মুখং পরিকীর্ত্তিতম্।।[৮৫]

টীকায় বলা হয়েছে–"যত্র সন্ধৌ, নানা অনেকৈঃ অর্থৈঃ বৃত্তান্তৈঃ রসৈঃ শৃঙ্গারাদিভিশ্চ সম্ভবো ব্যঞ্জনং যস্যাঃ সা তথোক্তা, তথা প্রারম্ভেন সমাযুক্তা উৎসাহরূপপ্রারম্ভাবস্থা যুক্তা ইত্যর্থঃ, বীজস্য প্রাগুক্তলক্ষণস্য সমুৎপত্তির্ভবতি তৎ মুখমিব মুখং মুখসন্ধিঃ পরিকীর্ত্তিতং কথিতম্।"[৮৬] মুখসন্ধির শুরুতেই বলা হয়েছে–'যত্র বীজসমুৎপত্তি......' বীজের লক্ষণ করতে গিয়ে বিশ্বনাথ-কবিরাজ বলেছেন–

স্বল্পমাত্রং সমুদ্দিষ্টং বহুধা যদ্বিসর্পতি

ফলস্য প্রথমো হেতুর্বীজং তদভিধীয়তে।।[৮৭]

অর্থাৎ, কোন ঘটনা নাটকের প্রথমে স্বল্পভাবে প্রদর্শিত হয়ে পরে নানা প্রকার অপ্রধান ঘটনার প্রভাবে ক্রমশ বিস্তৃত হয়ে যখন নায়কের মুখ্য উদ্দেশ্যের প্রধান কারণ তখন নাটকীয় পরিভাষায় বলে বীজ। *দশরূপকার* ধনঞ্জয়ের মতে–"বীজবত্ বীজম্।"[৮৮] *নাট্যশাস্ত্রে* বলা হয়েছে–

অল্পমাত্রং সমুৎসৃষ্টং বহুধা যৎপ্রসর্পতি।

ফলাবসানং যচ্চৈব বীজং তদভিধিয়তে।।[৮৯]

অর্থাৎ, যা অল্পমাত্র সমুৎসৃষ্ট হয়ে বহুপ্রকারে প্রসারিত হয় এবং ফললাভে পর্যবসিত হয়, তা বীজ নামে অভিহিত হয়। মুখসন্ধির লক্ষণে 'প্রারম্ভেন সমাযুক্তা' বলা হয়েছে, আরম্ভের লক্ষণ করতে গিয়ে বিশ্বনাথ-কবিরাজ বলেছেন – "ভবেদারম্ভ উৎসুক্যং যন্মুখ্যফলসিদ্ধয়ে"[৯০] অর্থাৎ, প্রধান ফলসিদ্ধির জন্য যে উতসুক্য তাকেই বলা হয়েছে আরম্ভ। আরম্ভের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ধনঞ্জয় বলেছেন – "ঔৎসুক্যমাত্রমারম্ভঃ ফললাভায় ভুয়সে।"[৯১] অর্থাৎ, প্রভূত ফললাভের জন্য কেবল ঔৎসুক্যকে আরম্ভ বলে। *নাট্যশাস্ত্রে* আরম্ভের লক্ষণে বলা হয়েছে–

ঔৎসুক্যমাত্রবন্ধস্তু যদ্বীজস্য নিবধ্যতে।

মহতঃ ফলযোগস্য স খল্বারম্ভ ইষ্যতে।।[৯২]

অর্থাৎ, মহাফললাভের বীজ সম্বন্ধে শুধু ঔৎসুক্য যে জন্মায় তা আরম্ভ বলে কথিত। যে সন্ধিতে বহুপ্রকার বৃত্তান্ত ও রসযুক্ত ভাবে আরম্ভ নামক অবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে বীজের উৎপত্তি হয়, তাকেই মুখসন্ধি বলে।

জয়দ্রথবধ নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে জয়দ্রথস্য বধম্ অর্থাৎ জয়দ্রথের নিধন এই নাটকের মূল বিষয়বস্তু। নাটকের প্রথমাঙ্কের দ্বিতীয়দৃশ্যে দেখা যায়–

অদ্যৈব তাবদ্ বিনিপাতয়ামি

সূর্য্যাস্তযানস্য চ মধ্যতোহি

জযদ্রথং দুষ্টকৃতিং বলেন

নোচেত্ স্বয়ং মৃত্যুমহং বৃণোমি।।[৯৩]

আবার, কিছু পরে–

জযদ্রথং মৃত্যুগৃহং প্রবেশ্য

সর্ব্বাংস শত্রুন্ সমরে নিপাত্য

অকৌরবং ভূমিতলং বিধায়

পুত্রস্য তৃপ্তিং ধরণৌ করোমি।।[৯৪]

পুত্র অভিমন্যুর প্রাণঘাতী জয়দ্রথের নিধনকে কেন্দ্র করে কৃষ্ণের সাথে অর্জুনের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে নাটকের মুখ্যফল ফুটে উঠেছে। অভিমন্যুর মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণই নাটকের মুখ্য বা প্রধান ফল যা দ্বিতীয়াঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে ফুটে উঠেছে। অর্জুনের প্রতিজ্ঞার মধ্য দিয়ে নানা অর্থও ফুটে উঠেছে–সূর্য্যাস্তের মধ্যে হয় জয়দ্রথ নিধন হবে না হয় অর্জুন নিজেই আত্মঘাতী হবে। নানারসও দেখা গিয়েছে, নাটকের শুরুতেই অর্জুনের প্রতিজ্ঞার মধ্য দিয়ে বীর রস, অভিমন্যুর মৃত্যুতে অর্জুনের সাথে কৃষ্ণের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে করুণ রস ফুটে উঠেছে।

প্রতিমুখসন্ধির লক্ষণ করতে গিয়ে *নাট্যশাস্ত্রে* দেখা যায়–

বীজস্যোদ্ঘাটনং যত্তু দৃষ্টনষ্টমিব ক্বচিত্।

মুখে ন্যস্তস্য সর্বত্র তদ্বৈ প্রতিমুখং ভবেত্।।[৯৫]

অর্থাৎ, মুখে স্থাপিত বীজ কখন দৃষ্ট কখন অদৃষ্ট হলে তার উদ্ঘাটন প্রতিমুখ নামক সন্ধিতে হয়। *দশরূপকে* বলা হয়েছে–“লক্ষ্যালক্ষ্যতয়োদ্ভেদস্তস্য প্রতিমুখং ভবেত্।”[৯৬] বিশ্বনাথ-কবিরাজ *সাহিত্যদর্পণে* বলেছেন–

ফলপ্রধানোপায়স্য মুখসন্ধিনিবেশিনঃ

লক্ষ্যালক্ষ্য ইবোদ্ভেদো যত্র প্রতিমুখঞ্চ তত্।।[৯৭]

অর্থাৎ, মুখসন্ধিতে মুখ্যফলসিদ্ধির যে উপায় অর্থাৎ বীজ সন্নিবিষ্ট থাকে, লক্ষিত বা অলক্ষিতভাবে তার প্রথম প্রকাশ বা অঙ্কুরোদ্গম যেখানে ঘটে তাকে প্রতিমুখসন্ধি বলে। মুখসন্ধিতে আবির্ভূত নাটকের প্রধান ফল কিছুটা প্রকাশিত আবার কিছুটা অনুমান প্রভৃতির দ্বারা বুঝে নিতে হয় তাকে প্রতিমুখসন্ধি বলে। ধনঞ্জয়ও প্রতিমুখসন্ধিতে নাটকীয় প্রধান ফলের স্পষ্ট ও অস্পষ্ট এই মিশ্র ভাবের উপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন– "তস্য বীজস্য কিঞ্চিল্লক্ষ্যঃ কিঞ্চিদলক্ষ্য ইবোদ্ভেদঃ প্রকাশনং তত্ প্রতিমুখম্।"[৯৮]

জয়দ্রথবধ নাটকের দ্বিতীয়াঙ্কে প্রথমদৃশ্যে ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে দুর্যোধনের কথোপকথন লক্ষ্য করা যায়। দুর্যোধন অভিমন্যুর মৃত্যু সংবাদের কথা জানিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করে এবং তাদের কথোপকথনের মধ্যেই প্রতিমুখসন্ধি ফুটে উঠেছে। ধৃতরাষ্ট্র বলেছেন–

দুঃশলা নাম যা কন্যা মম প্রাণাধিক প্রিয়া
সা বৈধব্যং গতাদ্যৈব ভাতৃণাং বঃ প্রসাদতঃ।।[৯৯]

নাটকের প্রধান যে ফল জয়দ্রথের বধ তা এখানে প্রকাশ পেয়েছে এবং দুঃশলা বিধবা হবে ইত্যাদি বিভিন্ন কথোপকথনের মধ্য দিয়েও অনুমানের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে নাটকের মুখ্যফল।

গর্ভসন্ধির লক্ষণ করতে গিয়ে *নাট্যশাস্ত্রে* বলেছেন–

উদ্ভেদস্তস্য বীজস্য প্রাপ্তিরপ্রাপ্তিরেব বা।
পুনশ্চান্বেষণং যত্র স গর্ভ ইতি সংজ্ঞিতঃ।।[১০০]

অর্থাৎ, যাতে ঐ বীজের উন্মেষ, প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তি ঘটে এবং পুনরায় অন্বেষণ হয় তা গর্ভ নামে কথিত হয়। বিশ্বনাথ-কবিরাজ বলেছেন–

ফলপ্রধানোপায়স্য প্রাগুদ্ভিন্নস্য কিঞ্চন
গর্ভো যত্র সমুদ্ভেদো হ্রাসান্বেষণবান্ মুহুঃ।।[১০১]

প্রাক অর্থাৎ গর্ভসন্ধির পূর্বসন্ধিতে বা প্রতিমুখ নামক দ্বিতীয় সন্ধিতে কিঞ্চন অর্থাৎ কিঞ্চিৎ ভাবে বা আংশিক ভাবে উদ্ভিন্নস্য অর্থাৎ প্রকাশিত। প্রতিমুখসন্ধিতে নাটকের মুখ্য ফল কিছুটা ব্যক্ত হয় আবার কিছুটা অনুমান করে নিতে হয় কিন্তু গর্ভসন্ধিতে নাটকের মুখ্যফল সম্যক ভাবে প্রকাশিত হয়। এই উদ্ভেদ প্রক্রিয়া হবে 'হ্রাসান্বেষণবান্ মুহুঃ।' হ্রাস অর্থাৎ বিভিন্ন বিঘ্ন থাকার জন্য মুখ্য প্রয়োজন অন্তর্হিত হয়, সেই ফলকে অন্বেষণ করে খুঁজে বার করা হয় আবার অন্তর্হিত হয়। এইভাবে গর্ভসন্ধিতে বারে বারে বিঘ্নের আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটতে থাকে। *দশরূপকে* দৃষ্টনষ্ট বীজের পৌনঃপুনিক অন্বেষণকে গর্ভসন্ধি বলে – "গর্ভস্তু দৃষ্টনষ্টস্য বীজস্যান্বেষণং মুহুঃ।"[১০২] ধনিকের অবলোক টীকায় বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়েছে – "প্রতিমুখসন্ধৌ লক্ষ্যালক্ষ্যরূপতয়া স্তোকভিন্নস্য বীজস্য সবিশেষোদ্ভদপূর্বকঃ সান্তরায়ো লাভঃ, পুনর্বিচ্ছেদঃ, পুনঃ প্রাপ্তিঃ, পুনশ্চ তস্যৈবান্বেষণং বারংবারং সোঽনির্ধারিতৈকান্তফলপ্রাপ্ত্যাশাত্মকো গর্ভসন্ধিরিতি।"[১০৩] রূপগোস্বামী গর্ভসন্ধির সম্বন্ধে বলেছেন– "দৃষ্টাদৃষ্টস্য বীজস্য গর্ভো হ্রাসগবেষণাত্।"[১০৪]

জয়দ্রথবধ নাটকের তৃতীয়াঙ্কের প্রথম দৃশ্যতে দুর্যোধন ও শকুনির কথোপকথনে দেখা যায়–

অভুমন্যুর্থথাবদ্ধো ব্যূহমধ্যে নিপাতিতঃ।

অর্জ্জুনোঽপি তথাদ্যৈব ভবিষ্যতি নিপাতিতঃ।।[১০৫]

শকুনি এই উক্তিটি থেকে নাটকের মুখ্য বা প্রধান যে ফল তা সংশয় প্রাপ্ত হয়ে কিছুটা বিঘ্নের আবির্ভাব হয়। কারণ পূর্বেই অভিমন্যুবধ ক্ষেত্রে ব্যূহমধ্যে প্রবেশ পাণ্ডবদের পরাজয়ের কথা জানা যায়।

আবার, চতুর্থাঙ্কের প্রথম দৃশ্যতে কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের কথোপকথনে দেখা যায়–

কর্ণস্য পরমং চাস্ত্রমেক পুরুষনাশকম্।

পুরন্দর প্রদত্তন্তু চাসীদ্ ভীতিকরং যুধি।।

অস্মিন্ স্থিতেরণে চাস্মিন্ মৃত্যু পার্থস্য নিশ্চিতঃ।

বারণে ন হি সামর্থং লেশতোঽপি চ বিদ্যতে।।[১০৬]

ইন্দ্রের কাছ থেকে কর্ণ একপুরুষ হত্যা করার অমোঘ অস্ত্র লাভ করেন। সেই অস্ত্র থাকলে অর্জুনের পরাজয় কেউই রক্ষা করতে পারত না কিন্তু যুদ্ধকালে সেই অস্ত্রের দ্বারা ঘটোত্কচকে বধ করা হয়েছে, কৃষ্ণের এই উক্তি থেকে নাটকের মুখ্য যে ফল তা সম্যক রূপে প্রকাশিত হয়।

আবার, চতুর্থাঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে দ্রোণাচার্য্য, শকুনি ও দুর্যোধনের কথোপকথনে লক্ষ্য করা যায়–

"ব্যূহমধ্যে অতীব গুপ্তস্থানে মহাবীরৈর্বেষ্টয়িত্বা জযদ্রথো রক্ষিতঃ। দ্বারেষ্বপি মহন্তো বীরা নিয়োজিতাঃ। যথা কোঽপি দ্বারামতিক্রমিতুং নৈব সমর্থো ভবেত্।"[১০৭]

দ্রোণাচার্যের উক্তি–"অভিমন্যুবধদিনে যথা তৈরর্জ্জুনো দুরং নীতঃ অদ্যাপি তথৈব ক্রিয়তে..............।"[১০৮]

দ্রোণাচার্যের এই উক্তিতে শকুনি বলেন–

অর্জ্জুনেন বিনা তত্র পাণ্ডবেষু চ কশ্চন।

ব্যূহভেদং ন জানানি প্রমাণিতং তু পূর্ব্বতঃ।।[১০৯]

ইত্যাদি উক্তির দ্বারা নাটকের মূল বা প্রধান লক্ষ্য বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে এবং দর্শকের মনে সংশয় উঠেছে জয়দ্রথের বধ কি সম্ভব হবে, কারণ ব্যূহভেদ করতে পূর্বেই অসমর্থ হয়েছে পাণ্ডবরা। এইভাবেই বারবার বিঘ্নের আবির্ভাব ও তিরোভাবের দ্বারা গর্ভসন্ধি লক্ষ্য করা গিয়েছে।

বিমর্শ সন্ধির লক্ষণ করতে গিয়ে *নাট্যশাস্ত্রে* বলা হয়েছে–

গর্ভনির্ভিন্নবীজার্থ বিলোভনকৃতোঽপি বা।

ক্রোধব্যসনজো বাপি বিমর্শঃ স ইতি স্মৃতঃ।।[১১০]

অর্থাৎ, গর্ভে প্রকাশিত বীজার্থ প্রলোভন বা ক্রোধ হেতু চিন্তা বা অনুধাবন বিমর্শ নামে কথিত। ধনঞ্জয়ের মতে গর্ভসন্ধি হল–

ক্রোধেনাবমৃশেদ্যত্র ব্যসনাদ্বা বিলোভনাত্।

গর্ভনির্ভিন্নবীজার্থঃ সোঽবমর্শ ইতি স্মৃতঃ।।[১১১]

অর্থাৎ, ক্রোধ, ব্যসন বা বিলোভনের দ্বারা যেখানে ফলপ্রাপ্তি বিষয়ে পর্যালোচনা দেখা যায় এবং যেখানে গর্ভসন্ধির সঙ্গে সম্পৃক্ত বীজার্থ পরিস্ফুট হয়, সেখানে অবমর্শ সন্ধি হয়। অবমর্শন হল পর্যালোচনা। তা ক্রোধ, ব্যসন বা বিলোভনের দ্বারা অবধারিত ঐকান্তিক ফলপ্রাপ্তি বিষয়ক গর্ভসন্ধিতে উদ্ভিন্ন বীজার্থের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হলে বিমর্শ বা অবমর্শ সন্ধি হয়। *সাহিত্যদর্পণ*কার একইভাবে বলেছেন–

যত্র মুখ্যফলোপায় উদ্ভিন্নো গর্ভতোঽধিকঃ।

শাপাদ্যৈঃ সান্তরায়শ্চ স বিমর্ষ ইতি স্মৃতঃ।।[১১২]

গর্ভসন্ধির চেয়েও বেশী প্রকাশিত অবস্থায় মুখ্য ফলসিদ্ধির উপায়ভূত বীজ যখন অভিশাপ প্রভৃতি দ্বারা অন্তরায়গ্রস্ত হয় তখন তাকে বিমর্শসন্ধি বলে। মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ তাঁর টীকায় বলেছেন নাটকের প্রধান ফলের যে কোন প্রকার বাধা অর্থেই আদি শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে – "আদ্যশব্দাদ্বিপক্ষকৃতবাধাদিভিশ্চ সান্তরায়ো।"[১১৩] রূপ-গোস্বামী বিমর্শসন্ধির লক্ষণ করতে গিয়ে স্পষ্টভাবে বলেছেন–

যত্র প্রলোভনক্রোধব্যসনাদ্যৈর্বিমৃশ্যতে।

বীজবান্ গর্ভনির্ভিন্নঃ স বিমর্ষ ইতীর্য্যতে।।[১১৪]

অর্থাৎ, গর্ভসন্ধিতে বিকশিত বীজ যখন প্রলোভন, ক্রোধ, দুঃখ প্রভৃতির মাধ্যমে বিকশিত হয় তাকে বিমর্শ সন্ধি বলে। বিমর্শ কথাটির অর্থ চিন্তা। সাগরনন্দীর মতে বীজার্থের বিমর্শ ত্রিবিধ উপায়ে ঘটতে পারে প্রলোভন থেকে উদ্ভূত, ক্রোধ থেকে জাত এবং বিপদ থেকে উৎপন্ন – "অস্য বিমর্শস্ত্রিধা ভবতি – বিলোভনসমুদ্ভবঃ, ক্রোধজঃ ব্যসনজশ্চ।"[১১৫]

পঞ্চমাঙ্কের প্রথম দৃশ্যতে ভীম ও যুধিষ্ঠিরের কথোপকথনে দেখা গিয়েছে–"মধ্যাহ্ন কাল আগত প্রায়ঃ। কিং ভবিষ্যতি? জয়দ্রথস্যাপি সংবাদং ন প্রাপ্নোতি..........."[১১৬] ইত্যাদি উক্তির দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে চিন্তিত হতে দেখা যায়। ভীমসেনকে অর্জুনের সংবাদ জানার জন্য নির্দেশ দেন–"শীঘ্রং অর্জ্জুনস্য সংবাদো জ্ঞায়তাম্।"[১১৭] কিছুক্ষণ পর ভীমসেন প্রবেশ করে বলেন–"ধনঞ্জয়স্য সংবাদ পরিজ্ঞাতঃ। যুদ্ধছলেন সংশপ্তকৈর্ধনঞ্জয়ো দুরং নীতঃ...........। সংসশপ্তকান্ বিনাশ্য অধুনা ব্যূহমধ্যে প্রাবিশদ্ ধনঞ্জয়.........[১১৮]" ইত্যাদি উক্তির দ্বারা নাটকের প্রধান যে ফল অর্থাৎ জয়দ্রথের নিধন তা আরও প্রকাশিত হল কারণ ব্যূহমধ্যে জয়দ্রথকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে তা পূর্বে উল্লেখ পাওয়া যায় এবং ব্যূহভেদ করে অর্জুনের প্রবেশ নাটকের প্রধান ফলের পরিপূর্তির অনেক সম্মুখে চলে আসে।

পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা যায় কাল প্রায় শেষ হতে চলেছে কিন্তু জয়দ্রথের সন্ধান তখনও পাওয়া যায় নি। সেই জন্য কৃষ্ণ মনে মনে ঠিক করেন – "কালোঽতিক্রামতি এব। জযদ্রথস্য সন্ধানং কথমপি নোপলভ্যতে। অতএব অধুনাচ্ছাদ সুদর্শনেন সূর্য্যামাচ্ছয়ামি। যেন সূর্য্যোঽস্তং গত ইতি মন্যমানাঃ জযদ্রথরক্ষণে উদাসীনা ভবেয়ুঃ কৌরবাঃ।"[১১৯] এই বলে সুদর্শন চক্রের দ্বারা সূর্য্যকে আচ্ছাদন করতেই নেপথ্য থেকে উল্লাস

ভেসে আসে এবং জয়দ্রথের সঙ্গে দুর্য্যোধনেরা রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেন। বিমর্ষ সন্ধির লক্ষণের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে 'আদি' শব্দের দ্বারা যে কোন প্রকার বাধার কথা বলা হয়েছে। *জয়দ্রথবধ* নাটকের প্রধান যে ফল তা এই ঘটনার মাধ্যমে বাধা প্রাপ্ত হয়েছে বলে মনে হয় কারণ কৌরবগণ ও দর্শকগণ মনে করেছেন সূর্যাস্ত হয়ে গিয়েছে অর্জুনের প্রতিজ্ঞা পূরণ হল না। তাই এখানে বিমর্শ সন্ধি লক্ষিত হয়েছে ।

নির্বহণ সন্ধির লক্ষণ সম্বন্ধে *নাট্যশাস্ত্র*কার বলেছেন–

সমানয়নমর্থানাং মুখাদ্যানাং সবীজিনাম্।

ফলোপসঙ্গতানাঞ্চ জ্ঞেয়ং নির্বহণং তু তত্।।[১২০]

অর্থাৎ, মুখাদিতে প্রতিপাদিত বীজযুক্ত বিষয়সমূহের পরিণতি ও ফলের সহিত যোগ নির্বহণ নামে কথিত। নির্বহতি মুখ্যফলং সম্পদ্যতে অস্মিন্নিতি নির্বহণম্–এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে এই সন্ধির নাটকের মুখ্যফল সম্পাদিত হয় বলে এর নাম নির্বহণ সন্ধি। এই সন্ধির অপর নাম উপসংহৃতি। যে সন্ধিতে সমস্ত অন্তরায় তিরোহিত হওয়ার ফলে সমস্ত প্রারব্ধ কর্ম নাট্যের মুখ্যফল সাধনের জন্য প্রবর্তিত হয় সেই সন্ধিকে হলা হয় উপসংহৃতি বা নির্বহণ সন্ধি। *সাহিত্যদর্পণ*কার বিশ্বনাথ এই সন্ধির লক্ষণ প্রায় ধনঞ্জয় কৃত লক্ষণের অনুরূপ–

বীজোবন্তো মুখাদ্যর্থা বিপ্রকীর্ণা যথাযথম্।

একার্থমুপনীয়ন্তে যত্র নির্বহণং হি তত্।।[১২১]

যথাযথভাবে অর্থাত্ *নাট্যশাস্ত্রের* নিয়মকে যথার্থ ভাবে মেনে বিপ্রকীর্ণাঃ অর্থাৎ স্ব স্ব স্থানে বিক্ষিপ্ত ভাবে উপন্যস্ত, বীজবন্তো বা বীজযুক্ত, মুখাদ্যর্থা অর্থাৎ মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ সন্ধিতে প্রতিপাদিত বিষয়বস্তু যেখানে একটি মাত্র মুখ্য বা প্রধান ফলের উদ্দেশ্যে উপনীত হয় সেই সন্ধির নাম নির্বহণ সন্ধি। অর্থাৎ, মুখসন্ধি প্রভৃতির মাধ্যমে ক্রমবিস্তৃত বিষয়গুলি যেখানে যথার্থভাবে ফলসিদ্ধিতে উপস্থিত হয় তা নির্বহণসন্ধি বা উপসংহৃতি সন্ধি।

জয়দ্রথবধ নাটকের মুখ্যফল জয়দ্রথের নিধন। অর্জুনের প্রতিজ্ঞারূপী নাটকের বীজকে কেন্দ্র করে শকুনির বুদ্ধি ইত্যাদির দ্বারা যুদ্ধকালে এসে উপস্থিত হয় এবং কাল অতিক্রম হয়ে যাচ্ছে দেখে কৃষ্ণের বুদ্ধির প্রয়োগের ফলে জয়দ্রথের সঙ্গে দ্রোণাচার্য্যরা মঞ্চে প্রবেশ করে এবং দেখা যায় কৃষ্ণ সুদর্শন চক্র আপসারিত করে নেয়। তারপর বর্ণিত যুদ্ধের বর্ণনা এবং অবশেষে জয়দ্রথের মৃত্যু নির্বহণ সন্ধির অন্তর্গত।

নাটকের অপর বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গিয়ে বিশ্বনাথ-কবিরাজ বলেছেন –"নানাবিভূতিভিঃ।"[১২২] লক্ষ্মী টীকায় এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছে–"নানেতি। মহাসহায়মিত্যভিপ্রায়েণোক্তমিতি ভাবঃ। তথা চ মহান্তো জনাঃ সহায়া নায়কস্যোদ্দেশ্যকার্য্যেষু সাহায্যকরা যত্র তন্মহাসহায়ম্।"[১২৩] *নাট্যশাস্ত্রে* বলা হয়েছে – "নানাবিভূতিসংযুতম্।"[১২৪] 'বিভূতি' শব্দের অর্থ সম্পদ। অতএব নাটক হবে নানা প্রকার সম্পদশোভিত। কিন্তু লক্ষ্মী টীকায় এর অন্য ব্যাখ্যা করে বলেছেন নায়কের থেকেও গুণবত্তার দিক থেকে শ্রেষ্ঠ কেউ তার সহায়ক হিসাবে এখানে কাজ করবে[১২৫]।

মূল *বৈয়াসিক-মহাভারতে* যেমন মুখ্য চরিত্র নির্বাচনে অর্থাৎ নায়ক নির্বাচনে সমস্যা সৃষ্টি করে তেমনি এই নাটকেও সমস্যা দেখা দিয়েছে। কিন্তু জয়দ্রথস্য বধম্ যদি এরকম সমাস করা হয় তাহলে বধত্ব রূপ কার্যের প্রধান অর্জুনই। কৃষ্ণের সহায়তা ছাড়া জয়দ্রথের নিধন সম্ভব ছিল না তা নাটকে উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু নিধন রূপ কার্য সিদ্ধ করেছে অর্জুনই। তাই *জয়দ্রথবধ* নাটকে অর্জুনকেই নায়ক বলে মনে করা যেতে পারে। অভিমন্যুর মৃত্যুতে অর্জুন অস্থির হয়ে শোক জ্বালায় বিদীর্ণ হয়ে পড়ে। এমন অবস্থায় কৃষ্ণ বলেন– "ধনঞ্জয়! ক্ষত্রিয়স্ত্বং। ক্ষত্রিয়স্য শোকপ্রকাশস্তু নাশ্রুবারিণা প্রতিশোধগ্রহণেনৈব....."[১২৬] ইত্যাদি উক্তির দ্বারা অর্জুনের ক্রোধ প্রজ্বলিত করা থেকে শুরু করে জয়দ্রথের মৃত্যু পর্যন্ত অর্জুনের সহায়ক তথা পথ প্রদর্শকরূপে আমরা কৃষ্ণকে পেয়েছি এবং নায়ক অর্থাৎ অর্জুনের গুণবত্তার দিক থেকে শ্রেষ্ঠ সহায়করূপে পেয়ে থাকি। তাই পঞ্চমাঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের শেষে অর্জুনের উক্তি – "অত্রাপি নাস্তি মে কিমপি কৃতিত্বং এতদপি মাধব প্রসাদাদেব সমভবেত্"[১২৭] অর্থাৎ, এখানে আমার কোন কৃতিত্ব নেই, এই মাধবের অনুগ্রহের জন্যই সম্ভব হয়েছে। সুতরাং নাটকে নায়কের অর্থাৎ অর্জুনের গুণবত্তার দিক থেকে শ্রেষ্ঠ সহায়ক রূপে কৃষ্ণ এখানে বর্ণিত হয়েছে।

ভরতের *নাট্যশাস্ত্রে* নাটকের লক্ষণে বলা হয়েছে যাতে রাজগণের সুখ ও দুঃখ থেকে উদ্ভূত কার্যকলাপ নানা রস, ভাব ও ক্রিয়া দ্বারা বহুপ্রকারে বর্ণিত হয় তার নাম নাটক–

নৃপতীনাং যচ্চরিতং নানারসভাবচেষ্টিতৈর্বহুধা।
সুখদুঃখোৎপত্তিকৃতং তজ্ জ্ঞেয়ং নাটকংনাম।।[১২৮]

বিশ্বনাথ-কবিরাজ বলেছেন – "সুখদুঃখসমুদ্ভূতিঃ নানারসনিরন্তরম্"[১২৯] অর্থাৎ, নাটকে কোথাও সুখের বর্ণনা যেমন থাকবে সাথে সাথে দুঃখের বর্ণনাও থাকবে এবং শৃঙ্গার-করুণাদি নানা রসে পূর্ণ থাকবে। অভিমন্যুর মৃত্যুতে অর্জুনের যে আর্তনাদ তা প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা গিয়েছে–

অভিমন্যুর্ভবেনাস্তি যদোদেতি চ মানসে
তদা শোকেন মে কৃষ্ণ হৃদয়ং হি বিদীর্য্যতে।।[১৩০]

আরও,

কীদৃগ্ জ্বালা ভবতি হৃদয়ে বোধনে নো সমর্থঃ
শোকৈস্তাপৈ র্বিরহ দহনৈঃ সর্ব্বতোঽহং বিদীর্ণঃ।
শান্তির্ণাস্তে মনসি মম ভোঃ লেশতোঽদ্যেহ কাচিত্
কস্মিন্ স্থানে গমনবিধিনা চিত্তযদোঽপগচ্ছেত্।।[১৩১]

ইত্যাদি উক্তির দ্বারা দর্শকের হৃদয়ও অর্জুনের ন্যায় কাতর হয়েছে এবং করুণ রস আস্বাদিত হয়েছে।

অন্তিম সর্গে নাটকের প্রধান যে বীজ অর্থাৎ জয়দ্রথের মৃত্যুতে দর্শকের মনে প্রতিশোধরূপ সুখাগম হয়েছে। পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে যখন সূর্য অস্ত গিয়েছে এই মনে করে ব্যূহ থেকে জয়দ্রথরা সম্মুখে আসে এবং বুঝতে পারে সবটাই কৃষ্ণের ছলনা তখন অর্জুন বলেন – "অর্জুন নেত্র দেশে প্রবিষ্টং জযদ্রথং রক্ষিতুং কোঽপি ন সমর্থো ভবেত্। অধুনৈব পশ্য। ইতি শরং ক্ষিপতি। শরবিদ্ধো জযদ্রথো নিহতশ্চ।"[১৩২] অর্থাৎ, অর্জুনের চোখের সামনে এসে পড়েছে জয়দ্রথ, রক্ষা করতে কেউ সমর্থ হবে না। এখনি দেখ বাণ নিক্ষেপ

করে ইত্যাদি উক্তির দ্বারা অর্জুনের প্রতিজ্ঞা রক্ষা এবং পুত্রের মৃত্যুর প্রতিশোধের দ্বারা দর্শকের মনেও সুখের অনুভূতি জেগে ওঠে।

নাটকের অঙ্ক বিষয়ে বলতে গিয়ে বিশ্বনাথ কবিরাজ বলেছেন – "পঞ্চাদিকা দশপরাস্ত্রত্রাঙ্কাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।"[১৩৩] নাটকের কয়টি অঙ্ক থাকবে সে বিষয়ে নির্দিষ্ট কোন মত নেই। পাঁচ থেকে দশের মধ্যে যে কোন অঙ্ক থাকতে পারে। কিন্তু পাঁচের কম এবং দশের অধিক অঙ্ক থাকতে পারবে না। অঙ্ক শব্দের অর্থ নাটকের পরিচ্ছেদ। অঙ্কের লক্ষণ করতে গিয়ে বিশ্বনাথ-কবিরাজ বলেছেন–

প্রত্যক্ষচিত্রচরিতৈর্যুক্তো ভাবরসোদ্ভবৈ

অন্তনিষ্ক্রান্ত নিখিলপাত্রোঽঙ্ক ইতি কীর্ত্তিতঃ।"[১৩৪]

অর্থাৎ, ভাব ও রস যা থেকে উদ্ভব হয় সেইরূপ মহিষী ও পরিজনবর্গের এবং অমাত্য ও বণিকগণের বিচিত্র চরিত্র সুস্পষ্টভাবে অঙ্কে সংযুক্ত হবে। অঙ্কের শেষে সমস্ত নাট্যোল্লিখিত পাত্রই বাইরে নিষ্ক্রান্ত হবে। নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় বিরচিত *জয়দ্রথবধ* নাটকটিতে পাঁচটি অঙ্ক আছে এবং প্রতিটি অঙ্কে দুটি করে দৃশ্য দেখা গিয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে *নাট্যশাস্ত্রের* বাইরে আধুনিক সংস্কৃত নাটকের প্রভাবেই দৃশ্যের ব্যবহার দেখা গিয়েছে।

বিশ্বনাথ কবিরাজ নাটকের লক্ষণ করতে গিয়ে অপর বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন–

প্রখ্যাতবংশো রাজর্ষিধীরোদাত্তঃ প্রতাপবান্

দিব্যোঽথ দিব্যাদিব্যো বা গুণবান্ নায়কো মতঃ।।[১৩৫]

অর্থাৎ, নাটকের নায়ক প্রখ্যাত বংশযুক্ত হবে, রাজর্ষি, ধীরোদাত্ত, প্রতাপবান হবে এবং দিব্য অথবা অদিব্য গুণযুক্ত হবে। *নাট্যশাস্ত্রেও* বলা হয়েছে–

প্রখ্যাতবস্তুবিষয়ং প্রখ্যাতোদাত্তনায়কং চৈব।

রাজর্ষিবংশচরিতং তথা চ দিব্যাশ্রয়োপেতম্।।[১৩৬]

যে চরিত্র দৃশ্যকাব্যে প্রধান, সমস্ত ঘটনা যাকে কেন্দ্র করে আবির্ভূত হয়, যে নাট্যফলের অধিকারী তাকেই নায়ক বলা হয়। নায়কের কি কি গুণ থাকবে সে বিষয়ে *সাহিত্যদর্পণ*কার বিশ্বনাথ-কবিরাজ বলেছেন–

ত্যাগী কৃতী কুলীনঃ সুশ্রীকো রূপযৌবনোৎসাহী।

দক্ষোঽনুরক্তলোকস্তেজোবৈদগ্ধ্যশীলবান্নেতা।।[১৩৭]

অর্থাৎ, দানশীল, বীর, সৎকুলোদ্ভব, বুদ্ধিমান, রূপযৌবনশালী ও অধ্যবসায়ী, নিরলস, লোকপ্রিয়, লোকানুরক্ত, তেজ ও বৈদগ্ধ্যসম্পন্ন ও সচ্চরিত্র ব্যক্তিকে আলংকারশাস্ত্রানুসারে নায়ক বলা হয়। *নাট্যশাস্ত্রে* নায়কের লক্ষণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে–

ব্যসনী প্রাপ্তদুঃখো বা যুজ্যতেঽভ্যুদয়েন যঃ।

তথা পুরুষবাহুল্যে প্রধানো নায়কঃ স্মৃতঃ।।[১৩৮]

অর্থাৎ, নাট্যে বহু পুরুষ চরিত্রের ক্ষেত্রে যে দুর্ভাগ্যহত বা বিপন্ন ব্যক্তি অবশেষে উন্নতি লাভ করে তাকে নায়ক বলা হয়। আবার ধনঞ্জয় তাঁর *দশরূপকের* দ্বিতীয় প্রকাশে নায়কের গুণাবলী সম্বন্ধে বলেছে–

নেতা বিনীতো মধুরস্ত্যাগী দক্ষঃ প্রিয়ংবদঃ।

রক্তলোকঃ শুচির্বাগ্মী রূঢ়বংশঃ স্থিরো যুবা।।[১৩৯]

বুদ্ধ্যুৎসাহস্মৃতিপ্রজ্ঞাকলামানসমন্বিতঃ।

শূরো দৃঢ়শ্চ তেজস্বী শাস্ত্রচক্ষুশ্চ ধার্মিকঃ।।[১৪০]

অর্থাৎ, নায়ক বা নেতা হবেন বিনীত, মধুর, ত্যাগী, দক্ষ, প্রিয়ভাষী, শুচি, লোকপ্রিয়, বাগ্মী, প্রখ্যাতকুলোদ্ভব, স্থির এবং যুবক। তিনি হবেন বুদ্ধিমান, উৎসাহী, স্মৃতিমান্, প্রজ্ঞাশালী, কলাসমন্বিত, বীর, দৃঢ়, তেজস্বী, শাস্ত্রানুসারী এবং ধার্মিক। *জয়দ্রথবধ* নাটকের নায়ক অর্জুন। কুন্তীর গর্ভে ইন্দ্রের ঔরস জাত পাণ্ডুর ক্ষেত্রজপুত্র অর্জুন অর্থাৎ প্রখ্যাত বংশযুক্ত, প্রতাপবান এবং দিব্য-অদিব্য গুণযুক্ত নায়ক। ধীরোদাত্ত নায়কের লক্ষণ করতে গিয়ে *সাহিত্যদর্পণ*কার বলেছেন–

অবিকত্থনঃ ক্ষমাবানতিগম্ভীরঃ মহাসত্ত্বঃ।

স্থেয়ান্ নিগূঢ়মানো ধীরোদাত্ত দৃঢ়ব্রতঃ কথিতঃ।।[১৪১]

একই ভাবে *দশরূপকেও* বলা হয়েছে–

মহাসত্ত্বোঽতিগম্ভীরঃ ক্ষমাবানবিকত্থনঃ।

স্থিরো নিগূঢ়াহঙ্কারো ধীরোদাত্তো দৃঢ়ব্রতঃ।।[১৪২]

শোকক্রোধাদিতে অবিকৃতচিত্ত, গম্ভীরপ্রকৃতি, ক্ষমাশীল, আত্মপ্রচারে বিমুখ, স্থির, বিনয়াদি দ্বারা অহংকার গোপনকারী এবং কর্তব্যপালনে দৃঢ়চেতা নায়কই ধীরোদাত্ত পদবাচ্য। *জয়দ্রথবধ* নাটকের নায়ক অর্জুন হলেন হস্তিনাপুরের রাজা পাণ্ডুর পুত্র এবং যদুবংশীয় রাজা শূরসেনের কন্যা কুন্তীর পুত্র। সুতরাং অর্জুন প্রখ্যাতবংশজাত, রাজর্ষি, (দিব্য) ও প্রতাপবান। *জয়দ্রথবধ* নাটকের বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ্য করে অর্জুনকে ধীরোদাত্ত নায়ক বলা যেতে পারে।

আচার্য বিশ্বনাথ নাটকের বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গিয়ে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বলেছেন–

এক এব ভবেদঙ্গী শৃঙ্গারো বীর এব বা।

অঙ্কমন্যে রসাঃ সর্ব্বে কার্য্যং নির্বহণেঽদ্ভুতম্।।[১৪৩]

অর্থাৎ, নাটকে একটাই রস প্রধান হবে, শৃঙ্গার অথবা বীর (অথবা অন্যরস) অন্য রসগুলো অপ্রধানভাবে অবস্থান করবে এবং নির্বহণ সন্ধিতে অদ্ভুতরসের সন্নিবেশ থাকবে। কুসুমপ্রতিমা টীকায় বলা হয়েছে–"একঃ শৃঙ্গার এব, একো বীর এব বা শব্দাৎ একঃ শান্ত এব বা অঙ্গ্যো প্রধানরসো ভবেৎ। তথা চ উত্তমপ্রকৃতীনাং শৃঙ্গার-বীর-শান্তানাং মধ্যে যঃ কশ্চিদেক এব রসো নাটকে প্রধানতয়া নিবদ্ধব্য ইত্যক্তং ভবতি।"[১৪৪] ধ্বনিকার বলেছেন–"প্রসিদ্ধেঽপি প্রবন্ধানাং নানারসনিবন্ধনে। একো রসোঽঙ্গীকর্তব্যস্তেষামুৎকর্ষমিচ্ছতা।"[১৪৫] *জয়দ্রথবধ*

নাটকে অর্জুনের প্রতিজ্ঞা থেকে শুরু করে জয়দ্রথের বধ পর্যন্ত প্রধান ভাবে বীররস পরিলক্ষিত হয় এবং অঙ্গরস রূপে করুণ ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। রামচরণতর্কবাগীশ মহাশয় টীকায় বলেছেন – “নির্বহণে উপসংহারাখ্যচরমসন্ধৌ। অদ্ভুতমাশ্চর্য্যরসঃ, কার্য্যে নায়ককর্মণি ব্যাপৃতাঃ সব্যাপারাঃ।”[১৪৬] *জয়দ্রথবধ* নাটকের পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে নির্বহণ সন্ধিতে দেখা যায় শকুনির পরামর্শে জয়দ্রথকে ব্যূহ মধ্যে লুকিয়ে রক্ষা করা হচ্ছে। কাল অতিক্রম প্রায়, জয়দ্রথকে বধ না করতে পারলে অর্জুন প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে আত্মহনন করবে এই ভেবে কৃষ্ণ সুদর্শন চক্রের দ্বারা সূর্যকে আবরণ করেন। কাল অতিক্রম হয়ে গিয়েছে ভেবে অর্জুন মূর্ছিত হয়ে পড়ে। কাল অতিক্রম হয়েছে এই ভেবে জয়দ্রথের মঞ্চে উপস্থিত হওয়ার পর কৃষ্ণ সুদর্শন চক্র অপসারিত করেন, এখানে অদ্ভুত রস আস্বাদিত হয়েছে বলে মনে হয়।

সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে নাটকের লক্ষণ করতে গিয়ে একদম অন্তিমে বলা হয়েছে–

চত্বারঃ পঞ্চ বা মুখ্যাঃ কার্য্যব্যাপৃতপুরুষাঃ।
গোপুচ্ছাগ্রসমাগ্রন্তু বন্ধনং তস্য কীর্ত্তিতম্।।[১৪৭]

অর্থাৎ, চারজন বা পাঁচজন মুখ্যকার্য্যে সহায়ক পুরুষ থাকবে এবং নাটকের বন্ধন গোপুচ্ছের মত হবে। *জয়দ্রথবধ* নাটকটিতে কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীম, দুর্য্যোধন, শকুনি প্রভৃতি মুখ্যকার্য্যে সহায়ক চরিত্র দেখতে পাওয়া যায়। টীকায় বলা হয়েছে- ‘গোপুচ্ছাগ্রসমাগ্রমিতি ক্রমেণাঙ্কাঃ সূক্ষ্মাঃ কর্ত্তব্যাঃ।’[১৪৮] নাটকের বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় অর্জুনের প্রতিশোধ গ্রহণের প্রতিজ্ঞা, সমস্ত ঘটনা শুনে দুর্যোধনকে ধৃতরাষ্ট্রের তিরস্কার, কূটবুদ্ধি শকুনি অর্জুনের প্রতিজ্ঞার কথা শুনে নিজেদের জয় সুনিশ্চিত ভেবে জয়দ্রথরক্ষার্থে পরিকল্পনা, ইন্দ্রপ্রদত্ত অস্ত্র পূর্বেই ব্যবহৃত হওয়ায় কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে নিশ্চিন্ত থাকার পরামর্শ, মধ্যাহ্নকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পরও জয়দ্রথের অনুসন্ধান না পাওয়ায় কৃষ্ণ সুদর্শন চক্রের দ্বারা সূর্যের আবরণ, ব্যূহমধ্য থেকে দুর্যোধনের সঙ্গে প্রবেশ করেন জয়দ্রথের প্রবেশ, সুদর্শন চক্র অপসারণ এবং অবশেষে জয়দ্রথের বধ। নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে গোপুচ্ছের ন্যায় বিস্তৃত হয়ে অন্তিমে সূক্ষ্ম হয়ে উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে।

নাট্যতত্ত্বানুসারে এই দৃশ্যকাব্যটিকে ‘নাটক’ আখ্যায় ভূষিত করা যেতে পারে। কারণ নাট্যতত্ত্বের প্রেক্ষিতে নাটকের যা যা মুখ্য গুণ তা প্রায় সবই এই দৃশ্যকাব্যে লক্ষ্য করা যায়। যদিও নাট্যতত্ত্বের বাইরেও আধুনিক সংস্কৃত নাটকের কৌশল এখানে গ্রহণ করা হয়েছে তথাপি নাট্যতত্ত্বানুসারে এটিকে ‘নাটক’ বলতে অসুবিধা হয় না।

❖ ৪.২.৭ ভরতবাক্য

নাটকের শেষে প্রধান নাটকীয় পাত্রের দ্বারা শুভ কামনা বা কল্যাণ কামনাকে প্রশস্তি বলা হয় প্রশস্তি হল নির্বহণ সন্ধির চতুর্দশ অঙ্গের অন্তিম অঙ্গ[১৪৯]। ভরতাচার্যের মতে নৃপ, দেশ, ব্রাহ্মণ প্রভৃতির কল্যাণ কামনার

দ্বারা রূপকের সমাপ্তি ঘটে – “নৃপদেশপ্রশান্তিশ্চ প্রশস্তিরভিধীয়তে”[১৫০]। *দশরূপকে* বলা হয়েছে “প্রশস্তিঃ শুভশংসনম্”[১৫১]। *সাহিত্যদর্পণে* *নাট্যশাস্ত্রের* ন্যায় অনুরূপ লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়[১৫২]। এই প্রশস্তিমূলক বাক্যকেই ভরতবাক্য বলা হয়। যদিও *নাট্যশাস্ত্র* বা পরবর্তী নাট্যতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থে ‘ভরতবাক্য’ কথাটি পাওয়া যায় না। রূপকের সমাপ্তিতে নট বা ভরতের উক্তিরূপে সন্নিবিষ্ট এই প্রশস্তির নাম দেওয়া হয়েছে ভরতবাক্য। *জয়দ্রথবধ* নাটকের পরিসমাপ্তিতে ভরতবাক্য হল–

সত্যোধর্ম্মঃ প্রচলতু সদা সর্ব্ববিশ্বে সমন্তাৎ
হিংসাদ্বেষ সকলভূবনাৎ দূরমেব প্রযাতু।
শুদ্ধজ্ঞানাদ্ নিখিলমনুজাঃ শান্তিপূর্ণা ভবন্তু
দৈবীবাণী নিয়তমিহসা দিব্যভাসা বিভাতু।।[১৫৩]

অর্থাৎ, সত্যধর্ম্ম প্রচলিত হোক সবসময় সর্ববিশ্বে, হিংসা, দ্বেষ দূরীভূত হোক সমস্ত পৃথিবী থেকে। শুদ্ধজ্ঞানের জন্য সমস্ত মানুষ শান্তিপূর্ণ হোক, দৈবীবাণী নিয়ত বজায় থাকুক, সংস্কৃত শোভিত হোক। যুধিষ্ঠিরের এই শুভ কামনার দ্বারা নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটে।

জয়দ্রথবধ নাটকে নাট্যকার নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় *বৈয়াসিক-মহাভারতের* ঘটনাকে অবলম্বন করেও বিভিন্ন চরিত্রের কথোপকথনে মানবিক সমস্যা, সামাজিক সমস্যা এবং ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সমস্যাগুলিকে ব্যাখ্যা করেছেন। এই নাটকের তাত্ত্বিক দিক আলোচনা করতে গিয়ে দেখা যায় তিনি *নাট্যশাস্ত্রের* বিভিন্ন গ্রন্থকে যথাযথ সম্মান জানিয়েও বর্তমান সমাজের প্রভাবকে উপেক্ষা করতে পারেন নি। সেই কারণে নাটকের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে কোথাও কোথাও সমস্যা উদ্ভূত হয়েছে।

৪.৩ চরিত্র-বিশ্লেষণ

এই নাটকে মুখ্য এবং গৌণ চরিত্র রূপে যেসকল চরিত্রের ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি হল–

নাটকের চরিত্র	**নাটকের অঙ্ক ও দৃশ্য**
অর্জুন	প্রথমাঙ্কে প্রথমদৃশ্য (নেপথ্যে), প্রথমাঙ্কে দ্বিতীয় দৃশ্য, পঞ্চমাঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য
কৃষ্ণ	প্রথমাঙ্কে দ্বিতীয় দৃশ্য, দ্বিতীয়াঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য, চতুর্থাঙ্কে প্রথমদৃশ্য, পঞ্চমাঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য
ধৃতরাষ্ট্র	দ্বিতীয়াঙ্কে প্রথমদৃশ্য
দুর্যোধন	দ্বিতীয়াঙ্কে প্রথমদৃশ্য, তৃতীয়াঙ্কে প্রথমদৃশ্য, তৃতীয়াঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য, চতুর্থাঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য, পঞ্চমাঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য
যুধিষ্ঠির	দ্বিতীয়াঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য, চতুর্থাঙ্কে প্রথমদৃশ্য, পঞ্চমাঙ্কে প্রথমদৃশ্য, পঞ্চমাঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য
শকুনি	তৃতীয়াঙ্কে প্রথমদৃশ্য, তৃতীয়াঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য, চতুর্থাঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য, পঞ্চমাঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য
জয়দ্রথ	তৃতীয়াঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য
দ্রোণাচার্য	চতুর্থাঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য
ভীম	পঞ্চমাঙ্কে প্রথমদৃশ্য

অর্জুন–কুন্তীর গর্ভে ইন্দ্রের ঔরসে জাত পাণ্ডুর ক্ষেত্রজপুত্র হলেন অর্জুন। তিনি তৃতীয় পাণ্ডব নামে খ্যাত। পূর্বজন্মে 'নর' নামক ঋষি ছিলেন অর্জুন। অর্জুনের জন্ম মুহূর্তে দৈববাণী হয়েছিল যে এই শিশু পরশুরামের ও বিষ্ণুর ন্যায় তেজস্বী এবং পরাক্রমশালী হবেন। বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং অতিশয় যশস্বী হবেন। ইন্দ্রের ন্যায় অজেয় হয়ে যশ বিস্তার করবেন[১৫৪]। এছাড়া তাঁর আরও কিছু নাম ছিল–ধনঞ্জয়, বিজয়, শ্বেতবাহন, ফাল্গুন, কিরীটী, বীভৎসু, সব্যসাচী, গুড়াকেশ[১৫৫]। শুভ ও মঙ্গলজনক কাজে তাঁর রুচি থাকার জন্য তিনি অর্জুন নামে খ্যাত।

বিশ্বনাথ-কবিরাজ নাটকের লক্ষণ করতে গিয়ে নায়কের কথা বলেছেন–

প্রখ্যাতবংশো রাজর্ষিধীরোদাত্তঃ প্রতাপবান্

দিব্যোঽথ দিব্যাদিব্যো বা গুণবান্ নায়কো মতঃ।।[১৫৬]

অর্থাৎ, নাটকের নায়ক প্রখ্যাত বংশযুক্ত হবে, রাজর্ষি, ধীরোদাত্ত, প্রতাপবান হবে এবং দিব্য অথবা অদিব্য গুণযুক্ত হবে। *নাট্যশাস্ত্রেও* বলা হয়েছে–

প্রখ্যাতবস্তুবিষয়ং প্রখ্যাতোদাত্তনায়কং চৈব।

রাজর্ষিবংশচরিতং তথা চ দিব্যাশ্রয়োপেতম্।।[১৫৭]

যে চরিত্র দৃশ্যকাব্যে প্রধান, সমস্ত ঘটনা যাকে কেন্দ্র করে আবির্ভূত হয়, যে নাট্যফলের অধিকারী তাকেই নায়ক বলা হয়। নায়কের কি কি গুণ থাকবে সে বিষয়ে *সাহিত্যদর্পণ*কার বিশ্বনাথ-কবিরাজ বলেছেন–

ত্যাগী কৃতী কুলীনঃ সুশ্রীকো রূপযৌবনোৎসাহী।

দক্ষোঽনুরক্তলোকস্তেজোবৈদগ্ধ্যশীলবান্নেতা।।[১৫৮]

অর্থাৎ, দানশীল, বীর, সৎকুলোদ্ভব, বুদ্ধিমান, রূপযৌবনশালী ও অধ্যবসায়ী, নিরলস, লোকপ্রিয়, লোকানুরক্ত, তেজ ও বৈদগ্ধ্যসম্পন্ন ও সচ্চরিত্র ব্যক্তিকে অলংকারশাস্ত্রানুসারে নায়ক বলা হয়। *নাট্যশাস্ত্রে* নায়কের লক্ষণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে–

ব্যসনী প্রাপ্তদুঃখো বা যুজ্যতেঽভ্যুদয়েন যঃ।

তথা পুরুষবাহুল্যে প্রধানো নায়কঃ স্মৃতঃ।।[১৫৯]

অর্থাৎ, নাট্যে বহু পুরুষ চরিত্রের ক্ষেত্রে যে দুর্ভাগ্যহত বা বিপন্ন ব্যক্তি অবশেষে উন্নতি লাভ করে তাকে নায়ক বলা হয়। আবার ধনঞ্জয় তাঁর *দশরূপকে*র দ্বিতীয় প্রকাশে নায়কের গুণাবলী সম্বন্ধে বলেছে–

নেতা বিনীতো মধুরস্ত্যাগী দক্ষঃ প্রিয়ংবদঃ।

রক্তলোকঃ শুচির্বাগ্মী রূঢ়বংশঃ স্থিরো যুবা।।[১৬০]

বুদ্ধ্যুৎসাহস্মৃতিপ্রজ্ঞাকলামানসমন্বিতঃ।

শূরো দৃঢ়শ্চ তেজস্বী শাস্ত্রচক্ষুশ্চ ধার্মিকঃ।।[১৬১]

অর্থাৎ, নায়ক বা নেতা হবেন বিনীত, মধুর, ত্যাগী, দক্ষ, প্রিয়ভাষী, শুচি, লোকপ্রিয়, বাগ্মী, প্রখ্যাতকুলোদ্ভব, স্থির এবং যুবক। তিনি হবেন বুদ্ধিমান, উৎসাহী, স্মৃতিমান্, প্রজ্ঞাশালী, কলাসমন্বিত, বীর, দৃঢ়, তেজস্বী, শাস্ত্রানুসারী এবং ধার্মিক। *জয়দ্রথবধ* নাটকের নায়ক অর্জুন। কুন্তীর গর্ভে ইন্দ্রের ঔরসে জাত পাণ্ডুর ক্ষেত্রজপুত্র অর্জুন অর্থাৎ প্রখ্যাত বংশজাত, প্রতাপবান এবং দিব্য-অদিব্য গুণযুক্ত নায়ক। নায়কের ভেদ প্রসঙ্গে বিশ্বনাথ-কবিরাজ বলেছেন–

ধীরোদাত্তো ধীরোদ্ধতস্তথা ধীরললিতশ্চ।

ধীরপ্রশান্ত ইত্থমুক্তঃ প্রথমশ্চতুর্ভেদঃ।।[১৬২]

অর্থাৎ, নায়ক চার প্রকার ধীরোদাত্ত, ধীরোদ্ধত, ধীরললিত ও ধীরপ্রশান্ত। ধীরোদাত্ত নায়কের লক্ষণ করতে গিয়ে *সাহিত্যদর্পণ*কার বলেছেন–

অবিকত্থনঃ ক্ষমাবানতিগম্ভীরঃ মহাসত্ত্বঃ।

স্থেয়ান্ নিগূঢ়মানো ধীরোদাত্ত দৃঢ়ব্রতঃ কথিতঃ।।[১৬৩]

একই ভাবে *দশরূপকে*ও বলা হয়েছে–

মহাসত্ত্বোঽতিগম্ভীরঃ ক্ষমাবানবিকত্থনঃ।

স্থিরো নিগূঢ়াহঙ্কারো ধীরোদাত্তো দৃঢ়ব্রতঃ।।[১৬৪]

শোকক্রোধাদিতে অবিকৃতচিত্ত, গম্ভীরপ্রকৃতি, ক্ষমাশীল, আত্মপ্রচারে বিমুখ, স্থির, বিনয়াদি দ্বারা অহঙ্কার গোপনকারী এবং কর্তব্যপালনে দৃঢ়চেতা নায়কই ধীরোদাত্ত পদবাচ্য। *জয়দ্রথবধ* নাটকের নায়ক অর্জুন হলেন হস্তিনাপুরের রাজা পাণ্ডুর পুত্র এবং যদুবংশীয় রাজা শূরসেনের কন্যা কুন্তীর পুত্র। সুতরাং অর্জুন প্রখ্যাতবংশজাত, রাজর্ষি, (দিব্য) ও প্রতাপবান। *জয়দ্রথবধ* নাটকের বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ্য করে অর্জুনকে ধীরোদাত্ত নায়ক বলা যেতে পারে। *দশরূপকে* নায়কের সাত্ত্বিক গুণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে –

শোভা বিলাসো মাধুর্যং গাম্ভীর্যং স্থৈর্যতেজসী।

ললিতৌদার্যমিত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ পৌরুষা গুণাঃ।।[১৬৫]

অর্থাৎ, শোভা, বিলাস, মাধুর্য, গাম্ভীর্য, স্থৈর্য, তেজ, লালিত্য এবং ঔদার্য এই আটটি পুরুষের সাত্ত্বিক গুণ। *সাহিত্যদর্পণে*ও এই আটটি গুণ স্বীকার করা হয়েছে[১৬৬]। ধনঞ্জয়ের মতে নীচের প্রতি ঘৃণা, প্রবলের প্রতি স্পর্ধা এবং শৌর্য ও দক্ষতাকে শোভা বলা হয়[১৬৭]। ধৈর্যসমন্বিত গতি ও দৃষ্টি এবং সস্মিত বাক্যকে বিলাস বলেছেন[১৬৮]। অত্যন্ত ক্ষোভের মধ্যেও নায়কের ঈষৎ বিকারকে মাধুর্য বলা হয়[১৬৯]। নায়কের সেই গুণকে গাম্ভীর্য বলা হয় যার প্রভাবে কোন প্রকার বিকার লক্ষিত হয় না[১৭০]। মাধুর্যে মৃদু বিকার হলেও গাম্ভীর্যে তা পরিলক্ষিত হয় না। নানা প্রতিবন্ধকতা বা বাধাবিঘ্ন থাকা সত্ত্বেও নায়ক যদি নিজের সংকল্প থেকে বিচ্যুত না হয় তবে তা স্থৈর্য গুণ[১৭১]। কোন নায়ক যদি প্রাণের বিনিময়েও তিরস্কার, অপমান প্রভৃতি সহ্য না করেন তা তেজ নামক গুণ[১৭২]। নায়কের মধ্যে কোমলতাযুক্ত শৃঙ্গারাত্মক চেষ্টার অভিব্যক্তিই ললিত নামক গুণ[১৭৩]। প্রিয় বাক্যের সাথে জীবন পর্যন্ত দান করা এবং সজ্জনের উপগ্রহ ঔদার্য[১৭৪]।

অর্জুনকে *জয়দ্রথবধ* নাটকে প্রথমাঙ্কে দ্বিতীয় দৃশ্যে এবং পঞ্চমাঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্যে দেখতে পাওয়া যায়। জয়দ্রথের বধকে কেন্দ্র করে অর্জুনের প্রতিজ্ঞা দিয়েই নাটকটি শুরু হয় –

অদ্যৈব তাবদ্ বিনিপাতয়ামি

সূর্য্যাস্তযানস্য চ মধ্যতোহি

জয়দ্রথং দুষ্টকৃতিং বলেন

নোচেত্ স্বয়ং মৃত্যুমহং বৃণোমি।।[১৭৫]

কৃষ্ণ শান্ত করার চেষ্টা করলে অর্জুন তাঁকে বলেন প্রাণপ্রিয় প্রাণের অধিক নয়নমণি অভিমন্যুকে কীভাবে ভুলে যাবেন তিনি। অভিমন্যু নেই এই কথা যখনই মনে উদয় হচ্ছে শোকের দ্বারা হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে তাঁর।[১৭৬] হৃদয় শোকতাপে ও বিরহ জ্বালায় সর্বপ্রকারে বিদীর্ণ হচ্ছে। মনে লেশ মাত্র শান্তি নেই তাঁর।[১৭৭] এখান থেকে পুত্রের প্রতি পিতার স্নেহশীল ভাব প্রকাশ পায়। অর্জুনের এমন অবস্থা দেখে কৃষ্ণ শোক নির্মুক্ত করে প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্য উদ্যোগী হওয়ার কথা বলেন। অর্জুন একথা শুনে মনে করেন সত্যই রোদনের শেষ নেই, পুত্র অভিমন্যুর মৃত্যুতে যারা ভাগীদার তাদের যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু বিধান করবেন তিনি–

অভিমন্যোঃ শিশোর্ঘাতে যে চাংশ ভাগিনো রণে।

তেষাং মৃত্যুং বিধায়ৈব পুত্রতৃপ্তিং করোম্যহম্।।[১৭৮]

এখানে অর্জুনের শোক সম্বরণ করা, বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন ও বিবেচনশীলতার গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিতীয়াঙ্কের প্রথম দৃশ্যে দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে এসে অভিমন্যুর মৃত্যুর কথা জানালে ধৃতরাষ্ট্র বলেন 'জয়দ্রথ নিহত হল আজ, জয়দ্রথ বধ হবে এবিষয়ে কোন সংশয় নেই'– "হা ধিক! জযদ্রথো নিহত এব।"[১৭৯] এখান থেকে অর্জুনের পরাক্রমের পরিচয় ফুটে উঠেছে। পঞ্চমাঙ্কের প্রথম দৃশ্যে দেখা যায় যুধিষ্ঠির ভীমকে ধনঞ্জয়ের সংবাদ আনার কথা বলেন। ভীম ফিরে এসে জানান যুদ্ধের ছলে সংশপ্তকরা ধনঞ্জয়কে দূরে নিয়ে গিয়েছেন। অর্জুন তাদের বিনাশ করে এখন ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করছেন। এখান থেকে অর্জুনের বীরত্বের পরিচয় মেলে। পঞ্চমাঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে কৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন আচার্য্য গোপনে জয়দ্রথকে ব্যূহ মধ্যে লুকিয়ে রেখেছেন অতএব ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ কর। অর্জুন প্রত্যুত্তরে বলেন নিমেষে সমস্ত মূঢ়বুদ্ধি মানুষদের বলের দ্বারা হত্যা করে যোদ্ধাহীন করবেন কৌরবদের যুদ্ধকে তিনি।[১৮০] পুত্রের হত্যাকারী পাপিষ্ঠ জয়দ্রথকে কি উপায়ে কোন বলের দ্বারা কে রক্ষা করতে সমর্থ হবে তিনি দেখবেন–

মম পুত্রস্য হন্তারং পাপিষ্টং তং জয়দ্রথম্।
কেনোপায়েন কো রক্ষেৎ পশ্যাম্যদ্য বলেন তৎ।।[১৮১]

এখান থেকে তাঁর বীরত্বের পরিচয় নাটকে ফুটে উঠেছে। কৃষ্ণ যখন সুদর্শন চক্রের দ্বারা সূর্যকে আবরণ করেন তখন সকলে মনে করেন সূর্যাস্ত হয়েছে। কৌরবরা উল্লাস করতে করতে জয়দ্রথকে নিয়ে ব্যূহ থেকে বেরিয়ে আসেন। কৃষ্ণ তখন অর্জুনকে বারবার জয়দ্রথকে বধের কথা বললেও অর্জুন বলেন সূর্যাস্ত হয়েছে কীভাবে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করবেন তিনি – "বাসুদেব! কথং প্রতিজ্ঞালঙ্ঘনং করোমি। সূর্যে অস্তং গতে কথং জযদ্রথং হনিষ্যামি।"[১৮২] এখান থেকে তাঁর প্রতিশ্রুতিরক্ষা বা অঙ্গীকারবদ্ধ হবার গুণ প্রকাশিত হয়। কৃষ্ণ সুদর্শন চক্র অপসারিত করলে সকলের কাছে তাঁর ছল প্রকাশিত হয়। জয়দ্রথকে সামনে পেয়ে অর্জুন বাণ নিক্ষেপ করে জয়দ্রথকে বধের দ্বারা পুত্রের প্রতি অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। এছাড়া ভ্রাতা হিসাবে ভ্রাতৃভক্তি, কৃষ্ণের কথা নীতি-বিরুদ্ধ মনে হলেও বাস্তব-ভিত্তিতে মেনে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন প্রভৃতি গুণ তাঁর চরিত্রের মধ্য দিয়ে আলোচ্য নাটকে ফুটে উঠেছে।

নাট্যকার এই নাটকের মূল চরিত্র হিসাবে অর্জুনকে যেভাবে চিত্রিত করেছেন তার মাধ্যমে অর্জুন এখানে কেবল বীর নয়, একজন হৃদয়বান পিতা, পাশাপাশি ভ্রাতাদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ভালোবাসা সবই প্রকাশ পেয়েছে। একটি মানবিক চরিত্র রূপে যে যে গুণ থাকার দরকার অর্জুনের মধ্যে সেই সকল গুণই লক্ষ্য করা যায়। একাধারে তিনি বীর, অন্যদিকে নীতিবোধ সম্পন্ন ক্ষত্রিয়। অন্যায় যুদ্ধে জয়লাভ ক্ষত্রিয়ের গৌরব বৃদ্ধি করে না সেই বোধ তাঁর মধ্যে জাগ্রত আছে তা লক্ষ্য করা যায়। সর্বপরি তিনি শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত এবং তাঁর আদেশই ধ্রুব সত্য এটাও লক্ষ্য করা যায়। ফলত অর্জুন এই নাটকে একজন গভীর অনুভূতি সম্পন্ন পিতা, ভ্রাতা এবং দায়িত্ব সম্পন্ন আদর্শ ক্ষত্রিয় রূপে চিত্রিত হয়েছেন।

কৃষ্ণ – কংস যদুবংশের শূরসেন বা বসুদেবের সঙ্গে দেবকীর বিবাহ দেন। শ্রীকৃষ্ণ এঁদেরই পুত্র[১৮৩]। *বৈয়াসিক-মহাভারতে* শ্রীকৃষ্ণের কোন বাল্যলীলা বর্ণিত হয়নি। তবে তাঁর আবির্ভাব সম্পর্কে বলা হয়েছে নারায়ণ তাঁর মস্তক থেকে শুক্ল ও কৃষ্ণ দুটি কেশ ছিঁড়ে শুক্লকেশটি রোহিণীর ও কৃষ্ণকেশটি দেবকীর গর্ভে দেন। প্রথমটি বলদেবরূপে এবং দ্বিতীয়টি কৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হন। জয়দ্রথবধ নাটকে কৃষ্ণকে প্রথমাঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য, দ্বিতীয়াঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য, চতুর্থাঙ্কের প্রথম দৃশ্য, পঞ্চমাঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণকে নায়কের সহায়ক রূপে নাটকে দেখতে পাওয়া যায়। পুত্র অভিমন্যুর মৃত্যুতে অর্জুন যখন মর্মাহত হয়ে পরেন ঠিক তখনই কৃষ্ণ বলতে শুরু করেন– "ক্ষত্রিয়সত্তম্। ক্ষত্রিয়স্য শোকপ্রকাশস্তু নাশ্রুবারিণা প্রতিশোধগ্রহণেনৈব।"[১৮৪] ধনঞ্জয়! ক্ষত্রিয় তুমি, ক্ষত্রিয়ের শোক প্রকাশ অশ্রু ব্যায়ের দ্বারা নয়, প্রতিশোধ গ্রহণের দ্বারাই হয়। যাদের প্রচেষ্টায় যুদ্ধে অভিমন্যু নিহত হয়েছে তাদের রক্তধারার দ্বারা যুদ্ধস্থলে তর্পণ কর।[১৮৫] শোক নির্মুক্ত করে প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্য উদ্যোগী হওয়ার উপদেশ দেন। এখান থেকে অর্জুনের প্রতি তাঁর বন্ধুপ্রীতি প্রকাশ পায়। আবার অন্যদিকে যুধিষ্ঠির যখন ভেঙে পরেন বাসুদেব তাঁকে এমন কাতর না হবার কথা বলেন। এখন নিশ্চেষ্ট হওয়া উচিত নয় কারণ এই যুদ্ধের ফলের দ্বারাই সমস্ত যুদ্ধের জয় পরাজয় নিশ্চিত হবে।[১৮৬] এখান থেকে তাঁর পরিবেশ পরিস্থিতিকে বিবেচনা করে কাজ করার গুণের পরিচয় মেলে। কৃষ্ণ নির্দেশ দেন শোক পরিত্যাগ করে বলের দ্বারা উঠে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে সবাইকে যুদ্ধের জন্য যত্নের দ্বারা প্রস্তুত হতে হবে।[১৮৭] আচার্যের সমস্ত ছলকে বুদ্ধির দ্বারা বিনাশ করে জয়দ্রথের বিনাশের জন্য সবাইকে প্রস্তুত হতে হবে।[১৮৮] তাই মুখ্য সবাইকে ডেকে মিলিত করে পরামর্শ করে যুদ্ধনীতি স্থির করার উপদেশ দেন। সাবধান করে এটাও বলেন পরামর্শের গোপনতা যেন সুরক্ষিত থাকে কারণ সবার প্রচেষ্টার উপর ধনঞ্জয়ের জীবন নির্ভর করছে। এখান থেকে তাঁর যুদ্ধনীতি সম্পর্কে ধারণার গুণ প্রকাশিত হয়। চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে যুধিষ্ঠির জানতে চান ঘটোত্কচবধে ভীষণ ব্যথিত ও বিষণ্ণ ভীমসেন। কিন্তু তাঁর মধ্যে ভাবান্তর পরিলক্ষণ করা যাচ্ছে না কেন? কৃষ্ণ উত্তরে বলেন ইন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত এক পুরুষ-হত্যাকারী পরম অস্ত্র যেটি কর্ণের ছিল সেটি যুদ্ধে খুবই ভয়ের কারণ ছিল।[১৮৯] সেটি থাকলে যুদ্ধক্ষেত্রে পার্থের মৃত্যু নিশ্চিত হত, সেটিকে বারণে লেশমাত্র সামর্থ ছিল না। সেইজন্য ঘটোত্কচবধে মনে যেমন দুঃখ তেমনি ধনঞ্জয়ের প্রাণরক্ষার সম্ভাবনা সৃষ্টি হওয়ায় মন আনন্দ লাভ করেছে। তাই দুঃখের প্রকাশ ঘটেনি–

কর্ণস্য পরমং চাস্ত্রমেক-পুরুষনাশকম্।
পুরন্দর-প্রদত্তন্তু চাসীদ্ ভীতিকরং যুধি।।
অস্মিন্ স্থিতে রণে চাস্মিন্ মৃত্যু পার্থস্য নিশ্চিতঃ।
বারণে ন হি সামর্থং লেশতোঽপি চ বিদ্যতে।।[১৯০]

এখান থেকে তাঁর দূরদৃষ্টি প্রকাশ ঘটে। পঞ্চমাঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা যায় সূর্যাস্ত প্রায় আগত কিন্তু তখনও জয়দ্রথের অবস্থান জানা যায়নি তাই তখন কৃষ্ণ ঠিক করেন সুদর্শন চক্রের মাধ্যমে সূর্যকে আবরণ করবেন

যাতে সকলে ভাবে সূর্যাস্ত হয়েছে– "কালোঽতিক্রামতি এব। জয়দ্রথস্য সন্ধানং কথমপি নোপলভ্যতে। অতএব অধুনাচ্ছাদ সুদর্শনেন সূর্য্যামাচ্ছয়ামি। যেন সূর্য্যোঽস্তং গত ইতি মন্যমানাঃ জয়দ্রথরক্ষণে উদাসীনা ভবেয়ুঃ কৌরবাঃ"[১৯১]। তাঁর এই পরিকল্পনা বা ছল নায়কের উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে প্রভাব ফেলেছে। এখান থেকে তাঁর কূটনীতির পরিচয় পাওয়া যায়। জয়দ্রথকে নিয়ে দুর্যোধনরা ব্যূহ থেকে বেরিয়ে আসেন এবং অর্জুনের দ্বারা জয়দ্রথ বধ হন। কৃষ্ণকে এখানে পতাকা নায়ক বলেই মনে হয় কারণ নায়কের উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে সহায়ক রূপে ফলপ্রাপ্তি পর্যন্ত তার অবদান রয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ এই নাটকে আদর্শ বন্ধু হিসাবে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে যুধিষ্ঠির, অর্জুন প্রভৃতিকে মানসিক ভাবে সুস্থ রাখার চেষ্টা করেছেন। শরণাগতের রক্ষা যে তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ তাও এই নাটকে জয়দ্রথবধের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। যেকোন পরিস্থিতিতে যুধিষ্ঠির প্রভৃতির সহায়তা করেছেন স্বার্থহীন আদর্শ বন্ধুরূপে।

ধৃতরাষ্ট্র– অরিষ্টার পুত্র হংসনামক গন্ধর্বরাজই পরজন্মে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পুত্র কুরুবংশবর্ধন ধৃতরাষ্ট্র। ব্যাসদেবের ঔরসে বিচিত্রবীর্যের জ্যেষ্ঠা ভার্যা কাশীরাজকন্যা অম্বিকার গর্ভে জন্ম[১৯২]। এমন শোনা যায় অম্বিকা-ব্যাসদেবের মিলন কালে ব্যাসদেবের ভয়ানক আকৃতি দেখে অম্বিকা ভয়ে চোখ বন্ধ করে নেন। এর ফলে অম্বিকা অন্ধপুত্র প্রসব করেন। জন্মান্ধ হেতু ধৃতরাষ্ট্র রাজা হতে পারেননি, কনিষ্ঠ ভ্রাতা পাণ্ডুই রাজা হন। গান্ধার রাজ সুবলের কন্যা গান্ধারীর সঙ্গে বিবাহ হয়। গান্ধারী ব্যাসদেবের বরে শতপুত্র ও এককন্যার জননী হন। *জয়দ্রথবধ* নাটকে দ্বিতীয়াঙ্কের প্রথমদৃশ্যেই কেবল ধৃতরাষ্ট্র চরিত্রটি দেখতে পাওয়া যায়। বিজয়লাভের আনন্দে পিতাকে অভিবাদন জানানোর জন্য দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রগৃহে আসতে দেখা যায়। ধৃতরাষ্ট্র অভিবাদনের কারণ জানতে পেরে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন–

যো বালকো কৌরববংশ স্যকেতুঃ
প্রিয়ো যদূনাং হি তথা কুরুণাম্।
বিরাটবংশস্য তথা প্রিয়োঽসৌ
নিপাতিতো দুষ্টরণে বিবোধৈঃ।।[১৯৩]

অর্থাৎ, যে বালক কৌরববংশকেতু, যদুগণের তথা কুরুগণের প্রিয় তেমন বিরাটবংশের প্রিয় নির্বোধগণের দ্বারা দুষ্টযুদ্ধে নিপাতিত হয়েছে সে। এখান থেকে অভিমন্যুর প্রতি তাঁর স্নেহ প্রকাশিত হয়। মৃত্যুর মূল রচনা করে বংশ ন্যাসের হেতু হয়ে বালককে হত্যা করে নিলজ্জ উপস্থিত হয়েছ[১৯৪] ইত্যাদি উক্তির মধ্য দিয়ে এখানে নীতি বিরুদ্ধ কাজে সমর্থন যে তিনি করেন না তা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি দুর্যোধনকে বলেছেন পুত্র শোকে দীপ্ত কৌরবরা অতিভীষণ যুদ্ধ করবে, এখানে কারুরই নিষ্কৃতি নেই।[১৯৫] এখান থেকে তাঁর পরিণাম সম্পর্কে অবহিত হবার গুণ প্রকাশিত হয়েছে। দুর্যোধন যখন বলেন জয়দ্রথ একাই সমস্ত পাণ্ডবদের আটকে রেখেছিল, ধৃতরাষ্ট্র তা শুনে দুঃশলার কথা চিন্তা করে দুঃখী হয়ে বলেন–

দুঃশলা নাম যা কন্যা মম প্রাণাধিকপ্রিয়া।

সা বৈধব্যং গতাদ্যৈব ভ্রাতৄণাং বঃ প্রসাদতঃ।।[১৯৬]

অর্থাৎ, দুঃশলা নামে যে কন্যা আমার প্রাণের থেকেও প্রিয়, তোমাদের ভাইদের আনন্দের জন্য সে বিধবা হল। এখান থেকে তাঁর পিতৃস্নেহ যেমন দুর্যোধনের প্রতি তেমনি কন্যার প্রতিও লক্ষিত হয়েছে। তিনি অন্তিমে বলেন– "হা ধিক! জয়দ্রথো নিহত এব"

ধনঞ্জয়পরেনৈব জযদ্রথো নিপাতিতঃ।

ভবিষ্যতি ধ্রুবং যুদ্ধে সংশয়ো নাস্তি কশ্চন।।[১৯৭]

অর্থাৎ, ধনঞ্জয়ের দ্বারা যুদ্ধে জয়দ্রথ বধ হবে এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই। এখানেও পরিণাম সম্পর্কে তাঁর অবহিতের গুণ প্রকাশ পেয়েছে।

এই নাটকে ধৃতরাষ্ট্রের চরিত্রটি একটি ভিন্ন মাত্রা সংযোজন করে। কারণ পুত্র স্নেহে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র বহুল প্রচারিত হলেও এই নাটকে দুর্যোধনাদির অভুমন্যুবধকে তিনি সমর্থন করেন নি। সেখানে তাঁর নীতিবোধ তাঁকে প্রতিবাদি করে তোলে। তিনি একমাত্র কন্যা দুঃশলার পরিণতির কথা অনুমান করে যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন তাতে তাঁর দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। কন্যা দুঃশলার বৈধব্যের আশঙ্কায় সঙ্কিত ধৃতরাষ্ট্র যে হৃদয়বান পিতা তাও লক্ষ্য করা গিয়েছে।

শকুনি– গান্ধার রাজ সুবলের জ্যেষ্ঠ পুত্র হলেন শকুনি। পিতামহ ছিলেন নগ্নজিৎ। ভগ্নী গান্ধারীর মতে শকুনি অর্থশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন[১৯৮]। তাঁর গবাক্ষ, শরভ, বিভু, সুভগ, ভানুদত্ত, বৃষক এবং অচল নামে সাত ভাই ছিল। গান্ধারীর বিবাহের পর শকুনি দুর্যোধনের পরামর্শদাতা হয়েছিলেন। *জয়দ্রথবধ* নাটকে শকুনিকে তৃতীয়াঙ্কের প্রথমদৃশ্যে, তৃতীয়াঙ্কের দ্বিতীয়দৃশ্যে, চতুর্থাঙ্কের দ্বিতীয়দৃশ্যে, পঞ্চমাঙ্কের দ্বিতীয়দৃশ্যে দেখতে পাওয়া যায়। শকুনি এই নাটকে প্রতিনায়ক রূপে দেখা গিয়েছে। প্রতিনায়কের লক্ষণ করতে গিয়ে *দশরূপকে* বলা হয়েছে–"লুব্ধো ধীরোদাত্তঃ স্তব্ধঃ পাপকৃদ ব্যসনী রিপুঃ"[১৯৯]। *সাহিত্যদর্পণে* বলা হয়েছে–"ধীরোদাত্তঃ পাপকারী ব্যসনী প্রতিনায়কঃ"[২০০]। তৃতীয়াঙ্কের শুরুতে দুর্যোধন শকুনিকে পিতার তিরস্কারের কথা জানালে শকুনি বলেন জ্বরার এমন পরিণতি হয়–"জরায়া এবমেব পরিণতিঃ"[২০১]। এখান থেকে ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি তাঁর ক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি দুর্যোধনকে বলেছেন ইন্দ্র, বরুণ, চন্দ্র বা পবন মিলিত হলেও জয়দ্রথকে নিহত করার সামর্থ কারুর নেই।[২০২] এখান থেকে শকুনির অহঙ্কারের বহিঃপ্রকাশ হয়েছে। তিনি আরও বলেন, অভিমন্যুকে ব্যূহমধ্যে যেমন ভাবে আবদ্ধ করে নিহত করেছেন অর্জুনকেও সেভাবেই নিহত করবেন তিনি–

অভুমন্যুর্থথাবদ্ধো ব্যূহমধ্যে নিপাতিতঃ।

অর্জ্জুনোঽপি তথাদ্যৈব ভবিষ্যতি নিপাতিতঃ।।[২০৩]

এখান থেকে তাঁর অহঙ্কার পুনরায় প্রকাশিত হয়। শকুনি আশ্বাস দেন যে সৌবল পুত্র তাঁদের সাথে আছেন কৃষ্ণের বুদ্ধিকে পরাস্ত করার জন্য। তাই চিন্তার বহিঃপ্রকাশের প্রয়োজন নেই এতে মন্ত্রসিদ্ধি বিফল হতে

পারে। এখান থেকে তাঁর যুদ্ধনীতি সম্পর্কে বোধ প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয় দৃশ্যে জয়দ্রথকে অতি আত্মবিশ্বাসী দেখে সাবধান করে তিনি বলেন শিশু অভিমন্যু কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী নয় এখন তাঁর। অর্জুন শিবের থেকে অস্ত্র প্রাপ্ত হয়েছে, ইন্দ্রের থেকেও দৈব অস্ত্র মানুষাস্ত্রের দ্বারা সর্বপ্রকারে পরিশোভিত।[২০৪] ভীম তাঁর রক্ষক, অন্য পাণ্ডবরা ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবীরও রক্ষক। কংসের শত্রু কংসারি কূটবুদ্ধি বাসুদেব তাঁর মিত্র, সারথী, রক্ষক, বন্ধু ও বুদ্ধিদাতা।[২০৫] তাই সাবধানতা অবলম্বন করে হটকারী কাজ না করাই উচিত এখন তাঁর। এখান থেকে তাঁর অগ্র পশ্চাৎ ভেবে কাজ করার বুদ্ধি প্রকাশিত হয়েছে। চতুর্থাঙ্কে দ্রোণাচার্যকে তিনি বুদ্ধি দেন যে কার্যসিদ্ধি করতে হলে অর্জুনকে ব্যূহের সামনে থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে, না হলে ব্যূহপ্রবেশে তাঁকে বাধা দিতে কেউই সমর্থ হবে না। এখান থেকে তাঁর কূটবুদ্ধির বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। দ্রোণাচার্য যখন চিন্তিত হয়ে পরেন এই ভেবে যে ব্যূহের দ্বার রক্ষা করতে না পারলে পাণ্ডবেরা প্রবেশ করে ফেলবে। তখন শকুনি নিশ্চিন্ত হতে বলেন এই বলে যে অর্জুন ছাড়া পাণ্ডবের মধ্যে কেউই ব্যূহভেদ করতে জানে না তা পূর্বেই প্রমাণিত–

অর্জ্জুণেন বিনা তত্র পাণ্ডবেষু চ কশ্চন।
ব্যূহভেদং ন জানানি প্রমানিতং তু পূর্ব্বতঃ।।[২০৬]

এখান থেকে প্রতিপক্ষ সম্পর্কে সচেতনতার পরিচয় দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু অন্তিমে কৃষ্ণের ছলে পরাস্ত হয়ে জয়দ্রথকে রক্ষার চেষ্টা বিফল হয় তাঁর।

শকুনি চরিত্রটি এই নাটকে ভিন্ন রূপে উপস্থিত হয়েছে। কারণ এখানে শকুনি অনেকটাই আত্মশক্তিনির্ভর। শুধু এই নির্ভরতা কেবলমাত্র তাঁর অহঙ্কার বলা যায় না কারণ যুদ্ধনীতি সম্পর্কে যে বিচক্ষণতার পরিচয় তিনি দিয়েছেন এবং যুদ্ধের প্রয়োজনে অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করেই কাজ করতে হয় সেবিষয়ে তিনি জ্ঞানের পরিচয় রেখেছেন। আত্ম-নির্ভরশীল হয়েও যে কার দ্বারা কোন কাজ সমাধা হতে পারে তা তিনি বিচক্ষণতার সাথে দুর্যোধনকে জানাতে ভোলেন নি।

জয়দ্রথ–সিন্ধুরাজ বৃদ্ধক্ষত্রের পুত্র হলেন জয়দ্রথ। তিনি ধৃতরাষ্ট্রের একমাত্র কন্যা দুঃশলাকে বিবাহ করেন। দুঃশলার গর্ভজাত জয়দ্রথের পুত্রের নাম সুরথ। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ নিয়ে অর্জুন যখন সিন্ধুদেশে উপস্থিত হন, তখন অর্জুনের নাম শুনেই ভয়ে সুরথের মৃত্যু হয়।[২০৭] *জয়দ্রথবধ* নাটকে তৃতীয়াঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে জয়দ্রথকে দেখতে পাওয়া যায়। পঞ্চম অঙ্কে তাঁর উপস্থিতি থাকলেও কোন বক্তব্য পাওয়া যায় না। কৌরবরাজ দুর্যোধন যখন চিন্তিত হয়ে পরেন জয়দ্রথের রক্ষার জন্য, তখন জয়দ্রথ তাঁকে নিশ্চিন্ত করে বলেন যুদ্ধে নিজের বলের দ্বারাই তিনি পার্থকে জয় লাভ করবেন। অর্জুনের নিশ্চিত মৃত্যু হবে রক্ষা করতে কেউই সমর্থ হবে না। আরও বলেন–

কিং সিংহরাজং হরিণঃ কদাচিদ্
ভোক্তুং সমর্থো বহুচেষ্টয়াপি।

নভস্তলাত্ কিং গ্রহরাজ ভানু-

মধস্তলে কোঽপি চ পাতয়েয়ুঃ।।[২০৮]

অর্থাৎ, হরিণ কি সিংহরাজকে বহু চেষ্টার মাধ্যমে কখনও ভক্ষণ করতে পারে? আকাশ থেকে কি গ্রহরাজ ভানুকে কেউ নিচে নামিয়ে আনতে পারে। এখান থেকে তাঁর অহঙ্কার এবং অহঙ্কার থেকে বাস্তব জ্ঞানের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। পঞ্চম অঙ্কের শেষে যখন কৃষ্ণ সুদর্শন চক্রের দ্বারা সূর্যকে আচ্ছাদিত করেন তখন দুর্যোধনের সাথে জয়দ্রথের প্রবেশ দেখা যায় এবং অন্তিমে অর্জুনের বাণে নিহত হয়ে নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটে।

আলোচ্য নাটকে জয়দ্রথের উপস্থিতি সল্প পরিসরে। এই নাটকে *বৈয়াসিক-মহাভারতের* মূল যে জয়দ্রথ চরিত্র তার অনেকটাই ছায়া ফেলেছে। কারণ *বৈয়াসিক-মহাভারতে* জয়দ্রথকে হটকারী, অবিবেচক রুপেই দেখা গিয়েছে। এই নাটকে জয়দ্রথ চরিত্রে তাঁর অবিবেচনা প্রসূত ব্যবহার দৃষ্টিগোচর হয়। যেমন অহঙ্কার, হিংসা, ক্রোধ এগুলি জয়দ্রথের চরিত্রের বিশেষত্ব বলে মনে হয়।

যুধিষ্ঠির–পঞ্চ পাণ্ডবের মধ্যে জ্যেষ্ঠ হলেন যুধিষ্ঠির। কিন্দমমুনির অভিশাপে বংশলোপের আশঙ্কায় রাজা পাণ্ডুর অনুরোধে ধর্মের আহ্বানে কুন্তী যুধিষ্ঠিরের জন্ম দেন। জন্মের সময় দৈববাণী হয়েছিল এইপুত্র ধার্মিকশ্রেষ্ঠ, বীর, সত্যবাদী, নরোত্তম এবং পৃথিবীর অধিপতি হবেন[২০৯]। ধর্মের অংশে আবির্ভাব হয়েছিল বলে যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম, ধর্মরাজ ও ধর্মপুত্র বলা হয়ে থাকে। *জয়দ্রথবধ* নাটকে যুধিষ্ঠিরকে দ্বিতীয়াঙ্কের দ্বিতীয়দৃশ্যে, চতুর্থাঙ্কের প্রথমদৃশ্যে, পঞ্চমাঙ্কের প্রথমদৃশ্যে, পঞ্চমাঙ্কের দ্বিতীয়দৃশ্যে দেখতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণের উপস্থিতিতে যুধিষ্ঠির অত্যন্ত শোকা গ্রস্ত হয়ে পরেন। তিনি ভাবেন অভিমন্যুর বধে তিনি দায়ী। এখান থেকে তাঁর দায়িত্ববোধরূপ গুণের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণের অনুরোধে তিনি ধৈর্যচ্যুত না হবার কথা বলেন, ধৈর্য ধরে রাখাই কাজ এখন সবার। কৃষ্ণ সেইসময় ধনঞ্জয়ের প্রতিজ্ঞার কথা জানালে তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে বলেন সকলে জয়দ্রথকে সমস্ত বলের দ্বারা ঘিরে রক্ষা করবে যেখানে সূচেরও প্রবেশ সম্ভব নয়–

বেষ্টযিত্বা বলৈঃ সর্ব্বৈ রক্ষিষ্যন্তি জয়দ্রথং।

ছুরিকায়াঃ প্রবেশ্যস্য সম্ভবো ন ভবেদ্ যথা।।[২১০]

এখান থেকে তাঁর ভ্রাতৃস্নেহ প্রকাশিত হয় এবং প্রতিপক্ষকে অবজ্ঞা না করার যে যুদ্ধনীতি সেই নীতিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। কৃষ্ণকে নির্দেশ দানের জন্য অনুরোধ করেন সাথে বলেন তিনি যা চাইবেন সেভাবেই সব পালন করা হবে। এখানে কৃষ্ণের প্রতি তাঁর ভক্তি প্রকাশিত হয়। চতুর্থাঙ্কে দেখা যায় যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের কাছে জানতে চাইছেন ভীমসেন ঘটোত্কচবধে ভীষণ ব্যথিত কিন্তু তাঁর মধ্যে কেন দুঃখ প্রকাশ হচ্ছে না। কৃষ্ণের উত্তরে যুধিষ্ঠিরের মনে পরে কর্ণের মহাবলশালী অমোঘ অস্ত্রের কথা[২১১]। ঘটোত্কচের বলের জন্য কৌরবরা স্থির ছিল না তাই ঐ অস্ত্রের প্রয়োগ কর্ণকে দিয়ে করিয়েছিল। এখান থেকে তাঁর বিশ্লেষণী ক্ষমতা ফুটে ওঠে।

ব্যূহমধ্যে অভিমন্যু যেভাবে হত্যা হয়েছে সেই আশঙ্কায় অর্জুনেরও ব্যূহমধ্যে একই অবস্থা না হয় সেই দিকে সতর্ক করে যুধিষ্ঠির তাঁর বিশ্লেষণী ক্ষমতা প্রকাশ করেছেন। পঞ্চম অঙ্কে ভীম জানায় সংশপ্তকদের বিনাশ করে অর্জুন ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করেছেন, সে কথা শোনা মাত্রই তাঁকে সাহায্যের জন্য তাঁরা গমন করেন সেখানে। এখান থেকে তাঁর ভ্রাতৃস্নেহ প্রকাশিত হয়। অন্তিমে যুধিষ্ঠিরকে ভরতবাক্য পাঠ করতে দেখা যায়–

সত্যোধর্ম্মঃ প্রচলতু সদা সর্ব্ববিশ্বে সমন্তাত্
হিংসাদ্বেষ সকলভূবনাত্ দূরমেব প্রযাতু।
শুদ্ধজ্ঞানাদ্ নিখিলমনুজাঃ শান্তিপূর্ণা ভবন্তু
দৈবীবাণী নিয়তমিহসা দিব্যভাসা বিভাতু।।[২১২]

অর্থাৎ, সত্যধর্ম্ম প্রচলিত হোক সবসময় সর্ববিশ্বে, হিংসা দ্বেষ দূরীভূত হোক সমস্ত পৃথিবী থেকে। শুদ্ধজ্ঞানের জন্য সমস্ত মানুষ শান্তিপূর্ণ হোক, দৈবীবাণী নিয়ত বজায় থাকুক, সংস্কৃত শোভিত হোক। যুধিষ্ঠিরের এই শুভ কামনার দ্বারা নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটে। ভরতবাক্যের দ্বারা যুধিষ্ঠিরের সার্বিক মঙ্গল করার চিন্তা প্রকাশ পায় এখানে।

যুধিষ্ঠির এই নাটকে হৃদয়বান অভিবাবক হিসাবে চিত্রিত হয়েছেন। অভিমন্যুর হত্যার জন্য অভিবাবক রূপে তাঁর দায়িত্ব অস্বীকার করেন নি। তাঁরই ব্যর্থতায় অর্জুনকে পুত্রহারা হতে হয়েছে এরজন্য তিনি যেকেবল দুঃখিত তা নয় মানসিকভাবে পীড়িত। পুত্রশোকে ব্যাকুল অর্জুন যে কঠিন প্রতিজ্ঞা করে বসেছেন তাতে তিনি আরও বিহ্বল হয়ে পড়েছেন। অর্জুনের এই শপথ রক্ষার জন্য কি কি করা উচিত তা নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ এবং ভীম প্রভৃতির সঙ্গে আলোচনা করে তিনি তাঁর বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। যুধিষ্ঠিরের মতো ধীর স্থির ব্যক্তিকেও অর্জুনের জন্য চঞ্চল হতে দেখা গেছে এই নাটকে। এখান থেকে তাঁর রক্তমাংসের মনুষ্যত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্মে স্থির যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন কারণ শ্রীকৃষ্ণের ব্যাখ্যায় জগতের মঙ্গল প্রয়োজন ছিল এবং এই জগতের মঙ্গল যে তাঁর কাছে অনেক বেশী আকাঙ্ক্ষিত ছিল তা তাঁর ভরতবাক্যে লক্ষ্য করা যায়।

দুর্যোধন– ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর শতপুত্র ও এক কন্যার মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র হলেন দুর্যোধন[২১৩]। কলির অংশে তাঁর জন্ম। জন্মকালে উপস্থিত ব্রাহ্মণগণ ও বিদুর বলেছিলেন এই পুত্র সম্পূর্ণ কুলনাশক, একে ত্যাগ না করলে মহা অনর্থ হবে। কিন্তু পুত্র স্নেহে ধৃতরাষ্ট্র তা করেন নি। দুর্যোধনকে জয়দ্রথবধ নাটকে দ্বিতীয়াঙ্কের প্রথমদৃশ্যে, তৃতীয়াঙ্কের প্রথমদৃশ্যে, তৃতীয়াঙ্কের দ্বিতীয়দৃশ্যে, চতুর্থাঙ্কের দ্বিতীয়দৃশ্যে, পঞ্চমাঙ্কের দ্বিতীয়দৃশ্যে দেখতে পাওয়া যায়। অভিমন্যু বধের পর দুর্যোধন পিতা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে যান অভিবাদন করতে। পিতাকে বলেন শিশু অভিমন্যুকে বধ করে এসেছেন তিনি। তা দেখে অর্জুন প্রতিজ্ঞা করেছেন সূর্যাস্তের মধ্যে জয়দ্রথকে বধ করবেন না হলে স্বয়ং আত্মহনন করবেন। তাই আশীর্বাদের উদ্দেশ্যে এসেছেন তিনি। এখান থেকে পিতার প্রতি তাঁর আনুগত্য প্রকাশ পায়। পরে দুর্যোধনকে চিন্তান্বিত দেখতে পাওয়া যায় জয়দ্রথের রক্ষার জন্য।

শকুনিকে বলেন পিতাও চিন্তান্বিত, প্রিয় কন্যা তাঁর প্রাণসম, সেইজন্য সবরকম প্রযত্নের দ্বারা রক্ষা করতে হবে জয়দ্রথকে–

তাতোঽপি চিন্তান্বিতা এব তুভ্যং
কন্যা প্রিয়া প্রাণসমা তথাস্য।
তস্মাচ্চ তে রক্ষণমেব কার্য্যং
সর্ব্বপ্রযত্নাৎ সততং ধরণ্যাম্।।[২১৪]

এখান থেকে তাঁর যুদ্ধনীতি সম্পর্কে সচেতনতা, শকুনির উপর নির্ভরতা, গুরুর প্রতি আনুগত্য এবং ভগ্নীর প্রতি স্নেহশীলতা এবং পিতার প্রতি দায়িত্ববোধ প্রকাশ পায়। যুদ্ধ শুরুর আগেই শকুনির উল্লাস দেখে তাঁকে ফললাভের পূর্বে উল্লাস কখনও করা উচিত নয় তা জানান, বিফল হলে সবাই পরিহাস করবে।[২১৫] ফললাভের জন্য সর্বশক্তি দিয়ে যত্নের সাথে চেষ্টা করতে হবে তাও জানান। এখান থেকে দুর্যোধনের বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টির প্রকাশ ঘটে। অন্তিমে কৃষ্ণের ছলে পরাস্ত হয়ে জয়দ্রথকে রক্ষার চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

এই নাটকে দুর্যোধনকে কিছুটা অবিবেচকের ভূমিকাতে অবতীর্ণ হতে দেখা যায়। শকুনির পরামর্শে কেবলমাত্র অন্ধভাবে নির্ভরশীল হয়ে অভিমন্যু হত্যা এবং জয়দ্রথকে রক্ষা করার অবস্থায় সম্মতি জানিয়েছেন তিনি। নেতা হিসাবে তাঁর ভূমিকা স্পষ্ট নয়। তিনি পরনির্ভরশীল তা এই চরিত্রে পরিস্ফুট হয়েছে।

দ্রোণাচার্য–*বৈয়াসিক-মহাভারতে* বর্ণিত অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব হলেন দ্রোণাচার্য। তিনি পাণ্ডব ও কৌরবদের অস্ত্রগুরু ছিলেন। মহর্ষি ভরদ্বাজের পুত্র এবং ঋষি অঙ্গিরসের বংশজ।[২১৬] তিনি যুদ্ধে কলাকৌশল, ব্যূহ রচনা, দিব্যাস্ত্র-প্রয়োগে প্রভৃতিতে খুবই দক্ষ ছিলেন।[২১৭] *জয়দ্রথবধ* নাটকে দ্রোণাচার্যকে চতুর্থাঙ্কের দ্বিতীয়দৃশ্যে দেখতে পাওয়া যায়। ব্যূহ রক্ষার জন্য দুর্যোধন ও শকুনিকে উপদেশ দিতে দেখা যায় তাঁকে। শকুনি যখন বলেন অর্জুন ছাড়া পাণ্ডবের কেউই ব্যূহভেদ করতে জানেন না তখন দ্রোণাচার্য বলেন জয়দ্রথবধে পাণ্ডবেরা অসমর্থ হলে কৌরব প্রধানের বধের জন্য চেষ্টা করবেন। অতএব দুর্যোধনের কেশাগ্র যেন কেউ স্পর্শ করতে না পারে ভবিষ্যতে সেরকম যত্নকরে প্রচেষ্টা করা উচিত–

দুর্য্যোধনস্য কেশগ্রং স্রষ্টুং কশ্চিদ্ ন সক্ষমঃ।
ভবিষ্যতি তথা কুর্য্যুঃ সর্ব্ব এব প্রযত্নতঃ।।[২১৮]

আরও বলেন, কৌরবাদি রক্ষিত হলে সকলেই রক্ষিত হবে। শীর্ষ ছেদ যদি করা হয় তাহলে বৃক্ষকে কেউ রক্ষা করতে পারে না–

রক্ষিতে কৌরবাধীশে সর্ব্বে চ রক্ষিতাঃ খলু।
শীর্ষচ্ছেদে তু বৃক্ষস্য রক্ষণং ভবিতা কথম্।।[২১৯]

এখান থেকে রাজার প্রতি আনুগত্য ও যুদ্ধনীতিবোধ ও বিচক্ষণতা লক্ষ্য করা যায় তাঁর চরিত্রের মধ্য দিয়ে।

এই নাটকে দ্রোণাচার্য সেনাপতি হিসাবে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। কারণ জয়দ্রথকে রক্ষা করার জন্য যেভাবে ব্যূহ রচনা করা হয়েছে এবং জয়দ্রথকে সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা করেছেন তা তাঁর দক্ষতারই পরিচয় দেয়। শুধু তাই নয় তাঁর দলের নেতা দুর্যোধনকে যাতে পাণ্ডবেরা ক্ষতিগ্রস্ত করতে না পারে তার জন্য তিনি সচেতন ছিলেন। এর মাধ্যমে সুবিবেচক, অভিজ্ঞতা সম্পন্ন দক্ষ সেনাপতি রূপে দ্রোণাচার্য চরিত্রটি চিত্রিত হয়েছে।

ভীম – বায়ুর ঔরসে কুন্তীর গর্ভে পাণ্ডুর ক্ষেত্রজপুত্র হল ভীম[২২০]। জন্মের পরেই ভীম মায়ের কোল থেকে শিলার উপর পরে গেলে শিলাটি বিচূর্ণ হয়ে। শিশুর এমন অপরিমেয় শক্তি ও বিরাট আকৃতির জন্য নাম রাখা হয় ভীম। হনূমান ভীমের বৈমাত্রেয় ভাই। অতিরিক্ত ভোজন পটু হবার জন্য তাঁর অন্য নাম বৃকোদর ছিল[২২১]। পঞ্চমাঙ্কের প্রথম দৃশ্যে তাকে দেখতে পাওয়া যায়। যুধিষ্ঠির অর্জুনের সংবাদ না পেয়ে ব্যাকুল হলে ভীম সংবাদ নিয়ে আসেন তাঁর কাছে এবং পরে যুধিষ্ঠিরের সাথে অর্জুনের সহায়তার জন্য যেতে দেখা যায়। এখান থেকে ভ্রাতৃস্নেহ ও জ্যেষ্ঠভ্রাতার প্রতি আনুগত্য প্রকাশিত করে।

ভীম চরিত্রটিতে একাধারে জ্যেষ্ঠের প্রতি আনুগত্য, কনিষ্ঠের প্রতি স্নেহ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ভীম এই নাটকে অত্যন্ত সল্প সময়ের জন্য উপস্থিত হয়েছেন তার মধ্যেও তাঁর এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যেমন দেখা গিয়েছে তেমনি যুদ্ধ ক্ষেত্রে থেকে যুদ্ধে সয়াহতা করার ব্যাকুলতা লক্ষ্য করা গিয়েছে।

আলোচ্য নাটকে এই চরিত্রগুলি নিজ নিজ দায়িত্ব যেভাবে পালন করেছে তাতে নাটকটি একটি স্বার্থক রূপে পরিগণিত হয়েছে কারণ যুধিষ্ঠির ভীম প্রভৃতির ঐ স্নেহ প্রবণতা যেমন অর্জুনকে অন্য মাত্রায় উপস্থিত করে সেই সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সুবিবেচক বন্ধু বাৎসল্য এই নাটকটিকে অন্য মাত্রা এনে দেয়। শকুনির সুবিবেচিত কৌশল এবং শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধিপ্রসূত সহায়তা নাটকটিকে চিত্তাকর্ষক করে তুলেছে। প্রত্যেকটি চরিত্র অত্যন্ত প্রয়োজনীয় রূপে নাটকে অবতীর্ণ হয়েছে। কোন একটি চরিত্রকেও অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয় না। নান্দী শ্লোক থেকে ভরতবাক্য পর্যন্ত ব্যক্ত এই নাটকের লক্ষ্য জগতের মঙ্গলসাধন, সেই পথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে প্রত্যেকটি চরিত্র নাটকটিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে।

৪.৪ আলঙ্কারিক বিচার

কাব্যের স্বরূপ বিচারে বিশ্বনাথ তাঁর *সাহিত্যদর্পণে*– "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্"[২২২] বলেছেন। এই রস বিচার করতে গিয়ে আলঙ্কারিকগণ অলঙ্কারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। অলঙ্কার ছাড়া কাব্যের রস নির্মাণ প্রায় অসম্ভব বলেই মনে হয়। তাই কবিগণ তাঁদের কাব্যরচনায় অলঙ্কারকে উচ্চাসনে স্থাপন করেছেন। অলঙ্কারের বৈচিত্র কেবল রস নির্মাণে নয়, কবির পটুত্ব নির্মাণে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। এখানে আলোচ্য তিনটি নাটকেই কবি নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় অলঙ্কারের ব্যবহার করেছেন এবং অলঙ্কারের বিভিন্নতার মাধ্যমে কাব্যের সুষমাকে প্রস্ফুটিত করেছেন।

কবি এবং পাঠক উভয়ের সহিতত্ব রস স্থাপন ছাড়া সম্ভব নয়। কাব্যেরসের প্রয়োগ এবং তা সম্মকরূপে অনুভূত হলেই সাহিত্যরূপে পরিগণিত হতে পারে। আলোচ্য তিনটি নাটকেই কবি যথাযথ ভাবে রসের প্রয়োগ স্থাপন করেছেন এবং তা অতিসহজেই অনুভব করা যায়। রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন– "ভারতবর্ষে বেদমন্ত্রে ছন্দ প্রথম দেখা দিল, মন্ত্রে প্রবেশ করল প্রাণের বেগ, সে প্রবাহিত হতে পারল নিশ্বাসে প্রশ্বাসে, আবর্তিত হতে থাকল মননধারায়। মন্ত্রের ক্রিয়া কেবল জ্ঞানে নয়, তা প্রাণে মনে; স্মৃতির মধ্যে তা চিরকাল স্পন্দিত হয়ে বিরাজ করে। ছন্দের এই গুণ।"[২২৩] তিনি আরও বলেছেন "যে ছন্দ দিয়ে এই ছবি আঁকা এ শুধু ভাষার ছন্দ নয়, এ ভাবের ছন্দ। এতে ভাবের গুটিকয়েক উপকরণ উপমার গুচ্ছে সাজানো, তাই দিয়েই ওর জাদু। ওর নিত্যসচল কটাক্ষে অনেক না-বলা কথার ইশারা রয়ে গেল।"[২২৪] অর্থাৎ, সাহিত্যে ছন্দের এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। কাব্যের শ্রুতি মাধুর্য সৃষ্টি করে এই ছন্দ। এই ছন্দের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের মতে প্রাণস্পন্দন তৈরি হয়। এই প্রাণস্পন্দন তৈরি হয় কথাকে ছন্দে বাঁধা হলে। তিনি বলেছেন ছন্দ হছে সেই তার বাঁধা সেতার, কথার অন্তরের সুরকে সে ছাড়া দিতে পারে। ধনুকের সে ছিলা, কথাকে সে তীরের মতো লক্ষ্যের মর্মের মধ্যে প্রবেশ করে[২২৫]। সংস্কৃত সাহিত্যের এই ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে বৈচিত্রের স্রোতোবেগে। নানা ছন্দ সৃষ্টি হয়েছে কবির ব্যবহারে। কবি নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁর কাব্যে নানা ছন্দের ব্যবহার করেছেন। যদিও আলোচ্য তিনটি নাটকে অনুষ্টুভ্ ছন্দের ব্যবহারের আধিক্য লক্ষ্য করা গেছে কিন্তু যেখানে ভাবের বিশেষ ব্যঞ্জনার প্রয়োজন হয়েছে সেখানে অন্য ছন্দের ব্যবহার করতে কার্পণ্য করেন নি। তিনি নাটকের ভাষাকে সহজে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে বেশী অভিনিবেশ করেছেন বলেই হয়ত সহজসুখবোধ্য অনুষ্টুভ্ ছন্দের আধিক্য দেখা গিয়েছে। আলঙ্কারিকগণ কাব্যের বিচারে গুণরীতির ব্যবহারের গুরুত্বকে ব্যাখ্যা করেছেন। আলোচ্য তিনটি নাটকেই গুণ-রীতির ব্যবহার যথাযথ হয়েছে।

❖ ৪.৪.০ অলঙ্কার বিচার

ব্যাপক অর্থে সৌন্দর্য মাত্রই অলঙ্কার পদবাচ্য। সমাজে প্রচলিত বর্ণনাভঙ্গী যা কবির করা বর্ণনাকে সাধারণ বর্ণনা থেকে পৃথক করে, তাকে অলঙ্কার বলা হয়। অলঙ্কার শব্দের দ্বারা কাব্যের সারভূত সৌন্দর্যবর্দ্ধক যে

উপাদান তাকে বোঝান হয়। 'অলম্' শব্দের অর্থ ভূষণ। কাব্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য যার মাধ্যমে কাব্যভাষাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা হয় তাকে অলঙ্কার বলা হয়। আচার্য বামন তাঁর *কাব্যালঙ্কার-সূত্রবৃত্তি* গ্রন্থে বলেছেন কাব্য সকলের কাছে উপাদেয়, কারণ তাতে অলঙ্কার আছে–'কাব্যং গ্রাহ্যমলঙ্কারাৎ'[২২৬]। আচার্য দণ্ডীর মতে যেসব ধর্ম কাব্যের শোভা জন্মায় সেগুলিকে অলঙ্কার বলা হয়ে থাকে–'কাব্যশোভাকরান্ ধর্মানলঙ্কারান্ প্রচক্ষতে'[২২৭]। আলঙ্কারিক আচার্য বামন অলঙ্কার শব্দের দুইপ্রকার ব্যুৎপত্তি করেছেন 'অলংকৃতিরলংকারঃ' অর্থাৎ অলংকরণই অলঙ্কার এবং 'অলংক্রিয়তে অনেন ইতি অলঙ্কার' অর্থাৎ যার দ্বারা কাব্য অলংকৃত হয়। প্রথমটি সামান্য অর্থে ব্যবহার হয় এবং দ্বিতীয়তি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। শব্দের উপর কাব্যের অলঙ্কার নির্ভর করে। শব্দের দুটি দিক রয়েছে। শব্দের উচ্চারণ বা ধ্বনিগত দিক এবং শব্দের অর্থগত দিক। যার অর্থ আভ্যন্তরীণ। ধ্বনিগত দিক হল বাহ্যিক। শব্দের এই বৈশিষ্টের প্রেক্ষিতে ভামহ প্রভৃতি প্রাচীন আলঙ্কারিক শব্দ ও অর্থ ভেদে অলঙ্কারকে দুভাগে ভাগ করেছেন। পরবর্তীকালে শব্দ, অর্থ, শব্দ-অর্থ এবং রসগতভাবে অলঙ্কারকে চার ভাগে স্বীকার করা হয়েছে। শব্দালংকারের মধ্যে অনুপ্রাস, যমক প্রধান। কিন্তু অর্থালংকারের সংখ্যা অনেক। যেমন সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকার উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, অতিশয়োক্তি প্রভৃতি, ন্যায়মূলক অর্থালংকার হল অর্থাপত্তি, কাব্যলিঙ্গ, অনুমান প্রভৃতি, গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক অর্থালংকার হল ব্যাজস্তুতি, স্বভাবোক্তি, অর্থান্তরন্যাস প্রভৃতি।
আলোচ্য নাটকে উপমা অলঙ্কারের প্রয়োগ সর্বাধিক। তাছাড়া স্বভাবোক্তি, কারণমালা, ব্যাজস্তুতি, দীপক প্রভৃতি অলঙ্কারের প্রয়োগ করেছেন কবি। নিম্নে তা আলোচিত হল–

উপমা অলঙ্কারের প্রয়োগ–

অভিমন্যুর্যথাবদ্ধো ব্যূহমধ্যে নিপাতিতঃ।
অর্জুনোঽপি তথাদ্যৈব ভবিষ্যতি নিপাতিতঃ।।[২২৮]

অর্থাৎ, অভিমন্যুকে ব্যূহমধ্যে আবদ্ধ করে যেরকম নিহত করেছি অর্জুনকেও সেভাবেই নিহত করব। উপমা অলঙ্কারের সাধারণ লক্ষণে বলা হয়েছে–'সাম্যং বাচ্যমবৈধর্ম্যং বাক্যৈক্য উপমা দ্বয়োঃ'[২২৯]। *সাহিত্যদর্পণ*কার বিশ্বনাথের এই লক্ষণকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, একটিমাত্র বাক্যে দুইটি পদার্থের অর্থাৎ উপমান ও উপমেয় বৈধর্ম্যরহিত তুলনাবাচক শব্দের মাধ্যমে সাম্য বোঝালে উপমা হয়।

জয়দ্রথবধ নাটকের তৃতীয়াঙ্কের প্রথম দৃশ্যে উক্ত শ্লোকে দেখা যাচ্ছে যে অভিমন্যুর হত্যার সঙ্গে পাণ্ডুতনয়গণের মৃত্যুর সাদৃশ্য কল্পনা করা হয়েছে। যেভাবে অভিমন্যুর হত্যা হয়েছে সেই হনন প্রক্রিয়ার সঙ্গে পাণ্ডুনন্দনদের হত্যার পরিকল্পনার মাধ্যমে একটি সাম্য দেখা যাচ্ছে। এখানে উপমান অভিমন্যুর হত্যা আর পাণ্ডুতনয়দের হত্যা উপমেয়। সাধারণধর্ম হল হননপ্রক্রিয়া এবং সাদৃশ্যবাচক শব্দ হল 'যথা' 'তথা'। কিন্তু উপমেয় প্রত্যক্ষভাবে উল্লিখিত না থাকায় এটিকে পূর্ণোপমা বলা যায় না। কারণ পূর্ণোপমার লক্ষণে বলা হয়েছে–

সা পূর্ণা যদি সামান্যধর্ম ঔপম্যবাচি চ।
উপমেয়ঞ্চোপমানং ভবেদ্বাচ্যম্।।[২৩০]

সেই কারণে এটি পূর্ণোপমা না হয়ে লুপ্তোপমা হবে। যদি উপমার চারটি অঙ্গ পূর্ণভাবে বিদ্যমান না থাকে, যে কোন একটির বা দুটির বা তিনটির অঙ্গ লুপ্ত থাকে তাহলে তা লুপ্তোপমা হয়। *সাহিত্যদর্পণ*কার বলেছেন–

লুপ্তা সামান্যধর্মাদেরেকস্য যদি বা দ্বয়োঃ

ত্রয়াণাং বানুপাদানে শ্রৌত্যার্থী সাপি পূর্ববত্।।[২৩১]

বিশ্বনাথ-কবিরাজ একুশ প্রকার লুপ্তোপমার উল্লেখ করেছেন। অতএব উল্লিখিত শ্লোকে লুপ্তোপমা হয়েছে বলা যায়।

আলোচ্য নাটকে অভিমন্যুর সাথে অর্জুনের উপমার মাধ্যমে একদিকে যেমন শকুনির অহংকার প্রকাশ পেয়েছে তেমনই নায়ক অর্জুনের গুরুত্বকে পরোক্ষভাবে বোঝানো হয়েছে। কারণ অর্জুন সম্পর্কে শকুনি, দুর্যোধন প্রভৃতির যে ভীতি আছে তা এই বৈধর্মের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। এই অলঙ্কারের দ্বারা এই নাটকে বীর রস প্রকাশ পেয়েছে।

স্বভাবোক্তি অলঙ্কারের প্রয়োগ–

সাহিত্যদর্পণে স্বভাবোক্তি অলঙ্কারের লক্ষণ বিষয়ে বলা হয়েছে–'স্বভাবোক্তি দুরূহার্থস্বক্রিয়ারূপবর্ণনম্'[২৩২]। এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে "দুরূহযোঃ কবিমাত্রবেদ্যযোঃ, অর্থস্য ডিম্বাদেঃ, স্বয়োস্তদেকাশ্রযযোশ্চেষ্টাস্বরূপযোঃ।"[২৩৩] পদার্থের যথাযথ সূক্ষ্ম ও হৃদয়গ্রাহী বর্ণনাই স্বভাবোক্তি অলঙ্কার। অর্থাৎ বস্তুস্বভাবের সেই বর্ণনাই স্বভাবোক্তি অলঙ্কার সৃষ্টি করে যে বস্তুস্বভাবে স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন সাধারণ ব্যক্তির দুরধিগম্য কিন্তু রসিকজনের জ্ঞেয়। আলোচ্য নাটকে দেখা যায়–

নেত্রবারিপ্রপাতেন মৃতাত্মা ক্লিশ্যতে ভৃশম্।

শত্রুশোণিতপাতেন মৃতাত্মা তৃপ্যতে পরম্।।[২৩৪]

অর্থাৎ, চোখের জল মৃত আত্মাকে কষ্ট দেয়, শত্রুর রক্তপাতে মৃতাত্মা তৃপ্তি পায়। উক্ত শ্লোকে প্রিয়জনের নয়নবারি মৃতাত্মার কষ্টের কারণ আর শত্রুর রক্তপাত তৃপ্তির কারণ। এইভাবে সাধারণ বর্ণনার মাধ্যমে কবি অভীষ্টপূর্তিরূপ সুখ অভীষ্টের অপূর্তিজনিত দুঃখের উল্লেখ করেছেন। যদিও মৃত আত্মার সুখ বা দুঃখ কোনটাই হয় না কিন্তু কবির কল্পনায় জগতের মঙ্গল সূচিত হয়েছে। ইষ্টজনের বিচ্ছেদে অমঙ্গল এবং শত্রু জনের নিপাতে মঙ্গলের বার্তাই এই শ্লোকে অভিব্যক্ত হওয়ায় এখানে স্বভাবোক্তি অলঙ্কার হয়েছে বলা যায়।

আলোচ্য শ্লোকটিতে স্বভাবোক্তি অলঙ্কারের দ্বারা একই সঙ্গে করুণ রস এবং বীর রস প্রস্ফুটিত হয়েছে। অঙ্গী-রস এবং অঙ্গ-রস বর্ধনে এই অলঙ্কারের ব্যবহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

কারণমালা অলঙ্কারের প্রয়োগ–

*সাহিত্যদর্পণ*কার বিশ্বনাথ-কবিরাজ কারণমালা অলঙ্কারের লক্ষণ করতে গিয়ে বলেছেন

পরং পরং প্রতি পূর্বপূর্বস্য হেতুতা।

তদা কারণমালা স্যাত্।।[২৩৫]

অর্থাৎ পূর্ব-পূর্ব পদার্থ যদি পর পরবর্তী পদার্থের কারণ হয় তাহলে কারণমালা অলঙ্কার হয়।

মৃত্যুশ্চ মুল্যং ব্যরচ স্তমেব

বংশস্য নাশস্য চ হেতুরেকঃ।

বালং নিহত্যাপি বিলজ্জ এব

জয়ীতি মত্বেহ সমাগতোঽসি।।[২৩৬]

অর্থাৎ, মৃত্যুর মূল রচনা করে তুমি বংশ নাশের হেতু। বালককে হত্যা করে নির্লজ্জ জয় করেছি এই মনে করে এখানে এসেছো। *জয়দ্রথবধ* নাটকের উক্ত শ্লোকে মৃত্যুর মূল কারণ তুমি (দুর্যোধন) মৃত্যুর দ্বারা বংশের নাশ, বংশনাশের হেতু লজ্জা এবং বালকের হত্যাও লজ্জার কারণ। এইভাবে মৃত্যুর কারণ হিসাবে দুর্যোধন দুর্যোধনাদির মৃত্যু রূপ কার্যে বংশনাশের কারণ হিসাবে এবং বংশনাশের কার্যকে লজ্জার কারণ রূপে এবং শিশু হত্যার কারণে লজ্জার উল্লেখ করে কারণমালা অলঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে ।

আলোচ্য শ্লোকে কারণমালা ব্যবহারের মাধ্যমে নাট্যকার একটি হত্যার দ্বারা কৌরববংশের ন্যাস, বংশনাশ হেতু লজ্জা, বালকের হত্যা রূপ লজ্জা সংঘটিত করেছেন। এই কথা ব্যক্ত করে ধৃতরাষ্ট্রের নীতিবোধ ও দূরদৃষ্টির পরিচয় প্রকাশ করেছেন এখানে, যার দ্বারা ধৃতরাষ্ট্র চরিত্রটি অন্য মাত্রা লাভ করেছে।

ব্যাজস্তুতি অলঙ্কারের প্রয়োগ–

যুদ্ধেয়ুঃ পাণ্ডবা যুদ্ধে সর্ব্বাপায়েন যত্নতঃ।

কুটবুদ্ধিস্তথা চাস্তে কংসারির্যদুনন্দনঃ।।[২৩৭]

অর্থাৎ, যুদ্ধে পাণ্ডবরা সমস্ত উপায়ে যত্ন সহকারে যুদ্ধ করবে এবং কূটবুদ্ধি সম্পন্ন কংসারি যদুনন্দনও সেখানে আছে। *জয়দ্রথবধ* নাটকের উক্ত শ্লোকে যদুনন্দনকে কুটবুদ্ধি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে ‘কুটবুদ্ধি’ যদুনন্দনের নিন্দা করা হয়েছে আবার ‘কংসারিঃ’ বিশেষণের দ্বারা কৃষ্ণের বীরত্বকে বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ প্রশংসা করা হয়েছে। যদিও ‘কূট’ শব্দকে সাধারণভাবে সূক্ষ্ম বা দুষ্ট অর্থে ব্যবহার করা হয় তবুও এই শব্দের দ্বারা নিন্দা বা স্তুতি দুটিই হতে পারে কিন্তু এখানে বক্তার ধ্বনিতে নিন্দাই প্রকাশিত হয়েছে। 'অরি' শব্দের অর্থ শত্রু। কিন্তু এখানে কংস নামক বীরের শত্রু এই ধ্বনিতে কৃষ্ণের শক্তি ও বীরত্ব ধ্বনিত হয়েছে। *সাহিত্যদর্পণে* ব্যাজস্তুতি অলঙ্কারের লক্ষণ করতে গিয়ে বিশ্বনাথ-কবিরাজ বলেছেন–

উক্তা ব্যাজস্তুতিঃ পুনঃ।

নিন্দাস্তুতিভ্যাং বাচ্যাভ্যাং গম্যত্বে স্তুতিনিন্দয়োঃ।[২৩৮]

বৃত্তিতে বলা হয়েছে– 'নিন্দয়া স্তুতের্গম্যত্বে ব্যাজেন স্তুতিরিতি ব্যুৎপত্ত্যা ব্যাজস্তুতিঃ। স্তুত্যা বা নিন্দায়া গম্যতে ব্যাজরূপা স্তুতিঃ।'[২৩৯] অর্থাৎ নিন্দা বা প্রশংসার দ্বারা ব্যঞ্জনায় যথাক্রমে স্তুতি বা নিন্দা বোঝানো হলে ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার হয়। আলোচ্য শ্লোকে সেই রূপ দেখা যায় বলে ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার হয়েছে বলা যায়।

ব্যাজস্তুতি অলঙ্কারের দ্বারা প্রতিপক্ষ কৃষ্ণকে দুর্যোধন যেভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন তাতে এই নাটকের গতি ফলাভিমুখী হয়েছে।

দীপক অলঙ্কারের প্রয়োগ–

দীপক অলঙ্কারের লক্ষণ প্রসঙ্গে বিশ্বনাথ বলেছেন–

অপ্রস্তুতপ্রস্তুতয়োর্দীপকন্তু নিগদ্যতে।
অথ কারকমেকং স্যাদনেকাসু ক্রিয়াসু চেৎ।[২৪০]

দীপক অলঙ্কারের সংজ্ঞায় দুটি লক্ষণ উল্লেখিত হয়েছে। বর্ণনীয় ও বর্ণনীয় নয় এমন পদার্থসমূহের এক ধর্মের সাথে সম্বন্ধ হলে দীপক অলঙ্কার হয় এবং অনেক ক্রিয়ার সাথে একটি কারকের সম্বন্ধ হলে দীপক অলঙ্কার হয়। প্রথম লক্ষণ অনুসারে অপ্রস্তুত ও প্রস্তুত গুণ ক্রিয়াদিরূপ কোন একটি ধর্মের দ্বারা সম্বন্ধ হলে দীপক অলঙ্কার হয়ে থাকে। অর্থাৎ প্রস্তুত ও অপ্রস্তুত উভয়কেই কোন এক ধর্মের বন্ধনে বাঁধলয়েই দীপক অলঙ্কার হয়ে থাকে। জয়দ্রথবধ নাটকের তৃতীয়াঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা যায়–

কিং সিংহরাজং হরিণঃ কদাচিদ্
ভোক্তুং সমর্থো বহুচেষ্টয়াপি।
নভস্তলাত্ কিং গ্রহরাজ ভানু-
মধস্তলে কোঽপি চ পাতয়েয়ুঃ।।[২৪১]

অর্থাৎ, হরিণ কি সিংহরাজকে বহু চেষ্টার মাধ্যমে কখনও ভক্ষণ করতে পারে? আকাশ থেকে কি গ্রহরাজ ভানুকে কেউ নিচে নামিয়ে আনতে পারে? উক্ত শ্লোকে প্রস্তুত সিংহরাজের সঙ্গে অপ্রস্তুত কৌরবপক্ষকে বীর্য্যাদি ধর্মের সঙ্গে বাধা হয়েছে আবার হরিণের সঙ্গে পাণ্ডবদের দৌর্বল্যাদি ধর্মের দ্বারা বাঁধা হয়েছে। একইভাবে প্রস্তুত ভানুর সঙ্গে অপ্রস্তুত দুর্যোধনাদিকে শক্তির ধর্মে বাঁধা হয়েছে। ফলে এখানে দীপক অলঙ্কার হয়েছে বলা যায়।

দীপক অলঙ্কারের মাধ্যমে নাট্যকারের কেবল বীররস প্রকাশই নয় সৌন্দর্য কল্পনার পরিচয়ও পাওয়া যায়। সিংহরাজ এবং হরিণকে সামনে রেখে বাস্তব সমাজের একটি চিত্র এই অলঙ্কারের দ্বারা প্রস্ফুটিত হয়েছে।

❖ ৪.৪.১ রস বিচার

সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে সাহিত্য ও কাব্যের কোন ভেদ নেই। কবি নিজ প্রতিভানৈপুণ্যে শব্দ ও অর্থ চয়ন করে যে অপূর্ব শিল্প সৃষ্টি করেন তাহাই কাব্য– **'শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্।'**[২৪২]। শব্দ ও অর্থের মিশ্রণে সৃষ্টি হয় বলে এর অপর নাম সাহিত্য। মম্মটাচার্যের মতে– 'হ্লাদৈকময়ী নবরসরুচিরা'[২৪৩]। এই রকম বাণীর সাহায্যে কবি দৃশ্যমান জগতের বাইরে এক অলৌকিক জগৎ নির্মাণ করেন যা কেবল নিরবিচ্ছিন্ন আনন্দদান করে। তাই *অগ্নিপুরাণে* কবিকে বিশ্বস্রষ্টা বলা হয়েছে–

> অপারে কাব্যসংসারে কবিরেব প্রজাপতিঃ
>
> যথা বৈ রোচতে বিশ্বং তথেতং পরিবর্ত্ততে।[২৪৪]

প্রাকৃত জগতের দুঃখ, বেদনা, ভয়, ক্রোধ ইত্যাদি মানব চিত্তকে সংকীর্ণ করে কিন্তু কাব্যিক জগতে কেবলই আনন্দ। আনন্দ দানই কাব্যের ধর্ম। সাহিত্যের ভাষায় এই আনন্দ রস নামে পরিচিত[২৪৫]। মম্মটাচার্য লোকোত্তর আনন্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন কাব্য পাঠের সঙ্গে সঙ্গে চিত্তে যে আনন্দের উন্মেষ ঘটে এবং যার ফলে অন্য সকল জ্ঞেয় বিষয়ের বিলোপ হয় তা পরনিবৃতি – 'সমনন্তরমেব রসস্বাদনসমুদ্ভূতং বিগলিতবেদ্যান্তরমানন্দম্'[২৪৬]। সেই জন্য রসবর্জিত কোন কবিকর্ম কাব্যপদবাচ্য হতে পারে না– **'ন হি রসাদৃতে কশ্চিদর্থঃ প্রবর্ততে।'**[২৪৭]। *কাব্যপ্রকাশের* টীকায় চণ্ডীদাসও বলেছেন–'আস্বাদজীবাতুঃ পদসন্দর্ভ কাব্যম্'[২৪৮]। *নাট্যশাস্ত্রে* বলা হয়েছে 'রস ইতি কঃ পদার্থঃ? উচ্যতে আস্বাদ্যত্বাৎ'[২৪৯]। রস হল আস্বাদনের হেতু, তাহলে কিরূপে আস্বাদিত হয়? এর উত্তরে বলেছেন যেমন স্বচ্ছচিত্ত ব্যক্তিগণ নানা ব্যঞ্জনে সংস্কৃত অন্ন ভক্ষণ করতে করতে রসসমূহ আস্বাদন করে আনন্দলাভ করে, ঠিক তেমনি সহৃদয় দর্শকগণ নানা ভাবের বাচিক, আঙ্গিক ও সাত্ত্বিক অভিনয়ে ব্যক্ত স্থায়ী ভাব আস্বাদন করে আনন্দ অনুভব করে থাকে[২৫০]। আচার্য ভরতের মতে রস ব্যতীত কোন অর্থ প্রবর্তিত হয় না– 'ন হি রসাদৃতে কশ্চিদর্থঃ প্রবর্ততে।'[২৫১] তিনি আরও বলেছেন 'তত্র বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ'[২৫২] অর্থাৎ বিভাব অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে রস নিষ্পত্তি হয়ে থাকে। বিভাব কি এ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ভরতমুনি বলেছেন– 'বিভাব্যন্তেঽনেন বাগঙ্গসত্ত্বাভিনয়া ইতি বিভাবঃ'[২৫৩]। বাচিক ও আঙ্গিক অভিনয়াশ্রিত অনেক বিষয় এর দ্বারা হয় বলে বিভাব নাম হয়েছে[২৫৪]। রত্যাদির অনুভূতির করণের নাম বিভাব। এটি দুই প্রকার আলম্বন ও উদ্দীপন। রতি প্রভৃতি স্থায়ীভাব যাকে অবলম্বন করে প্রকাশিত হয় তাকে আলম্বন বিভাব বলা হয় এবং রতি প্রভৃতি স্থায়ীভাবের উদ্দীপককে উদ্দীপন বিভাব বলা হয়। আলম্বন ও উদ্দীপনের দ্বারা উদবুদ্ধ স্থায়ীভাব যার দ্বারা প্রকাশিত হয় তাকে অনুভাব বলে। অনুভাবের দ্বারা স্থায়ীভাব সহৃদয় দর্শকসমাজে অনুভাবিত হয়। স্থায়ীভাব স্থিরভাবে বর্তমান থাকে, তার উপর আবির্ভাব বা তিরোভাবের দ্বারা যা প্রকাশিত হয় তা ব্যভিচারী বা সঞ্চারীভাব বলা হয়ে থাকে। ভরতমুনি আটটি রস স্বীকার করেছেন–

> শৃঙ্গারহাস্যকরুণা রৌদ্রবীরভয়ানকাঃ।

বীভৎসাদ্ভূতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ।।[২৫৫]

আটটি রস স্বীকার করলেও ভরতমুনির মতে মৌলিক রস চারটি–শৃঙ্গার, রৌদ্র, বীর, বীভৎস। এই আটটি রস ছাড়াও পরবর্তীকালে আরও একটি রস স্বীকার করা হয় সেটি হল শান্তরস। এই নয়টি রসের মধ্যে একটি রস নাটকে প্রাধান্য পায়, তাকে অঙ্গীরস বলে। বিশ্বনাথ-কবিরাজ *সাহিত্যদর্পণের* ষষ্ঠপরিচ্ছেদে নাটকের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছেন–'এক এব ভবেদঙ্গী শৃঙ্গারো বীর এব বা।'[২৫৬] এছাড়াও অনেক অপ্রধান রসের উপস্থিতি থাকে, তাকে অঙ্গরস বলা হয়।

জয়দ্রথবধ নাটকের অঙ্গীরস হল বীররস। নাটকে অর্জুনের প্রতিজ্ঞা থেকে শুরু করে জয়দ্রথের বধ পর্যন্ত প্রধান ভাবে বীররস পরিলক্ষিত হয়েছে। বীররসের প্রকৃতি উত্তম এবং উৎসাহ হল এর স্থায়ীভাব। ধীরোদাত্ত ইত্যাদি উত্তমপ্রকৃতির নায়ক এই রসের আশ্রয় হয় বলে বীররস উত্তমপ্রকৃতির বলা হয়ে থাকে। সমস্ত বীরগণের অধীশ্বর মহেন্দ্র তাই বীররসের দেবতা মহেন্দ্র। মহেন্দ্রর বর্ণ হেম তাই বীররস হেমবর্ণ। বীররসের আলম্বন বিভাব হল বিজেতব্য প্রভৃতি। সহায়, অন্বেষণ প্রভৃতি হল এর অনুভাব। স্মৃতি, তর্ক, রোমাঞ্চ প্রভৃতি হল সঞ্চারীভাব। বিশ্বনাথ-কবিরাজ বীররসের লক্ষণ করতে গিয়ে বলেছেন–

উত্তমপ্রকৃতির্বীর উৎসাহস্থায়িভাবকঃ।
মহেন্দ্রদৈবতো হেমবর্ণোঽয়ং সমুদাহৃতঃ।
আলম্বনবিভাবাস্তু বিজেতব্যাদযো মতাঃ।।
বিজেতব্যাদিচেষ্টদ্যাস্তস্যোদ্দীপনরূপিণঃ।
অনুভাবাস্তু তত্র স্যুঃ সহায়ান্বেষণাদযঃ।।
সঞ্চারিণস্তু ধৃতিমতিগর্বস্মৃতিতর্করোমাঞ্চাঃ।
স চ ধর্ম্মদানযুদ্ধৈর্দযযা চ সমন্বিতশ্চতুর্দ্ধা স্যাত্।।[২৫৭]

জয়দ্রথবধ নাটকে অভিমন্যুর মৃত্যুতে অর্জুনের প্রতিজ্ঞা উদ্দীপন বিভাব, জয়দ্রথ আলম্বন বিভাব। প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্য কৃষ্ণের যুদ্ধ পরিকল্পনা, জয়দ্রথের অন্বেষণ প্রভৃতি অনুভাব। এবং ব্যূহভেদ করতে অসমর্থ হলে কৃষ্ণের পরিকল্পনা, সুদর্শন চক্রের দ্বারা সূর্যকে আচ্ছাদন, জয়দ্রথের আগমন ও যুদ্ধে তাঁর বধ প্রভৃতি এখানে সঞ্চারিভাব হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে উদ্ধৃত নাটকের শ্লোক নিম্নে উল্লেখ করা হল–

সিংহগহ্বরমধ্যে তু প্রবিষ্টং মৃগশাবকম্।
রক্ষিতুং কঃ সমর্থোঽত্র ভবিতা ভুবনত্রয়ে।।[২৫৮]
অপরাধেন শূন্যং তমভিমন্যুং শিশুং ভুবি।
নিস্পাপং সরলং হত্বা তস্য ফলমবাপ্নুহি।।[২৫৯]

এই বীররস আবার ধর্ম, দান, যুদ্ধ ও দয়া ভেদে চারপ্রকার। আলোচ্য নাটকের অর্জুন যুদ্ধবীর।

এছাড়া এই নাটকে অঙ্গরস রূপে করুণরস লক্ষিত হয়। অভিমন্যুর মৃত্যুতে অর্জুন, যুধিষ্ঠিরের উক্তিতে করুণ রস আস্বাদিত হয়েছে। উদাহরণ যথা–

অভিমন্যুর্ভবেনাস্তি যদোদেতি চ মানসে
তদা শোকেন মে কৃষ্ণ হৃদয়ং হি বিদীয্যতে।।[২৬০]

আরও,

কীদৃগ্ জ্বালা ভবতি হৃদয়ে বোধনে নো সমর্থঃ
শোকৈস্তাপৈ র্বিরহ দহনৈঃ সর্ব্বতোঽহং বিদীর্ণঃ।
শান্তির্ণাস্তে মনসি মম ভোঃ লেশতোঽদ্যেহ কাচিত্
কস্মিন্ স্থানে গমনবিধিনা চিত্তযদোঽপগচ্ছেত্।।[২৬১]

ইত্যাদি উক্তির দ্বারা দর্শকের হৃদয়ও অর্জুনের ন্যায় কাতর হয়েছে এবং করুণ রস আস্বাদিত হয়েছে। এখানে অভিমন্যুর মৃত্যু আলম্বন বিভাব, অর্জুন-যুধিষ্ঠিরাদির শোক অশ্রুপাত অনুভাব এবং অভিমন্যুর মৃত্যুতে যে বিষাদের সুর ঘনীভূত হয়েছে তা ব্যভিচারীভাব। করুণ রসের লক্ষণ প্রসঙ্গে *নাট্যশাস্ত্রে* বলা হয়েছে–

ইষ্টবধদর্শনাদ্বা বিপ্রিয়বচনস্য সংশ্রবাদ্বাপি।
এভির্ভাববিশেষৈঃ করুণরসো নাম সংভবতি।।
সস্বনরুদিতৈর্মোহাগমৈশ্চ পরিদেবিতৈর্বিলোপিতৈশ্চ।
অভিনেয়ঃ করুণরসো দেহায়াসাভিঘাতৈশ্চ।।[২৬২]

অর্থাৎ, অর্থাৎ, প্রিয়জনের বধ দর্শন, অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ প্রভৃতি ভাববিশেষ দ্বারা করুণরস উদ্ভূত হয়। সশব্দরোদন, মূর্ছা, পরিবেদন, বিলাপ, দেহের কষ্ট বা দেহে আঘাত দ্বারা করুণ রস অভিনেয়।

তাছাড়া অর্জুনের শোক মুক্ত করার জন্য কৃষ্ণের উক্তির মধ্য দিয়ে শান্তরস এবং ধৃতরাষ্ট্র যখন জানতে পারেন অভিমন্যুবধ বৃত্তান্ত তখন তাঁর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে ভয়ানক রসের বর্ণনা ফুটে উঠেছে আলোচ্য নাটকে।

সংকৃত সাহিত্যে আলঙ্কারিকগণ কাব্যের বিচারে রসের গুরুত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে রসকেই কাব্যের আত্মা রূপে বর্ণনা করেছেন – "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্"[২৬৩]। কিন্তু কোন একটি মাত্র রসের দ্বারা কাব্যরসিকের রসপিপাসা নিবৃত্ত হয় না। সেইকারণেই কুসুমপ্রতিমা টীকায় একাধিক রসের প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে – 'শৃঙ্গারবীরশান্তেতররসানাং প্রাধান্যস্য প্রসিদ্ধনাটকেষ্বদর্শনাদিযং ধ্বনিকারোক্তিরনাদরণীয়ৈবেত্যব ধেয়ম্। অন্যে সর্বে রসা অঙ্গং যথাসম্ভবমঙ্গভাবেনাবস্থাতুমর্হন্তীত্যর্থঃ।'[২৬৪] আলোচ্য নাটকে নাট্যকার অঙ্গীরস হিসাবে বীর রসকে ব্যবহার করলেও তারই পরিপুষ্টি সাধনের জন্য একাধিক (অঙ্গ) রসের ব্যবহার করেছেন। অঙ্গীরস বীর রসের ব্যবহারের মাধ্যমে নাটকের নামকরণ থেকে পরিণতি পর্যন্ত অভীষ্ট পথে পৌঁছান সহজ হয়েছে। সেই কারণে আলোচ্য নাটকটি সহৃদয়বেদ্য হয়েছে।

❖ ৪.৪.২ ছন্দ বিচার

ষড় বেদাঙ্গের মধ্যে ছন্দ অন্যতম। ছন্দ শব্দটি চুরাদিগণীয় ছদ্‌ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে চন্দয়তি হ্লাদয়তীতি ছন্দঃ। *ছান্দগ্যোপনিষদে* বলা হয়েছে – "দেবা বৈ মৃত্যোর্বিভ্যতস্ত্রয়ীং বিদ্যাং প্রাবিশংস্তে ছন্দোভিরচ্ছাদয়ন্যদেভিরচ্ছাদয়ংস্তচ্ছন্দসাং ছন্দস্ত্বম্"[২৬৫]। ছন্দ মন্ত্রের আচ্ছাদক, শ্লোকের মধ্যে আনন্দবিধায়কত্ব রূপে ছন্দ মর্যাদা লাভ করে। আচার্য গঙ্গাদাস তাঁর *ছন্দোমঞ্জরী* গ্রন্থে বলেছেন–

পদ্যং চতুষ্পদী তচ্চ জাতিরিতি দ্বিধা।

বৃত্তমক্ষরসংখ্যাতং জাতির্মাত্রাকৃতা ভবেৎ।।[২৬৬]

সমমর্দ্ধসমং বৃত্তং বিষমঞ্চেতি তৎবিধা।

সমং সমচতুষ্পাদং ভবত্যর্দ্ধসমং পুনঃ।।[২৬৭]

পদ্যে চারটি পদ থাকে। ঐ পদ্য বৃত্ত ও জাতি ভেদে দ্বিবিধ। বৃত্ত অক্ষর গণনার মাধ্যমে নিবন্ধ পদ্য এবং জাতি মাত্রার সংখ্যানুসারে রচিত পদ্য। বৃত্ত ত্রিবিধ সমবৃত্ত, অর্ধসমবৃত্ত এবং বিষমবৃত্ত। চারটি চরণেই সমান অক্ষর হলে সমবৃত্ত, প্রথম ও তৃতীয় এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে সমান অক্ষর হলে অর্ধসমবৃত্ত, প্রতিটি চরণেই ভিন্ন সংখ্যক অক্ষর সংখ্যা হলে বিষমবৃত্ত ছন্দ হয়ে থাকে। লঘু বর্ণে এক মাত্রা এবং দীর্ঘ বর্ণে দুই মাত্রা হয়ে থাকে। বৃত্তছন্দকে বোঝান হয় দশটি সংকেত অক্ষরের দ্বারা। এই দশটি অক্ষর হল–ম, য, র, স, ত, জ, ভ, ন, গ, ল। এগুলিকে গণ বলা হয়। শেষের দুটি অর্থাৎ গ এবং ল একটি করে অক্ষর নিয়ে গঠিত। লঘু অক্ষরের জন্য '—' এবং গুরু অক্ষরের জন্য এই '⌣' চিহ্ন দ্বারা নির্দেশ করা হয়। আচার্য গঙ্গাদাস ছন্দের লক্ষণে দশটি অক্ষরের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন–

মস্ত্রিগুরুস্ত্রিলঘুশ্চ নকারো

ভাদিগুরুঃ পুনরাদিলঘুর্যঃ।

জো গুরুমধ্যগতো রলমধ্যঃ

সোঽন্তগুরুঃ কথিতোঽন্তলঘুস্তঃ।।[২৬৮]

গুরুরেকো গকারস্তু লকারো লঘুরেককঃ।

ক্রমেণ চৈষাং রেখাভিঃ সংস্থানং দর্শ্যতে জথা।।[২৬৯]

ছন্দের এই বৈশিষ্টের জন্য লৌকিক সাহিত্য প্রণেতাগণ নিজ কাব্যে ছন্দের প্রয়োগ করেছেন, এবং সেই ধারা অব্যাহত রয়েছে আধুনিক সাহিত্য প্রণেতাগণের মধ্যেও। তার নিদর্শন স্বরূপ নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় বিরচিত *জয়দ্রথবধ* নাটকটি। নাটকটিতে ৭৩টি শ্লোক দেখতে পাওয়া যায়। *বৈয়াসিক-মহাভারতে* অন্যান্য ছন্দের প্রয়োগ দেখা গেলেও অনুষ্টুভ্‌ ছন্দের আধিক্য যেমনভাবে দেখা গিয়েছে, তেমনভাবে নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় বিরচিত *জয়দ্রথবধ* নাটকে অন্যান্য ছন্দের প্রয়োগ থাকলেও অনুষ্টুভ্‌ ছন্দের বাহুল্য দেখা গিয়েছে। জয়দ্রথবধ নাটকে যে সকল ছন্দ ব্যবহার করেছেন তা হল মালিনী, অনুষ্টুভ, উপজাতি, মন্দাক্রান্তা, ইন্দ্রবজ্রা।

প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে মালিনী ছন্দের প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায় –

নিখিলধরণিবন্ধুঃ পালকো যো ধরণ্যাঃ
সৃজতি হরতি বিশ্বং ধারয়ত্যত্র দেবঃ।
গুণচয়রহিতোঽপি ক্ষেমহেতোর্গুণী চ
ত্ববতু ভুবি স বিষ্ণুঃ সর্ব্বদা বঃ কৃপালুঃ।।[২৭০]

উপরি উক্ত শ্লোকের প্রতিপাদে ন-ন-ম-য-য গণগুলি থাকায় মালিনী ছন্দ হয়েছে। গঙ্গাদাস *ছন্দোমঞ্জরী* গ্রন্থে মালিনী ছন্দের লক্ষণ করতে গিয়ে বলেছেন–"ননমযযযুতেয়ং মালিনী ভোগলোকৈঃ"[২৭১]। ভোগী অর্থাৎ ৮ এবং লোক অর্থাৎ ৭, সুতরাং এখানে প্রথমে অষ্টম অক্ষরের পর এবং পরবর্তী সপ্তম অক্ষরের পর যতি হয়েছে।

অনুষ্টুভ্ ছন্দের প্রয়োগ দেখতে করে বলেছেন–

আচার্য্যস্যচ্ছলং সর্ব্বং বিনাপ্য বুদ্ধিপূর্ব্বকং।
জয়দ্রথবিনাশায় চেষ্টিতব্যং প্রযত্নতঃ।।[২৭২]

উপরি উক্ত শ্লোকের প্রতিচরণের পঞ্চমবর্ণ লঘু ও ষষ্ঠবর্ণ গুরু হওয়ায় অনুষ্টুভ্ ছন্দ হয়েছে। অনুষ্টুভ্ ছন্দের লক্ষণ করতে গিয়ে *ছন্দোমঞ্জরীর* গ্রন্থকার বলেছেন –

পঞ্চমং লঘু সর্বত্র সপ্তমং দ্বিচতুর্থয়োঃ।
গুরু ষষ্ঠঞ্চ জানীযাৎ শেষেষ্বনিয়মো মতঃ।।[২৭৩]

মন্দাক্রান্তার ব্যবহার করতে গিয়ে বলেছেন –

সত্যোধর্ম্মঃ প্রচলতু সদা সর্ব্ববিশ্বে সমন্তাত্
হিংসাদ্বেষ সকলভূবনাত্ দূরমেব প্রযাতু।
শুদ্ধজ্ঞানাদ্ নিখিলমনুজাঃ শান্তিপূর্ণা ভবন্তু
দৈবীবাণী নিয়তমিহসা দিব্যভাসা বিভাতু।।[২৭৪]

উপরি উক্ত শ্লোকে প্রতিপাদেই ম-ভ-ন-ত-ত-গ-গ গণ হয়েছে। ছন্দোমঞ্জরী গ্রন্থে মন্দাক্রান্তা ছন্দের লক্ষণ করতে গিয়ে বলেছেন- 'মন্দাক্রান্তাম্বুধিরসনগৈর্মোভনৌতৌগযুগ্মম্'[২৭৫]। অম্বুধি অর্থাৎ ৪, রস অর্থাৎ ৬, নগ অর্থাৎ ৭ সুতরাং প্রথমে চতুর্থবর্ণ পর, তারপর ষষ্ঠবর্ণ পর এবং পরবর্তী সপ্তমবর্ণ পর যতি হয়েছে এখানে।

ছন্দের ব্যবহারে নাটকের অভিব্যক্তির স্বচ্ছতা স্পষ্ট এবং অর্থপূর্ণ করে তোলে, দর্শকদের বুঝতে সাহায্য করে। ছন্দের লালিত্য নাটকের নাটকীয়তা বাড়ায়, ফলে দর্শকদের আকর্ষণ করে। আলোচিত নাটকে ছন্দের যেভাবে ব্যবহার হয়েছে তাতে নাটকীয়তা সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। নাট্যকার সহজ সরল সুবোধ্য ছন্দের ব্যবহারে দর্শকের রসাস্বাদনে সহায়তা করেছেন। নিম্নে আলোচ্য নাটকের ছন্দের একটি সূচী প্রস্তুত করা হল–

<table>
<tr><th>নাটকের নাম</th><th>অঙ্ক সংখ্যা</th><th>দৃশ্য</th><th>ছন্দ এবং শ্লোক সংখ্যা</th></tr>
<tr><td rowspan="12">জয়দ্রথবধ</td><td rowspan="2">প্রথম-অঙ্ক</td><td>প্রথম দৃশ্য</td><td>মালিনী– ১
অনুষ্টুভ্– ২,৩,৪,৫,৬,৭,৮</td></tr>
<tr><td>দ্বিতীয় দৃশ্য</td><td>ইন্দ্রবজ্রা– ৯
অনুষ্টুভ্– ১০,১১,১২,১৪,১৫,১৬
মন্দাক্রান্তা– ১৩
উপজাতি– ১৭</td></tr>
<tr><td rowspan="2">দ্বিতীয়-অঙ্ক</td><td>প্রথম দৃশ্য</td><td>অনুষ্টুভ্– ১৮,২১,২৩,২৪,২৫,২৬,২৭
উপজাতি–১৯,২০,২২</td></tr>
<tr><td>দ্বিতীয় দৃশ্য</td><td>অনুষ্টুভ্– ২৮,২৯,৩০,৩১,৩২,৩৩</td></tr>
<tr><td rowspan="2">তৃতীয়-অঙ্ক</td><td>প্রথম দৃশ্য</td><td>অনুষ্টুভ্– ৩৪,৩৫,৩৬,৩৭,৩৮</td></tr>
<tr><td>দ্বিতীয় দৃশ্য</td><td>উপজাতি– ৩৯,৪০,৪৫,৪৭
অনুষ্টুভ্– ৪১,৪২,৪৩,৪৪,৪৬,৪৮
ইন্দ্রবজ্রা– ৪৯</td></tr>
<tr><td rowspan="2">চতুর্থ-অঙ্ক</td><td>প্রথম দৃশ্য</td><td>অনুষ্টুভ্– ৫০,৫১,৫২,৫৩,৫৪,৫৫</td></tr>
<tr><td>দ্বিতীয় দৃশ্য</td><td>অনুষ্টুভ্– ৫৬,৫৭,৫৮,৫৯,৬০,৬১</td></tr>
<tr><td rowspan="4">পঞ্চম-অঙ্ক</td><td>প্রথম দৃশ্য</td><td>শ্লোকহীন</td></tr>
<tr><td rowspan="3">দ্বিতীয় দৃশ্য</td><td>অনুষ্টুভ্ – ৬২,৬৩,৬৪,৬৫,৬৬,৬৭,৬৮,৬৯,৭০, ৭১,৭২,৭৩,৭৪
মন্দাক্রান্তা– ৭৫</td></tr>
<tr><td>মোট শ্লোক সংখ্য– ৭৫
অনুষ্টুভ্– ৬২ উপজাতি– ৮
মন্দাক্রান্তা– ২ মালিনী– ১
ইন্দ্রবজ্রা–২</td></tr>
</table>

❖ ৪.৪.৩ গুণ-রীতি বিচার

বিশ্বনাথ-কবিরাজ তাঁর *সাহিত্যদর্পণ* গ্রন্থে গুণের সংজ্ঞা করতে গিয়ে বলেছেন – ‘রসস্যাঙ্গিত্বমাপ্তস্য ধর্মাঃ শৌর্যাদয়ো যথা। গুণাঃ’[২৭৬]। অর্থাৎ দেহের অঙ্গিরূপ রসের ধর্ম হল গুণ?। যেমন শৌর্য, দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি দৈহিক ধর্মগুলি আত্মার গৌরব সাধন করে বলে গুণ নামে অভিহিত। তেমনই শব্দার্থ রূপ অঙ্গের অঙ্গিরূপ রসের ধর্মগুলি গুণ বলা হয়। রসের প্রকাশক পদগুলি যে কাব্য শব্দে ব্যবহৃত হয়, গুণগুলি সেই ব্যবহারে

উপযোগী রসের গৌরব সাধন করে সেইজন্য তা গুণ বলে কথিত। গুণ যদি রসের ধর্ম হয় তবে গুণ থাকলে রস অবশ্যই থাকবে। সেইজন্য বিশ্বনাথ রসযুক্ত বাক্যকে কাব্য বলেছেন। *সাহিত্যদর্পণে* গুণগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে মাধুর্য, ওজঃ এবং প্রসাদ – 'মাধুর্য্যমোজোঽথ প্রসাদ ইতি তে ত্রিধা'[২৭৭]। বিশ্বনাথ-কবিরাজ আরও কিছু গুণের উল্লেখ করলেও সেগুলি কম বেশী এই তিনটি গুণের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত। সাধারণত নবরসের মধ্যে শৃঙ্গার, করুণ ও শান্তরস মাধুর্যগুণ বিশিষ্ট, রৌদ্র, বীর ও বীভৎসরস ওজঃগুণ বিশিষ্ট এবং হাস্য, অদ্ভুত ও ভয়ানকরস প্রসাদগুণ বিশিষ্ট হয়ে থাকে।

জয়দ্রথবধ নাটকটির অঙ্গী রস বীর। অতএব নাটকটিতে ওজঃগুণ হয়েছে বলতে পারি। ওজঃ গুণের লক্ষণ প্রসঙ্গে *সাহিত্যদর্পণে* বলা হয়েছে–

ওজশ্চিত্তস্য বিস্তাররূপং দীপ্তত্বমুচ্যতে।

বীর-বীভৎস-রৌদ্রেষু ক্রমেণাধিক্যমস্য তু।।[২৭৮]

অর্থাৎ, চিত্তের বিস্তাররূপ দীপ্তিকে ওজগুণ বলে। বীর, বীভৎস ও রৌদ্ররসের ক্রমানুসারে আধিক্য দেখতে পাওয়া যায়।

রসভেদে গুণের বিভেদ স্বীকৃত হলেও নিত্যানন্দ-মুখোপাধ্যায়ের নাটকে প্রসাদগুণেরও ব্যবহার লক্ষিত হয়। প্রসাদগুণের লক্ষণ করতে গিয়ে বিশ্বনাথ-কবিরাজ বলেছেন–

চিত্তং ব্যাপ্নোতি যঃ ক্ষিপ্তং শুষ্কেন্ধনমিবানলঃ।

স প্রসাদঃ সমস্তেষু রসেষু রচনাসু চ।।[২৭৯]

অর্থাৎ, অগ্নি যেমন শুষ্ক কাষ্ঠকে আত্মসাৎ করে তেমনই যে গুণ শীঘ্র চিত্তকে আকর্ষণ করে তাকে প্রসাদগুণ বলে যা সমস্ত রস ও রচনায় থাকে। কাব্য শ্রবণমাত্র অর্থবোধ হলে প্রসাদগুণ হয়ে থাকে। নিত্যানন্দ-মুখোপাধ্যায়ের *জয়দ্রথবধ* নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল ভাষার সরলতা। নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় এই নাটকে প্রসাদগুণের বাহুল্য দেখিয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ আলোচ্য নাটকের একটি শ্লোক উল্লেখ করা হল–

জয়দ্রথং মৃত্যুগৃহং প্রবেশ্য

সর্ব্বাংস শত্রূন্ সমরে নিপাত্য

অকৌরবং ভূমিতলং বিধায়

পুত্রস্য তৃপ্তিং ধরণৌ করোমি।।[২৮০]

বিশ্বনাথ-কবিরাজ রীতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন–

পদসঙ্ঘটনা রীতিরঙ্গসংস্থাবিশেষবৎ।

উপকর্ত্রী রসাদীনাম্।।[২৮১]

অর্থাৎ, অঙ্গের সংস্থাপনের মতো পদগুলির যোজনাবিশেষকে রীতি বলে। এই রীতি রসাদির উপকার সাধন করে। বিশ্বনাথের মতে দেহের মুখ, চোখ প্রভৃতি অঙ্গের সংস্থাপনের ন্যায় কাব্যের শব্দার্থরূপ শরীরে পদগুলির

যথাযথ যোজনাবিশেষকে রীতি বলে। বামনাচার্য এই রীতিকে কাব্যের আত্মা বলেছেন–'রীতিরাত্মা কাব্যস্য'[২৮২]। বিশ্বনাথ-কবিরাজ সাহিত্যদর্পণে রীতির চারপ্রকার ভেদ করেছেন–'সা পুনঃ স্যাশ্চতুর্বিধা। বৈদর্ভী চাথ গৌড়ী চ পাঞ্চালী লাটিকা তথা[২৮৩]। পাঞ্চালী রীতির লক্ষণ করে বলেছেন–

বর্ণৈঃ শেষৈঃ পুনর্দ্বয়োঃ।

সমস্ত-পঞ্চষ-পদো বন্ধঃ পাঞ্চালিকা মতা[২৮৪]।।

অর্থাৎ, পূর্বোক্ত রীতিদ্বয়ের অবশিষ্ট বর্ণের দ্বারা, পাঁচ অথবা ছয়টি সমাসযুক্ত পদশোভিত রচনা হল পাঞ্চালী রীতি। এ প্রসঙ্গে তিনি ভোজরাজের সংজ্ঞা উদ্ধৃত করেছেন–

সমস্তপঞ্চষপদামোজঃ কান্তিবিবর্জিতাম্।

মধুরাং সুকুমারাঞ্চ পাঞ্চালীং কবয়ো বিদুঃ[২৮৫]।।

অর্থাৎ, পাঁচ অথবা ছয়টি সমাসযুক্ত পদসম্বলিত, ওজঃ, কান্তি প্রভৃতি গুণসমন্বিত, মধুর ও সুকুমারতা সম্পন্ন রচনা হল পাঞ্চালী রীতি।

নিত্যানন্দ-মুখোপাধ্যায় বিরচিত *জয়দ্রথবধ* নাটকটি ওজঃ গুণযুক্ত এবং অল্পসমাসযুক্ত রচনা। তাই কবি পাঞ্চালী রীতির প্রয়োগ করেছেন বলা যায়। উদাহরণ স্বরূপ নাটকটির একটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হল–

অদ্যৈব তাবৎ সুত শোক দীপ্তঃ

কুর্ব্বন্তি যুদ্ধন্ত্বতিভীষণং ভোঃ।

ন নিষ্কৃতিঃ স্যাদিহ কস্যচিচ্চ

যুদ্ধস্য শেষো ভবিতা কিলাদ্য।।[২৮৬]

অর্থাৎ, আজই তাহলে পুত্র শোকে দীপ্ত অতিভীষণ যুদ্ধ করবে এখানে কারোরই নিষ্কৃতি নেই আজই যুদ্ধের শেষ হবে।

কাব্যের গুণ ও রীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই আলঙ্কারিকগণ মনে করেছেন। সেইকারণেই আলোচ্য নাটকেও গুণ-রীতির যথাযথ ব্যবহারের ফলে মনোহারী কাব্য রূপে এটি রসজ্ঞ ব্যক্তির মনোহরণ করতে পেরেছে। কারণ যখন যে রসটি স্ফুট হয়েছে তখন তার অনুকূল গুণ এবং রীতিকে ব্যবহার করেছেন। তা সত্ত্বেও পাঠক এবং শ্রোতার কথা বিবেচনা করে প্রসাদ গুণকেই অধিক ব্যবহার করা হয়েছে। রীতির ব্যবহারের ক্ষেত্রেও নাট্যকারের অভিনবত্ব দেখা যায়। কারণ শ্রবণসুখহেতু এবং বোধগম্যের প্রয়োজনে তিনি পাঞ্চালী রীতিকেই অধিক মাত্রায় ব্যবহার করে ভাষাকে সরল এবং বহুজনবোধ্য করে তুলেছেন।

উল্লেখপঞ্জি

[১] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *জয়দ্রথবধ*, শ্লোক ৯

[২] *তদেব*, শ্লোক ২১

[৩] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *সাহিত্যদর্পণ*, ৬/১৫৭, পৃষ্ঠা ৩১৬

[৪] *সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), নাট্যশাস্ত্র* (প্রথম খণ্ড), ৫/৭, পৃষ্ঠা ১০২

[৫] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *পূর্বোক্ত*, ৬/১০, পৃষ্ঠা ২৬৫

[৬] *তদেব*, ৬/১০, পৃষ্ঠা ২৬৬

[৭] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), *পূর্বোক্ত* (প্রথম খণ্ড), ৫/১০৭, পৃষ্ঠা ১১৮

[৮] *তদেব*, ৫/২৪, পৃষ্ঠা ১০৫

[৯] অমল শিব পাঠক (সম্পা), *নাট্যপ্রদীপ*, পৃষ্ঠা ২৩

[১০] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), *পূর্বোক্ত* (প্রথম খণ্ড), ৫/১০৭, পৃষ্ঠা ১১৮

[১১] অমল শিব পাঠক (সম্পা), *পূর্বোক্ত*, পৃষ্ঠা ২

[১২] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *পূর্বোক্ত*, ৬/১১, পৃষ্ঠা ২৬৬

[১৩] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, শ্লোক ১

[১৪] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *পূর্বোক্ত*, ৬/১৪, পৃষ্ঠা ২৭০

[১৫] *তদেব*, বৃত্তি অংশ দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা ২৭০

[১৬] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), *পূর্বোক্ত* (তৃতীয় খণ্ড), ২২/২৫, পৃষ্ঠা ৭৩

[১৭] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *পূর্বোক্ত*, ৬/১৫, পৃষ্ঠা ২৭০

[১৮] *তদেব*, বৃত্তি অংশ দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা ২৭১

[১৯] *তদেব*, ৬/১২, পৃষ্ঠা ২৬৮

[২০] *তদেব*, ৬/১৬, পৃষ্ঠা ২৭১

[২১] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), *পূর্বোক্ত* (তৃতীয় খণ্ড), ২২/২৮-২৯, পৃষ্ঠা ৭৩

[২২] *তদেব*, ২২/৩০, পৃষ্ঠা ৭৪

[২৩] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, প্রথমাঙ্কে প্রথমদৃশ্য

[২৪] *তদেব*, শ্লোক ৮

[২৫] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), *পূর্বোক্ত* (তৃতীয় খণ্ড), ২২/৩২, পৃষ্ঠা ৭৪

[২৬] সীতানাথ আচার্য (সম্পা), *দশরূপক*, প্রথম প্রকাশ, পৃষ্ঠা ২৮

[২৭] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), *পূর্বোক্ত* (তৃতীয় খণ্ড), ২১/২১, পৃষ্ঠা ৪৯

[২৮] সীতানাথ আচার্য (সম্পা), *পূর্বোক্ত*, ১/১৮, পৃষ্ঠা ২৮

[২৯] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *পূর্বোক্ত*, ৬/৪৭, পৃষ্ঠা ২৮৫

[৩০] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), *পূর্বোক্ত* (তৃতীয় খণ্ড), ২১/২২, পৃষ্ঠা ৫০

[৩১] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *পূর্বোক্ত*, ৬/৪৮, পৃষ্ঠা ২৮২

[৩২] সীতানাথ আচার্য (সম্পা), *পূর্বোক্ত*, ১/১৭, পৃষ্ঠা ২৫

[৩৩] *তদেব*, প্রথম প্রকাশ, বৃত্তি অংশ দ্রস্তব্য, পৃষ্ঠা ২৫

[৩৪] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, শ্লোক ৯

[৩৫] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), *পূর্বোক্ত* (তৃতীয় খণ্ড), ২১/২৩, পৃষ্ঠা ৫০

[৩৬] সীতানাথ আচার্য (সম্পা), *পূর্বোক্ত*, ১/১৭, পৃষ্ঠা ২৭

[৩৭] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *পূর্বোক্ত*, ৬/৪৯, পৃষ্ঠা ২৮৩

[৩৮] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, শ্লোক ১১

[৩৯] *তদেব*, প্রথমাঙ্কে দ্বিতীয় দৃশ্য

[৪০] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), *পূর্বোক্ত* (তৃতীয় খণ্ড), ২১/২৪, পৃষ্ঠা ৫০

[৪১] সীতানাথ আচার্য (সম্পা), *পূর্বোক্ত* (প্রথম প্রকাশ), বৃত্তি অংশ দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা ১৮

[৪২] *তদেব*, ১/১৩, পৃষ্ঠা ১৮

[৪৩] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *পূর্বোক্ত*, ৬/৫০, পৃষ্ঠা ২৮৩

[৪৪] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), *পূর্বোক্ত* (তৃতীয় খণ্ড), ২১/২৬, পৃষ্ঠা ৫০

[৪৫] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *পূর্বোক্ত*, ৬/৫৩, পৃষ্ঠা ২৮৪

[৪৬] সীতানাথ আচার্য (সম্পা), *পূর্বোক্ত*, ১/১৬, পৃষ্ঠা ২৪

[৪৭] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), *পূর্বোক্ত* (তৃতীয় খণ্ড), ২১/৬, পৃষ্ঠা ৪৭

[৪৮] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *পূর্বোক্ত*, ৬/৫৪, পৃষ্ঠা ২৮৫

[৪৯] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), *পূর্বোক্ত* (তৃতীয় খণ্ড), ২১/৯, পৃষ্ঠা ৪৭

[৫০] সীতানাথ আচার্য (সম্পা), *পূর্বোক্ত*, ১/২০, পৃষ্ঠা ৩০

[৫১] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *পূর্বোক্ত*, ৬/৫৫, পৃষ্ঠা ২৮৫

[৫২] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, প্রথমাঙ্কে দ্বিতীয় দৃশ্য

[৫৩] *তদেব*, শ্লোক ১৭

[৫৪] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), *পূর্বোক্ত* (তৃতীয় খণ্ড), ২১/১০, পৃষ্ঠা ৪৭

[৫৫] সীতানাথ আচার্য (সম্পা), *পূর্বোক্ত*, শ্লোক ১/২০, পৃষ্ঠা ৩১

[৫৬] তত্রৈব

[৫৭] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *পূর্বোক্ত*, ৬/৫৬, পৃষ্ঠা ২৮৫

[৫৮] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, শ্লোক ৩১

[৫৯] *তদেব*, শ্লোক ৩২

[৬০] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), *পূর্বোক্ত* (তৃতীয় খণ্ড), ২১/১১, পৃষ্ঠা ৪৮

[৬১] সীতানাথ আচার্য (সম্পা), *পূর্বোক্ত*, ১/২১, পৃষ্ঠা ৩২

[৬২] *তদেব*, বৃত্তি অংশ দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা ৩২

[৬৩] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *পূর্বোক্ত*, ৬/৫৭, পৃষ্ঠা ২৮৫

[৬৪] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, শ্লোক ৫৭

[৬৫] *তদেব,* পঞ্চমাঙ্কে প্রথম দৃশ্য

[৬৬] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), *পূর্বোক্ত* (তৃতীয় খণ্ড), ২১/১২, পৃষ্ঠা ৪৮

[৬৭] সীতানাথ আচার্য (সম্পা), *পূর্বোক্ত,* শ্লোক ১/২১, পৃষ্ঠা ৩৩

[৬৮] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *পূর্বোক্ত,* ৬/৫৮, পৃষ্ঠা ২৮৫

[৬৯] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত,* পঞ্চমাঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য

[৭০] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), *পূর্বোক্ত* (তৃতীয় খণ্ড), ২১/১৩, পৃষ্ঠা ৪৮

[৭১] সীতানাথ আচার্য (সম্পা), *পূর্বোক্ত,* ১/২২, পৃষ্ঠা ৩৪

[৭২] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *পূর্বোক্ত,* ৬/৫৯, পৃষ্ঠা ২৮৬

[৭৩] *তদেব,* ৬/১, পৃষ্ঠা ২৬১

[৭৪] *তদেব,* ৬/4, পৃষ্ঠা ২৬১

[৭৫] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত,* শ্লোক ১

[৭৬] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *পূর্বোক্ত,* ৬/৬, পৃষ্ঠা ২৬২

[৭৭] *তদেব,* বৃত্তি অংশ দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা ২৬৩

[৭৮] যজ্ঞেশ্বর শর্মা পরাশর (সম্পা), *সাহিত্যদর্পণ* (খণ্ড ২), পৃষ্ঠা ১৬০৬

[৭৯] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *পূর্বোক্ত,* ৬/৬, পৃষ্ঠা ২৬২

[৮০] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), *পূর্বোক্ত* (তৃতীয় খণ্ড), ২১/১, পৃষ্ঠা ৪৬

[৮১] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *পূর্বোক্ত,* ৬/৬১, পৃষ্ঠা ২৮৬

[৮২] *তদেব,* বৃত্তি অংশ দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা ২৮৬

[৮৩] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), *পূর্বোক্ত* (তৃতীয় খণ্ড), ২১/৩৮, পৃষ্ঠা ৫২

[৮৪] সীতানাথ আচার্য (সম্পা), *পূর্বোক্ত,* ১/২৪, পৃষ্ঠা ৩৭

[৮৫] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *পূর্বোক্ত,* ৬/৬৩, পৃষ্ঠা ২৮৬

[৮৬] যজ্ঞেশ্বর শর্মা পরাশর (সম্পা), *পূর্বোক্ত,* পৃষ্ঠা ১৭৬৪

[৮৭] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *পূর্বোক্ত,* ৬/৪৮, পৃষ্ঠা ২৮২

[৮৮] সীতানাথ আচার্য (সম্পা), *পূর্বোক্ত,* পৃষ্ঠা ২৫

[৮৯] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), *পূর্বোক্ত* (তৃতীয় খণ্ড), ২১/২২, পৃষ্ঠা ৫০

[৯০] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *পূর্বোক্ত,* ৬/৫৫, পৃষ্ঠা ২৮৫

[৯১] সীতানাথ আচার্য (সম্পা), *পূর্বোক্ত,* ১/২০, পৃষ্ঠা ৩০

[৯২] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), *পূর্বোক্ত* (তৃতীয় খণ্ড), ২১/৯, পৃষ্ঠা ৪৭

[৯৩] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত,* শ্লোক ৯

[৯৪] *তদেব,* শ্লোক ১৭

[৯৫] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), *পূর্বোক্ত,* (তৃতীয় খণ্ড), ২১/৩৯, পৃষ্ঠা ৫৩

[৯৬] সীতানাথ আচার্য (সম্পা), *পূর্বোক্ত,* ১/৩০, পৃষ্ঠা ৫৩

[৯৭] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *পূর্বোক্ত,* ৬/৬৪, পৃষ্ঠা ২৮৭

[৯৮] সীতানাথ আচার্য (সম্পা), *পূর্বোক্ত* (প্রথম প্রকাশ), পৃষ্ঠা ৫৩

[৯৯] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, শ্লোক ২৬

[১০০] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), *পূর্বোক্ত* (তৃতীয় খণ্ড), ২১/৪০, পৃষ্ঠা ৫৩

[১০১] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *পূর্বোক্ত*, ৬/৬৫, পৃষ্ঠা ২৮৭

[১০২] সীতানাথ আচার্য (সম্পা), *পূর্বোক্ত*, ১/৩৬, পৃষ্ঠা ৭২

[১০৩] *তদেব*, টীকা অংশ দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা ৭২

[১০৪] বাবুলাল শুক্ল শাস্ত্রী (সম্পা), *নাটকচন্দ্রিকা*, শ্লোক ৭৮, পৃষ্ঠা ৪৬

[১০৫] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, শ্লোক ৭৫

[১০৬] *তদেব*, শ্লোক ৫২

[১০৭] *তদেব*, চতুর্থাঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য

[১০৮] তত্রৈব

[১০৯] *তদেব*, শ্লোক ৫৭

[১১০] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), *পূর্বোক্ত* (তৃতীয় খণ্ড), ২১/৪১, পৃষ্ঠা ৫৩

[১১১] সীতানাথ আচার্য (সম্পা), *পূর্বোক্ত*, ১/৪৩, পৃষ্ঠা ৯২

[১১২] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *পূর্বোক্ত*, ৬/৬৬, পৃষ্ঠা ২৮৭

[১১৩] যজ্ঞেশ্বর শর্মা পরাশর (সম্পা), *পূর্বোক্ত*, পৃষ্ঠা ১৭৭২

[১১৪] বাবুলাল শুক্ল শাস্ত্রী (সম্পা), *পূর্বোক্ত*, পৃষ্ঠা ৫৫

[১১৫] সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় (সম্পা), *নাটকলক্ষণরত্নকোশ*, পৃষ্ঠা ১০৪

[১১৬] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পঞ্চমাঙ্কের প্রথম দৃশ্য

[১১৭] *তদেব*, পঞ্চমাঙ্কের প্রথম দৃশ্য

[১১৮] তত্রৈব

[১১৯] তত্রৈব

[১২০] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), *পূর্বোক্ত* (তৃতীয় খণ্ড), ২১/৪২, পৃষ্ঠা ৫৩

[১২১] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *পূর্বোক্ত*, ৬/৬৭, পৃষ্ঠা ২৮৮

[১২২] *তদেব*, ৬/৬, পৃষ্ঠা ২৬২

[১২৩] যজ্ঞেশ্বরদত্ত শর্মা পারাশর (সম্পা), *পূর্বোক্ত*, পৃষ্ঠা ১৬০৯

[১২৪] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), *পূর্বোক্ত* (তৃতীয় খণ্ড), ২০/১১, পৃষ্ঠা ২০

[১২৫] যজ্ঞেশ্বরদত্ত শর্মা পারাশর (সম্পা), *পূর্বোক্ত*, পৃষ্ঠা ১৬০৩

[১২৬] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, প্রথমাঙ্কে দ্বিতীয় দৃশ্য

[১২৭] *তদেব*, পঞ্চমাঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য

[১২৮] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), *পূর্বোক্ত* (তৃতীয় খণ্ড), ২০/১১, পৃষ্ঠা ২০

[১২৯] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *পূর্বোক্ত*, ৬/৬, পৃষ্ঠা ২৬২

[১৩০] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, শ্লোক ১১

[১৩১] *তদেব,* শ্লোক ১৩

[১৩২] *তদেব,* পঞ্চমাঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য

[১৩৩] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *পূর্বোক্ত,* ৬/৬, পৃষ্ঠা ২৬২

[১৩৪] *তদেব,* ৬/৭, পৃষ্ঠা ২৬৫

[১৩৫] *তদেব,* ৬/৬, পৃষ্ঠা ২৬২

[১৩৬] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), *পূর্বোক্ত* (তৃতীয় খণ্ড), ২০/১০, পৃষ্ঠা ২০

[১৩৭] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *পূর্বোক্ত,* ৩/৩৬, পৃষ্ঠা ৬৫

[১৩৮] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), *পূর্বোক্ত* (চতুর্থ খণ্ড), ৩৪/২৩, পৃষ্ঠা ২১১

[১৩৯] সীতানাথ আচার্য (সম্পা), *পূর্বোক্ত* ২/১, পৃষ্ঠা ১৫০

[১৪০] তত্রৈব

[১৪১] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *পূর্বোক্ত,* ৩/৩৮, পৃষ্ঠা ৬৫

[১৪২] সীতানাথ আচার্য (সম্পা), *পূর্বোক্ত,* ২/৪-৫, পৃষ্ঠা ১৫৮

[১৪৩] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), পূর্বোক্ত, ৬/৬, পৃষ্ঠা ২৬৩

[১৪৪] যজ্ঞেশ্বরদত্ত শর্মা পারাশর (সম্পা), *পূর্বোক্ত,* পৃষ্ঠা ১৬০৭

[১৪৫] অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), *ধ্বন্যালোক,* ৩/২১, পৃষ্ঠা ২১৭

[১৪৬] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা.), *পূর্বোক্ত,* টীকা অংশ দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা ২৬৩

[১৪৭] *তদেব,* ৬/৬, পৃষ্ঠা ২৬৩

[১৪৮] *তদেব,* টীকা অংশ দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা ২৬৩

[১৪৯] সীতানাথ আচার্য (সম্পা), *পূর্বোক্ত,* ১/৫০, পৃষ্ঠা ১১৭

[১৫০] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), *পূর্বোক্ত,* ২১/১০৩, পৃষ্ঠা ৬৪

[১৫১] সীতানাথ আচার্য (সম্পা), *পূর্বোক্ত,* ১/৫৪, পৃষ্ঠা ১৩৩

[১৫২] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *পূর্বোক্ত,* ৬/১৩৫, পৃষ্ঠা ৩০৮

[১৫৩] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত,* শ্লোক ৭৫

[১৫৪] অমল কুমার ঘোষ (সম্পা), *মহাভারতের চরিত্র-পরিচিতি,* পৃষ্ঠা ৩১

[১৫৫] তত্রৈব

[১৫৬] *গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), পূর্বোক্ত, ৬/৬,* পৃষ্ঠা ২৬২

[১৫৭] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), *পূর্বোক্ত* (তৃতীয় খণ্ড), ২০/১০, পৃষ্ঠা ২০

[১৫৮] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *পূর্বোক্ত,* ৩/৩৬, পৃষ্ঠা ৯৫

[১৫৯] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত,* ৩৪/২৩, পৃষ্ঠা ২১১

[১৬০] সীতানাথ আচার্য (সম্পা), *পূর্বোক্ত,* ২/১, পৃষ্ঠা ১৫০

[১৬১] *তদেব,* ২/২, পৃষ্ঠা ১৫০

[১৬২] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *পূর্বোক্ত,* ৩/৩৭, পৃষ্ঠা ৬৫

[১৬৩] *তদেব,* পৃষ্ঠা ৯৫

[১৬৪] সীতানাথ আচার্য (সম্পা), *পূর্বোক্ত* ২/৪, পৃষ্ঠা ১৫৮

[১৬৫] *তদেব*, ২/১০, পৃষ্ঠা ১৭৪

[১৬৬] *গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), পূর্বোক্ত*, ৩/৬২, পৃষ্ঠা ১০৩

[১৬৭] সীতানাথ আচার্য (সম্পা), *পূর্বোক্ত*, ২/১১, পৃষ্ঠা ১৭৫

[১৬৮] *তদেব*, ২/১১, পৃষ্ঠা ১৭৬

[১৬৯] *তদেব*, ২/১২, পৃষ্ঠা ১৭৭

[১৭০] *তদেব*, ২/১২, পৃষ্ঠা ১৭৮

[১৭১] *তদেব*, ২/১৩, পৃষ্ঠা ১৭৮

[১৭২] *তদেব*, ২/১৩, পৃষ্ঠা ১৭৯

[১৭৩] *তদেব*, ২/১৪, পৃষ্ঠা ১৭৯

[১৭৪] *তদেব*, ২/১৪, পৃষ্ঠা ১৮০

[১৭৫] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, শ্লোক ৯

[১৭৬] *তদেব*, শ্লোক ১১

[১৭৭] *তদেব*, শ্লোক ১৩

[১৭৮] *তদেব*, শ্লোক ১৬

[১৭৯] *তদেব*, দ্বিতীয়াঙ্কের প্রথমদৃশ্য

[১৮০] *তদেব*, শ্লোক ৬৪

[১৮১] *তদেব*, শ্লোক ৬৫

[১৮২] *তদেব*, পঞ্চমাঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য।

[১৮৩] অমল কুমার ঘোষ (সম্পা), *পূর্বোক্ত*, পৃষ্ঠা ১৩১

[১৮৪] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, প্রথমাঙ্কের দ্বিতীয়দৃশ্য

[১৮৫] *তদেব*, শ্লোক ১৪

[১৮৬] *তদেব*, শ্লোক ৩০

[১৮৭] *তদেব*, শ্লোক ৩১

[১৮৮] *তদেব*, শ্লোক ৩২

[১৮৯] *তদেব*, শ্লোক ৫১

[১৯০] *তদেব*, শ্লোক ৫২

[১৯১] *তদেব*, পঞ্চমাঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য

[১৯২] অমল কুমার ঘোষ (সম্পা), *পূর্বোক্ত*, পৃষ্ঠা ২৫১

[১৯৩] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, শ্লোক ১৯

[১৯৪] *তদেব*, শ্লোক ২০

[১৯৫] *তদেব*, শ্লোক ২২

[১৯৬] *তদেব*, শ্লোক ২৬

[১৯৭] *তদেব,* শ্লোক ২৭

[১৯৮] অমল কুমার ঘোষ (সম্পা), *পূর্বোক্ত,* পৃষ্ঠা ৪৬৫

[১৯৯] সীতানাথ আচার্য (সম্পা), *পূর্বোক্ত* , ২/৯, পৃষ্ঠা ১৭৮

[২০০] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *পূর্বোক্ত,* ৩/১৩৩, পৃষ্ঠা ১৪০

[২০১] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত,* তৃতীয়াঙ্কের প্রথমদৃশ্য

[২০২] *তদেব,* শ্লোক ৩৪

[২০৩] *তদেব,* শ্লোক ৩৫

[২০৪] *তদেব,* শ্লোক ৪১

[২০৫] *তদেব,* শ্লোক ৪৩

[২০৬] *তদেব,* শ্লোক ৫৭

[২০৭] অমল কুমার ঘোষ (সম্পা), *পূর্বোক্ত,* পৃষ্ঠা ১৮৫

[২০৮] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত,* শ্লোক ৩৯

[২০৯] অমল কুমার ঘোষ (সম্পা), *পূর্বোক্ত,* পৃষ্ঠা ৪৪১

[২১০] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত,* শ্লোক ২৮

[২১১] *তদেব,* শ্লোক ৫৩

[২১২] *তদেব,* শ্লোক ৭৫

[২১৩] অমল কুমার ঘোষ (সম্পা), *পূর্বোক্ত,* পৃষ্ঠা ২২৮

[২১৪] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত,* শ্লোক ৪৯

[২১৫] *তদেব,* শ্লোক ৬০

[২১৬] অমল কুমার ঘোষ (সম্পা), *পূর্বোক্ত,* পৃষ্ঠা ২৩৮

[২১৭] *তদেব,* আদিপর্ব, অধ্যায় ১৪১, শ্লোক ৫-১০

[২১৮] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত,* শ্লোক ৫৮

[২১৯] *তদেব,* শ্লোক ৫৯

[২২০] অমল কুমার ঘোষ (সম্পা), *পূর্বোক্ত,* পৃষ্ঠা ৩৮০

[২২১] তত্রৈব

[২২২] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *পূর্বোক্ত,* ১/৩, পৃষ্ঠা ২৩

[২২৩] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র-রচনাবলী* (একাদশ খণ্ড), পৃষ্ঠা ৫৭৮

[২২৪] *তদেব,* পৃষ্ঠা ৫৭৯

[২২৫] *তদেব,* পৃষ্ঠা ৫৩০

[২২৬] শ্রীকৃষ্ণ সূরি (সম্পা), *কাব্যালঙ্কার-সূত্রবৃত্তি,* ১/১, পৃষ্ঠা ৪

[২২৭] পণ্ডিত রঙ্গাচার্য শাস্ত্রী (সম্পা), *কাব্যাদর্শ,* ২/১, পৃষ্ঠা ১০৯

[২২৮] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, শ্লোক ৩৫

[২২৯] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *পূর্বোক্ত,* ১০/১৭, পৃষ্ঠা ৫০৩

[২৩০] *তদেব,* ১০/১৮, পৃষ্ঠা ৫০৫

[২৩১] *তদেব,* ১০/২২, পৃষ্ঠা ৫০৯

[২৩২] *তদেব,* ১০/১২১, পৃষ্ঠা ৬২৫

[২৩৩] *তদেব,* পৃষ্ঠা ৬২৫

[২৩৪] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত,* শ্লোক ১৫

[২৩৫] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *পূর্বোক্ত,* ১০/৯৯, পৃষ্ঠা ৬০৭

[২৩৬] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত,* শ্লোক ২০

[২৩৭] *তদেব,* শ্লোক ৩৭

[২৩৮] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *পূর্বোক্ত,* ১০/৭৮, পৃষ্ঠা ৫৮৩

[২৩৯] *তদেব,* পৃষ্ঠা ৫৮৩

[২৪০] *তদেব,* ১০/৬৭, পৃষ্ঠা ৫৫৭

[২৪১] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত,* শ্লোক ৩৯

[২৪২] সি. শঙ্কর শাস্ত্রী (সম্পা), *কাব্যালঙ্কার,* ১/১৬, পৃষ্ঠা ১৩

[২৪৩] গোপী নাথ কবিরাজ (সম্পা) *কাব্যপ্রকাশ* (প্রথম ভাগ), ১/১, পৃষ্ঠা ২-৩

[২৪৪] মৈত্রেয়ী দেশপাণ্ডে (সম্পা), *দ্যা অগ্নি মহাপুরাণ,* ৩৩৯/১০, পৃষ্ঠা ১২২২

[২৪৫] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *পূর্বোক্ত,* ৩/২, পৃষ্ঠা ৭২

[২৪৬] গোপী নাথ কবিরাজ (সম্পা) *পূর্বোক্ত* (প্রথম ভাগ), ১/২ বৃত্তি অংশ দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা ৬

[২৪৭] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), *পূর্বোক্ত* (প্রথম খণ্ড), বৃত্তি অংশ দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা ১৩৭

[২৪৮] গোপী নাথ কবিরাজ (সম্পা) *পূর্বোক্ত* (প্রথম ভাগ), পৃষ্ঠা ১৩

[২৪৯] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), *পূর্বোক্ত* (প্রথম খণ্ড), বৃত্তি অংশ দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা ১৩৭

[২৫০] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), *পূর্বোক্ত* (প্রথম খণ্ড), ৬/৩২-৩৩, পৃষ্ঠা ১৩৮

[২৫১] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত* (প্রথম খণ্ড), বৃত্তি অংশ দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা ১৩৭

[২৫২] *তদেব,* পৃষ্ঠা ১৩৭

[২৫৩] *তদেব,* বৃত্তি অংশ দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা ১৫৪

[২৫৪] *তদেব,* ৭/৪, পৃষ্ঠা ১৫৪

[২৫৫] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত* (প্রথম খণ্ড), ৬/১৫, পৃষ্ঠা ১৩৩

[২৫৬] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *পূর্বোক্ত,* ৬/৬, পৃষ্ঠা ২৬৩

[২৫৭] *তদেব,* ৩/২০৬, পৃষ্ঠা ১৮১

[২৫৮] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত,* শ্লোক ৭০।

[২৫৯] *তদেব,* শ্লোক ৭১।

[২৬০] *তদেব,* শ্লোক ১১

[২৬১] *তদেব,* শ্লোক ১৩

[২৬২] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত* (প্রথম খণ্ড), ৬/৬২-৬৩, পৃষ্ঠা ১৪৬

[২৬৩] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *পূর্বোক্ত*, ১/৩, পৃষ্ঠা ২৩

[২৬৪] যজ্ঞেশ্বরদত্ত পারাশর (সম্পা), *পূর্বোক্ত*, পৃষ্ঠা ১৬০৭

[২৬৫] স্বামী গম্ভীরানন্দ (সম্পা), *উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী* (দ্বিতীয় ভাগ), প্রথম অধ্যায়, চতুর্থ খণ্ড, প্রবাক ২, পৃষ্ঠা ৪৭

[২৬৬] রামতারণ শর্মা (সম্পা), *ছন্দোমঞ্জরী*, ১/৪, পৃষ্ঠা ২

[২৬৭] *তদেব*, ১/৫, পৃষ্ঠা ৩

[২৬৮] *তদেব*, ১/৮, পৃষ্ঠা ৪

[২৬৯] *তদেব*, ১/৯, পৃষ্ঠা ৪

[২৭০] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, শ্লোক ১

[২৭১] রামতারণ শর্মা (সম্পা), *পূর্বোক্ত*, দ্বিতীয় স্তবক, ১৫/৪, পৃষ্ঠা ৬৫

[২৭২] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, শ্লোক ৩২

[২৭৩] রামতারণ শর্মা (সম্পা), *পূর্বোক্ত*, চতুর্থ স্তবক, শ্লোক ৩, পৃষ্ঠা ১১৫

[২৭৪] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, শ্লোক ৭৫

[২৭৫] রামতারণ শর্মা (সম্পা), *পূর্বোক্ত*, দ্বিতীয় স্তবক, ১৭/৪, পৃষ্ঠা ৭৭

[২৭৬] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *পূর্বোক্ত*, ৮/১, পৃষ্ঠা ৪৪৭

[২৭৭] *তদেব*, ৮/২, পৃষ্ঠা ৪৪৮

[২৭৮] *তদেব*, ৮/৬, পৃষ্ঠা ৪৫১

[২৭৯] *তদেব*, ৮/৮, পৃষ্ঠা ৪৫৩

[২৮০] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, শ্লোক ১৭

[২৮১] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *পূর্বোক্ত*, ৯/১, পৃষ্ঠা ৪৬৫

[২৮২] বেচনা ঝা (সম্পা), *কাব্যালংকারসূত্র*, ১/২/৬, পৃষ্ঠা ১৫

[২৮৩] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *পূর্বোক্ত*, ৯/২, পৃষ্ঠা ৪৬৫

[২৮৪] *তদেব*, ৯/৫, পৃষ্ঠা ৪৬৭

[২৮৫] কামেশ্বরনাথ মিশ্র (সম্পা), *সরস্বতীকণ্ঠাভরণ*, ২/৩০, পৃষ্ঠা ২৩২

[২৮৬] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, শ্লোক ২২

পঞ্চম অধ্যায়:

ঘটোৎকচবধ-নাট্যকর্মের সমীক্ষা

পঞ্চম অধ্যায়

ঘটোৎকচবধ-নাট্যকর্মের সমীক্ষা

এই অধ্যায়ে নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় বিরচিত অপ্রকাশিত *ঘটোৎকচবধ* নাটক, তার বঙ্গানুবাদ, তার নাট্যতত্ত্ব বিচার, চরিত্র বিচার এবং আলংকারিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৫.০ মূল নাটক

श्रीनित्यानन्दमुखोपाध्यायरचितं *घटोत्कचवधनाटकम्*

प्रथमाङ्के प्रथमदृश्यम्

नान्दी

य आदिदेवः पुरुषप्रधानः
विश्वेषु सर्व्वेषु च पूज्यपादः।
अनन्तकीर्त्तिर्वहुरूपधारी
स पातु युस्मान् करुणावतीर्णः ॥१॥

सूत्रधारः – (प्रविश्य) अभिवादये आर्य्यमिश्रान्। अद्य गीर्व्वाणवाणी-प्रचारमहोत्सवे कस्यचित् नवीननाटकस्य प्रयोगाय आदिष्टोऽस्मि पारिषदैः। नाटकविवेचनार्थम् आह्वयामि पारिपार्श्विकम् – भो मारिष! एहि रङ्गस्थलम्।

पारिपार्श्विकः –(प्रविश्य) भाव! एषोऽहमागतोऽस्मि।

सूत्रधारः – अद्य अस्मिन् गीर्व्वाणवाणीप्रचारमहोत्सवे किमपि नवीनं नाटकं प्रयोक्तव्यमित्यादिष्टं पारिषदैः। तद् निरुप्यतां कतमत् प्रकरणमाश्रयणीयम्।

पारिपार्श्विकः – महाभारताश्रितस्य कस्यचित् प्रकरणस्य प्रयोग एव समीचीन इति मया मन्यते।

सूत्रधारः – महाभारतन्तु अनन्तरत्नाश्रितम्।

महाभारतमध्ये तु सर्व्वमेव प्रवर्त्तते।

नास्ति यद् भारते तत्तु विश्वेष्वपि न वर्त्तते ॥२ ॥

अतएव सामान्येन नाभिध्याय विशेषेणोच्यताम्।

पारिपाश्विकः – श्रुयताम्–

रामगोपालपुत्रेण नित्यानन्देन शर्म्मणा।

नवीनं लिखितं किञ्चिद् नाटकं भारताश्रितम् ॥३ ॥

आख्यानं द्रोणपर्व्वीयं समाश्रित्यप्रधानतः।

घटोत्कचवधं नाम नाटकं रचितं नवम् ॥४ ॥

वर्ज्जितं स्त्रीचरित्रेण क्षुद्रकारं तथैव च।

काठिन्यरहितचेदं स्वप्नकुशीलवैर्युतम् ॥५ ॥

सूत्रधारः – भवतु। तर्हि इदमेव आश्रीयताम्।

पारिपाश्विकः – तथैव क्रियते। भवता रङ्गस्थलस्य यथायथं सन्निवेशः क्रियताम्। मयापि कुशीलवाः सज्जीक्रियन्ते।

सूत्रधारः – तथैवास्तु। त्वं सत्वरं गच्छ। कुशीलवेषु सज्जीक्रितेषु श्रीघ्रमिश।

पारिपाश्विकः – यथादिशति मारिषः। (निष्कान्तः)

सूत्रधारः – श्रुतम् आर्य्यमिश्रैः वयमद्य महाभारताश्रित-घटोत्कचवधस्य प्रयोगाय प्रयत्नं कुर्म्मः। अतएव भवन्तु अवहिता भवन्तः। अहमपि रङ्गस्थलं सज्जीकरोमि। अत्र द्वाराणि भवन्तु। अत्र उपद्वाराणि अत्र मध्यमण्डपम्।

पारिपाश्विकः – (प्रविश्य) भाव भाव! सर्व्वनाशः समुपस्थितः।

सूत्रधारः – कथमिव?

पारिपाश्विकः – नायको नाटकस्यास्य स एव नोपलभ्यते।

चिन्ताजीर्णा वयन्तावत् नाटकं भविता कथम् ॥६ ॥

सूत्रधारः – अन्विष्टं किं प्रयत्नेन पारिषदैस्तु सर्व्वतः।

गन्तुं वा शक्नुयात् कुत्र तिष्ठत्यत्रैव कुत्रचित् ॥९ ॥

पारिपाश्विकः – सर्व्वैः प्रयत्नतोऽन्विष्टं नोपलव्धस्तथाप्यसौ।

भवता यत्न आधेयो नान्योपायोऽत्र वर्त्तते ॥८॥

सूत्रधारः – भवतु पश्यामि ।

घटोत्कच महाभाग कुत्र तिष्ठसि साम्प्रतम् ।
त्वदर्थं व्याकुलाः सर्व्वे त्वरितमेहि भीमज ॥९॥

नेपथ्ये – आः को माम् आह्वयति?

घटोत्कचः – हैडिम्बिर्भीमपुत्रोऽहं विश्रामे निरतोऽस्मि हि ।
अकाले मां समाहूय विरक्तं कुरुषे कथम् ॥१०॥

सूत्रधारः – मारिष! विरक्तो घटोत्कच इहैव रङ्गस्थले आगच्छति । अतएव अत्रावस्थानं न समीचीनं । वयमन्यत्र गच्छामः ।

पारिपार्श्विकः – सुष्टु अभिहितम् ।

(निष्क्रान्तौ)

प्रथमाङ्के द्वितीयदृश्यम्

घटोत्कचः – हैडिम्बिर्भीमपुत्रोऽहं विश्रामे निरतोऽस्मि हि अकाले मां समाहूय विरक्तं कुरुषे कथम् ।

दौवारिकः – महाराज! मर्षयतु मर्षयतु भवान् । पाण्डव भवनात् विशेषकार्य्यवशाद् दूतः प्रेषितो भगवता वासुदेवेन । तेनैव भवन्तुमाह्वयामि ।

घटोत्कचः – किं पाण्डव-भवनाद् भगवता वासुदेवेन दूतः सम्प्रेषितः? कुत्र आस्ते सम्माननीय स महाभागः?

दौवारिकः – अत्रै वा पेक्षते भवद्दर्शनाय ।

घटोत्कचः – शीघ्रं ससम्मानं समर्य्यादं प्रवेशय तं महाभागम् ।

दौवारिक – आदिशति महाभागः । (निष्क्रान्तः)

घटोत्कचः – पाण्डवा एव पूज्या मे सर्व्वथा धरणीतले
वासुदेवो जगत् पूज्यस्ततो दूतः समागतः ॥११॥

(दूतेन सह दौवारिकः प्रविशति)

दौवारिकः – प्रविशतु प्रविशतु महाभागः

हिडिम्वातनयो वीरो भीमसेनसुतस्तथा।
महाशक्तिवीरो राजापेक्षते भवतः कृते ॥१२॥

दूत – (उपसृत्य) महाराज!

पान्डवैः प्रेषितश्चास्मि वासुदेवः धीमता।
राक्षसानामधीयस्य भवतः सन्निधावहम् ॥१३॥

दौवारिक – आगच्छतु आगच्छतु भवान्। आसन परिग्रहं करोतु।

दूत – यथा निर्दिशति महाराजः। (उपविशति)

घटोत्कचः – भवतामभ्यर्थनाय किं कर्त्तुं शक्नुयामहम्।

दूतः – भवतां मधुरव्यवहारेणैव अभ्यर्थितोऽस्मि।

घटोत्कचः – अथ मम परमपूज्यचरणाः पितृपादाः, अन्ये पाण्डवाः विश्वपूजिता भगवन्तो वासुदेवाश्च सर्व्वे कुशलिनः?

दूतः – कुशलिनः शरीरेण सर्व्वे तिष्ठन्ति सर्व्वतः।
स्वस्थान मनसा ते तु भवन्त्येव कथञ्चन ॥१४॥
अथ भवतः अनामयं कुशलञ्च पृच्छन्ति वासुदेवपुरःसरा युधिष्ठिरादयः सर्व्वे पाण्डवाः।

घटोत्कचः – आशीर्वादेन तेषां हि देहेन मनसा तथा
कुशली सर्व्वतश्चास्मि स्वस्थः सुखी च सर्व्वतः ॥१५॥
किन्तु तेषां मानसिका स्वस्थता वार्त्ता श्रुत्वा अतीव व्याकुलोऽस्मि।
शीघ्रमभिधीयतां कारणम्।

दूतः – भवान् किं कमपि संवादं न जानाति?

घटोत्कचः – किं वृत्तं सङ्घठितम्? कथयतु शीघ्रं। किमपि नाहं जानामि।

दूतः – छलेन दुर्य्योधन एष राजा

सर्व्वांश्च पाण्डोस्तनयान् दुरात्मा
सादित्य वर्षानि वने निवास्य।
अज्ञातवासेन तथैव वर्षं

संक्लेश्य चासौ नहि पूर्णतृप्तः ॥१६॥

घटोत्कचः – किं मम पितृन् एवं क्लेशयति दुरात्मा दुर्योधनः।

दूतः – न केवलम् एवमेव। अपिव श्रुयताम्

द्रौपदीं जननीं पूर्ण्यं वस्त्राकर्षेण दुर्ज्जनः।

क्लेशयति सभामध्ये पापिष्ठोमनुजाधमः ॥१७॥

घटोत्कचः – आः धिक् धिक् एतदपि मया श्रोतव्यमासीत्

पिता मे किं गदाशून्यश्चूर्णयति न मस्तकम्।

गाण्डीवेन विना किन्नु गान्डीवीवर्त्ततेऽधुना ॥१८॥

पापान्येवं चरन्नेष जीवत्यद्यापि भूतले।

क्षमां कुर्वन्ति यद्येते नाहं क्षमामि लेशतः। ॥१९॥

अद्यैव यास्मामि ससैन्य एव

निहन्मि दुर्योधनमेव तूर्णम्।

अन्यांश्च सर्व्वान् कुरु वंशजातान्

संघातयाम्येव निमेषतो हि ॥२०॥

दूतः – रक्षोराज! शान्तो भवतु। धैर्य्यं धरतु। मैत्र्य स्थानाय वहुधा प्रचेष्टितोऽपि भगवान् प्रत्याख्यातो दुरात्मन तेनैव आतिकैः पाण्डवैः कुरुक्षेत्रे युद्धम् उद्योगपरैः भूयते।

घटोत्कचः – सुष्ठ्वेव क्रियते।

दूतः – तत्, समैन्या भवन्तः युद्धेऽस्मिन् पाण्डवपक्षग्रहणाय आमन्त्रास्ते भगवता वासुदेवेन।

घटोत्कचः – अत्र पुनः का कथा? भवान् तत्र गत्वा कथयतु

अद्यैव यास्यामि वलेन युक्तः

सञ्चूर्णयाम्येव कुरुन् समग्रान्।

तातापमानप्रतिशोधमेव

गृह्णामि युद्धे वलिनां समक्षम् ॥२१॥

दूतः – विजयातं रक्षोराजः। प्रतिगच्छामि पाण्डवशिविरम्।

घटोत्कचः – गच्छतु भवान्। अहमप्यचिरमेव गच्छामि।

(निष्क्रान्ताः सर्व्वे)

द्वितीयाङ्के प्रथमदृश्यम्

युधिष्ठिरः – वासुदेव! किमेतत् सम्वृत्तम्?

वर्त्तमाने महायुद्धे संस्थिते त्वयि माधवे।
अभिमन्यू रणे शेते निर्व्वान्धिव इवाद्यहा ॥२२॥

कृष्णः – धर्म्मराज! कथमेवं विचलितो भवसि?

दैवस्य प्रतिरोधं वा केन कर्त्तुं प्रशक्यते।
निर्द्धारितन्तु यत्पूर्व्व भविष्यत्येव तद् ध्रुवम् ॥२३॥
अवश्यं यद् भवेत् पृथ्व्यां वाधस्तस्य न सम्भवेत्।
नोचेद् राम नलादीनां दुःखमेतद् कथं भवेत् ॥२४॥

युधिष्ठिरः – वासुदेव! अवश्यम्भाविभावस्य अप्रतिवोधत्वे कथं तर्हि अस्माभिरेवं प्रयासः क्रियते?

कृष्णः – धर्मराज! कथं विस्मरसि?

पूर्व्वजन्मनि कर्म्माणि कृतानि यानि भूतले।
प्राणिभिस्तानि भुज्यन्ते दैवरूपेण सर्व्वतः ॥२५॥

युधिष्ठिरः – पूण्यशीलेन अभिमन्युना पूर्व्वजन्मनि किमेवं कुकर्म्मानुष्ठितं यस्य फलेन यौवनप्रारम्भे एव मृत्युस्तमावृणोत्।

कृष्णः धर्म्मराज! श्रुयताम्

मुनिशापवशाच्छन्द्र आगतोऽसौ धरातले।
शापशेषाद् गतश्चैव शापमुक्तो निजोगृहे ॥२६॥

युधिष्ठिरः – नियम एष एवस्यां यदि च धरणीतले।
नवीन कर्म्मपाशेन कथं वद्धा भवेम भोः ॥२७॥

कृष्णः – कृतं कालेन सर्व्वं हि निमित्तं यूयमेव हि।

युष्मान् विनापि कार्य्याणि भविष्यन्ति न संशयः ॥२८॥

युधिष्ठिरः – कालचक्रेण कार्य्यं स्याद् यदि सर्व्वं जनार्द्दन।
गुरु हत्यादि पापेन लिप्ताः स्याम वयं कथम् ॥२९॥

कृष्णः – मद्वाक्ये प्रत्ययाभावो धर्म्मराज यतस्तव।
रुध्यतां समरं यत्नात् त्वयैव पाण्डुनन्दन ॥३०॥

युधिष्ठिरः – कृष्णवाक्ये तु मे नास्ति संशयो लेशतः क्वचित्।
गुरु हत्यादि पापस्य भयेन विह्वलोऽस्मि भोः ॥३१॥

कृष्णः – भवतु, समररोधाय पुनश्चेष्टयते तव वाक्येन।

युधिष्ठिरः – वासुदेव! तथैव क्रियताम्। एवं प्रतिनियतं स्वजनवियोगं सोढुं कथमपि न शक्नोमि।

कृष्णः – यत्यते मया। फलन्तु परिज्ञातमेव। कः कोऽत्र भोः।

दौवारिकः – (प्रविश्य) विजयतां द्वारकाधिपतिः। एषोऽहमस्मि।

कृष्णः – शीघ्रं घटोत्कचमाहूयताम्।

दौवारिकः – यदादिशति देवः। (निष्क्रान्तः)

युधिष्ठिरः – वासुदेव!

सुभद्राया दशाचाद्य वीरोत्तमस्य फाल्गुनेः।
लेशतश्चिन्त्यते यावत् हृदयं दीर्यते मया ॥३२॥

यदैव सर्व्वस्या आपस्त्वहमेव कारणमिति स्मरामि तदैव आत्मनि महान् धिक्का आयाति। वासुदेव! मम कृते सुभद्रा जनन्यद्य निःसन्ताना। किं मया कृतम्। कथमस्मान्मम् मुक्तिर्भविष्यति?

कृष्णः – धर्म्मराज! कथं भवता एवं पुनः पुनर्विचिन्तयता अतीव खद्यते? धर्म्मज्ञे त्वयि नैतद् युज्यते।

युधिष्ठिरः – कथमपि आत्मानमववोधयितुं नैव शक्नोमि। वासुदेव! किं क्रियेत मया?

घटोत्कचः – (प्रविश्य) मातुल! अभिवादये भवन्तम्।

कृष्णः – स्वस्ति।

घटोत्कचः – मातुल! कथं मां स्मरति भवान्?

कृष्णः – घटोत्कच! अभिमन्युवधजनित शोकतापाभ्यां भृशं कातरो धर्म्मराजः।

घटोत्कचः – मातुल! किं कथयामः। अभिमन्योर्वधेन अस्माकमपि हृदयं विदीर्य्यते।

कृष्णः – तेनैव त्वमाहूतोऽसि।

घटोत्कचः आदिशतु भवान् सवंशं दुर्य्योधनं हत्वा अभिमन्युवधस्य प्रतिशोधं गृह्णामि।

कृष्णः – नहि नहि, तन्न कार्य्यम्।

घटोत्कचः – तर्हि किं क्रियेत मया?

कृष्णः – धृतराष्ट्र नृपस्याग्रे गच्छ त्वमधुनैव हि।

मम वाक्याद् वदास्मै च समरस्य निवृत्तये ॥३३॥

अभिमन्युं निहत्यापि जीविष्यन्तीह कौरवाः।

प्रतिज्ञा फाल्गुनेश्चापि पूर्णा नैव भविष्यति ॥३४॥

कृष्णः – एतद्विचारणया अलम्। शीघ्रं मत्प्रतिनिधिर्भूत्वा धृतराष्ट्रस्य समीपे गत्वा युद्धप्रतिरोधाय निवेदय।

घटोत्कचः – न वुधे चक्रिनो भवतश्चक्रम्। त्वद्बोधस्य नास्ति मे प्रयोजनम्। निदेशवर्त्तिनो वयम् अविचार्य्यैव निर्द्देशं पालयामः। एषोऽहं गच्छामि।

(निष्क्रान्तः)

द्वितीयाङ्के द्वितीयदृश्यम्

धृतराष्ट्रः – सञ्जय! किं कथयसि? सुभद्रा हृदयानन्दनः अर्ज्जुननयनमनिः वासुदेवस्नेहाश्रयः सकलपाण्डवप्रीत्याकरः अभिमन्युः सप्तरथि परिवेष्टितः अन्यायभावेन घातितः?

सञ्जयः अथ किं महाराज!

रथिभिः सप्तभिस्तावद् द्रोणमूख्यैर्महावलैः।

अन्यायेन निरस्त्रोऽसावभिमन्युर्निपातितः ॥३५॥

धृतराष्ट्रः – हा धिक् कष्टम्।

जानामि मद्यो मम वंशनाश

स्त्ववश्यमेवेह भवेन्न रक्षा।
वंशस्य कस्यापि कथञ्चनैव
कर्त्तुञ्च शक्यं न मयाद्य किञ्चित् ॥३६ ॥
वंशस्य नाशो मम भालदेशे
द्रष्टव्यरूपेण सुचिह्नितो हि।
विरूपभावेन कथं विधात्रा
पापां मया किं चरितं मया हा ॥३७ ॥

सञ्जय – महाराज! शान्तो भवतु। धैर्य्यं धरतु। अस्थिरो मा भवतु। अयन्तु आरम्भः। अधुनैव यदि एवम् अस्थिरो भवेत्। तर्हि भविष्यति कीदृशी दशा स्यात्?

धृतराष्ट्रः – नहि नहि सञ्जय अहं शान्तो भवामि, धैर्य्यं धरामि, अस्थैर्य्यं त्यज्यमि।

घटोत्कचः – (नेपथ्ये) पितामह! एतेन विना का वा भवति वर्त्तते भवतः।

धृतराष्ट्रः – कस्त्वम् ? सञ्जय! कोऽसौ समागतः ?

घटोत्कचः – (प्रविश्य) पितामह!

हैडिम्विर्भीमपुत्रोऽहं घटोत्कच इति श्रुत।
प्रेषितो दूतरूपेण वासुदेवेन साम्प्रतम् ॥३८ ॥

धृतराष्ट्रः – घटोत्कच! कथय कथय किमाज्ञापयति भगवान् वासुदेवः।

घटोत्कचः – प्रथमतो वासुदेवेन सविनयमभिवादनं निवेदितं भवेत।

धृतराष्ट्रः – नहि नहि, अयुक्तं कृतं तेन। ममैव प्रणामो निवेदनीयस्तस्मै।

घटोत्कचः – दूतोऽहं तथैव करोमि। अधुना मम प्रणामो गृह्यतां भवता।

धृतराष्ट्रः – एह्येहि वत्स! मह्यं आलिङ्गनं देहि।

घटोत्कचः – (स्वगतम्) अत्रैव सावधानीकृतोऽस्मि वासुदेवेन।

आलिङ्गणाच्छलेनासौ शतहस्तिवलान्वितः।
शोकतापविदग्धो हि चूर्णयेद् नास्ति संशयः ॥३९ ॥

धृतराष्ट्रः – पौत्रघटोत्कच! कथं प्रतिशव्द न शृणोमि। कुत्र त्व गतोऽसि।

घटोत्कचः – पितामह! अहमत्रैव तिष्ठामि। किन्तु

राक्षसेन मनुष्यस्यालिङ्गनं युज्यते कथम्।

विचिन्त्य विरतश्चास्मि वाक्यतस्ते पितामह ॥४० ॥

आलिङ्गनं तिष्ठतु। अधुना तिष्ठतु अन्यस्य कस्यचित् कार्य्यस्य प्रसङ्गे श्रुयतां वासुदेववार्त्ता।

धृतराष्ट्रः – त्वरितं कथय वासुदेव-निर्देशम्।

घटोत्कचः – श्रुयतां पितामह!

अभिमन्युवधं श्रुत्वा पाण्डवाः शोकविह्वलाः।
समरे किं करिष्यन्ति वक्तुं केन हि शक्यते ॥४१ ॥

धृतराष्ट्रः – घटोत्कच! किं कथयामि

आर्जुने वधमाकर्ण्य दीयतिं हृदयं मम।
अन्यायेन वधस्तावद् घृणाया अपि कारणम् ॥४२ ॥

घटोत्कचः – अपि च श्रूयताम् –

जयद्रथस्य मुख्यस्य घातकस्य वधाय हि।
अर्ज्जुनेन प्रतिज्ञैषा भानोरस्तगतेः पुरा ॥४३ ॥

धृतराष्ट्रः – सञ्जय! किं कथयत्येष घटोत्कचः! जयद्रथ एव अभिमन्युवधे मुख्यभूमिकामग्रहीदिति?

सञ्जयः – महाराज! यथार्थमभिधीयते घटोत्कचेन।

धृतराष्ट्रः – हा वत्से दुःशले! तव अवैधव्यदशाया अद्यैव परिसमाप्तिः।

घटोत्कचः – पितामह! केवलं दुःशलामुद्दिश्य कथं शुच्यते?

पुत्राणां शतमेवैव तवाचिरादा विनश्यति।
स्नुषाणामपि सर्व्वासां दशा त्वया विचिन्त्यताम् ॥४४ ॥
तव पौत्राः समग्राश्च विनश्यन्त्य चिरादेव।
वंशीयस्तवचैकोऽपि जीविष्यति न कश्चन ॥४५ ॥

धृतराष्ट्रः – सञ्जय सञ्जय! घटोत्कचं प्रतिनिवर्त्तय मामपि अन्यत्र नय।

घटोत्कचः – पितामह! अहन्तु अधुनैव गमिष्यामि। अथ वासुदेवादेशाद् विज्ञापयामि

कुलस्थितौ तवेच्छा स्यात् कापि धीमन् कथञ्चन
अद्यापि युद्धतः पुत्रं दुर्य्योधनं निवर्त्तय ॥४६ ॥

धृतराष्ट्रः – ममाभिवादन निवेदन पूर्व्वकं निवेद्यतां भगवान वासुदेवः

असमर्थो भवाम्यत्र कर्त्तुं नार्हो हि किञ्चन।

पापवीजफलं तस्माद् भोक्तव्यं किं करोम्यहम्॥४७॥

घटोत्कचः – तथैव निवेदयिष्यामि।

(निष्क्रान्तः)

तृतीयाङ्के प्रथमदृश्यम्

दुर्य्योधनः – मातुल! श्रुतं भवता?

शकुनिः – दुर्य्योधन! किमभवत्?

दुर्य्योधनः – दूतं प्रेषितो वासुदेवेन।

शकुनिः – कथम्

दुर्य्योधनः – भीतिप्रदर्शनमुखेन युद्धप्रतिरोध प्रार्थनाज्ञापनाय।

शकुनिः – कस्यसपीपे?

दुर्य्योधनः – दुर्व्वलहृदयस्य जनकस्य समीपे।

शकुनिः – क एष दूतः?

दुर्य्योधनः – भीमात्मजो राक्षस घटोत्कचः।

शकुनिः – योग्योऽपि तु र्योग्यपुत्रः।

दुर्य्योधनः – अर्ज्जुनस्य एवं प्रतिज्ञाद्यनन्तरं एवं प्रस्तावस्य तात्पर्य्यं नोपलभ्यते।

शकुनिः – अभिमन्योर्दशां स्मृत्या भीत भीतास्तुपाण्डवाः।

तेनैव वासुदेवेन प्रस्तावः प्रेषितोऽधुना॥४८॥

दुर्य्योधनः – एवमेव भवितव्यम्।

शकुनिः – अन्धराज एव किं त्वां प्रस्तावमिमं विज्ञापितवान्।

दुर्य्योधनः – अथ किम्।

शकुनिः – किमुक्त त्वया।

दुर्य्योधनः – श्रवणमात्रमेव प्रस्तावोऽसौ मया प्रत्याख्यातः।

शकुनिः – किम कथयत् तदा ते जनक?

दुर्य्योधनः – किमपि नाकथयत्। केवलं करुणं व्यलपत् वृद्धो राजा। (श्रुतिमभिनीय) पाण्डवशिविरे कथं सहसा शङ्खतुर्य्यभेरीध्वनिः।

शकुनिः – तर्हि किं ते रात्रावेव युद्धमभिलषन्ति?

दुर्य्योधनः – एवमेव भवेत्।

शकुनिः – मन्यन्ते समग्रदिवस युद्धव्यापारेण श्रान्ताः क्लान्ता तथा अभिमन्युवध विजयोत् सवेन परिमग्ना सर्व्वे। अतएव अधुनैव आक्रमणेन अस्मत्पक्षीयाः पराभूता भविष्यन्तीति।

दुर्य्योधनः – वुद्धिरियन्तु भ्रान्ता

द्रक्ष्यन्ति तेऽधुना सर्व्वे कौरवानां वलं पुनः।
युद्धाकाङ्क्षा निवृत्तास्याच्छस्त्राघातेन सर्व्वतः ॥४९॥

अलं विलम्वेन

यास्यामि युद्धे महता वलेन शस्त्रैस्तथास्त्रैः परिसज्जितोऽहम्।
सर्व्वांश्चपाण्डोस्तनयान् सपुत्रान् सञ्चूर्णयामि स्ववलेन सद्यः ॥५० ॥

(निष्क्रान्तौ)

तृतीयाङ्के द्वितीय दृश्यम्

कृष्णः – अभिमन्युवधविजयोल्लासेन उज्जीविताः कौरवाः भीषणं युध्यन्ते।

युधिष्ठिरः – वासुदेव! किमद्यैव युद्धस्य परिसमाप्तिर्भवेत्?

कृष्णः – मम तु एतद् युद्धं नानुमतमासीत्।

युधिष्ठिरः – तर्हि कथं प्रवृत्तं युद्धमिदम्?

कृष्णः – मध्यम् पाण्डवेन शङ्खतुर्यादि घोषेण युद्धमिदमाहूतम्।

युधिष्ठिरः – वासुदेव जनार्द्दन! युद्धस्य का परिणतिर्भवेत्?

कृष्णः – परिणतिस्तु परिणतैव आस्ते। अस्माकं दर्शनं सापेक्षते।

युधिष्ठिरः – किन्तु हृदयं अतीव उद्विग्नं भवति। वासुदेव! कमपि उपायं कुरु।

कृष्णः – भवतु दृष्ट उपायः। कः कोऽत्र भोः?

दौवारिक – (प्रविश्य) देव! अभिवादये। एषोऽहमस्मि द्वारदेशे।

कृष्णः – स्वस्ति। शीघ्रं घटोत्कचं प्रवेशय।

दौवारिक – यदादिशति देवः। (निष्क्रान्तः)

युधिष्ठिरः – वासुदेव! घटोत्कचः किं करिष्यति?

कृष्णः – स एव अद्यास्मिन् युद्धे अस्माकं नेता भविष्यति।

युधिष्ठिरः – किम्? घटोत्कचोऽस्माकं नेता भविष्यति।

कृष्णः – अथ किम्।

युधिष्ठिरः – भीमार्जुनादौ अवस्थितेऽपि वालके घटोत्कचे नेतृत्वं दातुमिच्छसि?

कृष्णः – अथ किम्।

युधिष्ठिरः – कस्तेऽभिप्रायः?

कृष्णः – यथाकाले ज्ञास्यसि।

घटोत्कचः – (प्रविश्य) अभिवादये मातुलम्।

कृष्णः – अविनश्वर कीर्तिभान् भव।

घटोत्कचः – मातुलो मां स्मरति?

कृष्णः – अथ किम्?

घटोत्कचः – आदिशतु मातुलः।

कृष्णः – वत्स!

अभिमन्योर्वधेनाद्य शोकविश्वलमानसाः।
पितरस्ते भवन्त्येव युद्धे किंवा भविष्यति॥५१॥

घटोत्कचः – मातुल! कं चिन्तयति भवान्?

सति पुत्रे कथं योग्ये चिन्त्येत जनकेन हि।
पुत्र एव पितुः कार्य्यं करिष्यति न संशयः॥५२॥

अतएव चिन्त्या परित्यजतु भवान्।

समापयाम्यहं सद्यः पितृणां कार्य्यमुत्तमम्।
युद्धपरिसमाप्तिः स्याद द्यैव नहि संशयः॥५३॥

कृष्णः – वत्स घटोत्कच! तथैवास्तु। अद्य त्वमेव नेतृत्वभारं गृहाण।

घटोत्कचः – नेतृत्वेन नास्ति प्रयोजनम्। भवतामनुवर्तिना भवतामादेशः परिपाल्येत मया।

कृष्णः – वत्स घटोत्कच!

दुर्योधनस्य चौद्धत्यं स्मर्त्तव्यं सर्व्वदा त्वया।
दूतस्त्वं प्रेषकश्चाहं प्रत्याख्यातं तथाप्यहो ॥५४॥

घटोत्कचः – यस्यैव पश्चाच्छ मनः प्रयाति
कर्णे प्रवेशो नहि वन्धु वाचः।
तस्य क्वचित् स्याद्धि कथाञ्चदेव
विवेरियं नीतिरिहैव दृष्टा ॥५५॥

मातुल! भवन्निर्द्देशं यथायथमेव पालयामि।

कृष्णः – गच्छ वत्स! अविनश्वरकीर्तिभाग भव।

(निष्क्रान्ताः सर्व्वे)

चतुर्थाङ्के प्रथम दृश्यम्

दुर्य्योधनः – मातुलः! अद्य अतीव सङ्कुलं युद्धं वर्त्तमानम्। पाण्डवपक्षीयस्य आक्रमणेन अस्मद्दलं छिन्नभिन्नं पलायमानञ्च दृश्यते।

छिन्नञ्च भिन्नं सकलं वलं मे
स्थातुं न शक्तं पुरतः कथञ्चित्।
प्राणप्ररक्षार्थमिहैव सर्व्वं
पलायमानं समरे भयेन ॥५६॥

रथं विचूर्णं करिणो मृताश्च
हयास्तथैवाद्यमृतिं प्रयान्ति।
पदातिकाः सैन्यगणास्तथैव
पलायमाना भयतः समन्तात् ॥५७॥

शकुनिः – पुरोभागे पाण्डवेषु कोऽपि नावलोक्यते तर्हि कस्य नेतृत्वेन पाण्डवानां युद्धं प्रचलति?

दुर्य्योधनः – क न जानीषे?

घटोत्कचो राक्षसभूप एषः
जग्राह युद्धे परिचालकत्वम्।
तन्नेतृतायां समरं महोग्रं
करोति दग्धं तृणवद् मदीयम्॥५८॥

शकुनिः – घटोत्कचे एतावती शक्तिः!

दुर्य्योधनः – कथं न भवेन्मातुल!

अभिमन्युवधेनाद्य हविषा दहनो यथा।
तथा प्रदीप्त एवासौ करोति विक्रमं रणे॥५९॥
अपि च हिडिम्वातनयश्चासौ भीमसेन सुतस्तथा।
उभयोः प्राप्त वाञ्छक्तिं मानुषीं महावलः॥६०॥

शकुनिः – अपि च मन्ये

पाण्डवेषु तथान्येषु प्रतिष्ठाकाम्यया पुनः।
अमानुषं वलं सम्यग् दर्शयत्येष राक्षसः॥६१॥

दुर्य्योधनः – भवितुर्महति।

समाप्तिः किं भवेदद्य सर्व्वस्य समरस्य नु।
जयाशा दूरतो याता कथं रक्षा भवेद्धिः नः॥६२॥

शकुनिः – कथमेवं विचिन्त्यते त्वया।

समरेऽस्मिन् परिश्रान्ता अस्मदीयास्तु सैनिकाः।
निमेषाय पलायन्ते सङ्घवद्धास्तु ते पुनः॥६३॥

अपि च दुर्य्योधन! कथं विस्मर्य्यते

निर्व्वाणकाले परिदीप्त एव
कर्पूरवह्निर्हि सदा विलोक्यते।
तथैव चिन्ता किमु दीप्त वुद्धेः

कदापि केनापि च दृश्यते भोः ॥६४॥

दुर्य्योधनः – प्रगृह्य सर्व्वान् मम सैन्यवर्गान्
प्रयाति मृत्योः सदनं स्वयञ्च।
तेनैव किं मे भविता फलं वा
निःशेभिते सैन्यगणे रणेऽस्मिन्॥६५॥

शकुनिः – दुर्य्योधन! धैर्य्यं धर, विचलितो मा भव।
मयि तिष्ठति भो राजं श्चिन्ता का ते प्रवर्त्तते।
समस्यानां समाधानं मयैव क्रियते सदा॥६६॥
अद्यापि सर्व्वसमस्यानां समाधानमचिरेणैव भविष्यति।

दुर्य्योधनः – यदि किमपि समाधानं ज्ञायते त्वया तर्हि अधुनापि कथं चिश्चेष्टेन अवस्थीयते त्वया?

शकुनिः – नहि नहि, निश्चेष्टो नाहं स्थास्यामि। अधुनैव व्यवस्थां करोमि। चल अङ्गराजशिविरं गच्छामि।

दुर्य्योधनः – तत्र गमनेन किं स्यात्?

शकुनिः – तत्रैव समाधानं वर्त्तते।

दुर्य्योधनः – तर्हि चल।

(निष्क्रान्तौ)

चतुर्थाङ्के द्वितीय दृश्यम्

कर्णः – आगच्छ आगच्छ कौरवराज! आगच्छ मातुल। क्रियताम् आसन-परिग्रहः।
(उभौ उपविशतः)

कौरवराजः – कथम् ईदृश्यां रजन्यां त्वं समागतोऽसि? कथं वा चिन्तान्वितो व्याकुलश्च परिलक्ष्यसे?

दुर्य्यो – युद्धस्य संवादं सम्यग् न जानामि?

कर्णः – रात्रौ युद्धमारव्धमिति श्रूतम्। युद्धेऽस्मिन् तथा गुरुत्वं नास्माभिरर्पितम्। शोकखिन्नैः पाण्डवैस्तत्पक्षीयैर्वा किं वा कर्त्तुं प्रशक्येत इति मत्वैव वयं उदासीनाः स्मः।

दुर्य्योधनः – अतीव भयङ्करं युद्धं प्रवृत्तम्। अद्य अस्माकम् अस्तित्वं स्थास्यति नवेति महान् संशय आगतः

कर्णः – एवं ननु? तर्हि अधुनैव युद्धे गच्छामि।

शकुनिः – अङ्गराज! केवलं गमनेन कार्य्यसिद्धिर्नैव भविता। भीमसेनपुत्रो हैडिम्विर्घटोत्कचः अद्य अतीव भीषणं युध्यति। एकेनैव तेन समग्रं कौरववलमाकुलीकृतम्।

कर्णः – मा चिन्तय।

पश्यामि युद्धे कियती शक्तिः
भीमात्मजे वर्त्तते एव चास्मिन्।
अस्त्रैश्च शस्त्रैर्नितरां प्रहृत्य
सम्पातयाम्येव रणेचिराद्धि ॥६७॥

शकुनिः – तवोपयुक्तमेव वचनं त्वमभिदधासि। किन्तु घटोत्कचोऽसौ न साधारणो योद्धा।

राक्षस्या मायया युक्तोऽमानुषोऽसौ महावलः।
आवृणोतिक्षणादेव सर्व्वञ्च समरस्थलम् ॥६८॥

कर्णः – अस्त्रैश्चदैवैः सकलैश्चशस्त्रै
र्मायां समग्रामति मानुषीताम्।
संहृत्य शक्त्या निजयाचिरेण
सद्योहनिष्यामि घटोत्कचं तम् ॥६९॥

शकुनिः – कः संशयस्तवस्मिन् वचने। तथापि एकपुरुषघातकम् इन्द्रप्रदत्तमस्त्रं तुनिरे संर ।

कर्णः – नहि नहि। अन्यत्र कुत्रापि अस्य प्रयोगः कथम् नैव युज्यते।

दुर्य्योधनः – अङ्गराज! परं मित्र! जीवने रक्षिते परवर्त्तिनी अर्ज्जुन जयः कथं सम्भवेत्?

कर्णः – कौरवराज! कथमेवम् आशङ्कसे। अधुनैव युद्धे घटोत्कचं विचूर्णयामि। त्वं मा चिन्तय।

दुर्य्योधनः – नाहं चिन्तयामि। तथापि अद्य घटोत्कचो दुर्व्वारोऽभवत्। तेनैव त्वयि एवं प्रार्थना।

कर्णः – महाराज! कथं प्रार्थनेत्युच्यते। आदेश इत्याभिधीयताम्।
विधेर्यथैवेच्छा तथैवास्त। तर्हि आदिश युद्धे गच्छामि।

प्रयामि युद्धे परिसज्जितः सन्
घटोत्कचस्यास्य वधाय तूर्णम्।
निहत्यरक्षो वलतोऽर्ज्जुनञ्च
निष्पाण्डवां भूमिमहं करोमि ॥७० ॥

शकुनिः – विधिस्ते सहायो भवतु। अलं विलम्वेन। वयं सर्व्वे एव युद्धे व्रजामः।

(सर्व्वे निष्क्रान्ताः)

पञ्चमाङ्के प्रथमदृश्यम्

कृष्णः – धर्म्मराज! उदासीनेऽपि त्वयि युद्धन्तु चलत्येव। एवञ्च युद्धेऽस्मिन् कौरवराजस्य पराजय आसन्नप्राय एव।

युधिष्ठिरः – किं कथयामः। नियतिर्निर्वाधा सत्येव अग्रसरति स्वीयपत्रेय। यथा तवेच्छा तथैव भवतु। किं वा मया क्रियेत।

कृष्णः – धर्म्मराज! मया प्राज्ञेवोक्तम्। कालः स्वेच्छयैव प्रसरति। अन्यस्य कस्यापि तत्र किमपि सामर्थ्यं नास्ति। वयन्तु सर्व्वे एव निमित्तमात्रम्। अत्र सुखस्य दुःखस्य वा किमपि नास्ति। एतदेव सर्व्वतोऽवधारणीयम्। भवतु युद्धस्य सम्प्रति कीदृशी अवस्था सा ज्ञेया। कः कोऽत्र भोः?

दौवारिक – (प्रविश्य) जयति देवः एषोऽहमस्मि।

कृष्णः – गच्छ, श्रीघ्रं युद्धवृत्तान्तं ज्ञायताम्।

दौवारिक – यदादिशति देवः। (निष्क्रान्त पुनः प्रविश्य)
जयति देवः। देव! भीषणं युद्धं प्रवर्त्तते।

घटोत्कचस्यास्य पराक्रमेण

पलायमानाः कुरुसेनका हि।
पराजयं निश्चितमेव दृष्ट्वा
समागत स्त्वङ्गनृपः सशस्त्रः ॥७१॥

कृष्णः – किम्? अङ्गराजः समागतः?

दौवारिक – अथ किम् देव!

कृष्णः – (स्वगतम्) तर्हि धनञ्जय जयाय यथायथं चिन्तितं तथैव सर्व्वमापद्यते।

युधिष्ठिरः – वासुदेव! किं विचिन्त्यते त्वया?

कृष्णः – नहि नहि, कथं चिन्तयिष्यामि। किन्तु धर्म्मराज!
सम्प्रति घटोत्कचमनोवलवृद्धये अस्माभिरपि समरे गन्तव्यम्।

अङ्गराजे महावीरे समायाते रणे स्वयम्।
भविष्यति महायुद्धं संशयो नास्ति कश्चन ॥७२॥

तस्माद् अधुना घटोत्कचपार्श्वे अस्माभिरपि अवश्यमेव अवस्थातव्यम्।

युधिष्ठिरः – वासुदेव! यथा तवेच्छा तथैव भवेत्। तदतिक्रमणे कस्यास्ति किमपि सामर्थ्यम्।

कृष्णः – धर्म्मराज! विलम्वेनालम्। चलामो वयम्।

युधिष्ठिरः – वाढम्।

(निष्क्रान्तौ)

पञ्चमाङ्के द्वितीयदृश्यम्

घटोत्कचः – अङ्गराज! समागतोऽसि? आगच्छ। अद्यैव ते वलं परीक्षितं स्यात्।

अभिमन्युर्न चैवास्मि वालको दुर्व्वलो रणे।
चलिष्यति तथा नात्र हतवन्तो यथा शिशुम् ॥७३॥

कर्णः – वीर्य्यं प्रकाश्य वाक्येन किं फलमुपजायते।
कार्म्मुकेऽसौ निजा शक्तिः प्रकाशिता भवेद्ध्रुवम् ॥७४॥

घटोत्कचः – असिं वा कार्म्मुकं वापि यथेच्छं प्रतिगृह्यताम्।

वाहुयुद्धे रुचिः स्याद् वावयोरस्तु तथैव भोः ॥७५॥

कर्णः – गृहाण् कार्म्मुकं रक्षो धनुर्युद्धं प्रवर्त्तताम्।
परीक्षिता भवेच्छक्तिर्भाषणे कार्म्मुकेऽथवा ॥७६॥

(भीषणं युद्धं प्रचलति। कर्णपार्श्वे शकुनिदुर्योधनै घटोत्कचपार्श्वे कृष्णयुधिष्ठिरौ अवस्थितौ)

कृष्णः – घटोत्कच! युध्यस्व युध्यस्व। नास्ति भयम्। कौरवानां पराज आसन्नप्रायः।

दुर्य्योधनः – अङ्गराज! सर्व्व एव सैनिकाः प्रायेण पलायिताः अलं कालक्षेपेण। शीघ्रं इन्द्रदत्तमास्त्रं प्रक्षिप।

कर्णः – (स्वगतम्) का गतिः। विधे! अत्रापि त्वया पराभूतोऽस्मि। (इन्द्रदत्तमास्त्रं क्षिपति)

घटोत्कचः – अये! कर्णकाम्मुकविनिर्गताद् वाणाद् पर्वतप्रमाणो वह्निराशिर्मां धावति। अहो किं करोमि। नास्ति मे परित्राणम्। माधव माधव! तव चरणयुगले आश्रयं देहि मे।

कृष्णः – वत्स! त्वं स्वीयमहत्त्वेनैव मामधिगतोऽसि। अधुनैव मुक्तः सन दिव्यदेहेन वैकुण्ठलोकं गच्छ।

घटोत्कचः – कृतार्थोऽनुगृहीतोऽसि।

कृष्णः – अतपर किन्ते प्रयच्छामि।

घटोत्कचः – अतः परमपि प्रार्थना? तथापीदमस्तु

हिंसादिशून्या निजवान्धवेषु
स्वभावसिद्धाः परिपूतचित्ताः।
स्वकर्ममग्राः नृहिते विलग्ना
भवन्तु सर्वे मनुजा धरण्याम्॥७७॥

इति भरद्वाजगोत्रोद्भवो रामगोपालस्मृतिरत्नात्मजश्रीनित्यानन्दमुखोपाध्यायरचितं घटोत्कचवधनाटकं १३९३ वङ्गाव्दीयसौरज्यैष्ठस्योणत्रिंशदिवसे समाप्तम्।

त्रिंशत्संख्यकनाटकमिदम्।

৫.১ নাটকের বঙ্গানুবাদ

শ্রী নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়

রচিত নাটক

ঘটোৎকচবধ

প্রথমাঙ্কের প্রথম দৃশ্য

নান্দী

পুরুষদিগের প্রধান, এই বিশ্বে সকলের পূজনীয়, যার কীর্তি অনন্ত, বহুরূপধারণকারী যে আদিদেবতা, সেই করুণাময় ভগবান মহেশ্বর তোমাদেরকে রক্ষা করুন।। (১)

সুত্রধার : (প্রবেশ করে) আর্যগণকে অভিবাদন জানাই। আজ দেববাণীপ্রচারমহোৎসবে কোন একটি নূতন নাটক প্রয়োগ করার জন্য পারিষদগণ কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছি। নাটক বিবেচনা করার জন্য আমি এবার পারিপার্শ্বিককে আহ্বান করি- ওহে মারিষ! রঙ্গমঞ্চে এসো।

পারিপার্শ্বিক : মহাশয়! এই যে আমি এসেছি।

সুত্রধার : আজ এই দেববাণীপ্রচারমহোৎসবে কোন একটি নূতন নাটক মঞ্চস্থ করুন এই আদেশ আমি পারিষদগণের কাছ থেকে পেয়েছি। সুতরাং কোন প্রকরণ আশ্রয় করে তা করা যায় সেটা নিরূপণ করা উচিত।

পারিপার্শ্বিক : আমার মনে হয় মহাভারতাশ্রিত কোন প্রকরণ আশ্রয় করেই নাট্যপ্রয়োগ করা উচিত।

সূত্রধার : মহাভারত তো অনন্ত রত্নের ভাণ্ডার।

মহাভারতের মধ্যে তো সমস্ত কিছুই প্রবর্তিত হয়। তাই মহাভারতে যা নেই, তা সমগ্র বিশ্বেও নেই।। (২)

সুতরাং সামান্যভাবে না বলে বিশেষভাবে বলো।

পারিপার্শ্বিক : মহাশয়! ক্ষমা করবেন।
পণ্ডিত রামগোপাল শর্মার খ্যাতিমান পুত্র শ্রী নিত্যানন্দ শর্মার মহাভারতাশ্রিত একটি নূতন নাটক রয়েছে।। (৩)
যার আখ্যান প্রধানতঃ দ্রোণপর্বাশ্রিত এই নূতন নাটকের নাম *ঘটোত্কচবধ*।।\(৪)
স্ত্রীচরিত্রবর্জিত ক্ষুদ্রাকার এই নাটক কাঠিন্যরহিত।। (৫)

সূত্রধার : আচ্ছা! তাহলে এই নাটকই মঞ্চস্থ করা হোক।

পারিপার্শ্বিক : তাই হোক! আপনি রঙ্গস্থলকে যথাযথভাবে সজ্জিত করুন। আমিও কুশীলবগণকে সজ্জিত করি।

সূত্রধার : তাই হোক। তুমি তাড়াতাড়ি যাও। কুশীলবদের সাজিয়ে তাড়াতাড়ি এখানে এস।

পারিপার্শ্বিক : মহাশয় যেমন আদেশ করেন। (নিষ্ক্রান্ত)

সূত্রধার : আর্যগণ শুনলেন? আজ আমরা মহাভারতাশ্রিত *ঘটোত্কচবধ* নাটক মঞ্চস্থ করতে প্রযত্ন করব।
অতএব আপনারা অবহিত হোন। আমিও রঙ্গস্থল সজ্জিত করি। এই হল দ্বারসমূহ। আর এইদিকে এইগুলি উপদ্বার। এটি মণ্ডপের মধ্যভাগ।

পারিপার্শ্বিক : (প্রবেশ করে) মহাশয়! সর্বনাশ হয়ে গেছে।

সূত্রধার : কীভাবে?

পারিপার্শ্বিক : নাটকের নায়কের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা তাই চিন্তাকুল হয়ে আছি যে, কীভাবে নাটক শুরু করব।। (৬)

সূত্রধার : পারিষদদের নিয়ে যত্নসহকারে খুঁজেছ কি? কোথায় বা যাবে? দেখো এখানেই কোথাও আছে।। (৭)

পারিপার্শ্বিক : সকলেই ভালো করে খুঁজছে মহাশয়, তবুও তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। এখন আপনিই প্রযত্ন করুন। এছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।। (৮)

সূত্রধার : আচ্ছা দেখছি।

ঘটোত্কচ মহোদয়! কোথায় আপনি এখন? ওহে ভীমতনয়! আপনার জন্য আমরা সকলে ব্যাকুল। আপনি শীঘ্র আসুন।। (৯)

নেপথ্যে : আঃ! কে আমাকে ডাকে?

ঘটোত্কচ : ভীম এবং হিড়িম্বার পুত্র আমি ঘটোত্কচ এখন বিশ্রামে নিরত রয়েছি। অসময়ে আমাকে ডেকে বিরক্ত করছ কেন (১০)

সূত্রধার : মারিষ! বিরক্ত হয়ে ঘটোত্কচ এই রঙ্গস্থলেই আসছে। অতএব এখানে থাকা সমীচীন নয়। চলো আমরা অন্যত্র যাই।

পারিপার্শ্বিক : ঠিক বলেছেন মহাশয়।

(উভয়ের প্রস্থান)

প্রথমাঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য

ঘটোত্কচ : ভীম এবং হিড়িম্বার পুত্র আমি ঘটোত্কচ এখন বিশ্রামে নিরত রয়েছি। অসময়ে আমাকে ডেকে বিরক্ত করছ কেন?

দৌবারিক : মহারাজ! শান্ত হোন! শান্ত হোন! ভগবান বাসুদেব পাণ্ডবগণের বিশেষ কার্যের নিমিত্তে দূত প্রেরণ করেছেন। সেজন্যই আমি আপনাকে ডেকেছি।।

ঘটোত্কচ : কি? পাণ্ডবভবন থেকে ভগবান বাসুদেব দূত প্রেরণ করেছেন? তিনি এখন কোথায় আছেন?

দৌবারিক : তিনি আপনার দর্শনের জন্য এখানেই অপেক্ষা করছেন।

ঘটোত্কচ : শীঘ্রই সসম্মানে উপযুক্ত মর্যাদার সহিত পাণ্ডবদূতকে নিয়ে এসো।

দৌবারিক : মহাশয় যা আদেশ করেন। (নিস্ক্রান্ত)

ঘটোত্কচ : এই ধরণীতলে সর্বথা পাণ্ডবগণ পূজনীয় ব্যক্তি। ভগবান বাসুদেব তো জগত্পুজ্য। সেই তাদের কাছ থেকেই আগত দূত উপস্থিত হয়েছেন।। (১১) (দূতের সঙ্গে দৌবারিকের পুনঃপ্রবেশ)

দৌবারিক : মহাশয় প্রবেশ করুন।

হিড়িম্বা তথা ভীমসেনের বীরপুত্র মহাশক্তিধর মহারাজ ঘটোৎকচ আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।। (১২)

দূত : এগিয়ে মহারাজ!

পাণ্ডবগণ এবং ধীমান্ বাসুদেব কর্তৃক উপস্থিত হয়েছি রাক্ষসদের রাজা আপনার কাছে।

ঘটোৎকচ : আসুন আসুন মহাশয়! আসন গ্রহণ করুন।

দূত : মহারাজ যা নির্দেশ করেন। (উপবেশন)

ঘটোৎকচ : আপনার অভ্যর্থনার জন্য আমি কী করতে পারি।

দূত : আপনার মধুর ব্যবহারেই আমি অভ্যর্থিত হয়েছি।

ঘটোৎকচ : আচ্ছা। আমার পরমপূজ্যপাদ পিতৃদেব, অন্য পাণ্ডবগণ এবং বিশ্বপূজনীয় ভগবান বাসুদেব সকলেই কুশলে আছেন তো?

দূত : শরীরের দিক থেকে সকলেই সর্বতোভাবে কুশলে আছেন। কিন্তু মনের দিক থেকে তারা কিছুটা ব্যাকুল।। (১৪)

তারপর আপনার নিরাময়তা এবং কুশল জিজ্ঞাসা করেছেন বাসুদেব এবং যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ।

ঘটোৎকচ : তাদের আশীর্বাদে দেহ ও মনে আমি সর্বতোভাবে কুশল, সুস্থ ও সুখী।। (১৫)

কিন্তু তাদের মানসিক ব্যাকুলতার কথা শুনে আমিও ব্যাকুল হয়ে পড়েছি। শীঘ্র বলো এর কারণ কী?

দূত : আপনি কি কোন সংবাদই জানেন না?

ঘটোৎকচ : কী ঘটনা ঘটেছে? শীঘ্র বলো। আমি সত্যই কিছুই জানিনা।

দূত : এই দুরাত্মা রাজা দুর্যোধন পাণ্ডবগণকে বারো বছর বনবাসে পাঠিয়ে তারপর আবার এক বছর অজ্ঞাতবাসের কষ্ট দিয়েও এখনও তৃপ্ত হননি।। (১৬)

ঘটোৎকচ : কি! আমার পিতৃগণকে দুরাত্মা দুর্যোধন এভাবে কষ্ট দিচ্ছে?

দূত : কেবল এটাই নয়। আরও শুনুন।

জননী দ্রৌপদীকে এই দুর্জন সভামধ্যে এনে পূর্ণ বস্ত্র মোচনের চেষ্টা করে কষ্ট দিয়েছেন।। (১৭)

ঘটোত্‌কচ : আঃ আঃ ধিক্ ধিক্ এটাও আমাকে শুনতে হল।

আমার পিতৃদেব কি গদাশূন্য হয়েছেন? মস্তক চূর্ণ করতে পারেন নি? আর গাণ্ডীব ব্যতীত জীবনধারণ করেছেন।। (১৮)

এইভাবে পাপাচরণ করতে করতে এই দুর্যোধন এখনও ধরাতলে জীবিত হয়ে আছে? ওনারা ক্ষমা করলেও আমি তাকে ক্ষমা করব না। আজই আমি সসৈন্যে গিয়ে দুর্যোধনকে হত্যা করব।। (১৯)

আজই সসৈন্যে যাব দুর্যোধনকে শীঘ্রই হত্যা করব এবং অন্য সকল কৌরবকেবংশজকে আমি নিমেষে ধ্বংস করব।। (২০)

দূত : রক্ষরাজ! শান্ত হোন। ধৈর্য ধরুন। মৈত্রীস্থাপনের বহু প্রচেষ্টা করেছিলেন ভগবান বাসুদেব। কিন্তু তা সফল না হওয়ায় এবার পাণ্ডবগণ সেই দুরাত্মার বিরুদ্ধে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের উদ্যোগ আরম্ভ করেছেন।

ঘটোত্‌কচ : উচিত কাজই করেছেন।

দূত : সুতরাং ভগবান বাসুদেব আপনাকে এই যুদ্ধে সসৈন্যে পাণ্ডবকক্ষ গ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

ঘটোত্‌কচ : আর কী কথা আছে। আপনি সেখানে গিয়ে বলুন যে আজই আমি সৈন্য নিয়ে যাচ্ছি। সমগ্র কুরুবংশকে চূর্ণ করে ফেলব। আমি এই যুদ্ধের শিরোভাগে থেকে পিতৃগণের অপমানের প্রতিশোধ নেব।। (২১)

দূত : রক্ষোরাজের জয় হোক। আমিও শীঘ্র যাই।

ঘটোত্‌কচ : যাও তুমি। আমিও যাচ্ছি।

(সবাই নিষ্ক্রান্ত)

দ্বিতীয়াঙ্কে প্রথম দৃশ্য

যুধিষ্ঠির : বাসুদেব! এটা কী ঘটল?
এই মহাযুদ্ধে হে মাধব! তুমি স্বয়ং উপস্থিত থাকতেও অভিমন্যুকে যুদ্ধক্ষেত্রে সাহায্যের অভাবে একাকী প্রাণ দিতে হল।। (২২)

কৃষ্ণ : ধর্মরাজ! এভাবে বিচলিত হচ্ছেন কেন?
কে ই বা দৈবকে প্রতিরোধ করতে পারে? যা পূর্বেই নির্ধারিত আছে তা নিশ্চিতভাবেই ঘটবে যা হওয়ার তার কখনো বাধাপ্রাপ্তি সম্ভব নয়। নতুবা রাম, নল প্রমুখ রাজা কেনই বা দুঃখভোগ করবেন।। (২৩-২৪)

যুধিষ্ঠির : বাসুদেব! তাহলে অবশ্যম্ভী ঘটনাকে আমরা কেন প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করি?

কৃষ্ণ : ধর্মরাজ! কেন ভুলে যাচ্ছেন?
পূর্বজন্মের কৃত কর্মফলই প্রাণিগণ এই পৃথিবীতে দৈবরূপে সর্বথা ভোগ করে থাকে।। (২৫)

যুধিষ্ঠির : পুণ্যবান অভিমন্যু পূর্বজন্মে কী এমন কুকর্ম করেছিল, যার ফলস্বরূপ সে যৌবনের প্রারম্ভেই মৃত্যুবরণ করল ?

কৃষ্ণ : ধর্মরাজ! শুনুন।
মুনির অভিশাপবশত চন্দ্র এই ধরাতলে তার কর্মফল ভোগ করতে এসেছিল। শাপ শেষ হওয়ার ফলে সে শাপমুক্ত হয়ে নিজগৃহে গমন করেছে।। (২৬)

যুধিষ্ঠির : যদি পৃথিবীতে এটাই নিয়ম হয়, তাহলে নবীন কর্মপাশে আমরা কেন পুনরাবদ্ধ হই।। (২৭)

কৃষ্ণ : তাছাড়া কর্মকালে সর্বদাই তুমিই তো নিমিত্ত। তোমায় ছাড়াও কর্মই সংঘটিত হবে এটাতে কোনো সংশয় নেই।। (২৮)

যুধিষ্ঠির : হে জনার্দন! যদি কালচক্রেই সমস্ত কার্য সংঘটিত হয় তাহলে গুরুহত্যাদি পাপে আমরাই লিপ্ত হই কেন।। (২৯)

কৃষ্ণ : হে ধর্মরাজ! যদি আমার কথায় তোমার অবিশ্বাস তবে হে পাণ্ডুনন্দন তুমি যত্ন সহকারে এই যুদ্ধ বন্ধ কর।(৩০)

যুধিষ্ঠির : কৃষ্ণ বাক্যে আমার কোন সংশয় নেই। শুধু গুরুহত্যাদি পাপের ভয়ে আমি বিহ্বল হয়েছি।

কৃষ্ণ : আচ্ছা! আপনার কথায় আমি পুনর্বার সমর রোধ করার চেষ্টা করছি।

যুধিষ্ঠির : হ্যাঁ বাসুদেব! সেটাই করুন। এভাবে প্রতিনিয়ত স্বজনবিয়োগ কতই বা সহ্য করব?

কৃষ্ণ : প্রয়াস করছি। কিন্তু ফল তো আপনি জানেনই। কে? কে আছো এখানে?

দৌবারিক : (প্রবেশ করে) দ্বারকাধিপতির জয় হোক। এই আমি আছি।

কৃষ্ণ : শীঘ্রই ঘটোৎকচকে ডাকো।

দৌবারিক : মহাশয় যা আদেশ করেন। (প্রস্থান)

যুধিষ্ঠির : বাসুদেব!

সুভদ্রা তথা অর্জুনের আজ যা দশা, তা দেখে যেমন চিন্তিত হচ্ছি, তেমনই হৃদয়ও ব্যাথিত হয়ে উঠেছে।। (৩২)

যখনই বুঝতে পারছি এই সমস্ত ঘটনার কারণ আমি স্বয়ং, তখন নিজের প্রতি আমার প্রবল ধিক্কার জন্মাচ্ছে। বাসুদেব! আমার জন্যই আজ জননী হয়েও সুভদ্রা নিঃসন্তান।

আমি এ কী করলাম! কীভাবে আমার মুক্তি হবে?

কৃষ্ণ : ধর্মরাজ! বার বার আপনি এরকম চিন্তা কেন করছেন? এটা আপনার উপযুক্ত কাজ হচ্ছে না।

যুধিষ্ঠির : আমি কেন নিজেকে প্রতিরোধ দিতে পারছি না বাসুদেব! আমার কী করা উচিত?

ঘটোত্কচ : (প্রবেশ করে) মাতুল! আপনাকে অভিবাদন জানাই।

কৃষ্ণ : কল্যাণ হোক।

ঘটোত্কচ : মাতুল! বলুন আমায় কেন স্মরণ করেছেন?

কৃষ্ণ : ঘটোত্কচ! অভিমন্যুর মৃত্যুজনিত শোকতাপে ধর্মরাজ প্রবলভাবে কাতর হয়েছেন।

ঘটোৎকচ : মাতুল! কী বলব। অভিমন্যুর মৃত্যুতে আমার হৃদয়ও বিদীর্ণ হচ্ছে।

কৃষ্ণ : সেজন্যই তোমাকে ডেকেছি বৎস।

ঘটোৎকচ : আপনি আদেশ করুন দুর্যোধনকে সবংশে হত্যা করে অভিমন্যু বধের প্রতিশোধ নি।

কৃষ্ণ : না না, সে কাজের জন্য নয়।

ঘটোৎকচ : তাহলে আমি কী করতে পারি?

কৃষ্ণ : রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে আজই যাও। আমার কথা বলে যুদ্ধ প্রতিরোধ করার চেষ্টা করো।। (৩৩)

ঘটোৎকচ : কি যুদ্ধের নিবৃত্তি?

অভিমন্যুকে হত্যা করেও কৌরবরা এখনও জীবিত আছে। পিতা অর্জুনের প্রতিজ্ঞা এখনও পূর্ণ হয়নি।। (৩৪)

কৃষ্ণ : এরূপ বিচার করো না। শীঘ্রই আমার প্রতিনিধি হয়ে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে যাও। গিয়ে যুদ্ধ প্রতিরোধের জন্য নিবেদন জানাও।

ঘটোৎকচ : আপনার মতো কূটনীতিজ্ঞের কুটচক্র বোঝা মুশকিল। তাই বোঝার প্রয়োজনও নেই।

নির্দেশগ্রাহক আমরা তো শুধু বিচার না করেই নির্দেশ পালন করি। এই আমি যাচ্ছি।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয়াঙ্কে দ্বিতীয় দৃশ্য

ধৃতরাষ্ট্র : সঞ্জয়! কী বলছ? সুভদ্রার হৃদয়ের পুত্র, অর্জুনের নয়নের মণি, বাসুদেবের স্নেহভাজন, সকল পাণ্ডবের প্রীতির আকর অভিমন্যু সপ্তরথী পরিবেষ্টিত হয়ে অন্যায়ভাবে নিহত হয়েছে?

সঞ্জয় : হ্যাঁ মহারাজ!

দ্রোনাদি মহাশক্তিশালী সপ্ত রথী নিরস্ত্র অভিমন্যুকে অন্যায় ভাবে হত্যা করেছে।। (৩৫)

ধৃতরাষ্ট্র : হা ধিক! কষ্ট।

এখন আমি নিশ্চিত জানি যে আমার বংশনাশ অবশ্যম্ভাবী। এ থেকে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব।

অথচ আমি বংশরক্ষার জন্য কোনোভাবেই কিছু করতে পারছি না।। (৩৬)

আমি কি পাপ করেছি যে বিধাতা কর্তৃক বিরূপভাবে আমার ভাগ্যে বংশের নাশ দ্রষ্টব্যরূপে সুচিহ্নিত হয়েছে। (৩৭)

সঞ্জয় : মহারাজ! শান্ত হোন। ধৈর্য্য ধরুন। অস্থির হবেন না। এ তো সবেমাত্র যুদ্ধের আরম্ভ। এখনই যদি আপনি এরকম অস্থির হয়ে পড়েন তাহলে ভবিষ্যতে কী দশা হবে?

ধৃতরাষ্ট্র : না না আমি শান্ত আছি, ধৈর্য্য ধরছি, অস্থিরতা ত্যাগ করছি সঞ্জয়!।

(নেপথ্যে)

ঘটোত্কচ : পিতামহ! এছাড়া আপনার আর কী ই বা গতি আছে?

ধৃতরাষ্ট্র : কে তুমি? সঞ্জয়! কে উপস্থিত হয়েছ?

ঘটোত্কচ : (প্রবেশ করে) পিতামহ!

হিড়িম্বা ও ভীমের পুত্র আমি ঘটোত্কচ। সম্প্রতি বসুদেব আমাকে দূতরূপে প্রেরণ করেছেন।। (৩৮)

ধৃতরাষ্ট্র : ঘটোত্কচ! বলো বলো। ভগবান বাসুদেব কী আজ্ঞা করছেন

ঘটোত্কচ : প্রথমত বাসুদেব আপনাকে সবিনয় অভিবাদন নিবেদন করেছেন।

ধৃতরাষ্ট্র : না না, এটা তিনি ঠিক করেননি। আমারই প্রণাম নিবেদন করো তাকে।

ঘটোত্কচ : দূত হিসাবে আমি তাই করব। এখন আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

ধৃতরাষ্ট্র : এসো এসো বত্স! আমাকে আলিঙ্গন করো।

ঘটোত্কচ : (স্বগত) এখানেই বাসুদেব সাবধান করেছেন।

আলিঙ্গনে ইনি শতহস্তীসম শক্তিমান। শোকতাপে দগ্ধ ইনি যে শক্তিপ্রয়োগ করে চূর্ণ করে দেবেন তাতে সংশয় নেই।। (৩৯)

ধৃতরাষ্ট্র : পৌত্র ঘটোত্কচ! প্রতিশব্দ শুনছি না কেন? তুমি কোথায় গেলে?

ঘটোত্‌কচ : পিতামহ! আমি এখানেই আছি। কিন্তু মানুষের সাথে রাক্ষসের আলিঙ্গন করা কি উচিত? আপনার বাক্যে আমি সেটা চিন্তা করেই বিরত রয়েছি পিতামহ।। (৪০)

এখন থাক। এখন বরং অন্য কাজের প্রসঙ্গে বাসুদেবের বার্তা শ্রবণ করুন।

ধৃতরাষ্ট্র : বাসুদেবের নির্দেশ শীঘ্র জানাও।

ঘটোত্‌কচ : শুনুন পিতামহ!

অভিমন্যুর মৃত্যুর কথা শুনে শোকবিহ্বল পাণ্ডবগণ যে যুদ্ধে কী করবে তা বলা অসম্ভব।। (৪১)

ধৃতরাষ্ট্র : ঘটোত্‌কচ! কি বলব, অর্জুনপুত্র অভিমন্যুর দেহান্তের কথা শুনে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়েছে। অন্যায়ভাবে হত্যা সত্যই ঘৃণার কারণ।। (৪২)

ঘটোত্‌কচ : আরও শুনুন,

অভিমন্যুকে হত্যা করায় জয়দ্রথ মুখ্যভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তাই অর্জুন প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে তাকে হত্যা করবেন।। (৪৩)

ধৃতরাষ্ট্র : সঞ্জয়! কী বলছে ঘটোত্‌কচ অভিমন্যুবধে জয়দ্রথ মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল?

সঞ্জয় : মহারাজ! ঘটোত্‌কচ ঠিকই বলেছে।

ধৃতরাষ্ট্র : হ্যাঁ বৎস দুঃশলা! তোমার অবৈধব্য দশার আজই পরিসমাপ্তি ঘটবে।

ঘটোত্‌কচ : পিতামহ! কেবল দুঃশলাকে নিয়েই কেন শোক করছেন?

আপনার শতপুত্রের অচিরেই বিনাশ ঘটবে। সুতরাং সকলের দশার কথাই চিন্তা করুন।। (৪৪)

আপনার পৌত্রগণেরও বিনাশ ঘটবে শীঘ্রই। আপনার বংশের কেউই আর জীবিত থাকবে না।। (৪৫)

ধৃতরাষ্ট্র : সঞ্জয়! সঞ্জয়! ঘটোত্‌কচকে ফিরে যেতে বলো আর আমাকেও অন্যত্র নিয়ে চলো।

ঘটোত্‌কচ : পিতামহ! আমি তো এখনই ফিরে যাচ্ছি। কিন্তু বাসুদেবের বার্তা জ্ঞাপন করছি, হে ধীমন্ মহারাজ! যদি কোনপ্রকারে বংশরক্ষা করতে হয় তাহলে আজ এখনই যুদ্ধ থেকে পুত্র দুর্যোধনকে প্রতিনিবৃত্ত করুন।। (৪৬)

ধৃতরাষ্ট্র : আমার অভিবাদন নিবেদনপূর্বক ভগবান বাসুদেবকে জানিও যে অসমর্থ আমি কিছুই করতে পারব না। তাই পাপবীজের ফল আমাকে ভোগ করতেই হবে এছাড়া আমি আর কী করব।। (৪৭)

ঘটোত্‌কচ : তাই নিবেদন করব।

(প্রস্থান)

তৃতীয়াঙ্কে প্রথম দৃশ্য

দুর্যোধন : মাতুল! শুনেছেন আপনি?

শকুনি : দুর্যোধন! কী হয়েছে?

দুর্যোধন : বাসুদেব দূত প্রেরণ করেছিলেন।

শকুনি : কেন?

দুর্যোধন : ভীতিপ্রদর্শন করিয়ে যুদ্ধ প্রতিরোধে প্রার্থনা জানাতে।

শকুনি : কার কাছে?

দুর্যোধন : আমার দুর্বলহৃদয় পিতার কাছে।

শকুনি : দূতটি কে?

দুর্যোধন : ভীমপুত্র রাক্ষস ঘটোত্‌কচ।

শকুনি : যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র।

দুর্যোধন : অর্জুনের এরূপ প্রতিজ্ঞার পর এরকম প্রস্তাবের তাৎপর্য তো বুঝছি না।

শকুনি : অভিমন্যুর দশা স্মরণ করে পাণ্ডবরা ভয় পেয়েছে। তাই বাসুদেব এখন এরকম প্রস্তাব দিয়ে পাঠিয়েছেন।। (৪৮)

দুর্যোধন : এমনই হবে।

শকুনি : অন্ধরাজা কি তোমাকে এ প্রস্তাব জানিয়েছিলেন।

দুর্যোধন : হ্যাঁ।

শকুনি : তুমি কী বললে?

দুর্যোধন : শ্রবণমাত্রই এই প্রস্তাব আমি প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছি।

শকুনি : তখন তোমার পিতৃদেব কী বললেন?

দুর্যোধন : কিছুই বললেন না। কেবল করুণ বিলাপ করতে লাগলেন বৃদ্ধরাজা। (শব্দ শোনার অভিনয় করে)

পাণ্ডবশিবিরে হঠাত্ শঙ্খ, তুরী, ভেরীর ধবনি শোনা যাচ্ছে কেন?

শকুনি : তাহলে কি রাত্রিবেলাতেও যুদ্ধ করার ইচ্ছা প্রকাশ করছে?

দুর্যোধন : মনে হয় তাই হবে।

শকুনি : সমস্ত দিন যুদ্ধব্যাপারে পরিব্যাপ্ত সকলে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে রয়েছে। তাছাড়া অভিমন্যুবধের বিজয়োত্সবে সবাই অবসন্ন হয়ে পড়েছে। অতএব এখন আক্রমণ করলে আমাদের পক্ষের সৈন্যরা পরাভূত হয়ে যেতে পারে।

দুর্যোধন : এই বুদ্ধি তো ভ্রান্ত।

তারা সকলে কৌরবদের শক্তি পুনরায় দেখবে। অস্ত্রঘাতে এদের যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত করব।। (৪৯)

আর বিলম্বের প্রয়োজন নেই,

অস্ত্র, শস্ত্র, মহাসৈন্য নিয়ে আমি এখনই যুদ্ধে যাচ্ছি। সমস্ত পাণ্ডব তথা তাদের পুত্র পৌত্র সকলকে সৈন্য দ্বারা বিচূর্ণ করে দেবে।। (৫০)

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয়াঙ্কে দ্বিতীয় দৃশ্য

কৃষ্ণ : অভিমন্যুবধের বিজয়োল্লাসে উজ্জীবিত কৌরবরা ভীষণ যুদ্ধ করছে।

যুধিষ্ঠির : বাসুদেব! আজকেই কি যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হবে?

কৃষ্ণ : আমার তো এ যুদ্ধে মত-ই নেই।

যুধিষ্ঠির : তাহলে কেন এ যুদ্ধের প্রবৃত্তি?

কৃষ্ণ : মধ্যপাণ্ডব অর্জুনই শঙ্খতুর্য্যাদির দ্বারা এই যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

যুধিষ্ঠির : বাসুদেব জনার্দন! এ যুদ্ধে পরিণতি কী হবে?

কৃষ্ণ : পরিণতি তো পরিণতই আছে। শুধু আমাদের দেখার অপেক্ষা।

যুধিষ্ঠির : কিন্তু হৃদয় অতীব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছে। বাসুদেব! কোন উপায় করুন।

কৃষ্ণ : উপায় পাওয়া গেছে। কে? কে আছ এখানে?

দৌবারিক : (প্রবেশ করে) দেব! অভিবাদন জানাই। দ্বারদেশে আমি আছি।

কৃষ্ণ : কল্যাণ হোক। শীঘ্র ঘটোত্কচকে নিয়ে এসো।

দৌবারিক : মহাশয় যা আদেশ করেন। (প্রস্থান)

যুধিষ্ঠির : বাসুদেব! ঘটোত্ৎচ কী করবে?

কৃষ্ণ : সেই আজ এই যুদ্ধে আমাদের নেতা হবে।

যুধিষ্ঠির : কি? ঘটোত্কচ আমাদের নেতা হবে?

কৃষ্ণ : হ্যাঁ।

যুধিষ্ঠির : ভীমাদি উপস্থিত থাকতেও বালক ঘটোত্কচ নেতৃত্ব দেবে?

কৃষ্ণ : হ্যাঁ।

যুধিষ্ঠির : কী আপানর অভিপ্রায়?

কৃষ্ণ : যথাকালে জানবে।

ঘটোত্কচ : (প্রবেশ করে) মাতুল! আপনাকে প্রণাম।

কৃষ্ণ : অবিনশ্বর কীর্তিমান হও।

ঘটোত্কচ : মাতুল! আমাকে স্মরণ করেছেন?

কৃষ্ণ : হ্যাঁ বত্স।

ঘটোত্কচ : আদেশ করুন মাতুল।

কৃষ্ণ : বত্স।

অভিমন্যুবধে আজ তোমার শোকবিহ্বল পিতৃগণের যা অবস্থা যুদ্ধে কী যে হবে।। (৫১)

ঘটোত্কচ : মাতুল! আপনি চিন্তা করছেন কেন?

পিতৃগণ সর্বদা পুত্রগণকে কীভাবে যোগ্য করবেন তা ই চিন্তা করেন। পুত্রই পিতার কার্য করতে পারবে এতে কোন সংশয় নেই।। (৫২)

অতএব আপনি চিন্তা পরিত্যাগ করুন।

পিতৃগণের কার্য এখন আমি উত্তমরূপেই সমাপন করব। যুদ্ধের আজই পরিসমাপ্তি ঘটবে এতে কোন সন্দেহ নেই।। (৫৩)

কৃষ্ণ : বত্স ঘটোত্কচ! তাই হোক। আজ তুমিই তাহলে নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করো।

ঘটোত্কচ : নেতৃত্বের প্রয়োজন নেই। আপনার অনুগামী হয়ে আমি আপনার আদেশই পালন করে যাব।

কৃষ্ণ : বত্স ঘটোত্কচ!

দুর্যোধনের ঔদ্ধত্য তুমি সর্বদা স্মরণে রেখো। সে তোমাকে দূতরূপেও প্রত্যাখ্যান করেছে।। (৫৪)

ঘটোত্কচ : যার পিছনে মন যাচ্ছে তার কানে বন্ধুর কথা প্রবেশ করে না, বিধির এই রকম নিয়মই এখানে দেখা যাচ্ছে। (৫৫)

মাতুল! আপনার নির্দেশ যথাযথ ভাবে পালন করব।

কৃষ্ণ : যাও বত্স অবিনশ্বর কীর্তির অধিকারী হও।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থাঙ্কে প্রথম দৃশ্য

দুর্যোধন : মাতুল! আজ অতীব ভয়ংকর যুদ্ধ শুরু হয়েছে। পাণ্ডবপক্ষদের আক্রমণে আমাদের সৈন্যসামন্ত ছিন্নভিন্ন হয়েছে এবং তাদেরকে পলায়ন করতে দেখা যাচ্ছে।

আমাদের সকল সৈন্য ছিন্নভিন্ন হয়েছে, কিছুতেই তারা সামনে থাকতে পারছে না। প্রাণরক্ষার নিমিত্ত তারা সকলে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ভয়ে পলায়ন করছে।। (৫৬)

রথ বিচূর্ণ, হস্তীসমূহ নিহত, অশ্বগুলিরই তথৈবচ অবস্থা। তেমনভাবেই পদাতিক সৈন্যগণও চারিদিকে প্রাণভয়ে পলায়ন করছে।। (৫৭)

শকুনি : পাণ্ডবদের পুরোভাগে তো কাউকে দেখা যাচ্ছে না, তাহলে কার নেতৃত্বে পাণ্ডবদের যুদ্ধ চলছে?

দুর্যোধন : কে না জানে।

রাক্ষসরাজ ঘটোত্কচ আজ যুদ্ধ পরিচালনার ভার নিয়েছে। তার নেতৃত্বেই যুদ্ধ এরূপ উগ্র হয়ে উঠেছে যে, যেন তৃণপর্যন্ত দগ্ধ হয়ে যাবে মনে হচ্ছে।। (৫৮)

শকুনি : ঘটোত্কচের এতখানি শক্তি!

দুর্যোধন : কেনই বা হবে না মাতুল!

আজ অভিমন্যুবধের কারণে অগ্নিতে যেভাবে ঘৃতদান করলে প্রচণ্ড প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে, তেমনভাবেই তো ইনি দেখছি যুদ্ধে বিক্রম প্রদর্শন করছেন।। (৫৯)

আরও ঘটোত্কচ হিড়িম্বা ও ভীমসেনের পুত্র। উভয় দিক থেকে তাই সে অমানুষিক শক্তির অধিকারী হয়েছে।। (৬০)

শকুনি : মনে হয় পাণ্ডব তথা অন্যদের মধ্যে নিজের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য এই রাক্ষস এরূপ অমানুষিক শক্তি প্রদর্শন করছে।। (৬১)

দুর্যোধন : হতে পারে

তাহলে আজই কি সমগ্র যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটতে চলেছে? জয়ের আশা তো ক্রমশ দূরেই চলে যাচ্ছে। কীভাবে এ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।। (৬২)

শকুনি : তুমি কেন চিন্তা করছে।

এই যুদ্ধে আমাদের সৈনিকরা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে। নিমেষে পলায়ন করলেও তাদের পুনরায় সংঘবদ্ধ করতে হবে।। (৬৩)

তাছাড়া দুর্যোধন! ভুলে যাচ্ছ কেন?

নিভে যাওয়ার সময় কর্পূরজনিত অগ্নি হঠাত্ করে প্রবলভাবে পরিদীপ্ত হতে দেখা যায়।

তেমনি যুদ্ধেও কখনও কখনও কাউকে কাউকে এরকম উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতে দেখা যায় সেটাই চিন্তার।। (৬৪)

দুর্যোধন : আমার সৈন্যসকল আমাকে ত্যাগ করে একে একে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে যাচ্ছে। এই যুদ্ধে আমার সৈন্যগণ ধীরে ধীরে নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে। আমার যে কী ফল হবে! ।। (৬৫)

শকুনি : দুর্যোধন! ধৈর্য্য ধরো। বিচলিত হয়ো না।

আমি থাকতে এরূপ চিন্তা কেন স্থান পাচ্ছে? আমি সর্বদাই কোন না কোন ভাবে সমস্যার সমাধান করেছি।। (৬৬)

এখনও সকল সমস্যা সমাধান অচিরেই হবে।

দুর্যোধন : যদি আপনার কোনোরকম সমাধান জানা থাকে তাহলে এখন কেনই বা আপনি নিশ্চেষ্ট হয়ে রয়েছেন।

শকুনি : না না আমি নিশ্চেষ্ট হয়ে নেই। এখনই ব্যবস্থা করছি। চলো। অঙ্গরাজের শিবিরে যাই।

দুর্যোধন : সেখানে গিয়ে কী হবে?

শকুনি : সেখানেই সমাধান রয়েছে।

দুর্যোধন : তাহলে চলো।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থাঙ্কে দ্বিতীয় দৃশ্য

কর্ণ : আসুন আসুন কৌরবরাজ! আসুন মাতুল। আসন পরিগ্রহণ করুন।

(উভয়ের উপবেশন) কৌরবরাজ! এইরকম রাত্রিবেলা আপনার আসার কারণ জানতে পারি? কেনই বা আপনাকে এরকম চিন্তাক্লিষ্ট ও ব্যাকুল মনে হচ্ছে?

দুর্যোধন : যুদ্ধের সংবাদ সম্যক জানেন না?

কর্ণ : রাত্রে যুদ্ধ হবে এরূপ সংবাদ শুনছিলাম। এই যুদ্ধে ততটা দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়নি।

শোকক্লিষ্ট পাণ্ডবেরা বা তত্পক্ষীয় রাজাগণ কী করবে তা ভেবে আমরা উদাসীন হয়ে রয়েছি।

দুর্যোধন : অতীব ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শুরু হয়েছে। আজ আমাদের অস্তিত্ব থাকবে কি না তা নিয়েই প্রবল সংশয় উপস্থিত হয়েছে।

কর্ণ : তাই নাকি? তাহলে এখনই যুদ্ধে যাচ্ছি।

শকুনি : অঙ্গরাজ! কেবল গেলেই কার্যসিদ্ধি হবে না। হিড়িম্বা ও ভীমসেনের পুত্র ঘটোত্কচ আজ ভীষণ যুদ্ধ করছে। একাই সে সমগ্র কৌরবসেনাকে আকুল করে তুলছে।

কর্ণ : চিন্তা করবেন না।

ভীমতনয় ঘটোত্কচের কত শক্তি আছে তা আমি এই যুদ্ধে দেখব। অস্ত্র ও শস্ত্র দ্বারা মুহুর্মুহু প্রহারে অচিরেই তাকে আমি যুদ্ধে পরাস্ত করব।। (৬৭)

শকুনি : তোমার উপযুক্ত কথাই তুমি বলেছ। কিন্তু ঘটোত্কচ সাধারণ যোদ্ধা নয়।

রাক্ষসের মায়ার সঙ্গে অমানুষিক শক্তিতে সে সমগ্র যুদ্ধক্ষেত্রে সে বিচরণ করছে।। (৬৮)

কর্ণ : দৈব্য অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা রাক্ষসের সমস্ত মায়া ও অমানুষী শক্তিকে দমন করে নিজের পরাক্রম দ্বারা আমি অচিরেই ঘটোত্কচ হত্যা করব।। (৬৯)

শকুনি : তোমার এই কথায় কি আর সংশয় আছে। তবুও একপুরুষঘাতক ইন্দ্র প্রদত্ত অস্ত্র তোমার তূনীরে রাখো।

কর্ণ : না না। অন্য কোথাও এই অস্ত্রের প্রয়োগ কোনোভাবেই উচিত নয়।

দুর্যোধন : মিত্র অঙ্গরাজ! পরবর্তীতে যদি জীবনই না থাকে তাহলে অর্জুনকে কীভাবে জয় করবেন?

কর্ণ : কৌরবরাজ! আশঙ্কা করছেন কেন? আজই আমি ঘটোত্কচকে চূর্ণ করব। আপনি চিন্তা করবেন না।

দুর্যোধন : আমি চিন্তা করছি না। তথাপি আজ ঘটোত্কচকে প্রতিরোধ করা যাচ্ছে না। সেজন্যই আপনার কাছে এরূপ প্রার্থনা।

কর্ণ : মহারাজ! প্রার্থনা কেন বলছেন? আদেশ বলুন। বিধির বা ইচ্ছা তাই হোক। তাহলে আদেশ করুন। যুদ্ধে যাই।

সজ্জিত হয়ে আমি শীঘ্রই যুদ্ধে যাচ্ছি ঘটোত্কচকে বধ করার জন্য। স্বপরাক্রমে অর্জুনকেও নিহত করে আমি এই ভূমিকা নিস্পাণ্ডব করব।। (৭০)

শকুনি : বিধি তোমার সহায় হোক। আর বিলম্বের প্রয়োজন নেই। আমরাও সকলে যুদ্ধে যাই।

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চমাঙ্কে প্রথম দৃশ্য

কৃষ্ণ : ধর্মরাজ! উদাসীন হয়েও আপনি যুদ্ধে চলছেন। এই যুদ্ধ কৌরবরাজের পরাজয় প্রায় আসন্ন।

যুধিষ্ঠির : কী বলব? সত্যই নিয়তিকে বাধা দেওয়া যায় না। তা নিজ পথেই অগ্রসর হয়। আপনার যা ইচ্ছা সেটাই হোক। আমিই বা কী করব!

কৃষ্ণ : ধর্মরাজ! আমি তো পূর্বেই বলেছি। মহাকাল তার নিজের ইচ্ছাতেই এগিয়ে চলে। অন্য কারও সেখানে কিছুমাত্র করার সামর্থ্য থাকে না। আমরা সকলে তো নিমিত্তমাত্র। এখানে সুখ বা দুঃখের কিছুই নেই। এটা সকলেরই সম্যক অবধারণ করা উচিত। আচ্ছা সম্প্রতি যুদ্ধের কেমন অবস্থা, কতটা অগ্রগতি হল। কে? কে আছো এখানে?

দৌবারিক : (প্রবেশ করে) দেব! আপনার জয় হোক! এই যে আমি আছি।

কৃষ্ণ : যাও। শীঘ্র যুদ্ধের বৃত্তান্ত জেনে এসো।

দৌবারিক : মহাশয় যা আদেশ করেন। (প্রস্থান করলেন এবং পুনঃপ্রবেশ করে) দেবের জয় হোক। হে দেব!
ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে।
ঘটোত্কচের পরাক্রমের দ্বারা সমস্ত কৌরবসৈন্য চারিদিকে পলায়ন করেছে। পরাজয় নিশ্চিত জেনে তারা আবার সশস্ত্র অঙ্গরাজকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।। (৭১)

কৃষ্ণ : কি? অঙ্গরাজ উপস্থিত হয়েছেন?

দৌবারিক : হ্যাঁ।

কৃষ্ণ : (স্বগত) তাহলে ধনঞ্জয়ের জয়ের জন্য যেমন ভেবেছিলাম তেমনই সব ঘটছে।

যুধিষ্ঠির : বাসুদেব! কি চিন্তা করছেন আপনি?

কৃষ্ণ : না না, চিন্তা করব কেন? কিন্তু ধর্মরাজ! এখন ঘটোত্কচের মনোবলবৃদ্ধির জন্য আপনাদেরও যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়া উচিত।

মহাবীর অঙ্গরাজের যুদ্ধক্ষেত্রে স্বয়ং উপস্থিত হওয়ার জন্য এখন যে মহাসংগ্রাম ঘটতে চলেছে তাতে কোন সংশয় নেই।। (৭২)

সেজন্যই এখন ঘটোত্কচের পাশে আমাদের অবশ্যই থাকা প্রয়োজন।

যুধিষ্ঠির : বাসুদেব! আপনার যেমন ইচ্ছা তাই হোক।

কৃষ্ণ : ধর্মরাজ! আর বিলম্ব নয়। চলুন আমরা যাই।

যুধিষ্ঠির : বেশ।

(সবাই নিষ্ক্রান্ত)

পঞ্চমাঙ্কে দ্বিতীয় দৃশ্য

ঘটোত্কচ : অঙ্গরাজ! উপস্থিত হয়েছেন? আসুন আজ আপনার শক্তিপরীক্ষা হোক।

আমি বালক অভিমন্যু নয় যে, যুদ্ধে দুর্বল, অনভিজ্ঞ। যেমনভাবে একটি শিশুকে হত্যা করেছেন সেরকম তো আর এখানে চলবে না।। (৭৩)

কর্ণ : বাক্যে বীরত্ব প্রকাশ করে কী বা ফল হবে? ধনুকের দ্বারাই নিশ্চিতভাবে নিজ শক্তি প্রকাশিত হয়।। (৭৪)

ঘটোত্কচ : ধনু বা তরবারি যথা ইচ্ছা প্রতিগ্রহণ করো। যদি বাহুযুদ্ধে সম্মতি থাকে তাহলেও বলো, সেটাই হবে।। (৭৫)

কর্ণ : ওহে রাক্ষস ধনুক নাও, ধনুযুদ্ধই হোক। তোমার শক্তির পরীক্ষা হোক, দেখা যাক, সেটা ভাষণে নাকি ধনুকেও।। (৭৬)

(ভীষণ যুদ্ধ চলছে, কর্ণের পাশে শকুনি ও দুর্যোধন এবং ঘটোত্কচের পাশে কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের অবস্থান।)

কৃষ্ণ : ঘটোত্কচ! যুদ্ধ করো। যুদ্ধ করো। ভয় নেই। কৌরবদের পরাজয় প্রায় আসন্ন।

দুর্যোধন : অঙ্গরাজ! সকল সৈন্যই প্রায় পলায়ন করেছে। কালবিলম্ব করবেন না। শীঘ্রই ইন্দ্রপ্রদত্ত অস্ত্র নিক্ষেপ করো।

কর্ণ : (স্বগত) কি আর করি! ওহে ভাগ্য! এখানেও তুমি পরাভূত হলে। (ইন্দ্রপ্রদত্ত অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন)

ঘটোত্কচ : অয়ে! কর্ণের ধনুক থেকে বিনির্গত বাণ থেকে পর্বতপ্রমাণ বহ্নিরাশি আমার দিকে ধেয়ে আসছে।

অহো! কী করব? আমার পরিত্রাণ নেই। হে মাধব! তোমার চরণযুগলে আমাকে আশ্রয় দাও।

কৃষ্ণ : বত্স। তুমি স্বীয় মহত্ত্বে আমার স্মরণ পাবে। এখন মুক্ত হয়ে দিব্যদেহে বৈকুণ্ঠলোকে গমন করো।

ঘটোত্কচ : কৃতার্থ ও অনুগৃহীত হলাম প্রভু!

কৃষ্ণ : এরপর আর কি প্রার্থনা? তাহলে এই হোক নিজ আত্মীয়দের সঙ্গে হিংসাদিশূন্য ব্যবহার, স্বভাবসিদ্ধ পবিত্র চিত্তযুক্ত হয়ে নিজ কর্মে অগ্রসর হয়ে মনুষ্যহিতে নিরত থেকে মনুষ্যগণ এই পৃথিবীতে মানুষের পাশে থাকুক।। (৭৭)

ইতি ভরদ্বাজগোত্রোদ্ভব রামগোপালস্মৃতির পুত্র নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় বিরচিত "*ঘটোত্কচবধম্*" নামক নাটক ১৩৯৩ বঙ্গাব্দে সৌরজ্যৈষ্ঠমাসের ২৯ দিবসে সমাপ্ত।

৩০ সংখ্যক নাটক এটি।

৫.২ *ঘটোত্কচবধ* নাটকের নাট্যতত্ত্ব বিচার

যে কোন নাটকসমীক্ষার ক্ষেত্রে নাট্যতত্ত্ব-সমীক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। 'নাট্যতত্ত্ব' বলতে এখানে প্রাচীন নাট্যতত্ত্ব বোঝানো হয়েছে, প্রাচীন নাট্যতত্ত্ব কীভাবে আধুনিক কবিদের লেখনীতে অনুসৃত হয়েছে, সেটি বিচার্য বিষয়।

- **৫.২.০ বিষয়বস্তু:**

বৈয়াসিক-মহাভারত অবলম্বনে নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় বিরচিত বারোটি নাটকের মধ্যে অন্যতম নাটক হল *ঘটোত্কচবধ*। ১৩৯৩ বঙ্গাব্দে নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ৩০ সংখ্যক নাটক এটি। *বৈয়াসিক-মহাভারতের* দ্রোণপর্বের ৮৫তম অধ্যায় থেকে শুরু করে ১৮৩তম অধ্যায়ের বিষয়বস্তু অবলম্বনে *ঘটোত্কচবধ* নাটকটি রচিত হয়েছে। নাটকটির শুরুতেই দেখা যায় ভগবান বাসুদেব একজন দূত প্রেরণ করেছেন। দৌবারিক সেই দূতকে নিয়ে প্রবেশ করে এবং ঘটোত্কচের সাথে দূতের কথোপকথন শুরু হয়। কুশলবার্তা বিনিময়ের সময় দূত বলেন বাসুদেব, পাণ্ডবগণ শারীরিক দিক থেকে সকলেই সর্বতোভাবে কুশলে আছেন কিন্তু মনের দিক থেকে তারা কিছুটা ব্যাকুল–

> কুশলিনঃ শরীরেণ সর্ব্বে তিষ্ঠন্তি সর্ব্বতঃ।
>
> স্বস্থান মনসা তে তু ভবন্ত্যেব কথঞ্চন।।[১]

ঘটোত্কচ তাঁদের মানসিক ব্যাকুলতার কথা শুনে কারণ জানতে চাইলে দূত বলেন দুর্যোধন পাণ্ডবগণকে বারো বছর বনবাসে পাঠিয়ে তারপর আবার এক বছর অজ্ঞাতবাসের কষ্ট দিয়েও এখন তৃপ্ত হয়নি, জননী দ্রৌপদীকে সভামধ্যে এনে বস্ত্রমোচনের চেষ্টা করেছেন[২]। একথা শুনে ঘটোত্কচ ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন এবং দুর্যোধনকে হত্যা করার কথা বলেন। দূত তাঁকে শান্ত হতে বলেন এবং জানান পাণ্ডবগণ সেই দুরাত্মার বিরুদ্ধে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের উদ্যোগ আরম্ভ করেছেন। সাথে আরও জানান এই যুদ্ধে ভগবান তাঁকে সসৈন্যে পাণ্ডবকক্ষ গ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। দ্বিতীয়াঙ্কের শুরুতে যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণের কথোপকথন লক্ষ্য করা যায়। অভিমন্যুর অকাল প্রয়ানে যুধিষ্ঠির কাতর হয়ে পড়েছেন দেখে কৃষ্ণ ধর্মরাজকে বলেন যা পূর্বেই নির্ধারিত আছে তা নিশ্চিতভাবেই ঘটবে, না হলে রাম, নল প্রমুখ রাজা কেনই বা দুঃখভোগ করবেন। সাথে আরও বলেন পূর্বজন্মের কৃত কর্মফলই প্রাণিগণ এই পৃথিবীতে দৈবরূপে ভোগ করে থাকে। তা শুনে যুধিষ্ঠির বলেন যদি কালচক্রেই সমস্ত কার্য সংঘটিত হয় তাহলে গুরুহত্যাদি পাপে আমরা লিপ্ত হই কেন। একথা শুনে কৃষ্ণ ঘটোত্কচকে আহ্বান জানান এবং বলেন শীঘ্রই তাঁর প্রতিনিধি হয়ে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গিয়ে যুদ্ধ প্রতিরোধের জন্য নিবেদন করতে। ঘটোত্কচ ধৃতরাষ্ট্রের কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত জানান এবং বলেন যদি কোনপ্রকারে বংশরক্ষা করতে হয় তাহলে আজ এখনই যুদ্ধ থেকে পুত্র দুর্যোধনকে প্রতিনিবৃত্ত করুন[৩]। ধৃতরাষ্ট্র বলেন অসমর্থ তিনি, পাপবীজের ফল

ভোগ করতেই হবে তাঁকে। তৃতীয়াঙ্কে দুর্যোধন ও শকুনির কথোপকথন দেখতে পাওয়া যায়। দুর্যোধন শকুনিকে দূত প্রেরণের কথা জানান। শকুনি বলেন অভিমন্যুর দশা স্মরণ করে বাসুদেব এমন প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। এমন সময়ে পাণ্ডবশিবিরে হঠাৎ শঙ্খ, তুরী, ভেরীর ধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। অন্যদিকে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের কথোপকথন থেকে জানা যায় অভিমন্যুর বিজয়োল্লাসে উজ্জীবিত কৌরবরা ভীষণ যুদ্ধ করছে। কৃষ্ণ ঘটোত্কচকে আহ্বান জানান এবং তাঁকে আজ যুদ্ধের নেতৃত্ব দেন। তা দেখে যুধিষ্ঠির জানতে চান ভীমাদি থাকতে ঘটোত্কচ কেন। কৃষ্ণ বলেন যথাসময়ে জানবেন। চতুর্থাঙ্কে দেখা যায় দুর্যোধন শকুনিকে বলছেন ঘটোত্কচ যুদ্ধ পরিচালনার ভার নিয়ে অতীব ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শুরু করেছেন। পাণ্ডবদের আক্রমণে কৌরবদের সৈন্যসামন্ত ছিন্নভিন্ন হয়েছে এবং পলায়ন করছে। দুর্যোধন তা দেখে চিন্তিত হয়ে পরায় শকুনি তাঁকে নিয়ে কর্ণের শিবিরে যাবার পরামর্শ দেন। উভয়ে সেখানে গিয়ে কর্ণকে যুদ্ধের সমস্ত সংবাদ জানান। কর্ণ তা শুনে বলেন চিন্তা না করার জন্য, অচিরেই অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা মুহুর্মুহু প্রহারে ঘটোত্কচকে যুদ্ধে পরাস্ত করবে। তখন শকুনি বলেন এ বচনে কোন সংশয় নেই তাও ইন্দ্রপ্রদত্ত একপুরুষঘাতী অস্ত্র সঙ্গে রাখতে। কর্ণ বলেন– 'নহি নহি। অন্যত্র কুত্রাপি অস্য প্রয়োগঃ কথং নৈব যুজ্যতে।'[৪] অর্থাৎ, না না, অন্য কোথাও এই অস্ত্রের প্রয়োগ কোনোভাবেই উচিত নয়। দুর্যোধন বলেন আজ ঘটোত্কচকে প্রতিরোধ করা যাচ্ছে না, সেইজন্যই এরূপ প্রার্থনা। এই বলে সকলে মিলে তারা যুদ্ধস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। পঞ্চমাঙ্কে দেখা যায় কৃষ্ণ দৌবারিককে যুদ্ধের বৃত্তান্ত জেনে আসতে বলেন। দৌবারিক সংবাদ জেনে এসে বলেন–

> ঘটোত্কচস্যাস্য পরাক্রমেণ
> পলায়মানাঃ কুরুসৈনকা হি।
> পরাজয়ং নিশ্চিতমেব দৃষ্টা
> সমাগত স্ত্বঙ্গনৃপঃ সশস্ত্রঃ।।[৫]

ঘটোত্কচের পরাক্রমে সমস্ত কৌরবসৈন্য চারিদিকে পলায়ন করেছেন, পরাজয় নিশ্চিত জেনে তারা আবার সশস্ত্র অঙ্গরাজকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। অঙ্গরাজের উপস্থিতির কথা শুনে কৃষ্ণ মনে মনে বলেন– "(স্বগতম) তর্হি ধনঞ্জয় জয়ায় যথাযথং চিন্তিতং তথৈব সর্ব্বমাপদ্যতে।"[৬] অর্থাৎ, তাহলে ধনঞ্জয়ের জয়ের জন্য যেমন ভেবেছিলাম তেমনই সব ঘটছে। এইভেবে যুধিষ্ঠিরকে বলেন ঘটোত্কচের মনোবলবৃদ্ধির জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়া উচিত তাঁদেরও। পঞ্চমাঙ্কের অন্তিমে দেখা যায় কর্ণ ও ঘটোত্কচের মধ্যে মহাযুদ্ধ চলছে। কৌরবদের পরাজয় আসন্ন দেখে দুর্যোধন কর্ণকে বলেন –"অঙ্গরাজ! সর্ব্ব এব সৈনিকাঃ প্রায়েণ পলায়িতাঃ অলং কালক্ষেপেণ। শীঘ্রং ইন্দ্রদত্তমস্ত্রং প্রক্ষিপ।"[৭] অর্থাৎ অঙ্গরাজ! সকল সৈন্যই প্রায় পলায়ন করেছে। কালবিলম্ব করবেন না। শীঘ্রই ইন্দ্রপ্রদত্ত অস্ত্র নিক্ষেপ করো। কর্ণ ইন্দ্রপ্রদত্ত অস্ত্র প্রয়োগ করেন এবং ঘটোত্কচের মৃত্যু ঘটে। এখানেই নাটকটি সমাপ্ত ঘটে। নাটকটিতে পাঁচটি অঙ্ক আছে এবং প্রতিটি অঙ্কে দুটি করে দৃশ্য আছে।

নাটকের নাম	প্রণেতা	উৎস	রচনাকাল	চরিত্র	হস্তলিখিত পুঁথিতে পৃষ্ঠাসংখ্যা	অঙ্ক সংখ্যা	দৃশ্য	শ্লোকসংখ্যা
ঘটোত্কচবধ	নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়	*বৈয়াসিক-মহাভারতের* দ্রোণপর্ব	১৩৯৩ বঙ্গাব্দ	ঘটোত্কচ, দৌবারিক, দূত, কৃষ্ণ, ধৃতরাষ্ট্র, সঞ্জয়, কর্ণ, দুর্য্যোধন, যুধিষ্ঠির, শকুনি,	৩০	প্রথম-অঙ্ক	প্রথম দৃশ্য	১০
							দ্বিতীয় দৃশ্য	১১
						দ্বিতীয়-অঙ্ক	প্রথম দৃশ্য	১৩
							দ্বিতীয় দৃশ্য	১৩
						তৃতীয়-অঙ্ক	প্রথম দৃশ্য	৩
							দ্বিতীয় দৃশ্য	৫
						চতুর্থ-অঙ্ক	প্রথম দৃশ্য	১১
							দ্বিতীয় দৃশ্য	৪
						পঞ্চম-অঙ্ক	প্রথম দৃশ্য	২
							দ্বিতীয় দৃশ্য	৫
						মোট শ্লোকসংখ্যা–		৭৭

৫.২.১ নামকরণ

বৈয়াসিক-মহাভারত অবলম্বনে নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়ের *ঘটোত্কচবধ* নাটকের সূত্রপাত ঘটে ঘটোত্কচের কাছে কৃষ্ণের দূত প্রেরণের মধ্য দিয়ে। কর্ণের কাছে এক পুরুষঘাতী অস্ত্র আছে যা থেকে অর্জুনের প্রাণ বাঁচানো অনিশ্চিত। তাই কৃষ্ণ পরিকল্পনা করে ঘটোত্কচকে যুদ্ধের নেতা রূপে প্রেরণ করেন। ঘটোত্কচের পরাক্রমে কৌরবদের পরাজয় আসন্ন দেখে ইন্দ্র সেই অস্ত্র প্রয়োগ করতে বাধ্য হন। ঘটোত্কচস্য বধম্ অর্থাৎ ঘটোত্কচের বধ, এই বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে নাটকের নামকরণ সার্থক হয়েছে বলে মনে হয়। এই নাটকে ঘটোত্কচ নায়ক না হলেও প্রধান চরিত্ররূপে উপস্থিতি দেখা যায়। নাটকের প্রথম দিকেই কৃষ্ণের দূত এসে ঘটোত্কচকে যখন পাণ্ডবদের করুণবৃত্তান্ত জানান তখন সে মর্মাহত হয়। তারপর দূত হিসাবে কৃষ্ণের প্রস্তাব নিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয় তখন আবার আহত হয় এবং পরিশেষে কর্ণের অস্ত্রে হত হয়। ঘটোত্কচের যে মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় সেটাই এই নাটকের মূল সুর হয়ে উঠেছে।

❖ ৫.২.২ নান্দী

নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় বিরচিত *বৈয়াসিক-মহাভারত* অবলম্বনে *ঘটোৎকচবধ* নাটকের প্রথম অঙ্কে বলা হয়েছে–

> য আদিদেবঃ পুরুষপ্রধানঃ
> বিশ্বেষু সর্বেষু চ পূজ্যপাদঃ।
> অনন্তকীর্তির্বহুরূপধারী
> স পাতু যুস্মান্ করুণাবতীর্ণঃ।।[৮]

অর্থাৎ, পুরুষদিগের প্রধান, এই বিশ্বে সকলের পূজনীয়, যার কীর্তি অনন্ত, বহুরূপধারণকারী যে আদিদেবতা, সেই করুণাময় ভগবান মহেশ্বর তোমাদেরকে রক্ষা করুন। *নাট্যশাস্ত্রের* লক্ষণানুসারে এখানে মহেশ্বরের প্রার্থনার মাধ্যমে নান্দী বর্ণিত হয়েছে। নান্দীর বৈশিষ্টে অষ্ট বা ততোধিক পদের কথা বলা হয়েছে, এখানে আদিদেবঃ, পুরুষপ্রধানঃ ইত্যাদি অষ্টাধিক পদের ব্যবহার দেখা যায়। *নাট্যপ্রদীপে* বলা হয়েছে–

> শ্লোকপাদঃ পদং কেচিৎসুপ্তিঙন্তমথাপরে।
> পরেঽবান্তরবাক্যৈং চ পদমাহুর্বিশারদঃ।।[৯]

অর্থাৎ, স্থানবিশেষে সুবন্ত-তিঙন্ত, স্থানবিশেষে শ্লোকের এক-চতুর্থাংশ এবং লক্ষণানুসারে অবান্তর বাক্য যে কোন অর্থই হতে পারে। এখানে নান্দী সুপ্ বিভক্তি ও তিঙ্ বিভক্তিযুক্ত পদের মাধ্যমেই হয়েছে। এই নাটকে নান্দী শ্লোকের বিশেষত্ব যিনি নায়ক তিনিই এখানে স্তুত্য হিসাবে উপস্থিত এবং 'যুস্মান্' শব্দের দ্বারা নায়কের অভিপ্রেত চরিত্রগুলিকে পরোক্ষ ভাবে বোঝা যায়। তিনি যে করুণাবতীর্ণ তা এই নাটকের পরিশেষে দেখা যায়। অতএব নান্দী শ্লোকটি কেবল মঙ্গলকারক নয়, নাটকের বিষয়বস্তুর অনুকূল রূপে ব্যবহার করা হয়েছে।

❖ ৫.২.৩ প্রস্তাবনা–

নাটকীয় কোন ভূমিকা ছাড়াই মঞ্চে উপস্থিত 'ভরত' নামে পরিচিত অভিনেতাদের সাথে সংশ্লিষ্ট বলে বৃত্তিটির নাম ভারতী বৃত্তি। *নাট্যশাস্ত্রে* ভারতী বৃত্তির লক্ষণ করতে গিয়ে বলা হয়েছে–

> যা বাক্প্রধানা পুরুষপ্রযোজ্যা।
> স্ত্রীবর্জিতা সংস্কৃতপাঠ্যযুক্তা।।
> স্বনামধেয়ৈর্ভরতৈঃ প্রযুক্তা।
> সা ভারতী নাম ভবেত্তু বৃত্তিঃ।।[১০]

প্ররোচনা, বীথী, প্রহসন ও আমুখ এই চারটি ভারতীবৃত্তির অঙ্গ বলে কল্পিত – "তস্যাঃ প্ররোচনা বীথী তথা প্রহসনামুখে।"[১১] আমুখ ভারতী বৃত্তির সর্বপ্রধান অঙ্গ। নাট্যকার ও নাট্যবিষয়ের প্রস্তাব থাকার জন্য একে

প্রস্তাবনাও বলা হয়। স্থাপক এখানে নাট্যের বিষয় আস্থাপন করার জন্য এর অপর নাম স্থাপনা[১২]। এখানে নাট্যবস্তু, ইতিবৃত্তে কার্যের বীজ, ইতিবৃত্তের সূত্র বা পাত্রপ্রবেশ সূচনা ঘটে – "সূচয়েদ্বস্তু বীজং বা মুখং পাত্রমথাপি বা।"[১৩] বিশ্বনাথ-কবিরাজের মতে সূত্রধারসদৃশ স্থাপকের সাথে নটী বিদূষক বা পারিপার্শ্বিক যেখানে নিজ নিজ কর্তব্য অবলম্বনে প্রাসঙ্গিক নানা বাক্য ব্যবহার করে তাকেই আমুখ বা প্রস্তাবনা বলা হয়[১৪]। আলোচ্য নাটকটির প্রস্তাবনা আমুখ শ্রেণীর। ভরতাচার্যের মতে–

নটী বিদূষকো বাপি পারিপার্শ্বিক এব বা।
সুত্রধারেণ সহিতাঃ সংলাপং যত্র কুর্বতে।।
চিত্রৈর্বাক্যৈঃ স্বকার্য্যোত্থৈর্বীথ্যঙ্গৈরন্যথাপি বা।
আমুখং তত্তু বিজ্ঞেয়ং বুধৈঃ প্রস্তাবনাপি বা।।[১৫]

নাট্যশাস্ত্রে উদ্ঘাত্যক, কথোদ্ঘাত, প্রয়োগাতিশয়, প্রবৃত্তক ও অবলগিত এই পাঁচটি আমুখের অঙ্গ বলা হয়েছে–

উদ্ঘাত্যকঃ কথোদ্ঘাতঃ প্রয়োগাতিশয়স্তথা
প্রবৃত্তকাবলগিতে আমুখাঙ্গানি পঞ্চবৈ।।[১৬]

পণ্ডিত রামগোপাল শর্মার খ্যাতিমান পুত্র নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় রচিত *ঘটোত্‌কচবধ* নাটকের প্রথমাঙ্কে নান্দীর পরেই প্রস্তাবনা বর্ণিত হয়েছে। নান্দী পাঠের পরেই সুত্রধার মঞ্চে প্রবেশ করে আর্যগণকে অভিবাদন জানায় এবং রঙ্গমঞ্চে পারিপার্শ্বিককে আহ্বান জানায়। সূত্রধার ও পারিপার্শ্বিকের কথোপকথন থেকে জানা যায় *বৈয়াসিক-মহাভারত* অবলম্বনে রামগোপাল পুত্র নিত্যানন্দ শর্মা বিরচিত *ঘটোত্‌কচবধ* নাটকটি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। প্রথমাঙ্কের শেষে পারিপার্শ্বিক মঞ্চে প্রবেশ করে বলেন–

নায়কো নাটকস্যাস্য স এব নোপলভ্যতে।
চিন্তাকীর্ণা বয়ন্তাবত্ নাটকং ভবিতা কথম্।।[১৭]

অর্থাৎ, নাটকের নায়কের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা তাই চিন্তাকুল হয়ে আছি যে, কীভাবে নাটক শুরু করব। একথা শুনে সূত্রধার চতুর্দিক দেখার আভিনয় করতে করতে বলেন– "ঘটোত্‌কচ মহোদয়! কোথায় আপনি এখন? ওহে ভীমতনয়! আপনার জন্য আমরা সকলে ব্যাকুল। আপনি শীঘ্র আসুন।"[১৮] একথা বলার পরেই নেপথ্য থেকে–

আঃ কো মাম্ আহ্বয়তি।
হৈড়িম্বির্ভীমপুত্রোঽহং বিশ্রামে নিরতোঽস্মি হি।
অকালে মাং সমাহূয় বিরক্তং কুরুষে কথম্।।[১৯]

অর্থাৎ, আঃ! কে আমাকে ডাকে? ভীম এবং হিরিম্বার পুত্র আমি ঘটোত্‌কচ এখন বিশ্রামে নিরত রয়েছি। অসময়ে আমাকে ডেকে বিরক্ত করছ কেন। একথা শুনে সূত্রধার পারিপার্শ্বিককে বলেন–বিরক্ত হয়ে ঘটোত্‌কচ

রঙ্গস্থলেই আসছে, এখানে থাকা সমীচীন নয়। চলো আমরা যাই, একথার সাথেই প্রথম দৃশ্য সমাপ্ত হয়। দ্বিতীয় দৃশ্যের শুরুতে ঘটোত্কচ বিরক্ত হয়ে একই উক্তি করতে করতে মঞ্চে প্রবেশ করেন। তাকে শান্ত করার জন্য দৈবারিক মঞ্চে প্রবেশ করে জানান ভগবান বাসুদেব পাণ্ডবগণের বিশেষ কার্যের নিমিত্তে দূত প্রেরণ করেছেন, সেইজন্য আপনাকে আহ্বান করা হয়েছে। তাই এখানে কথোদ্ঘাত শ্রেণীর প্রস্তাবনা হয়েছে বলে মনে হয়। কথোদ্ঘাত প্রস্তাবনার লক্ষণ করতে গিয়ে *নাট্যশাস্ত্র*কার ভরতাচার্য বলেছেন যখন কোনো পাত্র সূত্রধারের বাক্য বা বাক্যার্থ গ্রহণ করে প্রবেশ করে, তখন তাকে কথোদ্ঘাত প্রস্তাবনা বলা হয়–

সূত্রধারস্য বাক্যং বা যত্র বাক্যার্থমেব বা।
গৃহীত্বা প্রবিশেত্ পাত্রং কথোদ্ঘাতঃ স কীর্তিতঃ।।[২০]

❖ ৫.২.৪ অর্থপ্রকৃতি

নাটকের প্রধান প্রয়োজন সিদ্ধির হেতু হল অর্থপ্রকৃতি। লক্ষণ পূর্বোক্ত। বীজ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী, কার্য এই পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়।

বীজ – *ঘটোত্কচবধ* নাটকের প্রথমাঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের শুরুতেই দেখা যায় পাণ্ডবভবন থেকে বাসুদেব দূত প্রেরণ করেছেন। দূত পাণ্ডবদের বারো বছর বনবাসের কথা ও দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের কথা জানান। সেকথা শোনামাত্রই ঘটোত্কচ অতি ক্রুদ্ধ হয়ে যান এবং সকল কৌরবদের নিমেষে ধ্বংসের কথা বলেন–

অন্যাংশ্চ সর্ব্বান্ কুরু বংশজামান্।
সংঘাতয়াম্যেব নিমেষতো হি।।[২১]

দূত তাঁকে শান্ত হতে বলেন এবং সসৈন্যে বাসুদেব তাঁকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তা জানান। অর্জুনের প্রতিজ্ঞায় কৃষ্ণ খুবই চিন্তিত হয়ে পরেন কারণ ইন্দ্রপ্রদত্ত একপুরুষ ঘাতক অস্ত্র কর্ণের কাছে আছে যা প্রয়োগে অর্জুনের মৃত্যু অবধারিত। তাই অর্জুনের প্রাণ বাঁচাতে কৃষ্ণের পরিকল্পনা অনুসারে কর্ণের অস্ত্র পূর্বেই প্রয়োগ করে নেওয়া। তাই ভীম ও হিড়িম্বার বীর পুত্র ঘটোত্কচকে যুদ্ধে আমন্ত্রণ কৃষ্ণের পরিকল্পনার একটি অংশ। নাটকের প্রারম্ভে স্বল্পভাবে প্রদর্শিত হয়ে, পরে বিস্তৃত ভাবে নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য পূরণ করে তখন নাটকীয় পরিভাষায় বীজ বলে।

বিন্দু – *ঘটোত্কচবধ* নাটকের দ্বিতীয়াঙ্কের প্রথম দৃশ্যে যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণের কথোপকথন অবান্তর বৃত্ত। যুধিষ্ঠির জানতে চান কৃষ্ণের উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধক্ষেত্রে সাহায্যের অভাবে অভিমন্যুর প্রাণ গেল কীভাবে? কৃষ্ণ বলেন দৈবকে প্রতিরোধ করতে কেই বা পারে। যা নিশ্চিতভাবে ঘটবে তার বাধাপ্রাপ্তি সম্ভব নয়[২২]। পূর্ব জন্মের কর্মফল দৈবরূপে ভোগ করতে থাকে। যুধিষ্ঠির বলেন কেন মানুষ তবে অবশ্যম্ভাবী ঘটনাকে প্রতিরোধ করার

চেষ্টা করে? পুণ্যবান অভিমন্যু কী এমন কুকর্ম করেছিল যে ফলস্বরূপ যৌবনের প্রারম্ভেরই মৃত্যুবরণ করতে হল। পৃথিবীতে যদি এটাই নিয়ম হয় তাহলে নবীন কর্মপাশে কেন পুনরাবদ্ধ হই[২৩]। কালচক্রে যদি সমস্থ কাজ সংঘটিত হয় তাহলে গুরুহত্যাদি পাপে কেন লিপ্ত হই? যুধিষ্ঠিরের এই প্রশ্ন যেন সমাজ জীবনের সাধারণ মানুষের প্রশ্নকে নাট্যকার শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন। এই প্রেক্ষিতে মনে পরে *বৈয়াসিক-মহাভারতে*র ভীষ্ম পর্বে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের কথোপকথনের অমৃত রূপে যে *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* উদ্ভূত হয়েছে সেখানেও শ্রীকৃষ্ণকে এই প্রশ্নে অর্জুনের মুখোমুখি হতে হয়েছে। অর্জুন বিষাদগ্রস্ত হয়ে এইরূপ সংশয়ের মুখে যুদ্ধ না করার মনোভাবে আক্রান্ত হন। তাঁর উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ যে তাত্ত্বিক উপদেশ দিয়েছেন তাতেও যেন সাধারণ মানুষের সংশয় দূর হয় না। নাট্যকার নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় একজন সামাজিক ব্যক্তি হিসাবে এখানে উত্থাপন করেছেন। ঠিক এই সময় দৌবারিক প্রবেশ করে জানায় ঘটোত্কচ এসে উপস্থিত হয়েছে যা নাটকের বৃত্তকে মূলঘটনা স্রোতে ফিরিয়ে আনে পুনরায়। তাই এখানে বিন্দু বর্ণিত হয়েছে বলে মনে হয়।

কার্য – *ঘটোত্কচবধ* নাটকে অর্জুনের প্রাণ বাঁচানোর জন্য কৃষ্ণের পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে ভীম ও হিড়িম্বার বীর পুত্র ঘটোত্কচকে যুদ্ধে আমন্ত্রণ এবং অন্তিমে ঘটোত্কচের বীরত্বে কৌরবদের পরাজয় আসন্ন দেখে কর্ণের একপুরুষঘাতী অস্ত্রের প্রয়োগের মাধ্যমে নাটকের মুখ্যফল লাভ হয়।

এই নাটকে পতাকা ও প্রকরী লক্ষ্য করা যায় না।

❖ ৫.২.৫ পঞ্চাবস্থা

ফলকামী ব্যক্তির আরব্ধ কার্যের পাঁচটি অবস্থা–আরম্ভ, যত্ন, প্রাপ্ত্যাশা, নিয়তাপ্তি ও ফলাগম।

আরম্ভ – *ঘটোত্কচবধ* নাটকের প্রথমাঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা যায় পাণ্ডবভবন থেকে বাসুদেব এক দূত প্রেরণ করেছেন। তিনি এসে ঘটোত্কচকে পাণ্ডবদের বারো বছর বনবাসের কথা জানান এবং সাথে বলেন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের কথাও। তা শুনে ঘটোত্কচ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সকল কৌরবদের নিমেষে ধ্বংসের কথা বলেন। দূত তাকে জানায় পাণ্ডবগণ সেই দুরাত্মার বিরুদ্ধে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের উদ্যোগ আরম্ভ করেছেন। আরও বলেন বাসুদেব আপনাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তা শুনে ঘটোত্কচ বলেন–

অদ্যৈব যাস্যামি বলেন যুক্তঃ
সঞ্চুর্ণযাম্যেব কুরূন্ সমগ্রান্।
তাতাপমানপ্রতিশোধমেব
গ্রহ্নামি যুদ্ধে বলিনাং সমক্ষম্[২৪]।।

অর্থাৎ, আজই সৈন্য নিয়ে গিয়ে সমগ্র কুরুবংশকে চূর্ণ করে ফেলবে। এই যুদ্ধে শিরোভাগে থেকে পিতৃগণের অপমানের প্রতিশোধ নেবেন। ঘটোত্কচবধ নাটকের প্রধান ফল ঘটোৎকচের বধের দ্বারা অর্জুনের সুরক্ষা। যুদ্ধে তাই কৃষ্ণ আমন্ত্রণ জানান তাঁকে। তাই কৃষ্ণের আমন্ত্রণ ও ঘটোৎকচের এই উক্তির মধ্য দিয়ে প্রধান ফলের প্রতি ঔৎসুক্য বা অভিলাষ প্রকাশিত হয়েছে।

যত্ন – *ঘটোৎকচবধ* নাটকের তৃতীয়াঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের সংবাদ দেখতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণ দৌবারিককে ঘটোৎকচকে সভায় আসার জন্য বলেন। যুধিষ্ঠির জানতে চান ঘটোৎকচ কি করবে? কৃষ্ণ জানান – "স এব অদ্যাস্মিন্ যুদ্ধে অস্মাকং নেতা ভবিষ্যতি"[২৫] ঘটোৎকচ এইযুদ্ধে আমাদের নেতা হবে। ঘটোৎকচ প্রবেশ করতে কৃষ্ণ বলেন অভিমন্যুবধে আজ শোকবিহ্বল পিতৃগণের যা অবস্থা যুদ্ধে কি যে হবে[২৬]। তা শুনে ঘটোৎকচ বলেন আপনি চিন্তা পরিত্যাগ করুন। পিতৃগণের কার্য তিনি উত্তমরূপে সমাপন করবে। যুদ্ধের আজই পরিসমাপ্তি ঘটবে[২৭]। কৃষ্ণ বলেন তাহলে আজ তুমিই যুদ্ধে নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করো – "অদ্য ত্বমেবনেতৃত্বভাবং গৃহাণ্।"[২৮] নাটকের প্রধান ফল ঘটোৎকচের বধের দ্বারা অর্জুনের সুরক্ষা কারণ কর্ণের কাছে একপুরুষঘাতী অমোঘ অস্ত্র আছে। যুদ্ধে তাই ঘটোৎকচকে আমন্ত্রণ। তাই এখানে ফললাভের উদ্দেশ্যে চেষ্টা প্রযত্ন নামক দ্বিতীয় অবস্থা ফুটে উঠেছে।

প্রাপ্ত্যাশা – *ঘটোৎকচবধ* নাটকের চতুর্থাঙ্কের প্রথমদৃশ্যে দুর্যোধন ও শকুনির কথোপকথন থেকে জানা যায় কৌরবদের সকল সৈন্য ছিন্নভিন্ন হয়েছে, কিছুতেই তাঁরা সামনে থাকতে পারছেন না। প্রাণরক্ষার নিমিত্ত তাঁরা সকলে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন–

> ছিন্নঞ্চ ভিন্নং সকলং বলং মে
> স্থাতুং ন শক্তং পুরতঃ কথঞ্চিত্।
> প্রাণপ্ররক্ষার্থমিহৈব সর্ব্বং
> পলায়নমানং সমরে ভয়েন।।[২৯]

রথ বিচূর্ণ, হস্তীসমূহ নিহত, অশ্বগুলিরই তথৈবচ অবস্থা। তেমনভাবেই পদাতিক সৈন্যগণও চারিদিকে প্রাণভয়ে পালাচ্ছে–

> রথং বিচূণং করিণো মৃতাশ্চ
> হয়াস্তথৈবাদ্যমৃতিং প্রয়ান্তি।
> পদাতিকাঃ সৈন্যগণাস্তথৈব
> পলায়মানা ভয়তঃ সমন্তাত্।।[৩০]

দুর্যোধনের এই উক্তি থেকে নাটকের প্রধান যে ফল তা কিছুটা বাধা প্রাপ্ত হয় কারণ ঘটোত্কচ এইভাবে যুদ্ধ করলে যুদ্ধ আজই সমাপ্ত হয়ে যাবে এবং শ্রীকৃষ্ণের পরিকল্পনা ব্যর্থ হবে। তাই নাটকের ফললাভে বিঘ্নের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে যা প্রাপ্ত্যাশা নামক অবস্থার উদাহরণ।

নিয়তাপ্তি – *ঘটোত্কচবধ* নাটকের চতুর্থাঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে কর্ণের সাথে শকুনি, কর্ণ ও দুর্যোধনের কথোপকথন দেখতে পাওয়া যায়। শকুনি সেখানে যুদ্ধের সমস্থ ঘটনা জানান। কীভাবে ঘটোত্কচ একাই

কৌরবসেনাকে আকুল করে তুলেছেম। তাই কর্ণকে যুদ্ধে একপুরুষ ঘাতক ইন্দ্রপ্রদত্ত অস্ত্রও সাথে রাখতে বলেন – "তথাপি একপুরুষ ঘাতকং ইন্দ্রপ্রদত্তমস্ত্রং তূনীরে সংরক্ষ।"[৩১] নাটকের প্রধান যে ফল কৃষ্ণের যে পরিকল্পনা এখানে নিশ্চিত ভাবে সূচিত হয়েছে তাই এটি চতুর্থ অবস্থা নিয়তাপ্তির উদাহরণ।

ফলাগম – *ঘটোত্কচবধ* নাটকে পঞ্চমাঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা যায় ঘটোত্কচের বীরত্বে কৌরবদের পরাজয় আসন্ন প্রায়। দুর্যোধন কর্ণকে বলেন "অঙ্গরাজ! সর্ব্ব এব সৈনিকাঃ প্রায়েণ পলায়িতাঃ অলং কালক্ষেপেণ। শীঘ্রং ইন্দ্রদত্তমস্ত্রং প্রক্ষিপ।" অর্থাৎ অঙ্গরাজ! সকল সৈন্যই প্রায় পলায়ন করেছে। কালবিলম্ব করবেন না। শীঘ্রই ইন্দ্রপ্রদত্ত অস্ত্র নিক্ষেপ করো। কর্ণ অমোঘ অস্ত্র নিক্ষেপ করেন ঘটোত্কচের মৃত্যু ঘটে। শ্রীকৃষ্ণের পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে নাটকের প্রধান ফল অর্থাৎ ঘটোত্কচের বধ ও অর্জুনের রক্ষারূপী ফলপ্রাপ্তি ঘটে যা পঞ্চম অবস্থার উদাহরণ।

❖ ৫.২.৬ নাট্যবৈশিষ্ট্য:

বৈয়াসিক-মহাভারত অবলম্বনে রচিত নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়ের অন্যতম নাটক *ঘটোত্কচবধ* নাটকটির প্রারম্ভেই পারিপার্শ্বিক ও সূত্রধারের কথোপকথনে দেখতে পাওয়া যায়–

রামগোপালপুত্রেণ নিত্যানন্দেন শর্ম্মণা।
নবীনং লিখিতং কিঞ্চিদ্ নাটকং ভারতাশ্রিতম্।
আখ্যানং দ্রোণপর্ব্বীয়ং সমাশ্রিত্যপ্রধানতঃ।
ঘটোত্কচবধং নাম নাটকং রচিতং নবম্।।[৩২]

অর্থাৎ, পণ্ডিত রামগোপাল শর্মার খ্যাতিমান পুত্র শ্রীনিত্যানন্দ শর্মার মহাভারতাশ্রিত একটি নূতন নাটক রয়েছে। যার আখ্যান প্রধানতঃ দ্রোণপর্বাশ্রিত এই নূতন নাটকের নাম *ঘটোত্কচবধ*। নাটকটির প্রারম্ভেই নিত্যানন্দ শর্মা উল্লেখ করেছেন এটি 'নাটক'। ভারতীয় নাট্যতত্ত্বানুসারে দৃশ্যকাব্যের তথা রূপকের মধ্যে অন্যতম প্রধান বিভাগ হল 'নাটক'। আলোচ্য রূপকটি 'নাটক' আখ্যায় ভূষিত করা যায় কি না, তা অবশ্যই বিচার্য বিষয়।

"নাটকং খ্যাতবৃত্তং স্যাত্"[৩৩] এই লক্ষণানুসারে নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় বিরচিত *ঘটোত্কচবধ* নাটকটি বৈয়াসিক-মহাভারতের দ্রোণপর্বাশ্রিত। সুতরাং নাটকটি 'খ্যাতবৃত্ত'।

"পঞ্চসন্ধি সমন্বিতম্"[৩৪] অর্থাত্ নাটকের বিষয়বস্তু পাঁচটি পর্বে বিভক্ত, যথাক্রমে – মুখসন্ধি, প্রতিমুখসন্ধি, গর্ভসন্ধি, বিমর্ষসন্ধি ও নির্বহন সন্ধি।

মুখসন্ধি- *ঘটোত্কচবধ* নাম থেকেই বোঝা যায় ঘটোত্কচস্য বধম্ অর্থাৎ ঘটোত্কচের বধই এই নাটকের মূল বিষয়বস্তু। নাটকের প্রথমাঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে মুখসন্ধি লক্ষ্য করা যায়। দৃশ্যের শুরুতেই দেখা যায়

পাণ্ডবভবন থেকে বাসুদেব দূত প্রেরণ করেছেন – "পাণ্ডবভবনাত্ বিশেষকার্য্যবশাদ্ দূতঃ প্রেষিতো ভগবতা বাসুদেবেন।"[৩৫] দূত সর্বপ্রথম পাণ্ডবদের বারো বছর বনবাসের কথা জানান পরে দ্রৌপদী বস্ত্রহরণের কথাও জানান। সেকথা শোনা মাত্রই ঘটোত্কচ অতি ক্রুদ্ধ হন এবং সকল কৌরবদের নিমেষে ধ্বংসের কথা বলেন–

অন্যাংশ্চ সর্ব্বান্ কুরু বংশজামান্।
সংঘাতয়াম্যেব নিমেষতো হি।।[৩৬]

দূত তাঁকে শান্ত হতে বলেন এবং সসৈন্যে বাসুদেব তাঁকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তা জানান। কোন ঘটনা নাটকের প্রারম্ভে স্বল্পভাবে প্রদর্শিত হয়ে, পরে বিস্তৃত ভাবে নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য পূরণ করে তখন নাটকীয় পরিভাষায় বীজ বলে। অভিমন্যুবধের পর পিতা অর্জুনের প্রতিজ্ঞায় কৃষ্ণ খুবই চিন্তিত হয়ে পরেন। কারণ ইন্দপ্রদত্ত একপুরুষ ঘাতক অস্ত্র কর্ণের কাছে আছে যা প্রয়োগে অর্জুনের মৃত্যু অবধারিত। তাই অর্জুনের প্রাণ বাঁচাতে কৃষ্ণের পরিকল্পনা অনুসারে কর্ণের অস্ত্র পূর্বেই প্রয়োগ করে নেওয়া। তাই ভীম ও হিড়িম্বার বীর পুত্র ঘটোত্কচকে যুদ্ধে আমন্ত্রণ কৃষ্ণের পরিকল্পনার একটি অংশ। এইভাবে নাটকের মূল উদ্দেশ্য এখানে রোপণ করা হয়েছে বলে মনে হয়।

প্রতিমুখসন্ধি–*ঘটোত্কচবধ* নাটকের তৃতীয়াঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণের কথোপকথনে প্রতিমুখসন্ধি লক্ষ্য করা যায়। শ্রীকৃষ্ণে দৌবারিককে আহ্বান করে বলেন ঘটোত্কচকে শীঘ্র নিয়ে আসার জন্য "শীঘ্রং ঘটোত্কচং প্রবেশয়।"[৩৭] যুধিষ্ঠির জানতে চান ঘটোত্কচ কি করবেন? শ্রীকৃষ্ণ উত্তরে বলেন সে-ই এই যুদ্ধে নেতা হবে "স এব অদ্যাস্মিন্ যুদ্ধে অস্মিন্ যুদ্ধে অস্মাকং নেতা ভবিষ্যতি।"[৩৮] যুধিষ্ঠির আরও জানতে চান তাঁর কি অভিপ্রায় "কস্তেঽভিপ্রায়"[৩৯]। প্রত্যুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ জানান "যথাকালে জ্ঞাস্যতি।"[৪০] প্রতিমুখসন্ধিতে, মুখসন্ধিতে আরব্ধ প্রধানফলের সামান্যভাবে প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় এবং কিছুটা অনুমানের দ্বারা বুঝে নিতে হয়। ঘটোত্কচকে যুদ্ধের নেতা করে শ্রীকৃষ্ণের যে পরিকল্পনা অর্থাৎ প্রধানফল তা প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় এবং যথাসময়ে জানতে পারবে এই প্রত্যুত্তরের মধ্য দিয়ে অনুমান করা যেতে পারে নাটকের মুখ্যফল।

গর্ভসন্ধি– *ঘটোত্কচবধ* নাটকের চতুর্থাঙ্কের প্রথমদৃশ্যে দুর্যোধন ও শকুনির কথোপকথনে দেখা গিয়েছে–

ছিন্নঞ্চ ভিন্নং সকলং বলং মে
স্থাতুং ন শক্তং পুরতঃ কথঞ্চিত্।
প্রাণপ্রক্ষার্থমিহৈব সর্ব্বং
পলায়মানং সমরে ভয়েন।।[৪১]
রথং বিচূর্ণং করিণো মৃতাশ্চ
হয়াস্তথৈবাদ্যমৃতিং প্রয়ান্তি।
পদাতিকাঃ সৈন্যগণাস্তথৈব

পলায়মানা ভয়তঃ সমন্তাত্।।[৪২]

অর্থাৎ, আমাদের সকল সৈন্য ছিন্নভিন্ন হয়েছে, কিছুতেই তারা সামনে থাকতে পারছে না। প্রাণরক্ষার নিমিত্ত তারা সকলে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ভয়ে পলায়ন করছে। রথ বিচূর্ণ, হস্তীসমূহ নিহত, অশ্বগুলিরই তথৈবচ অবস্থা। তেমনভাবেই পদাতিক সৈন্যগণও চারিদিকে প্রাণভয়ে পলায়ন করছে। দুর্যোধনের এই উক্তি থেকে নাটকের প্রধান যে ফল তা কিছুটা বাধা প্রাপ্ত হয় কারণ ঘটোত্কচ এইভাবে যুদ্ধ করলে যুদ্ধ আজই সমাপ্ত হয়ে যাবে এবং শ্রীকৃষ্ণের পরিকল্পনা ব্যর্থ হবে। আবার চতুর্থাঙ্কের প্রথম দৃশ্যের শেষে দুর্যোধন যখন বলেন – "যদি কিমপি সমাধানং জ্ঞায়তে ত্বয়া তর্হি অধুনাপি কথং নিশ্চেষ্টেন অবস্থীয়তে ত্বয়া?"[৪৩] অর্থাৎ, যদি আপনার কোনোরকম সমাধান জানা থাকে তাহলে এখন কেনই বা আপনি নিশ্চেষ্ট হয়ে রয়েছেন। তখন তাঁর উত্তরে শকুনি বলেন–"নহি নহি, নিশ্চেষ্টো নাহং স্থাস্যামি। অধুনৈব ব্যবস্থাং করোমি। চল অঙ্গরাজ শিবিরং গচ্ছামি।"[৪৪] অর্থাৎ, না না আমি নিশ্চেষ্ট হয়ে নেই। এখনই ব্যবস্থা করছি। চলো। অঙ্গরাজের শিবিরে যাই।

চতুর্থাঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে কর্ণের সাথে শকুনি, কর্ণ ও দুর্যোধনের কথোপকথন দেখতে পাওয়া যায়। শকুনি সেখানে যুদ্ধের সমস্ত ঘটনা জানান। কীভাবে ঘটোত্কচ একাই কৌরবসেনাকে আকুল করে তুলেছে। তাই কর্ণকে যুদ্ধে একপুরুষ ঘাতক ইন্দ্রপ্রদত্ত অস্ত্রও সাথে রাখতে বলেন–"তথাপি একপুরুষ ঘাতকং ইন্দ্রপ্রদত্তমস্ত্রং তূনীরে সংরক্ষ।"[৪৫] কর্ণ একথা শুনে বলেন "নহি নহি। অন্যত্র কুত্রাপি অস্য প্রয়োগঃ কথম্ নৈব যুজ্যতে"[৪৬] অর্থাৎ, না না। অন্য কোথাও এই অস্ত্রের প্রয়োগ কোনোভাবেই উচিত নয়। ইন্দ্র শকুনিকে নিশ্চিন্ত থাকতে বলেন, আজই ঘটোত্কচকে চূর্ণ করবেন তিনি। দুর্যোধন প্রত্যুত্তরে বলেন তিনি চিন্তা করছেন না। কিন্তু আজ ঘটোত্কচকে প্রতিরোধ করা যাচ্ছে না তাই এরূপ প্রার্থনা।' কর্ণ শুনে বলেন–"মহারাজ! কথং প্রার্থনেত্যুচ্যতে। আদেশ ইত্যাভিধীযতাম্। বিধের্যথৈবেচ্ছা তথৈবাস্ত"[৪৭] অর্থাৎ, মহারাজ! প্রার্থনা কেন বলছেন, আদেশ বলুন। বিধির যা ইচ্ছা তাই হোক। এইভাবে নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য বা প্রধান ফলে বারবার বিঘ্নের আবির্ভাব ও তিরোভাবের দ্বারা গর্ভসন্ধি লক্ষ্য করা গিয়েছে।

বিমর্ষসন্ধি – পঞ্চমাঙ্কের প্রথম দৃশ্যে কৃষ্ণ যখন দৌবারিককে যুদ্ধের বৃত্তান্ত জেনে আসার জন্য বলেন, দৌবারিক বৃত্তান্ত জেনে এসে বলে–

ঘটোত্কচস্যাস্য পরাক্রমেণ
পলায়মানাঃ কুরুসৈনকা হি।
পরাজয়ং নিশ্চিতমেব দৃষ্ট্বা
সমাগত স্ত্বঙ্গনৃপঃ সশস্ত্রঃ।।[৪৮]

অর্থাৎ, ঘটোত্কচের পরাক্রমের দ্বারা সমস্ত কৌরবসৈন্য চারিদিকে পলায়ন করেছে। পরাজয় নিশ্চিত জেনে তাঁরা আবার সশস্ত্র অঙ্গরাজকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। অঙ্গরাজের যুদ্ধে উপস্থিতির সংবাদ পেয়ে শ্রীকৃষ্ণ

মনে মনে বলেন "(স্বগতম) তর্হি ধনঞ্জয় জয়ায় যথাযথং চিন্তিতং তথৈব সর্ব্বমাপদ্যতে।"[৪৯] অর্থাৎ, তাহলে ধনঞ্জয়ের জয়ের জন্য যেমন ভেবেছিলাম তেমনই সব ঘটছে। শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তি থেকে নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য বা ফল সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশিত হয় এই অঙ্কে। কারণ কর্ণের একপুরুষঘাতক অস্ত্র প্রয়োগ করা এবং ধনঞ্জয়ের প্রাণরক্ষাই শ্রীকৃষ্ণের প্রধান বা নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য।

পঞ্চমাঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে কর্ণের উপস্থিতি দেখে ঘটোত্‌কচের সঙ্গে কৌরব পক্ষের ভয়ানক যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে কৌরবদের পরাজয় প্রায় আসন্ন হয়ে আসে। সকল সৈন্য পলায়ন করতে থাকে। এই দৃশ্যে নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য বাধা প্রাপ্ত হয়। গর্ভসন্ধির থেকেও এখানে নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয়েছে এবং অন্তিমে কৌরবদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী দেখে নাটকের মুখ্য ফলে বাধা প্রাপ্ত হওয়ায় বিমর্ষ সন্ধি লক্ষিত হয়েছে।

নির্বহনসন্ধি – *ঘটোত্‌কচবধ* নাটকের মুখ্য ফল ঘটোত্‌কচের বধ। শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধির দ্বারা ঘটোত্‌কচকে যুদ্ধে আমন্ত্রণরূপী বীজকে কেন্দ্র করে ঘটোত্‌কচের বীরত্বে কৌরবদের পরাজয় আসন্ন দেখে দুর্যোধন কর্ণকে বলেন– "অঙ্গরাজ! সর্ব্ব এব সৈনিকাঃ প্রায়েণ পলায়িতাঃ অলং কালক্ষেপেণ। শীঘ্রং ইন্দ্রদত্তমস্ত্রং প্রক্ষিপ।"[৫০] অর্থাৎ অঙ্গরাজ! সকল সৈন্যই প্রায় পলায়ন করেছে। কালবিলম্ব করবেন না। শীঘ্রই ইন্দ্রপ্রদত্ত অস্ত্র নিক্ষেপ করো। শ্রীকৃষ্ণের পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে নাটকের প্রধান ফল পঞ্চমাঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে সাধিত হয়। অন্তিমে ঘটোত্‌কচের মৃত্যু ঘটে, ইন্দ্রপ্রদত্ত অস্ত্রের প্রয়োগ ঘটে এবং ধনঞ্জয় সুরক্ষিত হয়।

"সুখদুঃখসমুদ্ভূতিঃ নানারসনিরন্তরম্"[৫১] অর্থাৎ নাটকে সুখ দুঃখ থেকে উদ্ভূত কার্যকলাপ নানা রসে বর্ণিত থাকবে। ঘটোত্‌কচবধ নাটকের বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, দ্বিতিয়াঙ্কের প্রথম দৃশ্যে কৃষ্ণের কাছে যুধিষ্ঠিরের বিলাপ।[৫২] যুধিষ্ঠির বলছেন কৃষ্ণকে–'সুভদ্রা তথা অর্জুনের আজ যা দশা, তা দেখে যেমন চিন্তিত হচ্ছি, তেমনই হৃদয়ও ব্যাথিত হয়ে উঠেছে[৫৩] যখনই বুঝতে পারছি এই সমস্ত ঘটনার কারণ আমি স্বয়ং, তখন নিজের প্রতি আমার প্রবল ধিক্কার জন্মাচ্ছে। বাসুদেব! আমার জন্যই আজ জননী হয়েও সুভদ্রা নিঃসন্তান। আমি এ কী করলাম! কীভাবে আমার মুক্তি হবে?' এইসমস্ত উক্তি থেকে দর্শকের হৃদয়ও যুধিষ্ঠিরের ন্যায় কাতর হয়েছে এবং করুণ রস আস্বাদিত হয়েছে। আবার নাটকের মূল যে বীজ অর্থাৎ কর্ণের একপুরুষঘাতী অস্ত্র প্রয়োগ কৃষ্ণের যে পরিকল্পনা সেই দিকে ঘটনার অগ্রগতি দেখে অর্জুনের প্রাণ বাঁচবে এই আনন্দ দর্শকবৃন্দও অনুভব করেন। এভাবে নাটকের সুখদুঃখের সমন্বয় লক্ষিত হয়েছে।

নির্দিষ্ট ভাবে অঙ্কের সংখ্যা নিয়ে মত না থাকলেও বিশ্বনাথ-কবিরাজের মতে "পঞ্চাদিকা দশপরাস্তত্রাঙ্কাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ"[৫৪] অর্থাৎ পাঁচ থেকে দশের মধ্যে অঙ্ক হতে হবে। নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় বিরচিত *ঘটোত্‌কচবধ* নাটকটিতে পাঁচটি অঙ্ক দেখতে পাওয়া যায় এবং প্রতিটি অঙ্কে দুটি করে দৃশ্য আছে।

ঘটোত্‌কচবধ নাটকের নায়ক হলেন কৃষ্ণ। কৃষ্ণ বসুদেব ও দৈবকীর পুত্র। বসুদেব হলেন যদুবংশীয় শূরসেনের পুত্র এবং যদুরাজবংশের রাজা উগ্রসেনের পুত্র কংসের বোন হলেন দেবকী। সুতরাং কৃষ্ণ প্রখ্যাতবংশদ্ভুত, রাজর্ষি, প্রতাপবান এবং দিব্য গুণযুক্ত। শোকক্রোধাদিতে অবিকৃতচিত্ত, গম্ভীরপ্রকৃতি, ক্ষমাশীল,

আত্মপ্রচারে বিমুখ, স্থির, বিনয়াদি দ্বারা অহঙ্কার গোপনকারী এবং কর্তব্যপালনে দৃঢ়চেতা নায়কই ধীরোদাত্ত পদবাচ্য। তাই আলোচ্য নাটকে কৃষ্ণ ধীরোদাত্ত নায়ক।

ঘটোত্‌কচবধ নাটকের বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় নাটকটির প্রধান রস বীর। বীর রস ছাড়া অঙ্গী রস রূপে করুণ, শান্ত প্রভৃতি রস পরিলক্ষিত হয়েছে।

ঘটোত্‌কচবধ নাটকে দূত, ধৃতরাষ্ট্র, কর্ণ, দুর্য্যোধন, যুধিষ্ঠির, শকুনি প্রভৃতি মুখ্যকার্যে সহায়ক চরিত্র দেখতে পাওয়া যায়। নাটকের বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় নাটকের মূল উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে গোপুচ্ছের ন্যায় নাটকের বন্ধন সাধিত হয়েছে।

নাট্যতত্ত্বানুসারে এই দৃশ্যকাব্যটিকে 'নাটক' আখ্যায় ভূষিত করা যেতে পারে। কারণ নাট্যতত্ত্বের প্রেক্ষিতে নাটকের যা যা মুখ্য গুণ তা প্রায় সবই এই দৃশ্যকাব্যে লক্ষ্য করা যায়। যদিও নাট্যতত্ত্বের বাইরেও আধুনিক সংস্কৃত নাটকের কৌশল এখানে গ্রহণ করা হয়েছে তথাপি নাট্যতত্ত্বানুসারে এটিকে 'নাটক' বলতে অসুবিধা হয় না।

❖ ৫.২.৭ ভরতবাক্য

ঘটোত্‌কচবধ নাটকের অন্তিমে ভরতবাক্য হল–

হিংসাদিশূন্যা নিজবান্ধবেষু
স্বভাবসিদ্ধাঃ পরিপূতচিন্তাঃ।
স্বকর্ম্মমগ্নাঃ নৃহিতে বিলগ্না
ভবন্তু সর্ব্বে মনুজা ধরণ্যাম্।।[৫৫]

অর্থাৎ, নিজ আত্মীয়দের সঙ্গে হিংসাদিশূন্য ব্যবহার, স্বভাবসিদ্ধ পবিত্র চিত্তযুক্ত হয়ে নিজ কর্মে অগ্রসর হয়ে মনুষ্যহিতে নিরত থেকে মনুষ্যগণ এই পৃথিবীতে মানুষের পাশে থাকুক। কৃষ্ণের এই কল্যাণ কামনার দ্বারা নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটে।

আলোচ্য নাটকের নামকরণ থেকে সংশয় তৈরী হয় যে নাটকের মূল নায়ক কে? *ঘটোত্‌কচবধ* নাটকে নাট্যকার নামকরণ থেকে শুরু করে একটি নতুন দিক অবলম্বন করার চেষ্টা করেছেন। সংস্কৃত নাট্যতত্ত্ব অবলম্বনে নায়কের মৃত্যু দেখানো যায় না। এই নাটকে মূল বৃত্তে *ঘটোত্‌কচবধ* থাকলেও তাঁকে নায়ক রূপে গ্রহণ করা যায় নি। নাট্যতত্ত্বের বিশ্লেষণের দ্বারা কৃষ্ণকে নায়ক রূপে উপরি উক্ত আলোচনায় গ্রহণ করা হয়েছে। এইখানে নাট্যকার নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়ের অভিনবত্ব এই যে নাট্যতত্ত্বের দৃষ্টির বাইরে গিয়ে ঘটোত্‌কচকে নায়ক করা যায়।

❖ ৫.৩ চরিত্র বিশ্লেষণ

এই নাটকে মুখ্য এবং গৌণ চরিত্র রূপে যেসকল চরিত্রের ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি হল–

নাটকের চরিত্র	**নাটকের অঙ্ক ও দৃশ্য**
ঘটোৎকচ	প্রথমাঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য, দ্বিতীয়াঙ্কে প্রথমদৃশ্য, দ্বিতীয়াঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য, তৃতীয়াঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য
দৌবারিক	প্রথমাঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য, দ্বিতীয়াঙ্কে প্রথমদৃশ্য, তৃতীয়াঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য, পঞ্চমাঙ্কে প্রথমদৃশ্য
দূত	প্রথমাঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য
যুধিষ্ঠির	দ্বিতীয়াঙ্কে প্রথমদৃশ্য, তৃতীয়াঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য, পঞ্চমাঙ্কে প্রথমদৃশ্য
কৃষ্ণ	দ্বিতীয়াঙ্কে প্রথমদৃশ্য, তৃতীয়াঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য, পঞ্চমাঙ্কে প্রথমদৃশ্য, পঞ্চমাঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য
ধৃতরাষ্ট্র	দ্বিতীয়াঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য
সঞ্জয়	দ্বিতীয়াঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য
দুর্যোধন	তৃতীয়াঙ্কে প্রথমদৃশ্য, চতুর্থাঙ্কে প্রথমদৃশ্য, চতুর্থাঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য, পঞ্চমাঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য
শকুনি	তৃতীয়াঙ্কে প্রথমদৃশ্য, চতুর্থাঙ্কে প্রথমদৃশ্য, চতুর্থাঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য
কর্ণ	চতুর্থাঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য, পঞ্চমাঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য

ঘটোৎকচ– দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেনের প্রথমা পত্নী রাক্ষসী হিড়িম্বার গর্ভজাত পুত্র ঘটোৎকচ[৫৬]। জন্ম মাত্রই এই পুত্র যৌবন লাভ করে এবং সর্বপ্রকার অস্ত্র প্রয়োগে দক্ষ হয়। মাথা তাঁর ঘটের মতো (হাতির ন্যায়) এবং উৎকচ (কেশ) শূন্য ছিল বলে নাম হয় ঘটোৎকচ। হিড়িম্বার এই পুত্রটির চক্ষু বিকট, কর্ণ শঙ্কুর ন্যায়, মুখ বিশাল, ওষ্ঠ তাম্রবর্ণ, দন্ত তীক্ষ্ণ, দীর্ঘ নাক, বক্ষ বিশাল[৫৭]। *ঘটোৎকচবধ* নাটকে ঘটোৎকচকে প্রথমাঙ্কের প্রথমদৃশ্যে, দ্বিতীয়াঙ্কের প্রথমদৃশ্যে, দ্বিতীয়াঙ্কের দ্বিতীয়দৃশ্যে, তৃতীয়াঙ্কের দ্বিতীয়দৃশ্যে দেখতে পাওয়া যায়। শুরুতেই দেখতে পাওয়া যায় এক দূত বিশেষ কার্যের নিমিত্তে বাসুদেবের বার্তা নিয়ে এসে উপস্থিত হয়েছেন। দৌবারিক ঘটোৎকচকে একথা জানাতে তিনি শীঘ্রই তাঁকে সসম্মানে নিয়ে আসার জন্য বলেন। এখান থেকে কৃষ্ণের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা লক্ষিত হয়। দূত প্রবেশ করে জানান দুর্যোধন পাণ্ডবগণকে বারোবছর বনবাসে এবং একবছর অজ্ঞাতবাসের কষ্ট দিয়েও তৃপ্ত হয়নি[৫৮] এখনো, জননী দ্রৌপদীকে সভামধ্যে এনে পূর্ণ বস্ত্র মোচনের

চেষ্টা করছেন তাঁরা। ঘটোত্কচ তা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন এইভাবে পাপাচরণ করতে করতে দুর্যোধন এখনও ধরাতলে জীবিত হয়ে আছেন কি করে? আজই সসৈন্যে গিয়ে দুর্যোধনকে হত্যা করবেন তিনি।[৫৯] এখান থেকে পিতৃকুলের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রস্ফুটিত হয় এবং আত্ম অহঙ্কার প্রকাশ পায়। দূত বলেন ভগবান বাসুদেব সেই দুরাত্মার বিরুদ্ধে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের উদ্যোগ শুরু করেছেন এবং তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সসৈন্যে পাণ্ডবপক্ষ গ্রহণের জন্য। তা শুনে ঘটোত্কচ বলেন বাসুদেবকে গিয়ে বলুন আজই সসৈন্যে গিয়ে কুরুবংশকে চূর্ণ করে পিতৃগণের প্রতিশোধ নেবে। এখান থেকে তাঁর চরিত্রে কৃষ্ণের প্রতি আনুগত্যের প্রকাশ মেলে। পরে দেখা যায় ঘটোত্কচ সভায় উপস্থিত হয়েছেন। কৃষ্ণ তাঁকে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে যাবার জন্য বলেন যুদ্ধ প্রতিরোধ করার জন্য। তা শুনে ঘটোত্কচ মনে করেন কূটনীতিজ্ঞের কুটচক্র বোঝা মুশকিল, তাই নির্দেশগ্রাহকরা বিচার না করেই নির্দেশ পালন করে থাকে। এখান থেকে কৃষ্ণের প্রতি অগাধ বিশ্বাস প্রকটিত হয়। ঘটোত্কচ ধৃতরাষ্ট্রের কাছে দূত রূপে গেলে তিনি আলিঙ্গন করতে চান কিন্তু ঘটোত্কচ এই বলে আলিঙ্গনে বাঁধা দেয় যে তিনি রাক্ষস পুত্র, মানুষের সাথে রাক্ষসের আলিঙ্গন উচিত নয়। এখান থেকে তাঁর উপস্থিত বুদ্ধির গুণ প্রকাশ পায়। ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গিয়ে অভিমন্যুর মৃত্যুর কথা, অর্জুনের প্রতিজ্ঞার কথা তিনি জানান। ঘটোত্কচ জানান কৌরববংশের রক্ষা করতে চাইলে এখনই পুত্র দুর্যোধনকে যুদ্ধ থেকে প্রতিনিবৃত্ত হতে–

> কুলস্থিতৌ তাবদ্ স্যাৎ কাপি ধীমন্ কথঞ্চন।
> অদ্যাপি যুদ্ধতঃ পুত্রং দুর্য্যোধনং নিবর্ত্তয়।।[৬০]

এখানেও তাঁর অহঙ্কার প্রকাশ পায়। তৃতীয়াঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা যায় অর্জুন শঙ্খ বাজিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিয়েছেন। কৃষ্ণ তখন ঘটোত্কচকে সভায় নিয়ে এসে জানান অভিমন্যুবধে শোকবিহ্বল পিতৃগণের খুবই করুণ অবস্থা। ঘটোত্কচ তা শুনে তৎক্ষণাৎ জানান পুত্রই পিতার কার্য করতে পারবে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি আজই ঘটবে এতে কোন সন্দেহ নেই। কৃষ্ণ তাঁকে যুদ্ধের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য বললে তিনি জানান তা প্রয়োজন নেই, তাঁর অনুগামী হয়েই আদেশ পালন করবেন – "নেতৃত্বেন নাস্তি প্রয়োজনম্। ভবতামনুবর্তিনা ভবতামাদেশঃ পরিপাল্যতে ময়া।"[৬১] এখান থেকে তাঁর কর্তব্যে নিশ্চলতা পরিস্ফুট হয়েছে। চতুর্থ অঙ্কে দুর্যোধন ও শকুনির কথোপকথনে জানা যায় রাক্ষসরাজ ঘটোত্কচের নেতৃত্বে যুদ্ধ উগ্র হয়ে উঠেছে। কৌরবদের সকল সৈন্য ছিন্নভিন্ন হয়েছে, প্রাণরক্ষার জন্য সকলে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করছে। রথ বিচূর্ণ, হস্তীসমূহ নিহত, অশ্বগুলির তথৈবচ অবস্থা। যেন তৃণ পর্যন্ত দগ্ধ হয়ে যাবে এমন মনে হচ্ছে। হিড়িম্বা ও ভীমসেনের পুত্র উভয় দিক থেকে অমানুষীক শক্তির অধিকারী তা এখানে চিত্রিত হয়েছে–

> ছিন্নঞ্চ ভিন্নং সকলং বলং মে
> স্থাতুং ন শক্তং পুরতঃ কথঞ্চিত্।
> প্রাণপ্ররক্ষার্থমিহৈব সর্ব্বং

পলায়মানং সমরে ভয়েন।।[৬২]

রথং বিচূর্ণং করিণো মৃতাশ্চ

হযাস্তথৈবাদ্যমৃতিং প্রযান্তি।

পদাতিকাঃ সৈন্যগণাস্তথৈব

পলাযমানা ভয়তঃ সমন্তাৎ।।[৬৩]

এখানে ঘটোত্কচের বীরত্বের বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়। অন্তিমে কর্ণ ও ঘটোত্কচের মধ্যে প্রবল যুদ্ধ হয় এবং পরাজয় আসন্ন দেখে কর্ণ ইন্দ্রপ্রদত্ত অস্ত্র নিক্ষেপ করেন। তাতে ঘটোত্কচের মৃত্যু ঘটে। ঘটোত্কচের চরিত্রের মধ্য দিয়ে স্বার্থহীন ভালোবাসার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে।

ঘটোত্কচ চরিত্রটির বিশ্লেষণে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে একটি নূতন আবেগ সৃষ্টি করে। কারণ সমাজে এখন মানুষের মনে সবকিছু কাজের লক্ষ্যে স্বীয় স্বার্থকে সর্বাগ্রে স্থাপন করা হয়। কিন্তু ঘটোত্কচ চরিত্রটিতে দেখা যায় যে সে পিতৃস্নেহ, পারিবারিক স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েও কোনরূপ স্বার্থের দিকে না তাকিয়ে পিতা ও তাঁর পরিবারকে রক্ষার জন্য নির্বিবাদে প্রাণ দেন যা এক মহান আদর্শ। এছাড়াও তিনি তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ও উচ্চশ্রেণীর মানুষ না হয়েও যে ত্যাগের আদর্শ স্থাপন করেছেন তা বর্তমান সমাজে অনুধাবন যোগ্য।

যুধিষ্ঠির – *ঘটোত্কচবধ* নাটকে যুধিষ্ঠিরকে দ্বিতীয়াঙ্কের প্রথমদৃশ্যে, তৃতীয়াঙ্কের দ্বিতীয়দৃশ্যে, পঞ্চমাঙ্কের প্রথমদৃশ্যে দেখতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়াঙ্কের প্রথম দৃশ্যে কৃষ্ণের সাথে যুধিষ্ঠিরের কথোপকথন দেখতে পাওয়া যায়। যুধিষ্ঠির জানতে চায় কৃষ্ণের উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধক্ষেত্রে সাহায্যের অভাবে অভিমন্যুর প্রাণ গেল কীভাবে? কৃষ্ণ বলেন দৈবকে প্রতিরোধ করতে কে ই বা পারে। যা নিশ্চিত ভাবে ঘটবে তার বাধাপ্রাপ্তি সম্ভব নয়[৬৪]। পূর্ব জন্মের কর্মফল দৈবরূপে ভোগ করতে থাকে। যুধিষ্ঠির বলেন কেন মানুষ তবে অবশ্যম্ভাবী ঘটনাকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেন? পুণ্যবান অভিমন্যু কী এমন কুকর্ম করেছিল যে ফলস্বরূপ যৌবনের প্রারম্ভেরই মৃত্যুবরণ করতে হল। পৃথিবীতে যদি এটাই নিয়ম হয় তাহলে নবীন কর্মপাশে কেন পুনরাবদ্ধ হই।[৬৫] কালচক্রে যদি সমস্ত কাজ সংঘটিত হয় তাহলে গুরুহত্যাদি পাপে কেন লিপ্ত হই? প্রতিনিয়ত স্বজনবিয়োগ কষ্টকর এই বলে কৃষ্ণকে যুদ্ধ রোধ করার জন্য অনুরোধ করেন। এখান থেকে তাঁর আত্মবিশ্লেষণ ও মানবতাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। এবং আধুনিক মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। যুধিষ্ঠিরের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণকে এই নাটকে বিশদ ব্যাখ্যা করতে দেখা যায় না তবে এই শাশ্বত প্রশ্ন নাট্যকার কিন্তু বাস্তবিক কারণেই তুলে ধরেছেন। তাছাড়া ধর্ম সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানবার কৌতূহলী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রশ্নপ্রতিপ্রশ্নের মাধ্যমে মানুষের জীবনের নিয়ন্ত্রক কে? ভাগ্য বা নিয়তি যদি মানুষের নিয়ন্ত্রক হয় তাহলে মানুষের কাজের প্রয়োজন কি। এর উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ যে উত্তর দেন ।

আলোচ্য নাটকে যুধিষ্ঠির আদর্শ পরিবার প্রধান, যুদ্ধের আদর্শ নেতা, সমাজের মঙ্গলকারক রূপে উপস্থিত হয়েছেন। রক্তমাংসের মানুষের যে আবেগ সে আবেগ তাঁর মধ্যে আছে আবার সামাজিক রূপে সমাজের মঙ্গলের জন্য সে আবেগকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতাও তাঁর আছে। আলোচ্য নাটকে মূল নিয়ন্ত্রক রূপে শ্রীকৃষ্ণকে দেখা গেলেও যুধিষ্ঠিরকে যে সাম্যাবস্থা মেনে চলতে দেখা গেছে তা যেকোন বিবেচক মানুষের অনুসরণ করার যোগ্য।

ধৃতরাষ্ট্র–*ঘটোৎকচবধ* নাটকে ধৃতরাষ্ট্রকে কেবল দ্বিতীয়াঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখতে পাওয়া যায়। অভিমন্যুকে অন্যায় ভাবে হত্যা করা হয়েছে শুনে সঞ্জয়কে বলতে থাকেন কৌরববংশের নাশ অবশ্যম্ভাবী, এথেকে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব। বংশরক্ষার জন্য কোনোভাবেই কিছু করতে অসমর্থ তিনি[৬৬]। এখান থেকে শিশুমৃত্যুকে তিনি যে সমর্থন করেন না তা প্রকাশিত হয়। সেই সময় ঘটোৎকচ সেখানে বাসুদেবের দূতরূপে উপস্থিত হয়। ধৃতরাষ্ট্র তাকে আলিঙ্গন করতে চায় কিন্তু ঘটোৎকচ তাতে সম্মতি দেয় না। এখান থেকে তাঁর স্বাভাবিক স্নেহ প্রবণতা প্রকাশ পায়। ঘটোৎকচের থেকে জানতে পারেন অভিমন্যুর মৃত্যুতে জয়দ্রথ মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তা শুনে ধৃতরাষ্ট্র দুঃশলার কথা ভেবে ভেঙে পরেন – "হা বৎসে দুঃশলা! তব অবৈধব্যদশাযা অদ্যৈব পরিসমাপ্তিঃ।"[৬৭] এখান থেকে পুত্রের ন্যায় কন্যার প্রতিও তাঁর স্নেহ প্রকাশিত হয়। ঘটোৎকচের থেকে যখন শোনেন তাঁর শতপুত্রেরই বিনাশ হবে তা সহ্য করতে না পেরে ফিরে যাবার জন্য বলেন। বাসুদেবকে জানাতে বলেন যে তিনি অসমর্থ বাধা দিতে, তাই পাপবীজের ফল ভোগ তাকে করতেই হবে–

> অসমর্থো ভবাম্যত্র কর্ত্তুং নার্হো হি কিঞ্চন।
> পাপবীজফলং তস্মাদ্ ভোক্তব্যং কিং করোম্যহম্।।[৬৮]

এখান থেকে তাঁর অসহায় অবস্থা এবং পরিণাম সম্পর্কে তিনি যে অবহিত তা ফুটে ওঠেছে।

ধৃতরাষ্ট্র তাঁর শোক জ্ঞাপনের মাধ্যমে এই নাটকের ফললাভের দিকেই শুধু ইঙ্গিত করেন নি, সামাজিক ভাবে যেন সকলকেই অবহিত করেছেন যে অন্যায় কখন মঙ্গল আনতে পারে না।

দুর্যোধন – *ঘটোৎকচবধ* নাটকে দুর্যোধনকে তৃতীয়াঙ্কের প্রথমদৃশ্যে, চতুর্থাঙ্কের প্রথমদৃশ্যে, চতুর্থাঙ্কের দ্বিতীয়দৃশ্যে, পঞ্চমাঙ্কের দ্বিতীয়দৃশ্যে দেখতে পাওয়া যায়। বাসুদেবের দূত প্রেরণ নিয়ে দুর্যোধন ও শকুনির মধ্যে কথোপকথন দেখতে পাওয়া যায়। দুর্যোধন জানায় তাঁর পিতার কাছে বাসুদেব ভীতিপ্রদর্শন করে যুদ্ধ প্রতিরোধ প্রার্থনা করেছেন। পিতা একথা জানাতে তৎক্ষণাৎ তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। পিতা তা দেখে করুন বিলাপ করতে থাকেন। এখান থেকে ধৃতরাষ্ট্রের যে দুর্যোধনের প্রতি যে অন্ধস্নেহ আছে সেই বিশ্বাসে যেন দুর্যোধন আহত হন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ক্ষণিকের জন্য হলেও কনিষ্ঠা ভগিনীর প্রতি যে দুর্বল স্নেহ তা জেগে ওঠে। পরক্ষণে আত্মভোগনিমগ্ন দুর্যোধন নিজেকে ফিরিয়ে আনেন। ঠিক এই সময় পাণ্ডবশিবির থেকে শঙ্খ,

তুরী, ভেরীর ধ্বনি ভেসে আসে। তা শুনে শকুনি যুদ্ধ ব্যাপারে চিন্তিত দেখে দুর্যোধন বলেন সকলে কৌরবদের শক্তি পুনরায় দেখবে পাণ্ডবরা। এখান থেকে তাঁর অহঙ্কার প্রস্ফুটিত হয়েছে। চতুর্থাঙ্কের প্রথম দৃশ্যে শকুনিকে দুর্যোধন যুদ্ধের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন পাণ্ডবপক্ষদের আক্রমণে সৈন্যসামন্ত ছিন্নভিন্ন হয়েছে এবং তাদেরকে পলায়ন করতে দেখা যাচ্ছে। রাক্ষসরাজ ঘটোত্কচ আজ যুদ্ধ পরিচালনার ভার নিয়েছেন। শকুনি তাকে নিয়ে কর্ণের কাছে গিয়ে উপস্থিত হন। কর্ণকে অনুরোধ করেন ঘটোত্কচকে প্রতিরোধ করা যাচ্ছে না তাই ইন্দ্রপ্রদত্ত অস্ত্র যেন শকুনির কথামতো সঙ্গে রাখেন তিনি। কর্ণ সেই অস্ত্র রাখতে রাজি না হলে তাকে পুনরায় বলেন। এখান থেকে মনে হয় তিনি কর্ণকে বন্ধুরূপে স্থান দিলেও রাজারূপে বন্ধুর প্রতি আবেগের থেকেও বড় হয়ে উঠেছে তাঁর অধিকারবোধ। অন্তিমে ঘটোত্কচের সাথে কর্ণের যুদ্ধে যখন সমস্ত সৈন্য পলায়ন করেছে তখন কালবিলম্ব না করে শীঘ্রই ইন্দ্রপ্রদত্ত অস্ত্র ব্যবহারের কথা দুর্যোধন জানান। যা প্রয়োগে ঘটোত্কচ মৃত্যুবরণ করেন।

দুর্যোধন চরিত্রটিতে স্বীয়স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য পিতা বন্ধু সকলের গুরুত্ব কম বলেই মনে হয়। কারণ পিতার বিলাপ, বন্ধু কর্ণের আপত্তিকে তিনি উপেক্ষা করতে পারেন কেবলমাত্র স্বীয়স্বার্থাভিমুখী শকুনির পরামর্শকে গুরুত্ব দিয়ে। যোদ্ধা হিসাবে তাঁর মধ্যে ভীতি এলেও তা তিনি অতিক্রম করতে পারেন বিচার বিবেচনার মাধ্যমে।

শকুনি–*ঘটোত্কচবধ* নাটকে শকুনিকে তৃতীয়াঙ্কের প্রথমদৃশ্যে, চতুর্থাঙ্কের প্রথমদৃশ্যে, চতুর্থাঙ্কের দ্বিতীয়দৃশ্যে দেখতে পাওয়া যায়। তৃতীয়াঙ্কের শুরুতে দুর্যোধনের সাথে শকুনির কথোপকথন দেখতে পাওয়া যায়। শকুনি যুদ্ধ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পরেন কারণ সমস্ত দিন যুদ্ধব্যাপারে পরিব্যাপ্ত সকলে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে রয়েছে। তাছাড়া অভিমন্যুবধের বিজয়োৎসবে সবাই অবসন্ন হয়ে পড়েছে। অতএব এখন আক্রমণ করলে সৈন্যরা পরাভূত হয়ে যেতে পারে। এখান থেকে তাঁর বাস্তববুদ্ধি ও যুদ্ধ সম্পর্কে ধারণার জ্ঞান প্রকাশিত হয়। পরে ঘটোত্কচের যুদ্ধে কৌরব সৈন্যের দৈন্যদশা দেখে দুর্যোধনকে ধৈর্য রাখার কথা বলেন। তিনি জানান কৌরব সৈন্যদেরকে পুনরায় সংঘবদ্ধ করতে হবে। নিভে যাবার আগে কর্পূরজনিত অগ্নি হঠাৎ প্রবলভাবে পরিদীপ্ত হতে দেখা যায়। শকুনি থাকতে চিন্তার কোন স্থান নেই তাঁদের। কোন না কোন ভাবে সমস্যার সমাধান নিশ্চয়ই হবে। এই বলে দুর্যোধনকে সাথে নিয়ে কর্ণের কাছে যান। এখান থেকে তাঁর বিচক্ষণতার প্রকাশ দেখা যায়। কর্ণকে গিয়ে বলেন হিড়িম্বা ও ভীমসেনের পুত্র ঘটোত্কচের যুদ্ধে সমগ্র কৌরব সেনা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। তাঁর এই অমানুষিক শক্তির কথা ভেবে শকুনি কর্ণকে ইন্দ্র প্রদত্ত অস্ত্র সাথে রাখার কথা বলেন। অন্তিমে এই অস্ত্রের দ্বারাই ঘটোত্কচের বধ হয়। এখান থেকে তাঁর দূরদর্শী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

আলোচ্য নাটকের নায়ক শ্রীকৃষ্ণের প্রতিপক্ষ হিসাবে শকুনি একটি বড় ভূমিকা পালন করেছেন। দুর্যোধনের সংশয় দূর করেছেন, কর্ণকে যুদ্ধে অমোঘ অস্ত্র নিতে বাধ্য করেছেন এবং যুদ্ধের প্রয়োজনে সেই অস্ত্র

প্রয়োগেও বাধ্য করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ যেমন অর্জুনের শক্তি রূপে কাজ করেছেন তেমনই প্রতিপক্ষ দুর্যোধনের শক্তি হিসাবে শকুনি কাজ করেছেন। তাঁর এই ভূমিকা কৃষ্ণের সমতুল্য রূপেই যেন সমীহ আদায় করে।

কর্ণ– *ঘটোৎকচবধ* নাটকে কর্ণকে চতুর্থাঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে এবং পঞ্চমাঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখতে পাওয়া যায়। ঘটোৎকচের পরাক্রমে চিন্তিত হয়ে শকুনি ও দুর্যোধন কর্ণের কাছে আসেন। দুর্যোধনের মুখে যুদ্ধের বৃত্তান্তের কথা শুনে তৎক্ষণাৎ যুদ্ধে যাবার জন্য কর্ণ প্রস্তুত হয়ে ওঠেন। তিনি বলেন ঘটোৎকচের কত শক্তি বা আছে? মুহুর্মুহু অস্ত্র শস্ত্র প্রহারে অচিরেই যুদ্ধে পরাস্ত করে দেব–

পশ্যামি যুদ্ধে কিয়তী শক্তিঃ
ভীমাত্মজে বর্ত্ততে এব চাস্মিন্।
অস্ত্রৈশ্চ শস্ত্রৈর্নিতরাং প্রহৃত্য
সম্পাতযাম্যেব রণেচিরাদ্ধি।।[৬৯]

এখান থেকে তাঁর চরিত্রে অহঙ্কার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু শকুনি ও দুর্যোধন উভয়ই অনুরোধ করেন ইন্দ্রপ্রদত্ত অস্ত্র সাথে রাখার জন্য। তিনি রাজি হন নি কিন্তু পরে মেনে নেন। এখান থেকে মনে হয় দুর্যোধনের বন্ধু হলেও দাসত্বের যন্ত্রণা অনুভব করেন তিনি, সেইকারণে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও রাজার ইচ্ছাকে চরিতার্থ করতে বাধ্য হন। এতে তাঁর অসহায়তা প্রকাশ পায়। অন্তিমে ঘটোৎকচের সাথে তাঁর প্রবল ধনুর্যুদ্ধ হয়। পরাজয় প্রায় আসন্ন দেখে দুর্যোধনের কথায় ইন্দ্রপ্রদত্ত অস্ত্র নিক্ষেপে ঘটোৎকচকে নিহত করেন।

এই নাটকে কর্ণ চরিত্রটিতে নিজের স্বার্থের থেকেও কৃতজ্ঞতা এবং সেনাপতি রূপে তাঁর গুরুত্বকেই প্রকাশিত হয়েছে। এর মাধ্যমে কর্তব্যপরায়ণতা অধিক গুরুত্ব লাভ করে।

কৃষ্ণ – *ঘটোৎকচবধ* নাটকে কৃষ্ণকে নায়করূপে দেখতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়াঙ্কের প্রথমদৃশ্যে, তৃতীয়াঙ্কের দ্বিতীয়দৃশ্যে, পঞ্চমাঙ্কের প্রথমদৃশ্যে, পঞ্চমাঙ্কের দ্বিতীয়দৃশ্যে কৃষ্ণ চরিত্রটি ফুটে উঠেছে। অভিমন্যুবধে যুধিষ্ঠির যখন কাতর হয়ে পরেন তখন কৃষ্ণ বলেন দৈবকে প্রতিরোধ করতে কেউ পারে না। যা পূর্বেই নির্ধারিত আছে তা নিশ্চিতভাবেই ঘটবে। নতুবা রাম, নল প্রমুখ রাজা কেনই বা দুঃখভোগ করবেন।[৭০] পূর্বজন্মের কৃত কর্মফলই প্রাণিগণ এই পৃথিবীতে দৈবরূপে সর্বথা ভোগ করে থাকেন। মুনির অভিশাপবশত চন্দ্র এই ধরাতলে তাঁর কর্মফল ভোগ করতে এসেছিল। শাপ শেষ হওয়ার ফলে সে শাপমুক্ত হয়ে নিজগৃহে গমন করেছে।[৭১] এখান থেকে শ্রীকৃষ্ণও যে ধর্মের কাছে আবদ্ধ তা জানাতে চেয়েছেন। যুধিষ্ঠির যখন বলেন কালচক্রে যদি কার্য সংঘটিত হয় গুরুহত্যাদি পাপে কেন লিপ্ত হব। একথা শুনে যুদ্ধ প্রতিরোধ করার জন্য কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রদ্ধা বশত ঘটোৎকচকে দূতরূপে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে যাবার জন্য বলেন। অভিমন্যুবধের বিজয়োল্লাসে কৌরবরা ভীষণ যুদ্ধ শুরু করলে কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ উপায় রূপে ঘটোৎকচকে এই যুদ্ধে নেতৃত্বভার গ্রহণ করার জন্য বলেন

–"অদ্য ত্বমেব নেতৃত্বভারং গৃহাণ।"[৭২] এটি তাঁর উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয়। পরে দৌবারিকের মুখে যুদ্ধে কর্ণের উপস্থিতির কথা জানতে পেরে মনে মনে ভাবেন–"ধনঞ্জয় জয়ায় যথাযথং চিন্ততং তথৈব সর্ব্বমাপদ্যতে"[৭৩] অর্থাৎ তাহলে ধনঞ্জয়ের জয়ের জন্য যেমন ভেবেছিলাম তেমনই সব ঘটছে। এটি তাঁর কূটনীতির পরিচয়। অন্তিমে ঘটোত্কচের পরাক্রমে কৌরবদের পরাজয় আসন্ন দেখে কর্ণ ইন্দ্র প্রদত্ত অস্ত্রের প্রয়োগ করেন। যা দেখে ঘটোত্কচ কৃষ্ণের চরণযুগলে আশ্রয় পার্থনা করে। কৃষ্ণ বলেন 'তুমি স্বীয় মহত্ত্বে আমার স্মরণ পাবে। এখন মুক্ত হয়ে দিব্যদেহে বৈকুণ্ঠলোকে গমন করো "ত্বং স্বীয়মহত্ত্বেনৈব মামধিগতোঽসি। অধুনৈব মুক্তঃ সন দিব্যদেহেন বৈকুণ্ঠলকং গচ্ছ।"[৭৪] এখান থেকে কৃষ্ণের অনুগতের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে।

আলোচ্য নাটকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণই যেন মূল নিয়ন্ত্রক রূপে কাজ করেছে। ঘটোত্কচকে আহ্ববান, যুধিষ্ঠিরাদির সাথে পরামর্শ স্থাপন, ধৃতরাষ্ট্রের কাছে দূতরূপে প্রেরণ, ঘটোত্কচকে যুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদান এবং অন্তে ঘটোত্কচের প্রতি আশীর্বাদ প্রদান, এই ভাবে কেন্দ্রবৃত্তে তিনি উপস্থিত। তিনি নেতা, তিনি নায়ক, তিনি বন্ধু বৎসল এবং অনুগতের প্রতি ভাবকপ্রবণ–এক মহনীয় চরিত্র।

৫.৪ আলঙ্কারিক বিচার

নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়কৃত *ঘটোৎকচবধ* নাটকের আলঙ্কারিক বিচারে অলঙ্কার, রস, ছন্দ, গুণ ও রীতির ব্যবহার এখানে আলোচিত হয়েছে।

❖ ৫.৪.০ অলঙ্কার বিচার

নারী যেমন ভূষণ ছাড়া সৌন্দর্য বিস্তার করতে পারেন না, তেমনই অলঙ্কার ছাড়া কাব্যের সৌন্দর্য বিস্তার সম্ভব নয়। এটি জানেন বলেই কবিগণ তাঁদের কাব্যে অলঙ্কারকে নানাভাবে ব্যবহার করে থাকেন। রসজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া অলঙ্কারের তাৎপর্য সাধারণগম্য নয়। তবুও রসবিস্তারে অলঙ্কার বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

ব্যতিরেক অলঙ্কারের প্রয়োগ–

পিতা মে কিং গদাশূন্যশ্চূর্ণয়তি মস্তকম্
গাণ্ডীবেন বিনা কিন্নু গাণ্ডীবীবর্ত্ততেঽধুনা।।[৭৫]

অর্থাৎ, আমার পিতৃদেব কি গদাশূন্য হয়েছেন? মস্তক চূর্ণ করতে পারেন নি? আর গাণ্ডীব ব্যতীত জীবনধারণ করেছেন। ব্যতিরেক অলংকারে উপমানের থেকে উপমেয়কে উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট রূপে দেখানো হয়ে থাকে। *সাহিত্যদর্পণ*কার বিশ্বনাথ-কবিরাজ ব্যতিরেক অলঙ্কারের লক্ষণ করতে গিয়ে বলেছেন–

আধিক্যমুপমেয়স্যোপমান্যূনতাথবা ব্যতিরেকঃ।[৭৬]

ঘটোৎকচবধ নাটকের উক্ত শ্লোকে গদাধারী ভীমকে ভীমের সঙ্গেই তুলনা করে তার গদাশূন্যতাকে স্থাপিত করা হয়েছে। গদাধারী ভীমকে একইসঙ্গে উপমান ও উপমেয়রূপে কল্পনা উপমেয় ভীমের ন্যুনতা দেখানো হয়েছে। একইভাবে গান্ডীবী অর্জুনের সাথে অর্জুনেরই তুলনা করে উপমেয় অর্জুনের ন্যুনতা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। এইভাবে এখানে ব্যতিরেক অলঙ্কারকে ব্যবহার করা হয়েছে।

এই অলঙ্কারের মাধ্যমে নাট্যকার নাটকের চরিত্রের গুরুত্বকে বুঝিয়েছেন অপূর্ব দক্ষতায়। যে ঘটোত্কচের মৃত্যু সেই ঘটোত্কচ সকল পিতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বলেই এই আত্মাহুতি দিতে পারেন। ভীম এবং অর্জুনের প্রতি তাঁর যে শ্রদ্ধা তা এই অলঙ্কার ব্যবহারের মাধম্যে জানা যায়।

বিশেষোক্তি অলঙ্কারের প্রয়োগ

"সতি হেতৌ ফলাভাবে বিশেষোক্তি"[৭৭] *সাহিত্যদর্পণে* উল্লিখিত বিশেষোক্তি অলঙ্কারের এই লক্ষণ থেকে বোঝা যায় যে যেখানে কারণ থাকা সত্ত্বেও ফলের অভাব হয় সেখানে বিশেষোক্তি অলঙ্কার হয়।

বর্তমানে মহাযুদ্ধে সংস্থিতে ত্বয়ি মাধবে।
অভিমন্যু রণে শেতে নির্ব্বান্ধব ইবাদ্যহা।।[৭৮]

অর্থাৎ, এই মহাযুদ্ধে হে মাধব! তুমি স্বয়ং উপস্থিত থাকতেও অভিমন্যুকে যুদ্ধক্ষেত্রে সাহায্যের অভাবে একাকী প্রাণ দিতে হল। *ঘটোৎকচবধ* নাটকের উক্ত শ্লোকে মাধবের অবস্থানরূপ কারণ থাকা সত্ত্বেও অভিমন্যুর রক্ষারূপ ফলের অভাবের উল্লেখ করা হয়েছে সেই কারণে এখানে বিশেষোক্তি অলঙ্কার হয়েছে বলা যায়।

আলোচ্য নাটকে এই অলঙ্কার পাণ্ডবগণের হৃদয়শূন্যতাকে স্বার্থক ভাবে প্রকাশ করেছে। শ্রীকৃষ্ণ যে কেবল পঞ্চ পাণ্ডবের বন্ধু নয় সমস্ত পাণ্ডবপক্ষীয়ের ভরসাস্থল তা এই অলঙ্কারের দ্বারা বোঝা যায়। অভিমন্যুর অসহায়তাকে প্রকাশ করতে 'নির্বান্ধব' শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যবাহী।

আক্ষেপ অলঙ্কারের প্রয়োগ–

*সাহিত্যদর্পণ*কার বিশ্বনাথ-কৃত আক্ষেপ অলঙ্কার এর লক্ষণ হল–

বস্তুনো বক্তুমিষ্টস্য বিশেষপ্রতিপত্তয়ে।
নিষেধাভাস আক্ষেপো বক্ষ্যমাণোক্তগো দ্বিধা।।[৭৯]

বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সাধনের ইচ্ছায় বক্তব্য বিষয়ে আপাত নিষেধের দ্বারা অভিপ্রেত বিষয়টিকে প্রকাশিত করা হলে আক্ষেপ অলঙ্কার হয়।

মদ্বাক্যে প্রত্যয়াভাবো ধর্ম্মরাজ যতস্তব।
রুধ্যতাং সমরং যত্নাৎ ত্বয়ৈব পাণ্ডুনন্দন।।[৮০]

ঘটোৎকচবধ নাটকের উক্ত শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধোন্মুখ করার উদ্দেশ্যে বক্তব্য বিষয়ে আপাত নিষেধ 'রুধ্যতাং সমরং' বলে তাঁর অভিপ্রেত যুদ্ধের বিষয়টিকে প্রকাশ করেছেন। এর দ্বারা এই শ্লোকে আক্ষেপ অলঙ্কার হয়েছে বলা যায়।

আক্ষেপ অলঙ্কারের প্রয়োগ এই নাটকে শ্রীকৃষ্ণের চতুরতাকে ফুটিয়ে তুলেছে। যুদ্ধে অনিচ্ছুক যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধে ইচ্ছুক করে তুলতে শ্রীকৃষ্ণ যে ভূমিকা নিয়েছেন তা এখানে আক্ষেপ অলঙ্কারের প্রয়োগ ছাড়া এত সহজভাবে বোঝান যেত না।

তুল্যযোগিতা অলঙ্কারের প্রয়োগ–

তুল্যযোগিতা অলঙ্কারের লক্ষণ করতে গিয়ে বিশ্বনাথ-কবিরাজ বলেছেন–

> পদার্থানাং প্রস্তুতানামন্যেষাং বা যদা ভবেৎ।
> একধর্মাভিসম্বন্ধঃ স্যাৎ তস্য তুল্যযোগিতা।।[৮১]

অর্থাৎ প্রস্তুত ও অপ্রস্তুত বস্তুগুলিকে একই ধর্মের বাঁধনে বাঁধলে তুল্যযোগিতা অলঙ্কার হয়।

> নির্ব্বাণকালে পরিদীপ্ত এব
> কর্পূরবহ্নির্হি সদা বিলোক্যতে।
> তথৈব চিন্তা কিমু দীপ্ত বুদ্ধেঃ
> কদাপি কেনাপি চ দৃশ্যতে ভোঃ।।[৮২]

অর্থাৎ, নিভে যাওয়ার সময় কর্পূরজনিত অগ্নি হঠাত্ করে প্রবলভাবে পরিদীপ্ত হতে দেখা যায়। তেমনি যুদ্ধেও কখনও কখনও কাউকে কাউকে এরকম উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতে দেখা যায় সেটাই চিন্তার। *ঘটোৎকচবধ* নাটকের উক্ত শ্লোকে প্রস্তুত কর্পূরবহ্নির সঙ্গে অপ্রস্তুত পাণ্ডবদের একই ধর্মে অর্থাৎ সাময়িক উজ্জ্বলতার পর করুণ পরিণতিরূপ ধর্মের বাঁধনে বাধা হয়েছে। সেই কারণে এখানে তুল্যযোগিতা অলঙ্কার হয়েছে বলা যায়।

এই অলঙ্কারটির মাধ্যমে দর্শকের সামনে যুদ্ধ চলাকালীন পাণ্ডবদের অবস্থা নাট্যকার এত সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন যাতে বোঝা যায় যুদ্ধে পাণ্ডবরা কখন পিছিয়ে কখন এগিয়ে, এক উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থায় বিদ্যমান।

উপমা অলঙ্কারের প্রয়োগ–

> অভিমন্যুবধেনাদ্য হবিষা দহনো যথা।
> তথা প্রদীপ্ত এবাসৌ করোতি বিক্রমং রণে।।[৮৩]

অর্থাৎ, আজ অভিমন্যুবধের কারণে অগ্নিতে যেভাবে ঘৃতদান করলে প্রচণ্ড প্রদীপ্ত হয়ে অথে, তেমনভাবেই তো ইনি দেখছি যুদ্ধে বিক্রম প্রদর্শন করছেন। *ঘটোৎকচবধ* নাটকের উক্ত শ্লোকে 'হবিষা দহনো' এই অংশের সঙ্গে 'রণে বিক্রমং' পদের তুলনা করা হয়েছে। অতএব এখানে উপমা অলঙ্কার হয়েছে। উপমা অলঙ্কারের লক্ষণটি হল – "সাম্যং বাচ্যমবৈধর্ম্যং বাক্যৈক্য উপমা দ্বয়োঃ"[৮৪]। এই শ্লোকে উপমান 'হবিষা দহনো' উপমেয় 'রণে বিক্রমং', সাধারণধর্ম 'প্রদীপ্ত' এবং সাদৃশ্যবাচক শব্দ 'যথা' 'তথা' ব্যবহৃত হয়েছে। এর জন্য এটিতে পূর্ণোপমা হয়েছে বলা যায়। পূর্ণোপমার লক্ষণ করতে গিয়ে বলেছেন–

> সা পূর্ণা যদি সামান্যধর্ম ঔপম্যবাচি চ।
> উপমেয়ঞ্চোপমানং ভবেদ্বাচ্যম্।।[৮৫]

এই শ্লোকে অভিমন্যুর হত্যা পাণ্ডবদের হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত বহ্নির কথা তুলে তাঁদের বীরত্বকে দুর্যোধন কতটা ভয় পেয়েছেন তা প্রকাশিত হয়েছে। এই শ্লোকটির দ্বারা যুদ্ধের পরিণতি পূর্বনির্দিষ্ট হয়ে যায়। আগুনের প্রতি মানুষের যেমন ভয় পাণ্ডবদের বীরত্বকে দুর্যোধনের তেমনই ভয় এই অলঙ্কার তা জ্ঞাপিত করে।

আলোচ্য শ্লোকে যেমন উপমার ব্যবহার হয়েছে তেমন আরও কয়েকটি স্থলে উপমার ব্যবহার দেখা যায়–

অভিমন্যুবধেনাদ্য হবিষা দহনো যথা।
তথা প্রদীপ্ত এবাসৌ করোতি বিক্রমং রণে।।[৮৬]

অর্থাৎ, আজ অভিমন্যুবধের কারণে অগ্নিতে যেভাবে ঘৃতদান করলে প্রচণ্ড প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে, তেমনভাবেই তো ইনি দেখছি যুদ্ধে বিক্রম প্রদর্শন করছেন।

আবার,

অভিমন্যুর্ন চৈবাস্মি বালকো দুর্ব্বলো রণে।
চলিষ্যটি তথা নাত্র হনবন্তো যথা শিশুম্।।[৮৭]

অর্থাৎ, আমি বালক অভিমন্যু নয় যে, যুদ্ধে দুর্বল, অনভিজ্ঞ। যেমনভাবে একটি শিশুকে হত্যা করেছেন সেরকম তো আর এখানে চলবে না।

❖ ৫.৪.১ রস বিচার

ঘটোৎকচবধ নাটকে অঙ্গীরস বীর। বীররসের স্থায়ীভাব উৎসাহ। বীররস উত্তম প্রকৃতির। সমস্ত বীরগণের অধীশ্বর মহেন্দ্র তাই বীররসের দেবতা মহেন্দ্র। মহেন্দ্রর বর্ণ হেম তাই বীররস হেমবর্ণ। বীররসের আলম্বন বিভাব হল বিজেতব্য প্রভৃতি। সহায়, অন্বেষণ প্রভৃতি হল এর অনুভাব। স্মৃতি, তর্ক, রোমাঞ্চ প্রভৃতি হল সাঞ্চারিভাব। বিশ্বনাথ-কবিরাজ বীররসের লক্ষণ করতে গিয়ে বলেছেন–

উত্তমপ্রকৃতির্বীর উৎসাহস্থাযিভাবকঃ।
মহেন্দ্রদৈবতো হেমবর্ণোঽয়ং সমুদাহৃতঃ।
আলম্বনবিভাবাস্তু বিজেতব্যাদযো মতাঃ।।
বিজেতব্যাদিচেষ্টদ্যাস্তস্যোদ্দীপনরূপিণঃ।
অনুভাবাস্তু তত্র স্যুঃ সহায়ান্বেষণাদযঃ।।
সঞ্চারিণস্তু ধৃতিমতিগর্বস্মৃতিতর্করোমাঞ্চাঃ।
স চ ধর্ম্মদানযুদ্ধের্দযযা চ সমন্বিতশ্চতুর্দ্ধা স্যাত্।।[৮৮]

ঘটোৎকচবধ নাটকে দুর্যোধনাদি কৌরব পক্ষ আলম্বন বিভাব, কৃষ্ণের দূত প্রেরণ এবং ঘটোৎকচকে পাণ্ডবদের বনবাসে প্রেরণ ও জননী দ্রৌপদীকে সভামধ্যে এনে বস্ত্রমোচনের কথা উদ্দীপন বিভাব। ঘটোৎকচকে নায়ক

রূপে যুদ্ধে প্রেরণ, কৃষ্ণের পরিকল্পনা ইত্যাদি অনুভাব। ঘটোৎকচের পরাক্রমে কৌরবদের পরাজয় আসন্ন দেখে কর্ণের একপুরুষঘাতী অস্ত্রের প্রয়োগে ঘটোৎকচের মৃত্যুর এখানে ব্যভিচারীভাব। উদাহরণ যথা–

অদ্যৈব যাস্যামি বলেন যুক্তঃ
সঞ্চূর্ণযাম্যেব কুরূন্ সমগ্রান্।
তাতাপমানপ্রতিশোধমেব
গৃহ্ণামি যুদ্ধে বলিনাং সমক্ষম্।।[৮৯]
ঘটোত্কচস্যাস্য পরাক্রমেণ
পলায়মানাঃ কুরুসেনকা হি।
পরাজয়ং নিশ্চিতমেব দৃষ্ট্বা
সমাগত স্ত্বঙ্গনৃপঃ সশস্ত্রঃ।।[৯০]

এই বীররস আবার ধর্ম, দান, যুদ্ধ ও দয়া ভেদে চারপ্রকার। আলোচ্য নাটকের নায়ক কৃষ্ণ ধর্মবীর।

আলোচ্য নাটকের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ অস্ত্র হাতে কখনই যুদ্ধ করেন নি। কিন্তু তিনি বীর, তাঁর অস্ত্র ধর্ম। এই একটি অস্ত্রেই তিনি জয়লাভ করেন। নাটকের আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর অস্ত্র ধর্মকে এমন সুচারুভাবে প্রয়োগ করেছেন যাতে প্রতিপক্ষ পরাভূত হতে বাধ্য হয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে তাঁর আচরণকে বীর রস প্রধান মনে না হলেও তিনি যে অটল, অতন্দ্র প্রহরীরূপে ধর্মকে রক্ষা করেছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য।

অঙ্গরস রূপে এখানে করুণ রস, শান্তরস লক্ষিত হয়েছে। দ্বিতীয়াঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণের কথোপকথনে করুণ রস দেখা গিয়েছে–

বর্ত্তমানে মহাযুদ্ধে সংস্থিতে ত্বয়ি মাধবে।
অভিমন্যু রণে শেতে নির্ব্বান্ধব ইবাদ্যহা।।[৯১]
সুভদ্রায়া দশাচাদ্য বীরোত্তমস্য ফাল্গুনেঃ।
লেশতশ্চিন্ত্যতে যাবৎ হৃদয়ং দীর্য্যতে ময়া।।[৯২]

এখানে অভিমন্যুর মৃত্যু আলম্বন বিভাব, অর্জুন-যুধিষ্ঠিরাদির শোক অশ্রুপাত অনুভাব এবং অভিমন্যুর মৃত্যুতে যে বিষাদের সুর ঘনীভূত হয়েছে তা ব্যভিচারীভাব। করুণ রসের লক্ষণ প্রসঙ্গে *নাট্যশাস্ত্রে* বলা হয়েছে–

ইষ্টবধদর্শনাদ্বা বিপ্রিয়বচনস্য সংশ্রবাদ্বাপি।
এভির্ভাববিশেষৈঃ করুণরসো নাম সংভবতি।।
সস্বনরুদিতৈর্মোহাগমৈশ্চ পরিদেবিতৈর্বিলোপিতৈশ্চ।
অভিনেয়ঃ করুণরসো দেহায়াসাভিঘাতৈশ্চ।।[৯৩]

অর্থাৎ, প্রিয়জনের বধ দর্শন, অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ প্রভৃতি ভাববিশেষ দ্বারা করুণরস উদ্ভূত হয়। সশব্দরোদন, মূর্ছা, পরিবেদন, বিলাপ, দেহের কষ্ট বা দেহে আঘাত দ্বারা করুণ রস অভিনেয়।

বীররস এই নাটকে অঙ্গীরস হলেও তার অঙ্গরূপে করুণ রস, শান্ত রস ও অদ্ভুদ রস ব্যবহৃত হয়েছে।

❖ ৫.৪.২ ছন্দ বিচার

নাটকটিতে ৭৭টি শ্লোক দেখতে পাওয়া যায়। নিত্যানন্দ-স্মৃতিতীর্থ বিরচিত *ঘটোৎকচবধ* নাটকে অন্যান্য ছন্দের প্রয়োগ থাকলেও অনুষ্টুভ্ ছন্দের বাহুল্য দেখা গিয়েছে। *ঘটোৎকচবধ* নাটকে যে সকল ছন্দ ব্যবহার করেছেন তা হল উপেন্দ্রবজ্রা, অনুষ্টুভ, উপজাতি, ইন্দ্রবজ্রা।

উপেন্দ্রবজ্রার উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেছেন–

য আদিদেবঃ পুরুষপ্রধানঃ
বিশ্বেষু সর্বেষু চ পূজ্যপাদঃ।
অনন্তকীর্তির্বহুরূপধারী
স পাতু যুস্মান্ করুণাবতীর্ণঃ।।[৯৪]

উপরি উক্ত শ্লোকের প্রতিপাদে জ-ত-জ-গ-গ গণগুলি থাকায় উপেন্দ্রবজ্রা ছন্দ হয়েছে। উপেন্দ্রবজ্রা ছন্দের লক্ষণ করতে গিয়ে *ছন্দোমঞ্জরী* গ্রন্থকার গঙ্গাদাস বলেছেন – "উপেন্দ্রবজ্রা প্রথমে লঘৌ সা"[৯৫]

অনুষ্টুভ্ ছন্দের উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেছেন –

কৃতং কালেন সর্ব্বং হি নিমিতং যূযমেব হি।
যুষ্মান্ বিনাপি কার্য্যানি ভবিষ্যন্তি ন সংসয়।।[৯৬]

উপরি উক্ত শ্লোকের প্রতিচরণের পঞ্চমবর্ণ লঘু ও ষষ্ঠবর্ণ গুরু হওয়ায় অনুষ্টুভ্ ছন্দ হয়েছে, অনুষ্টুভ্ ছন্দের লক্ষণ করতে গিয়ে *ছন্দোমঞ্জরী* গ্রন্থকার বলেছেন –

পঞ্চমং লঘু সর্বত্র সপ্তমং দ্বিচতুর্থয়োঃ।
গুরু ষষ্ঠঞ্চ জানীযাৎ শেষেষ্বনিয়মো মতঃ।।[৯৭]

অনুষ্টুভ্ ছন্দের আরও কিছু প্রয়োগ –

সুভদ্রায়া দশাচাদ্য ধারোত্তমস্য ফাল্গুনেঃ।
লেশতচিন্ত্যতে যাবদ্ হৃদয়ং দীর্য্যতেময়া।।[৯৮]

আবার কিছু পর

অভিমন্যুবধং শ্রুত্বা পাণ্ডবাঃ শোকবিহ্বলাঃ।
সমরে কিং করিষ্যন্তি বক্তুং কেন হি শক্যতে।।[৯৯]

ইন্দ্রবজ্রার উদাহরণ দেখা যায়–

অদ্যৈব যাস্যামি বলেন যুক্তঃ
সঞ্চুর্ণযাম্যেব কুরুন্ সমগ্রান্।
তাতাপমানপ্রতিশোধমেব
গৃহ্নামি যুদ্ধে বলিনাং সমক্ষম্।।[১০০]

উপরি উক্ত শ্লোকের প্রতিপাদে ত-ত-জ-গ-গ গণগুলি থাকায় ইন্দ্রবজ্রা ছন্দ হয়েছে। ইন্দ্রবজ্রা ছন্দের লক্ষণ করতে গিয়ে *ছন্দোমঞ্জরী* গ্রন্থকার গঙ্গাদাস বলেছেন – "স্যাদিন্দ্রবজ্রা যদি তৌ জগৌ গঃ"[১০১]

উপজাতির প্রয়োগও দেখতে পাওয়া যায়–

জানামি মদ্যো মম বংশনাশ
স্তবশ্যমেবেহ ভবেন্ন রক্ষা।
বংশস্য কস্যাপি কথঞ্চনৈব
কর্ত্তুঞ্চ শক্যং ন ময়াদ্য কিঞ্চিত্।।[১০২]

উপরি উক্ত শ্লোকে ইন্দ্রবজ্রা ছন্দ এবং উপেন্দ্রবজ্রা ছন্দের মিশ্রিত রূপ দেখা যাওয়ায় এটি উপজাতি ছন্দ হয়েছে। উপজাতি ছন্দের লক্ষণে গঙ্গাদাস বলেছেন–

অনন্তরোদীরিতলক্ষ্মভাজৌ
পাদৌ যদীয়া(বুপজাতয়)স্তাঃ।
ইত্থং কিলান্যস্বপি মিশ্রিতাসু
বদন্তি জাতিষ্বিদমেব নাম।।[১০৩]

ছন্দের ব্যবহারে নাটকের অভিব্যক্তির স্বচ্ছতা স্পষ্ট এবং অর্থপূর্ণ করে তোলে, দর্শকদের বুঝতে সাহায্য করে। ছন্দের লালিত্য নাটকের নাটকীয়তা বাড়ায়, ফলে দর্শকদের আকর্ষণ করে। আলোচিত নাটকে ছন্দের যেভাবে ব্যবহার হয়েছে তাতে নাটকীয়তা সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। নাট্যকার সহজ সরল সুবোধ্য ছন্দের ব্যবহারে দর্শকের রসাস্বাদনে সহায়তা করেছেন। নিম্নে আলোচ্য নাটকের ছন্দের একটি সূচী প্রস্তুত করা হল–

নাটকের নাম	অঙ্ক সংখ্যা	দৃশ্য	ছন্দ এবং শ্লোক সংখ্যা
ঘটোৎকচবধ	প্রথম-অঙ্ক	প্রথম দৃশ্য	উপেন্দ্রবজ্রা– ১ অনুষ্টুভ্– ২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯,১০
		দ্বিতীয় দৃশ্য	অনুষ্টুভ্ – ১১,১২,১৩,১৪,১৫,১৭,১৮,১৯ ইন্দ্রবজ্রা– ১৬,২০,২১
	দ্বিতীয়-অঙ্ক	প্রথম দৃশ্য	অনুষ্টুভ্ – ২২,২৩,২৪,২৫,২৬,২৭,২৮,২৯,৩০, ৩১,৩২,৩৩,৩৪
		দ্বিতীয় দৃশ্য	অনুষ্টুভ্ – ৩৫,৩৮,৩৯,৪০,৪১,৪২,৪৩,৪৪,৪৫, ৪৬,৪৭ উপজাতি – ৩৬,৩৭
	তৃতীয়-অঙ্ক	প্রথম দৃশ্য	অনুষ্টুভ্– ৪৯,৪৯, ৫০
		দ্বিতীয় দৃশ্য	অনুষ্টুভ্– ৫১,৫২,৫৩,৫৪ উপজাতি– ৫৫
	চতুর্থ-অঙ্ক	প্রথম দৃশ্য	উপজাতি– ৫৬,৫৮,৬৪,৬৫ উপেন্দ্রবজ্রা– ৫৭ অনুষ্টুভ্– ৫৯,৬০,৬১,৬২,৬৩,৬৬
		দ্বিতীয় দৃশ্য	ইন্দ্রবজ্রা– ৬৭,৬৯ অনুষ্টুভ্– ৬৮, উপজাতি– ৭০
	পঞ্চম-অঙ্ক	প্রথম দৃশ্য	উপেন্দ্রবজ্রা– ৭১ অনুষ্টুভ্– ৭২
		দ্বিতীয় দৃশ্য	অনুষ্টুভ্– ৭৩,৭৪,৭৫,৭৬ উপজাতি– ৭৭
			মোট শ্লোক সংখ্যা–৭৭ অনুষ্টুভ্–৬০ ইন্দ্রবজ্রা–৫ উপজাতি–৯ উপেন্দ্রবজ্রা–৩

❖ ৫.৪.৩ গুণ-রীতি বিচার

দেহের অঙ্গিরূপ রসের ধর্ম হল গুণ। যেমন শৌর্য, দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি দৈহিক ধর্মগুলি আত্মার গৌরব সাধন করে বলে গুণ নামে অভিহিত। *সাহিত্যদর্পণে* গুণগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে মাধুর্য, ওজঃ এবং প্রসাদ– “মাধুর্য্যমোজোঽথ প্রসাদ ইতি তে ত্রিধা”[১০৪] বিশ্বনাথ-কবিরাজ আরও কিছু গুণের উল্লেখ করলেও সেগুলি কম বেশী এই তিনটি গুণের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত। সাধারণত নবরসের মধ্যে শৃঙ্গার, করুণ ও শান্তরস মাধুর্যগুণ বিশিষ্ট, রৌদ্র, বীর ও বীভৎসরস ওজঃগুণ বিশিষ্ট এবং হাস্য, অদ্ভুত ও ভয়ানকরস প্রসাদগুণ বিশিষ্ট হয়ে থাকে।

ঘটোৎকচবধ নাটকটির অঙ্গী রস বীর। অতএব নাটকটিতে ওজঃগুণ হয়েছে বলা যায়। ওজঃ গুণের লক্ষণ প্রসঙ্গে *সাহিত্যদর্পণে* বলা হয়েছে চিত্তের বিস্তাররূপ দীপ্তিকে ওজগুণ বলে। বীর, বীভৎস ও রৌদ্রেরসের ক্রমানুসারে আধিক্য দেখতে পাওয়া যায়।

রসভেদে গুণের বিভেদ স্বীকৃত হলেও নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়ের নাটকে প্রসাদগুণেরও ব্যবহার লক্ষিত হয়। প্রসাদগুণের লক্ষণ করতে গিয়ে বিশ্বনাথ-কবিরাজ বলেছেন অগ্নি যেমন শুষ্ক কাষ্ঠকে আত্মসাৎ করে তেমনই যে গুণ শীঘ্র চিত্তকে আকর্ষণ করে তাকে প্রসাদগুণ বলে যা সমস্ত রস ও রচনায় থাকে। কাব্য শ্রবণমাত্র অর্থবোধ হলে প্রসাদগুণ হয়ে থাকে। নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়ের *ঘটোৎকচবধ* নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল ভাষার সরলতা। নিত্যানন্দ মুখপাধ্যায়ের এই নাটকে প্রসাদগুণের বাহুল্য দেখা গিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ আলোচ্য নাটকের একটি শ্লোক উল্লেখ করা হল–

ঘটোত্কচস্যাস্য পরাক্রমেণ
পলায়মানাঃ কুরুসৈনকা হি।
পরাজয়ং নিশ্চিতমেব দৃষ্ট্বা
সমাগত স্ত্বঙ্গনৃপঃ সশস্ত্রঃ।।[১০৫]

বিশ্বনাথ-কবিরাজ রীতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন অঙ্গের সংস্থাপনের মতো পদগুলির যোজনাবিশেষকে রীতি বলে। এই রীতি রসাদির উপকার সাধন করে। বিশ্বনাথের মতে দেহের মুখ, চোখ প্রভৃতি অঙ্গের সংস্থাপনের ন্যায় কাব্যের শব্দার্থরূপ শরীরে পদগুলির যথাযথ যোজনাবিশেষকে রীতি বলে। বামনাচার্য এই রীতিকে কাব্যের আত্মা বলেছেন– “রীতিরাত্মা কাব্যস্য”[১০৬] বিশ্বনাথ-কবিরাজ *সাহিত্যদর্পণে* রীতির চারপ্রকার ভেদ করেছেন–“সা পুনঃ স্যাশ্চতুর্বিধা। বৈদর্ভী চাথ গৌড়ী চ পাঞ্চালী লাটিকা তথা।”[১০৭] পাঞ্চালী রীতির লক্ষণ করে বিশ্বনাথ বলেছেন পূর্বোক্ত রীতিদ্বয়ের অবশিষ্ট বর্ণের দ্বারা, পাঁচ অথবা ছয়টি সমাসযুক্ত পদশোভিত রচনা হল পাঞ্চালী রীতি হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে তিনি ভোজরাজের সংজ্ঞা উদ্ধৃত করেছেন–

সমস্তপঞ্চষপদামোজঃ কান্তিবিবর্জিতাম্।
মধুরাং সুকুমারাঞ্চ পাঞ্চালী কবয়ো বিদুঃ।।[১০৮]

অর্থাৎ, পাঁচ অথবা ছয়টি সমাসযুক্ত পদসম্বলিত, ওজঃ, কান্তি প্রভৃতি গুণসমন্বিত, মধুর ও সুকুমারতা সম্পন্ন রচনা হল পাঞ্চালী রীতি।

নিত্যানন্দ-মুখোপাধ্যায় বিরচিত *ঘটোৎকচবধ* নাটকটি ওজঃ গুণযুক্ত এবং অল্পসমাসযুক্ত রচনা। তাই কবি পাঞ্চালী রীতির প্রয়োগ করেছেন বলা যায়। উদাহরণ স্বরূপ নাটকটির একটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হল–

ছিন্নঞ্চ ভিন্নং সকলং বলং মে
স্থাতুং ন শক্তং পুরতঃ কথঞ্চিত্।
প্রাণপ্ররক্ষার্থমিহৈব সর্ব্বং
পলায়নমানং সমরে ভয়েন।।[১০৯]

কাব্যের গুণ ও রীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই আলঙ্কারিকগণ মনে করেছেন। সেইকারণেই আলোচ্য নাটকেও গুণ-রীতির যথাযথ ব্যবহারের ফলে মনোহারী কাব্য রূপে এটি রসজ্ঞ ব্যক্তির মনোহরণ করতে পেরেছে। কারণ যখন যে রসটি স্ফুট হয়েছে তখন তার অনুকূল গুণ এবং রীতিকে ব্যবহার করেছেন। তা সত্ত্বেও পাঠক এবং শ্রোতার কথা বিবেচনা করে প্রসাদ গুণকেই অধিক ব্যবহার করা হয়েছে। রীতির ব্যবহারের ক্ষেত্রেও নাট্যকারের অভিনবত্ব দেখা যায়। কারণ শ্রবণসুখহেতু এবং বোধগম্যের প্রয়োজনে তিনি পাঞ্চালী রীতিকেই অধিক মাত্রায় ব্যবহার করে ভাষাকে সরল এবং বহুজনবোধ্য করে তুলেছেন।

উল্লেখপঞ্জি

[১] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *ঘটোৎকচবধ,* শ্লোক ১৪

[২] *তদেব,* শ্লোক ১৬-১৭

[৩] *তদেব,* শ্লোক ৪৬

[৪] *তদেব,* চতুর্থাঙ্কের দ্বিতীয়দৃশ্য

[৫] *তদেব,* শ্লোক ৭১

[৬] *তদেব,* পঞ্চমাঙ্কের প্রথম দৃশ্য

[৭] *তদেব,* পঞ্চমাঙ্কের দ্বিতীয়দৃশ্য

[৮] *তদেব,* শ্লোক ১

[৯] অমল শিব পাঠক (সম্পা), *নাট্যপ্রদীপ,* পৃষ্ঠা ২

[১০] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), *নাট্যশাস্ত্র* (তৃতীয় খণ্ড), ২২/২৫, পৃষ্ঠা ৭৩

[১১] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *সাহিত্যদর্পণ,* ৬/১৫, পৃষ্ঠা ২৭০

[১২] *তদেব,* বৃত্তি অংশ দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা ২৭১

[১৩] *তদেব,* ৬/১২, পৃষ্ঠা ২৬৮

[১৪] *তদেব,* ৬/১৬, পৃষ্ঠা ২৭১

[১৫] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), *পূর্বোক্ত* (তৃতীয় খণ্ড), ২২/২৮-২৯, পৃষ্ঠা ৭৩

[১৬] *তদেব,* ২২/৩০, পৃষ্ঠা ৭৪

[১৭] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত,* ১/৬

[১৮] *তদেব,* ১/৯

[১৯] *তদেব,* ১/১০

[২০] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), *পূর্বোক্ত* (তৃতীয় খণ্ড), ২২/৩২, পৃষ্ঠা ৭৪

[২১] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত,* শ্লোক ২০

[২২] *তদেব,* শ্লোক ২৩-২৪

[২৩] *তদেব,* শ্লোক ২৭

[২৪] *তদেব,* শ্লোক ২১

[২৫] *তদেব,* তৃতীয়াঙ্কের দ্বিতীয়দৃশ্য

[২৬] *তদেব,* শ্লোক ৫২

[২৭] *তদেব,* শ্লোক ৫৩

[২৮] *তদেব,* তৃতীয়াঙ্কের দ্বিতীয়দৃশ্য

[২৯] *তদেব,* শ্লোক ৫৬

[৩০] *তদেব,* শ্লোক ৫৭

[৩১] *তদেব,* চতুর্থাঙ্কের দ্বিতীয়দৃশ্য

[৩২] *তদেব,* শ্লোক ৩-৪

[৩৩] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *পূর্বোক্ত,* ৬/৬, পৃষ্ঠা ২৬২

[৩৪] তত্রৈব

[৩৫] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত,* প্রথমাঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য

[৩৬] *তদেব* শ্লোক ২০

[৩৭] *তদেব,* তৃতীয়াঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য

[৩৮] তত্রৈব

[৩৯] তত্রৈব

[৪০] তত্রৈব

[৪১] *তদেব* শ্লোক ৫৬

[৪২] *তদেব,* শ্লোক ৫৭

[৪৩] *তদেব,* চতুর্থাঙ্কের প্রথমদৃশ্য

[৪৪] তত্রৈব

[৪৫] *তদেব,* চতুর্থাঙ্কের দ্বিতীয়দৃশ্য

[৪৬] তত্রৈব

[৪৭] তত্রৈব

[৪৮] *পূর্বোক্ত,* শ্লোক ৭১

[৪৯] *তদেব,* পঞ্চমাঙ্কের প্রথম দৃশ্য

[৫০] *তদেব,* পঞ্চমাঙ্কের দ্বিতীয়দৃশ্য

[৫১] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *পূর্বোক্ত,* ৬/৬, পৃষ্ঠা ২৬২

[৫২] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত,* শ্লোক ২২

[৫৩] *তদেব,* শ্লোক ৩২

[৫৪] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *পূর্বোক্ত,* ৬/৬, পৃষ্ঠা ২৬২

[৫৫] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত,* শ্লোক ৭৭

[৫৬] অমল কুমার ঘোষ (সম্পা), *মহাভারতের চরিত্র-পরিচিতি,* পৃষ্ঠা ১৬৬

[৫৭] তত্রৈব

[৫৮] নিত্যানিন্দ মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত,* শ্লোক ১৬

[৫৯] *তদেব,* শ্লোক ১৯

[৬০] *তদেব,* শ্লোক ৪৬

[৬১] *তদেব,* তৃতীয়াঙ্কের দ্বিতীয়দৃশ্য

[৬২] *তদেব,* শ্লোক ৫৬

[৬৩] *তদেব,* শ্লোক ৫৭

[৬৪] *তদেব,* শ্লোক ২৩

[৬৫] তদেব, শ্লোক ২৭

[৬৬] *তদেব,* শ্লোক ৩৭

[৬৭] *তদেব,* দ্বিতীয়াঙ্কের দ্বিতীয়দৃশ্য

[৬৮] *তদেব,* শ্লোক ৪৭

[৬৯] *তদেব,* শ্লোক ৬৯

[৭০] *তদেব,* শ্লোক ২৩-২৪

[৭১] *তদেব,* শ্লোক ২৬

[৭২] *তদেব,* তৃতীয়াঙ্কের দ্বিতীয়দৃশ্য

[৭৩] *তদেব,* পঞ্চমাঙ্কের প্রথম দৃশ্য

[৭৪] *তদেব,* পঞ্চমাঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য

[৭৫] *তদেব,* শ্লোক ১৮

[৭৬] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *পূর্বোক্ত,* ১০/৭১, পৃষ্ঠা ৫৬৪

[৭৭] *তদেব,* ১০/৮৮, পৃষ্ঠা ৫৯৬

[৭৮] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত,* শ্লোক ২২

[৭৯] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *পূর্বোক্ত,* ১০/৮৫, পৃষ্ঠা ৫৯৩

[৮০] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত,* শ্লোক ৩০

[৮১] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *পূর্বোক্ত,* ১০/৬৬, পৃষ্ঠা ৫৫৬

[৮২] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত,* শ্লোক ৬৪

[৮৩] *তদেব,* শ্লোক ৫৯

[৮৪] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *পূর্বোক্ত,* ১০/১৭, পৃষ্ঠা ৫০৩

[৮৫] *তদেব,* ১০/১৮, পৃষ্ঠা ৫০৫

[৮৬] নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ, *পূর্বোক্ত,* শ্লোক ৫৯

[৮৭] *তদেব,* শ্লোক ৭৩

[৮৮] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *পূর্বোক্ত,* ৩/২০৬, পৃষ্ঠা ১৮১

[৮৯] নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ, *পূর্বোক্ত,* শ্লোক ২১

[৯০] *তদেব,* শ্লোক ৭১

[৯১] *তদেব,* শ্লোক ২২

[৯২] *তদেব,* শ্লোক ৩২

[৯৩] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), *পূর্বোক্ত* (প্রথম খণ্ড), ৬/৬২-৬৩, পৃষ্ঠা ১৪৬

[৯৪] নিত্যানন্দ মুখপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত,* শ্লোক ১

[৯৫] রামতারণ শর্মা (সম্পা), *ছন্দোমঞ্জরী,* দ্বিতীয় স্তবক, ১১/২, পৃষ্ঠা ২৯

[৯৬] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত,* শ্লোক ২৭

[৯৭] রামতারণ শর্মা (সম্পা), *পূর্বোক্ত,* চতুর্থ স্তবক, শ্লোক ৩, পৃষ্ঠা ১১৫

[৯৮] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত,* শ্লোক ৩১

[৯৯] *তদেব,* শ্লোক ৪১

[১০০] নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ, *পূর্বোক্ত,* শ্লোক ২১

[১০১] রামতারণ শর্মা (সম্পা), *পূর্বোক্ত,* দ্বিতীয় স্তবক, ১১/১, পৃষ্ঠা ২৯

[১০২] নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ, *পূর্বোক্ত,* শ্লোক ৩৬

[১০৩] রামতারণ শর্মা (সম্পা), *পূর্বোক্ত,* দ্বিতীয় স্তবক ১১/৩, পৃষ্ঠা ৩০

[১০৪] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *পূর্বোক্ত,* ৮/২, পৃষ্ঠা ৪৫১

[১০৫] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত,* শ্লোক ৭১

[১০৬] বেচনা ঝা (সম্পা), *কাব্যালংকারসূত্র,* ১/২/৬, পৃষ্ঠা ১৫

[১০৭] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *পূর্বোক্ত,* ৯/২, পৃষ্ঠা ৪৬৫

[১০৮] কামেশ্বরনাথ মিশ্র (সম্পা), *সরস্বতীকণ্ঠাভরণ,* ২/৩০, পৃষ্ঠা ২৩২

[১০৯] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত,* শ্লোক ৫৬

ষষ্ঠ অধ্যায়:

দ্রৌপদীমানরক্ষণ-নাটকের বিশ্লেষণাত্মক সমীক্ষা

ষষ্ঠ অধ্যায়

দ্রৌপদীমানরক্ষণ নাটকের বিশ্লেষণাত্মক সমীক্ষা

এই অধ্যায়ে নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় বিরচিত অপ্রকাশিত *দ্রৌপদীমানরক্ষণ* নাটক, তার বঙ্গানুবাদ, তার নাট্যতত্ত্ব বিচার, চরিত্র বিচার এবং আলংকারিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৬.০ মূল নাটক

श्रीनित्यानन्दमुखोपाध्यायरचितं *द्रौपदीमानरक्षण*

प्रथमाङ्के प्रथमदृश्यम्

नान्दी

नवजलधरकान्तिः पीतवासा वरेण्यः
सकलभुवनपाता चक्रहस्तः सुवेषः।
शरणगतजनानामाश्रयो यः कृपालु
र्वपनयतु स दुःखं सर्व्वतो वो मुरारिः॥ १

सूत्रधारः (प्रविश्य) अभिवादये समागतान् आर्य्यमिश्रान्। मारिष ! यदि सम्पन्ना ते नेपथ्यक्रिया तर्हि अत्रागच्छ।

पारिपार्श्विकः (प्रविश्य) भाव ! एषोऽहमागतोऽस्मि।

सूत्रः मारिष ! समागतानामार्य्यमिश्राणां चित्तविनोदनाय किमपि अस्माभिः प्रयोक्तव्यम्। तत्प्रयोगाश्रयणाय विषये परामर्शाय एव त्वामहम् आह्वयामि।

परिः अत्र विशेषपरामर्शस्य कोऽवकाशः।

सूत्रः कथमेवमभिधीयते त्वया ?

पारिः महाभारतमाश्रित्य यत् किञ्चिच्च प्रयुज्यताम्।
प्रीतिस्तेन भवेदेषां संशयो नास्ति कश्चन॥ २

सूत्रः पुराणनाटकानां हि प्रयोगोऽनिपुणैः कथम्।

तद् विचार्य्य विधातव्यं चिन्त्यताञ्च तथैव भोः ॥ ३

पारिः नवीनं नाटकञ्चापि वर्तते भारताश्रितम्।

वाधा तत्प्रयोगे नास्ति यत्यतां तत्र सर्व्वतः ॥ ४

श्रीत्रः भारताश्रितिं नवीनं किमपि वर्त्तते ननु ?

पारिः अथ किम् भाव !

सूत्रः तर्हि तस्य विबरणं सम्यग् अभिधीयताम्।

पारिः श्रूयतां भावेन।

रामगोपालपुत्रेण नित्यानन्देन शर्म्मणा।

रचितं नाटकं नाम " द्रौपदीमानरक्षणम्" ॥५

सूत्रः एवं ननु ? तर्हि अस्यैव प्रयोगोऽस्माभिः क्रियेत। सम्यग् आयोजनं क्रियताम्।

पारिः आयोजनं कृतम्। अत्र केवलं तवानुमतिरेव अपेक्षते। त्वया यतोऽनुमतं ततोऽधुनैव समारभ्यते नाटकम्। कुशीलवा अपि प्रस्तुताः।

सूत्रः आरभ्यतां तर्हि नाटकम्।

(नेपथ्ये)

दुर्य्योधनः मातुल!

पाण्डवानां तथा दृष्ट्वा सम्पदञ्चातुलां परां।

व्याकुलश्चञ्चलाश्चास्मि हन्तुमिच्छामि सर्व्वतः ॥६

सूत्रः मारिष ! क एष प्रविशति ?

पारिः सार्द्धं शकुनिना राजा दुर्योधनो महावलः

रङ्गस्थले समायाति चञ्चलमानसस्त्वसौ। ।७

सूत्रः तन्मारिष ! अस्माभिर्नेपथ्येवस्थायैव द्रष्टव्यम्।

पारिः तथैव भवतु।

(निष्क्रान्तौ)

प्रथमाङ्के द्वितीयदृश्यम्

दुर्योधनः　मातुल !

पाण्डवानां तथा दृष्टा सम्पदञ्चातुलां पराम्।
व्याकुलश्चञ्चलश्चास्मि हन्तुमिच्छामि सर्व्वतः॥

शकुनिः　वत्स ! स्वाभाविकमेतत्।

शत्रुणामुदयं दृष्ट्वा सोढुं शक्तो भवेज्जनः।
अचिन्त्यनीयमेतद्धि सर्व्वतोऽस्मिन् धरातले॥८

दुर्योधनः　सत्यमेव मातुल !

निर्मिता नगरी यैषा राजगेहं तथैव च।
अचिन्त्यरूपमेतद्धि दर्शनस्य कथा हि का॥९

मातुल ! भीमस्य परिहासं यदैव स्मरामि तदैव हृदयं मे प्रज्वलितं भवति।

शकुनिः　वत्स ! कथमिव ?

दुर्य्योधनः　श्रुयतां मातुलेन।

स्वच्छे च प्रस्तरे शुभ्रे जलशङ्का ममाभवत्।
जले प्रस्तरबुद्धिश्च पराभ्रान्तिरजायत॥१०
एतादृशीं ममावस्थां दृष्ट्वा भीमोऽति दुर्म्मतिः।
उच्चैर्हास्यं चकारासावुपहासाय मे तदा॥११
तस्य हास्यं तथा दृष्ट्वा स्थिताश्चान्ये जनास्तदा।
उपहसन्ति मां सर्व्वे निर्दयाः क्रूरवुद्धयः॥ १२

शकुनिः　एवं ननु ? अस्य प्रतीकारः अवश्यमेव करणीयः ?

दुर्य्योधनः　मातुल ! अहमपि तदेव कथयामि।

उपेक्षया प्रवर्द्धन्ते दुर्व्वलाः दुर्जना भुवि।
शासनं तेन कर्त्तव्यं दुष्टानां हि प्रयत्नतः॥१३

शकुनिः　समीचीनमेव अभिधीयते त्वया। उपायनिरूपणन्तु विशेषवैचक्षण्येन कर्त्तव्यम्।

उपायेऽनिर्णीते सम्यक् कार्य्यहानिः प्रजायते।
नीतिदिशा ततः कार्य्यमुपायस्य निरूपणम् ॥१४

दुर्य्योधनः कथमेवमभिधीयते मातुलेन।

वलेन हीनाः किमु दुर्बला वयम्
न साहसं किं मयि वर्त्तते ननु।
भयेन भीतो न च पाण्डुपुत्रतः
सदा समर्थोऽस्मि धराजये पुनः ॥१५

शकुनिः कौरवेश्वर ! कः सन्देहः।

अस्त्रेण शस्त्रेण युतः सदैव
वीरो महांस्त्वं सवलो धरेशः।
लोकप्रियो नीतिविदां वरेण्यः
को समः स्याद् धरणौ त्वया ॥१६

तथापि राजन् !

सद्यो यज्ञप्रकर्त्तासौ धार्मिकः पृथिवीश्वरः।
दानादिना जनानाञ्च प्रियतामगमद् भुवि ॥१७
आक्रमणं ततः कार्य्यं नाधुना तु कथञ्चन।
भवेयुः सकला बीराः पाण्डुपक्षसमाश्रिताः ॥ १८

अयशश्च ते घोषयेयुः सकलाः लोकाः।

दुर्य्योः तर्हि किं करणीयम् ?

शकुनिः मा चिन्तय।

बलाच्छलं समाश्रेयं कार्य्यसिद्धौ तु कुत्रचित्।
निश्चिन्तो भव वत्स त्वं यत्कार्य्यं करवाण्यहम् ॥१९

दुर्य्योः मातुल व्यक्तमभिधीयतां तेऽभिप्रायः।

शकुनिः महान् यदि ते आग्रहस्तर्हि श्रृणु।

द्यूतेनैव पराजित्य पाण्डवानां हि सम्पदम्।
सर्व्वामहं हरिष्यामि वत्स चिन्तां परित्यज ॥२०

दुर्य्यो:		सुष्ठ्वेव विचिन्तितं त्वया। तथैव क्रियताम्।

शकुनिः		अधुना विश्रामं लभस्व। पश्चात् परामृश्य सर्व्वं करिष्यामि।

दुर्य्यो:		तथैव भवतु।

(निष्क्रान्तौ)

द्वितीयाङ्के प्रथमदृश्यम्

वैतालिकः	(गायन्ति) जयति जयति राजा धार्मिकः शुद्धबुद्धिः
निखिल गुणनिवासः पाण्डवः सत्यमूर्त्तिः।
जनगणपरिपाले सर्व्वदा मग्नचेताः
विहितकृतिरतोऽसौ दानशीलो महात्मा॥२१

युधिष्ठिरः	गच्छत यूयं। विश्रामं लभध्वम्। वृकोदर !

भीमः		धर्म्मराज ! कथय।

युधिष्ठिरः	एतेभ्योः पारितोषिकं प्रयच्छ।

यद् आदिशति धर्म्मराजः। आगच्छत वैता- लिका: (वैतालिकैः सह निष्क्रान्तः)

युधिष्ठिरः	धनञ्जय !

आक्रम्य भूपान् स्ववलेन यूयम्
सर्व्वान् पराजित्य पराक्रमेन।
आदाय राज्यानि च वै नृपेभ्यः।
सम्राडुपाधिं परिदत्तवांश्च॥ २२

अर्ज्जुनः	अग्रज !

यदस्माभिः	कृतं राजन् तद् भवतः प्रसादतः।
भवतस्तु वलेनैव वलवन्तः सदा वयम्।२३

युधिष्ठिरः	धनञ्जय ! नैवं वाच्यम्। किं वा वलं वर्त्ततेऽस्माकं कस्याप्यनुष्ठाने।

सर्व्वेषु कृत्येषु सदा प्रमाणं
बलप्रदाता च महान् सहायः।

दयाश्रयः सर्व्वजनप्रपाता
विश्वस्य धाता भगवान् मुरारिः ॥२४

अर्ज्जुनः तत्र कः सन्देहः।
विना कृष्णवलेनात्र किं कर्त्तुं सक्षमा वयम्।
वलं परममस्माकं कृष्ण एव न संशयः। २५

किं बहुना।
वयं यन्त्रं सदावन्यां यन्त्री तु कमलाननः।
चालयति यथा सोऽस्माञ्चलामोऽत्र तथा वयम् ॥२६

युधिष्ठिरः धनञ्जय ! कथं सहसा मे वामाक्षि स्पन्दते
सूचयत्यशुभं किं नो वामाक्षिस्पन्दनेन भोः।
मनो मे चञ्चलं भ्रातर्भवति सहसा कथम् ॥२७

अर्ज्जुनः अग्रज ! कथं चिन्तयति भवान्
यस्य स्मरणमात्रेण सर्व्वाशुभं विनश्यति।
आस्ते स हृदये यस्य कथं तस्याशुभं भवेत् ॥२८

भीमः (प्रविश्य) धर्म्मराज ! परिपालितो भवदादेशः।
परितुष्टा वैतालिकाः साम्प्रतं विश्रामं लभन्ते।

युधिष्ठिरः अहमपि परितृप्तोऽस्मि। सुष्ठु कृतं त्वया।

दौवारिकः (प्रविश्य) बिजयतां महाराजः। महाराज ! कौरवेश्वरेण महाराज-दुर्योधनेन प्रेषितः कश्चिद् दूतः।

युधिष्ठिरः ससम्मानं प्रवेशय तम्।

दौवारिकः यद् आदिशति महाराजः। (निष्क्रान्तः)

युधिष्ठिरः सहसा दुर्योधनेन कथं दूतः सम्प्रेषितः ?

भीमः निश्चितमेव किमपि अभिसन्धायैव प्रेषितवानयं दूतम्।

दौवारिकः (दूतेन सह प्रविश्य) इत इतो भवान्। एष धर्म्मनिष्ठो महाराजो युधिष्ठिर उपविष्टस्तिष्ठति। उपसर्पतु भवान्।

दूतः (निरीक्ष्य) अयं स राजा धरणीश्वरो हि

धर्मैकनिष्ठो गुणवान् नयज्ञः।
सत्यव्रती दुःखिजनाश्रयश्च
युधिष्ठिरो वीरवरः सुकीर्त्तिः ॥२९

(उपसृत्य) बिजयतां महाराजः।

युधिष्ठिरः आगच्छ। आसनं परिगृह्यताम्। दूत ! अपि कुशलं कौरवेश्वरस्य?

दूतः अथ किम् महाराज ! सर्व्वं कुशलम्। कौरवेश्वरोऽपि भवतः कुशलम् अनामयञ्च पृच्छति।

युधिष्ठिरः सर्व्वं कुशलम्। अथ किमाह कौरवेश्वरः।

दूतः महाराज ! द्यूतक्रीड़ार्थं आमन्त्रितो भवान् कौरवेश्वरेण।

युधिष्ठिरः कौरवेश्वरस्य सादरामन्त्रणम् अवश्यमेव रक्षिष्यामि। विज्ञापय कौरवेश्वरम् अचिरादेवाहम् उपस्थितो भविष्यामि।

दूतः अनुगृहीतोऽस्मि। एवमेव विज्ञापयिष्यामि अनुमन्यतां मद्गमनम्।

युधिष्ठिरः गम्यतां पुनर्दर्शनाय। (दूतो निष्क्रान्तः)

अर्ज्जुनः निमन्त्रणप्रत्याख्यानमेव समीचीनमासीत्।

युधिष्ठिरः भ्रातः ! क्षत्रियाणां यथा युद्धायामन्त्रणप्रत्याख्यानम् अधर्म्मः, तथा द्यूत-क्रीडायामपि।

अर्ज्जुनः भवतु। यथा केशवस्य मनसि वर्त्तते तथैव भवतु।

युधिष्ठिरः अथ गच्छामो वयम् विश्रामाय।

सर्व्वेः वाढ़म्।

(निष्क्रान्ताः सर्व्वे)

द्वितीयाङ्के द्वितीयदृश्यम्

दुर्योधनः तात ! अभिवादये भवन्तम्।

धृतराष्ट्रः कस्त्वमसि ?

दुर्य्योधनः तात ! दुर्य्योधनोऽहम्।

धृतराष्ट्रः एह्येहि वत्स ! दीर्घजीबी भव। उपविश। वत्स ! अपि सर्व्वं कुशलम्।

दुर्य्योधनः तात ! भवत आशीर्व्वादेन सर्व्वं कुशलम्। तात ! भवत आशीर्व्वादं प्रार्थयन् समागतोऽस्मि।

धृतराष्ट्रः वत्स ! सततमेव आशीर्वादं करोमि। विशेषाशीर्वादस्य कः प्रसङ्गः ?

दुर्य्योधनः तात ! युधिष्टिरस्य यज्ञे निमन्त्रितस्तत्रागच्छम्। जानामि तत्। तत्र किमभवत् ?

दुर्य्योधनः धनमदमत्तैः पाण्डवैः उपहसितोऽस्मि।

धृतराष्ट्रः कथमिव ? युधिष्ठिरोऽपि त्वामुपहसितवान् ?

दुर्य्योधनः नहि तात ! युधिष्ठिरेण साक्षान्नोपहसितोऽस्मि। भीमादिद्वारैव अहमुपहसितोऽस्मि।

अपमानेन तेनैव चाद्यापि हृदयं मम।
चञ्चलमस्थिरं तावद् ज्वलति भीषणं सदा॥३०
यावत् तस्यापमानस्य प्रतिशोधो न गृह्यते।
तावच्चित्ते न शान्तिः स्याज्ज्वाला मे सर्व्वदा भवेत्॥ ३१

धृतराष्ट्रः वत्स ! त्वं किं कर्त्तुमिच्छसि ?

दुर्य्योधनः अहं युधिष्ठिरस्य राज्यम् आक्रमितुमैच्छम्।

धृतराष्ट्रः नहि नहि, तत् समीचीनं न मन्ये।

दुर्य्योधनः मातुलेनापि निषिद्धम्।

धृतराष्ट्रः तत् किमिच्छसि?

दुर्य्योधनः द्यूतेनैव पराजित्य राज्यमधिकरोम्यहम्।
धनाभिमदमेतेषां चूर्णयामि हि सर्व्वतः॥ ३२

धृतराष्ट्रः द्यूते तु वहबो दोषाः व्यसनं तत् प्रकीर्त्तितम्।
तस्याश्रयः समीचीनो न मन्यते मया तथा॥३३
अथ कः क्रीडिष्यति ?

दुर्य्योधनः ममप्रतिनिधीभूय मातुलः क्रीडिष्यति।

धृतराष्ट्रः कः ? दुर्मतिः शकुनिः क्रीडिष्यति ?

दुर्य्योधनः	अथ किम्।

धृतराष्ट्रः	(स्वगतम्)

पित्रादीनां वधस्यासौ प्रतिशोध ग्रहेच्छया।
आयातः कौरवेपक्षे मित्रतां परिदर्शयन्॥३४

दुर्य्योधनः	तात ! किं चिन्तयति भवान्।

धृतराष्ट्रः	वत्स ! एतदेव चिन्तयामि।

शकुनिः क्रूरबुद्धिर्हि पापकर्म्मरतस्त्वसौ।
धर्म्महीनः समाश्रेयः कथं त्वया भविष्यति॥३५
धर्म्मपथे स्थितानान्तु नाशुभं भवति क्वचित्।
धर्म्मो महद् बलं पुंसां धर्म्मो हि बान्धवः परः॥३६

दुर्य्योधनः	पितः ! द्यूतक्रीड़ा क्षत्रियाणामधर्म्मः स्यात् ?

अक्षक्रीड़ा च युद्धञ्च क्षत्रियाणां सदा भुवि।
तुल्य एवमतो धर्मस्त्वधर्मः शङ्कयते कथम्॥३७

धृतराष्ट्रः	द्यूतेनैव नलो राजा कठिनं दुःखमाप्तवान्।
द्यूतेन बुद्धिलोपो हि द्यूतं तेन परित्यजेत्॥ ३८

दुर्य्योधनः	एतत्तु साधारणानां कृते। नतु विजयैषिणां क्षत्रियाणां कृते।

धृतराष्ट्रः	हं, दुष्टबुद्धिना शकुनिना प्रभावितोऽसि। न जाने विधेः कोऽभिप्राय इति। तथापि बत्स ! किञ्चित् कथयामि।

धर्मेण पृथ्वी परिरक्षिता हि
श्रेष्ठाश्रयो धर्म इह प्रकीर्त्तितः।
धर्मेण युक्ता नरतां प्रयान्ति
धर्मेण हीनाः पशुबद्धरण्याम्॥३९

इति सम्यग् विचिन्त्य यथायथं क्रियताम्। वत्स ! सर्व्वदा कल्याणं लभस्वेत्याशीः सर्व्वदा क्रियते।

दुर्य्योधनः	पितः! कृतार्थोऽस्मि।

(निष्क्रान्तौ)

तृतीयाङ्के प्रथमदृश्यम्

सत्यभामा: नाथ ! कथं विमना इव परिलक्ष्यसे त्वम्।

कृष्णः प्रिये ! अतीव अशुभं वृत्तम्।

सत्यभामा: केषां ?

कृष्णः पाण्डवानाम्।

सत्यभामा: किमभवत् ?

कृष्णः राज्यहीना अभवन्।

सत्यभामा: कथमिव ?

कृष्णः द्यूतक्रीड़ा पराजितो युधिष्ठिरः।

सत्यभामा: केन सह क्रीड़ामकरोत् ?

कृष्णः पश्यता पाण्डवैश्वर्य्यमीर्षिणा कपटेन च।
दुर्य्योधनेन राज्यस्य लाभाय चेष्ट्यतेऽधुना ॥४०

सत्यभामा: नाथ ! त्वं सर्व्वं जानन्नपि कथं प्रतीकारं न करोषि ?

कृष्णः प्रिये !

प्रारब्धखण्डनं केन कर्तुं शक्येत भूतले।
प्रारब्धन्तु विना भोगं न नश्यति कथञ्चन।।४१

अपि च प्रिये !

भारं धरण्याः परिहर्तुकामः
समागतोऽहं धरणौ नरः सन्।
तत्कार्य्यसिद्ध्यावलम्बनञ्च
किञ्चित् समाश्रेयमबश्यमेव।।४२

सत्यभामा: नाथ ! तवाभिप्रायं सम्यग् बोद्धुं न पारयामि।

कृष्णः प्रिये ! पाण्डव - कौरवाणां विरोधं विना मम कार्य्यं वा कथम् सिध्येत्।

सत्यभामा: प्रियाणां आश्रितानाञ्च दुःखं विधाय कार्य्यं साधयिष्यसि त्वम् ?

कृष्णः वह्नितापं विना हेम्नः शुद्धिः किन्नु प्रजायते।

विना शोकेन दुःखेन चित्तशुद्धिः कथं भवेत् ॥ ४३

प्रिये ! सत्यमेवाभिहितं त्वया।

प्रियाश्च मे पाण्डवाः सर्व्वे प्रिया द्रौपदी सखी।
सदा ममाश्रिता एते सर्व्वतः शरणागताः।।४४
कल्याणायैव चैतेषां दुःखं मया प्रदीयते।
नो चेद् विषयमग्नास्तु विस्मरेयुः क्षितौ हि माम् ॥४५
आर्त्ता मां शरणं यान्ति चार्त्तितो मुक्तिकाम्यया।
नियम एष एवैव सदा भवति भूतले ॥४६

भवतु विपदि निमग्ना एते यथा धैर्य्यहीना न भवेयुः तथा मया विधेयमेव। तत् प्रिये किञ्चित्कालम् एकान्ते स्थातुमिच्छामि। यथेच्छं क्रियतां त्वया।

(निष्क्रान्तौ)

तृतीयाङ्के द्वितीयदृश्यम्

दुर्य्योधनः युधिष्ठिर ! कथम् अधोवदनस्तिष्ठसि ? अधुना किं क्रियेत ?

युधिष्ठिरः किं वा कर्तुं शक्नोमि। द्यूतपणेन राज्यं मे गतम्। अधुना राज्यहीनो भिक्षुकोऽस्मि।

दुर्योधनः युधिष्ठिर ! न पुनः क्रीड्येत त्वया।

युधिष्ठिरः कथं क्रीडिष्यामि। किं मे वर्त्तते यत् पणत्वेन रक्षणीयं भवेत्।

दुर्योधनः मातुल ! श्रुतं युधिष्ठिरस्य वचनं। एष कथयति पणत्वेन रक्षणीयमेव किञ्चिन्नास्तीति।

शकुनिः कथं नास्तीति ? अधुनापि द्रौपदी वर्त्तते।

भीमः अनार्य्य ! इदं वक्तुं जिह्वा ते न कम्पते।

दुर्य्योधनः मातुल ! भिक्षुकस्य शौर्यं वर्त्तते।

भीमः धूर्त्त ! कपट ! उपहासस्य प्रतीकारं करोमि।

युधिष्ठिरः वृकोदर ! शान्तो भव।

दुर्य्योधनः भोः क्षत्रियाभिमानिन् !

आमन्त्रितो हि युद्धे वा द्यूते च क्षत्रियो यदि।
आमन्त्रणं न रक्षेद् यः स वृथा क्षत्रनामधृक्। ४७

चल मातुल !

द्यूते पराजितश्चैष राज्यहीनोऽति दुर्वलः
विभेति क्रीड़ने क्षत्रधर्म्महीनस्त्वया सह।।४८
दुर्व्वलेन भीतेनापि धर्म्महीनेन चाप्यथ।
द्यूतक्रीड़ा न कर्त्तव्या क्षत्रियेण कदाचन॥४९

अतएव परिहर द्यूतक्रीड़ाम्। गच्छामो वयम्।

युधिष्ठिरः आः को वा भीतो भवत्यत्र धर्महीनस्तथैव च।
युधिष्ठिरो विभेत्येव न हि कस्माच्च कर्हिचित्॥ ५०

उपविश। क्रीडिष्याम्यहम्।

दुर्योधनः मातुल ! क्रीडिष्यति युधिष्ठिरः।

युधिष्ठिरः अथ किम्। क्रीडिष्याम्यहम्।

शकुनिः अथ कः पणः ?

युधिष्ठिरः भवतु ? द्रौपदी एव पणः।

दुर्योधनः भीम ! श्रुतम् अग्रजस्य वचनम्।

युधिष्ठिरः कथं विलम्बसे ? आरभ्यतां क्रीडनम्।

शकुनिः आरभ्यताम्। (उभयोः क्रीड़नं चलति। युधिष्ठिरः पराजितः।) युधिष्ठिर! त्वयैव अभिधीयतां क्रीड़नस्य किं फलमुपजातम्।

युधिष्ठिरः (अधोवदनः) पराजितोऽस्मि।

दुर्य्योधनः तर्हि अधुना पण ग्रहीतव्यः। दुःशासन !

दुःशासनः आदिशतु कौरवराजः।

दुर्य्योधनः शीघ्रं पाण्डवान्तःपुरं गच्छ। द्रौपदीं समानय सभायाम्।

दुःशासनः यद् आदिशति महाराजः। एषोऽहं गच्छामि। (निष्क्रान्तः)

भीमः		आः पापिष्ठ !

अर्ज्जुनः		मध्यमाग्रज ! शान्तो भव। व्याकुलेन नैव भवितव्यम्

अस्माकं शरणं कृष्णो वासुदेवो जनार्द्दनः।
व्याकुलाः स्मः कथन्तावत् तस्मिन् दामोदरे स्थिते ॥५१

दुर्य्योधनः		मातुल ! दुःशासनो यावद् द्रौपदीं नानयति तावत् किञ्चिद् विश्रामं ग्रहीतुमिच्छामि।

शकुनिः		वत्स ! यथेच्छसि। तथैव भवतु। कः कोऽत्र भोः !

दौवारिकः		आदिशतु भवान्।

शकुनिः		सामयिकसभासमाप्तिं घोषय। अधुना विश्रामाय गच्छामो वयम्।

दौवारिकः		यद् आदिशति भवान्। शृण्वन्तु शृण्वन्तु भवन्तः। महाराजकौरवेश्वरो विश्रामाय गच्छति। तेन किञ्चित् कालाय सभाभवनं अवरूद्धं भवति। विश्रान्ते च महाराजे पुनः सभाभवनमुदघ्वाटितं भविष्यति। भवन्तोऽपि विश्रामं गृह्णन्तु।

(निष्क्रान्ताः सर्व्वे)

चतुर्थाङ्के प्रथमदृश्यम्

सत्यभामाः		नाथ ! निविष्टेन मनसा किं निरीक्षसे त्वम् ?

कृष्णः		सत्यभामे! पश्य पश्य पाण्डवानां दुर्द्दशाम्।

सत्यभामाः		किमभवत् ?

कृष्णः		अधोवदना अनाथवत् तिष्ठन्तीमे।

सत्यभामाः		तवाश्रितानां कथमेतादृशी दशा ?

कृष्णः		प्रिये ! पृथिवीश्वरा अद्य दासत्वमापन्नाः।

सत्यभामाः		नाथ ! कथम् एवम् भवति ?

कृष्णः		प्रिये ! अहमपि किमप्यत्र कर्त्तु न प्रभवामि।

कालाधीनं जगत् सर्व्वं कालाधीनाश्च देवताः।
महाकालवशाः सर्व्वे प्राणिनो हि चराचराः ॥५२

सृष्टिः स्थितिश्च संहारः भाग्यञ्च प्राणिनां तथा।
महाकालेन शक्त्यैव नियन्त्र्यते सदैव हि ॥५३
ब्रह्मा रुद्रस्तथा चाहं महाकालवशाः सदा।
न शक्तिर्बर्त्तते काचिन्महाशक्तिबिलङ्घने ॥ ५४

सत्यभामाः देव ! यद्येवमेव। तर्हि तव भजनेन किं फलम् ?

कृष्णः प्रिये ! यथार्थं पृष्टं त्वया। श्रुयताम्।

कालस्वरूप एवाहं वर्त्ते नित्यं धरा त्रये।
रक्षामि मम भक्तांश्च कालरूपः सदैव हि। ५५
कालो व्यसनरूपी सन् ग्रसते पाण्डवानहो।
कालग्रासात् कथं रक्षा भवितेति विचिन्त्यते ॥५६

हा धिक् हा धिक् ! पापिष्ठो दुःशासनो धावति द्रौपदीग्रहणाय।

सत्यभामाः प्रभो ! किं करोति द्रौपदी ?

कृष्णः रजस्वला एकवस्त्रा द्रौपदी अन्तःपुरे अवतिष्ठते। न जानाति सा किमपि द्यूतक्रीड़ावृत्तान्तम्।

या सम्राज्ञी पृथिव्याहि मानिनी पतिगर्व्विता।
भाग्यं तस्या न जानाति सेयं भाग्यविडम्बिता ॥५७

प्रिये ! नात्र कथमपि स्थातुमर्हामि।

मामाश्रिता सदा भक्त्याः द्रौपदी भक्तितत्परा।
तस्या रक्षा मया कार्य्या सर्व्वदा यत्नतो मया ॥५८

सत्यभामे ! नापेक्षितं शक्नोमि। एषोऽहं गच्छामि हस्तिनापुरम्। व्याकुली भूतास्मि हस्तिनापुरगमनाय।

सत्यभामाः गच्छ नाथ ! शीघ्रं गच्छ, रक्ष द्रौपद्या मानं अहमपि व्याकुलीभूतास्मि द्रौपदीमानहानिशङ्कया। तत्परिरक्ष द्रौपदीम्।

कृष्णः भद्रे ! एषोऽहं गच्छामि।

(निष्क्रान्ताः सर्व्वे)

चतुर्थाङ्के द्वितीयदृश्यम्

दुःशासनः सुन्दरि ! आगच्छ। महाराजः कौरवेश्वरो दुर्य्योधनस्त्वामामन्त्रयते।

द्रौपदीः आः पापिष्ठ ! कथं महिलानाम् आवासस्थले प्राविशः ? शीघ्रं दूरमपसर।

दुःशासनः कुत्र अपसरामि ? अस्माकं शासनाद् वहिः किं नाम स्थानं वर्त्तते ?

द्रौपदीः पापिष्ठ ! कथं पाण्डवानां शासने त्वं प्राविशः ?

दुःशासनः सुन्दरि ! विस्मरतां कथाम्। अद्य पाण्डवानां शासने किमपि न वर्त्तते।

द्रौपदीः किं नाम ? सत्यं भणसि ?

दुःशासनः अथ किम् सत्यमेव वदामि। अनृतकथनेन किं नाम फलम्।

द्रौपदीः कथमेतत् सम्भवति ?

दुःशासनः द्यूतपणेन सर्व्वं विनष्टं पाण्डवानाम्। अद्य ते कौरवेश्वरस्य दासाः।

द्रौपदीः हा धिक् ! एतदपि श्रोतव्यमासीत्।

दुःशासनः सुन्दरि ! कथं विलम्बसे ? त्वां द्रष्टुं महाराजो दुर्य्योधन उद्ग्रीव एव अपेक्षसे।

द्रौपदीः आः पापिष्ठ ! कुक्कुरः किं गव्यं घृतं खादितुमर्हति ? अथवा जम्बुकः किं सिंहीदेहं स्प्रष्टुं समर्थो भवति ? शीघ्रं बर्हिर्गच्छ।

दुःशासनः सुन्दरि ! कथमशान्तिः सृज्यते ? शान्तिप्रिया वयम्। कथमपि अशान्तिं कर्त्तुं नेच्छामो वयम्। अतः विलम्वं परित्यज्य शीघ्रं महाराज- समीपमेवागच्छ।

द्रौपदीः मूढ़ ! पुनरपि श्रूयताम्।

सिंहस्य देहस्य किल स्पृशौ हि
शिवाः कदाचिन्नु शक्तिमत्यः।
किं मूषिकाः स्युर्गजराजनाशे
कदापि शक्ताः धरणीतले भोः॥५९

दुःशासनः को बा सिंहः शिवाः का वा सभायां गमने खलु।
जानीया दर्शनेनैव वृथावाक्कथनेन किम्॥६०

शीघ्रं चल। नोचेद् वलेनैव नेष्याम्यहम्।

द्रौपदीः अहं रजस्वला, तेन एकवस्त्रा तिष्ठामि। कथं मां सभां नेष्यसि।

दुःशासनः किमपि नाहं श्रोतुमिच्छामि। महाराजस्य आदेशमहं प्रतिपालयाम्येव। द्रौपदीः भद्र ! भ्रातृजायाया अपमाननायां तव कापि कुण्ठा न भवति ?

दुःशासनः हाः हाः हाः हाः भ्रातृजाया !

पञ्चभिः पुरुषै र्या तु भुज्यते कामतः सदा।
पत्नी नाम्नाभिधेया सा कथं भवितुमर्हति ॥६१

द्रौपदीः मूढ़ ! न जानासि ?

आदेशेन जनन्या हि मातृभक्तास्तु पाण्डवाः।
यथाविधिविवाहं ते कृतवन्तश्च शास्त्रतः ॥६२

दुःशासनः विधिना तेन चोढ़ायाः पुनरुद्वाहकर्म्मणि।
वाधा काचिन्न वर्त्तेत विवाहस्ते पुनर्भवेत् ॥६३

द्रौपदीः आः पापिष्ठ ! भ्रातृजायाम् एवं वक्तुं न लज्जसे ?

दुःशासनः सुन्दरि ! कथं क्रुध्यसि ? चल, भ्रातृजायैव भविष्यसि। आः पापिष्ठ ! शीघ्रमपसर मत्कक्षात्।

दुःशासनः शान्तेन न किमपि भबिष्यति। भवतु, बलादेव त्वामहं नेष्यामि। (गृह्णाति)

द्रौपदीः आः मुञ्च, मुञ्च माम्।

दुःशासनः मुञ्चामि, महाराजसमीपं नयामि। ततः। (आकर्षति)

द्रौपदीः हे जनार्द्दन ! वासुदेव ! मधुसूदन ! रक्ष रक्ष माम्। भगवन् ! शरणागतपालक ! त्वामहं शरणं गच्छामि। रक्ष रक्ष कृपया।

दुःशासनः चल, कृष्णस्त्वां रक्षिष्यति। चल, चल। (वलादाकृष्य द्रौपदीं नयति)

पञ्चमाङ्के प्रथमदृश्यम्

गान्धारीः महाराज ! श्रुतं सर्व्वं वृत्तान्तम् ?

धृतराष्ट्रः राज्ञि! किमभवत्?

गान्धारीः दुष्टशकुनेः परामर्शेन तव पुत्रो दुर्योधनः युधिष्ठिरेण कुपटद्यूतक्रीड़ां प्रवर्त्तयामास।

धृतराष्ट्रः ज्ञायते मया। ततः किमभवत् ?

गान्धारीः धूर्त्तस्य छलेन पराजितो युधिष्ठिरः।

धृतराष्ट्रः राज्ञि ! कथं छलेति अभिधीयते त्वया।

क्रीड़ने युद्धकृत्ये च जयः पराजयस्तथा।
एकस्य नियतं तावद् भवत्येव न संशयः॥६४

गान्धारीः महाराजेन यदुक्तं तन्न अयथार्थम्। किन्तु महाराजेन एतदपि निश्चितं ज्ञायते।

धर्मयुद्धं यथैवात्र भवति नियतं नृप।
तथा चाधर्म्मयुद्धञ्च क्षितौ भवितुमर्हति॥ ६५

धृतराष्ट्रः हं, एतद् यथार्थं नाभिहितं त्वया।

गान्धारीः द्यूतक्रीडायामपि तथात्वे नासम्भाव्यं कल्पनीयम।

धृतराष्ट्रः हं तथा भवितुमर्हति।

गान्धारीः शकुनिना कापट्येन युधिष्ठिरं पराजित्य राज्यमधिकृतवान् दुर्य्योधनः पाण्डवानाम्।

धृतराष्ट्रः किम् ? एवं कृतं तेन ?

गान्धारीः अथ किम् महाराज ! एतेनैव तस्य दुर्वृत्तिर्न निवृत्ता। दासत्वेनापि आवद्धाः पाण्डवाः द्यूतपणेन।

धृताराष्ट्रः हं।

गान्धारीः महाराज ! अतःपरं यत् क्रियते दुर्योधनेन तद् वक्तुमपि अहं लज्जामनुभवामि।

धृतराष्ट्रः गान्धारि ! किं क्रियते दुर्योधनेन ? शीघ्रं कथय। तच्छ्रोतुमिच्छामि।

गान्धारीः श्रुयतां महाराजेन।

द्रौपदीं पाण्डवानां हि बधूं कुलवधूं हि नः।
आनयति सभामध्ये चैकवस्त्रां रजस्वलाम् ||६६

धृतराष्ट्रः नहि नहि, कथमपि एतन्नैव भवितुमर्हति।

गान्धारीः महाराज ! यद्यस्य प्रतिरोधस्त्वया न क्रियेत तर्हि तव बंशस्य लोपः अवश्यम्भावीति नास्ति कश्चित् संशयः।

अपमानेन नारीणां महाशक्तिः प्रकुप्यति।
तस्याः कोपाद् रक्षणे तु शक्तिः कस्यापि नास्ति हि॥६७

धृतराष्ट्रः राज्ञि ! मा चिन्तय। अस्य प्रतिरोधः अवश्यमेव करणीयः।

गान्धारीः महाराज ! यदि ते एवमेव निश्चयः तर्हि कथमत्र विलम्बसे ? शीघ्रं तत्र गत्वा निवारय दुर्योधनं अस्माद् दुष्कर्म्मणः।

धृतराष्ट्रः गान्धारि ! त्वमेव मां तत्र नय।

गान्धारी चल महाराज ! अहं त्वां नयामि।

(निष्क्रान्तौ)

पञ्चमाङ्के द्वितीयदृश्यम्

दुर्य्योधनः दुःशासन ! कथम् एतावान् विलम्बः सञ्जातो द्रौपद्या आनयने ?

दुःशासनः सती साध्वीयं नागमिष्यति सभायां मर्य्यादाहानिभयात्।

दुर्य्योधनः आं?

दुःशासनः शृगाला वयं कथं सिंहं स्पृशामः।

दुर्य्योधनः कथं केशेष्वाकृष्य बलान्नानीता ?

दुःशासनः यदा शान्तेन नागता तदा

समाकृष्य तु केशेषु वलेन समुपानीता।
अतः परं बिधेयं यद् विधीयतां त्वया स्वयम्॥६८

भीमः आः पशो! तव वक्षोरक्तेन यदि द्रौपद्याः केशाः रञ्जिता न क्रियेरन् तदा नाहं पाण्डब भीमः।

द्रोपदीः अहमपि प्रतिज्ञां करोमि यावद दुःशासनपशो वक्षोरक्तेन मम केशा रञ्जिता न भवेयुस्तावद् नाहं वेणीं वध्नामि।

दुर्योधनः सुन्दरि ! कथं कुप्यसि ?

उपविश मम चोरौ राजभोगं प्रदास्ये
त्वमिह सकलराज्ये सर्व्वराज्येश्वरी स्याः।
कथमिहधरणौ त्वं भिक्षुजाया भवेथाः
नहि तब भयलेशः पाण्डवा दासभूताः ॥६९

द्रौपदीः स्थितेषु नाथेषु कथं नु तावत्
दनाथतां यामि पशोः समीपे।
कथं नु कश्चित् कुरुते न किञ्चित्
धर्मो नु लुप्तः सहसा धरण्याः ॥७०

भीमः नहि नहि साध्वि !
धर्म्मो न लुप्तो न च नाथहीना
ह्यपेक्षणीयः समयः सदैव।
अपेक्ष्यतां तेन स एव कालः
दुष्टस्य पाशाद् भविता हि मुक्तिः॥ ७१

अपिच

सूर्य्याचन्द्रमसौ देवौ प्रत्यक्षौ साक्षिणौ मया
प्रतिज्ञा क्रियते चाद्य दुर्य्योधनोरुभञ्जनम् ॥७२

दुःशासनः सुन्दरि ! कथम् अकारणं समयक्षेपः क्रियते ? याहि महाराजसमीपम्। तव सर्व्वं दुःखमपगतं भवेत्।

द्रौपदीः आः पशो ! (पादाघातं करोति)

दुर्य्योधनः किम् एतादृशी स्पर्द्धा ? मत्समक्षमेव मम भ्रातरि पदाघातः ? दुःशासन! पापिष्ठेयं विवस्त्रा क्रियताम्। (दुःशासनस्तथा कर्त्तुं चेष्टते)

द्रौपदीः भगवन् ! मधुसूदन ! जनार्द्दन ! शरणागत पालक ! त्वदाश्रितां दीनां मां रक्ष, रक्ष पशोराक्रमणात्। (दुःशासनः द्विगुणोत्साहेन द्रौपदीं विवस्त्रां कर्त्तुं चेष्टते यावत् तावदेव अपरिमितं वस्त्रमायाति)

दुःशासनः (व्याकुलः विषण्णश्च) हाधिक् कष्टम् ! कथम् एतादृशं वस्त्रं परिलभ्यते अनया।

द्रौपदीः तव दास्याः मे। जनार्द्दन ! कथं परित्राणं भवेत् पशुहस्तात् ! जगत्पते ! तव दास्याः सम्मानं रक्ष।

दुर्य्योधनः आश्चर्य्यम् ! कथमेतत् सम्भवति ? यावद् आकृष्यते वस्त्रं तावदेव आयाति ? कुत्र वस्त्रस्य शेषः ?

(गान्धारीधृतराष्ट्रौ प्रविशतः)

गान्धारीः आः किं क्रियते युष्माभिः ? शीघ्रं विरमत अस्मात् कर्म्मणः। दुःशासन ! अधुनापि वस्त्रं धरसि ? शीघ्रं त्यज।

धृतराष्ट्रः दुर्य्योधन ! किं क्रियते युष्माभिः ? युधिष्ठिर ! पाण्डवाः ! मातर्द्रौपदि ! गच्छत यूयं ससम्मानं स्वभवनं।

दुर्य्योधनः द्यूतक्रीड़ायाः पणेन इमे आवद्धाः।

धृतराष्ट्रः मद्वचनात् मुक्ताः। गच्छत यूयं ससम्मानं स्वभवनम्।

कृष्णः (प्रविश्य) महाराज ! परिरक्षितस्ते वंशः ध्वंसहस्तात्।

धृतराष्ट्रः गान्धारि ! क एष भाषते ?

गान्धारीः महाराज! भगवान् वासुदेवः समायातः।

धृतराष्ट्रः भगवन् ! जनार्द्दन ! वासुदेव ! वृद्धस्य मे सपत्नीकस्य धृतराष्ट्रस्य प्रणामं गृहाण।

कृष्णः हा धिक् ! किं क्रियते त्वया ? प्रणम्यस्त्वमेवतमेव मे प्रणामं गृहाण।

धृतराष्ट्रः भगवन् ! किमेतत् क्रियते त्वया ? किमस्माभि र्न ज्ञायते कस्त्वमिति ? भगवन् ! प्रसीद।

परामर्शेन दुष्टस्य पुत्रेण यत्कृतं प्रभो !
तस्य पुत्रापराधस्य प्रसादं कर्तुमर्हसि।।७३
तव प्रभावमेतस्मिन् विश्वे को ज्ञातुमर्हति।
कृपया यदि देवेश न ज्ञाप्यते त्वया विभो॥ ७४
क्षम्यन्तां कृपया चैते ममपुत्रास्त्वया विभो !
चरणे शरणं यामि यथेच्छं क्रियतां त्वया॥ ७५

कृष्णः न कृता चेत् क्षमा राजन् वर्तेरन् किमिमे क्षितौ।
क्षमा मया कृता पूर्वं शान्तिं त्वं याहि सर्व्वतः।।७६

धृतराष्ट्रः भगवन् कृतार्थोऽस्मि तवप्रसादेन।

कृष्णः महाराज ! किन्ते भूयः प्रियमुपहरामि।

धृतराष्ट्रः भगवन् ! अतःपरमपि प्रार्थना ? तथापीदमस्तु।

ईर्ष्याविहीनाः परया च शान्त्या
धर्मेस्थिताः स्वे सततं धरण्याम्।
स्वीये च कृत्ये निरताः सदैव
तिष्ठन्तु सर्व्वे मनुजाः सुखेन।।৭৭

इति भरद्वाजगोत्रोद्भव रामगोपालस्मृतिरत्नात्मजश्रीनित्यानन्दमुखोपाध्यायविरचितं 'द्रौपदीमानरक्षणं' नाम नाटकम् १३९३ बङ्गाब्दीय सौरफाल्गुनस्य अष्टादशदिवसे समाप्तम्।

৬.১ নাটকের বঙ্গানুবাদ

শ্রী নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়
রচিত নাটক
দ্রৌপদীমানরক্ষণ
প্রথমাঙ্কের প্রথমদৃশ্য
নান্দী

বর্ষার নতুন মেঘের মতো দেহ, হলুদ বসন পরিধানকারী, বরণীয়, সকল (চতুর্দশ/তিন) ভুবনেরপালক, চক্রধারী, সুন্দরবেশধার, শরণাগত ব্যক্তিবর্গের আশ্রয়স্থল, যিনি কৃপালু সেই মুরারি (শ্রীকৃষ্ণ) সর্বতভাবে তোমাদের দুঃখ দূর করুন।। (১)

সূত্রধার : (প্রবেশ করে) উপস্থিত আর্যবর্গকে আভিবাদন করি। মারিষ! যদি নেপথ্যক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে থাকে তাহলে এদিকে এসো।

পারিপার্শ্বিক : (প্রবেশ করে) মহোদয়! এই যে আমি এসেছি।

সূত্রধার : মারিষ! উপস্থিত আর্যবর্গের চিত্তবিনোদনের জন্য আমাদেরকে কোন একটি নাটক উপস্থাপন করতে হবে। সেই নাটকের প্রয়োগবিষয়ে পরামর্শের জন্যই আমি তোমাকে আহ্বান করেছি।

পারিপার্শ্বিক : এ বিষয়ে বিশেষ পরামর্শের অবকাশ আছে কি?

সূত্রধার : কেন এরকম বলছ তুমি?

পারিপার্শ্বিক : তার দ্বারাই (সহৃদয়গনের) প্রীতি হবে এবিষয়ে কোন সংশয় নেই তার জন্য মহাভারত আশ্রিত যে কোন একটি প্রয়োগ করুন।। (২)

সূত্রধার : অনিপুন ব্যক্তি কীভাবে পুরাণাশ্রিত নাটক প্রয়োগ করবে? সুতরাং সম্যক বিচার করে সুচিন্তিতভাবে তা বিধান করতে হবে।। (৩)

পারিপার্শ্বিক : মহাভারত আশ্রিত নূতন একটি নাটক আছে। যদি সেই নাট্যপ্রয়োগে কোন বাধা না থাকে, তাহলে সর্বতভাবে তা প্রয়োগ করতে যত্ন বা উদ্যোগ নিন।। (৪)

সূত্রধার : মহাভারত আশ্রিত নূতন নাটক আছে নাকি?

পারিপার্শ্বিক : হ্যাঁ মহাশয়, আছে।

সূত্রধার : তাহলে তার বিবরণ সম্যকরূপে বলো।

পারিপার্শ্বিক : শুনুন তাহলে মহাশয়

রামগোপাল শর্মা মহোদয়ের পুত্র নিত্যানন্দ শর্মার দ্বারা বিরচিত নাটকের নাম *"দ্রৌপদীমানরক্ষণম্"*।। (৫)

সূত্রধার : তাই নাকি? তাহলে এই নাটকের প্রয়োগ আমরা উপস্থাপন করব। সম্যক আয়োজন করো।

পারিপার্শ্বিক : আয়োজন করাই আছে। কেবলমাত্র আপনার অনুমতির অপেক্ষা আছে। আপনি যখনই অনুমতি করবেন, তখনই নাটক আরম্ভ হবে। কুশীলবগণও প্রস্তুত।

সূত্রধার : তাহলে শীঘ্রই নাটক আরম্ভ করো।

(নেপথ্যে)

দুর্যোধন : মাতুল,

পাণ্ডবদের সেরকম অতুল সম্পদ দেখে আমি বড়ই চঞ্চল হয়ে উঠেছি।

তাদের সর্বপ্রকারে তা হরণ করতে ইচ্ছা করি।। (৬)

সূত্রধার : মারিষ! এ কে প্রবেশ করছেন?

পারিপার্শ্বিক : ইনি মহারাজ দুর্যোধন, মাতুল শকুনির সঙ্গে চঞ্চলমতি হয়ে রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হচ্ছেন।। (৭)

সূত্রধার : তাহলে মারিষ! আমরা নেপথ্যে গিয়ে দেখি।

পারিপার্শ্বিক : তাই হোক মহাশয়!

(উভয়েই নিষ্ক্রান্ত হলেন)

প্রথমাঙ্কের দ্বিতীয়দৃশ্য

দুর্যোধন : মাতুল!
পাণ্ডবদের অতুল সম্পদ দেখে আমি বড়ই চঞ্চল হয়ে উঠেছি। তাদের সমস্ত সম্পদ হরণ করার জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে উঠেছি।

শকুনি : বত্‌স! এটাই স্বাভাবিক।
শত্রুর অভ্যুদয় দেখে কোন ব্যক্তি সহ্য করতে পারে এটা এই পৃথিবীতে সর্বতোভাবেই অচিন্তনীয় ব্যাপার।। (৮)

দুর্যোধন : সত্যই মাতুল!
যে এই রকম নগরী নির্মিত হয়েছে সেরকম রাজগৃহ অচিন্তরূপ আর দর্শনের তো কথাই নেই।। (৯)
মাতুল! ভীমের (সেই) পরিহাস আমি যখনই স্মরণ করি, তখন আমার হৃদয় যেন (ক্রোধ) প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে।

শকুনি : বত্‌স! কীরকম?

দুর্যোধন : তাহলে শুনুন মাতুল।
স্বচ্ছ শ্বেতপ্রস্তরে আমার জলের আশঙ্কা হয়েছিল। আবার একইভাবে জলেও প্রস্তরবুদ্ধি হওয়ার মতো পরম ভ্রান্তি তৈরী হয়েছিল।। (১০)
আমার এরকম অবস্থা দেখে অতিদুর্মতি ভীম আমাকে উপহাস করার জন্য উচ্চৈস্বরে অট্টহাস্য করেছিল।। (১১)
তার হাসি দেখে অন্য আরও যেসকল ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত ছিল, সেই নির্দয় ক্রুরবুদ্ধি ব্যক্তিগণও সবাই আমাকে উপহাস করেছিল।। (১২)

শকুনি : এরকম? এর প্রতীকার অবশ্যই করা উচিত।

দুর্যোধন : মাতুল! আমিও সেটাই বলছি।
পৃথিবীতে দুর্বল দুর্জন ব্যক্তি উপেক্ষার দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং সেই সকল দুষ্ঠ ব্যক্তিগণকে কঠোরভাবে শাসন করা উচিত।। (১৩)

শকুনি : বলেছ ঠিকই তুমিই। কিন্তু বিশেষভাবে বিচক্ষণবুদ্ধির দ্বারাই উপায়নিরূপণ করতে হবে। কারণ-
সঠিকভাবে উপায় নির্ণয় না করতে পারলে কার্যহানি হয়। সুতরাং নীতির মাধ্যমে উপায়ের কার্য নিরূপণ করা উচিত।। (১৪)

দুর্যোধন : মাতুল! আপনি এরকম বলছেন কেন?

আমাদের কি শক্তি নেই? আমরা কি দুর্বল? নাকি আমার মধ্যে সাহস নেই?

তাছাড়া পাণ্ডুপুত্রের ভয়ে ভীতও নই আমি। পৃথিবীজয় করতেও আমি সদা সমর্থ।। (১৫)

শকুনি : কৌরবেশ্বর! তাতে কোন সন্দেহই নেই।

সর্বদা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বীর মহান তুমি বলবান পৃথিবীপতি লোকপ্রিয়

নীতিবিদগণের মধ্যে বরেণ্য ব্যক্তি তোমার মতো এই পৃথিবীতে আর কে বা আছে? (১৬)

তবুও হে রাজা, সবেমাত্র যজ্ঞ করেছেন তিনি ধার্মিক পৃথিবী ঈশ্বর, দানাদির দ্বারা

জনসাধারণের প্রিয়পাত্র বলে পরিচিত। সুতরাং যজ্ঞ সম্পন্ন হওয়ার পরেই

আক্রমনাদি যা করার করো। এখন কোনোভাবেই তা করা যাবে না। এখন

আক্রমণ করলে সমস্ত বীর পাণ্ডুপক্ষ অবলম্বনই করবে।। (১৭-১৮)

তাছাড়া তোমার যশহীনতা সমস্তলোকে ঘোষিত হবে।

দুর্যোধন : তাহলে কী করা উচিত মাতুল?

শকুনি : চিন্তা করো না,

বল ছল আশ্রয় করতে হয় কার্যসিদ্ধির জন্য হে বত্‌স! তুমি নিশ্চিন্ত হও যা করার আমিই করছি।। (১৯)

দুর্যোধন : মাতুল! আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন।

শকুনি : যদি তোমার এতই আগ্রহ থাকে তাহলে শোন,

পাশার (অক্ষক্রীড়া) দ্বারা পরাজিত করে ঐ পাণ্ডবদের সমস্ত সম্পদ আমি হরণ করে নেব বত্‌স! তুমি চিন্তা পরিত্যাগ করো।। (২০)

দুর্যোধন : উত্তম চিন্তা করেছেন আপনি। এটাই করুন।

শকুনি : এখন চলো, আমরা দুজনেই বিশ্রাম নিই। পরে পরামর্শ করে সমস্ত কিছু করবো।

দুর্যোধন : তাই হোক।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয়াঙ্কে প্রথমদৃশ্য

বৈতালিক : (গানরত) ধার্মিক মহারাজ, পবিত্রচেতা, সমস্তগুণের আধারস্বরূপ, মূর্ত্তিমান্ সত্যধর্ম, প্রজাপালনে সর্বদা সজাগ, কল্যাণ কর্মসমূহে সদা নিরত দানশীল মহাত্মা জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবের জয় হোক।। (২১)

যুধিষ্ঠির : এবার তোমরা যাও। বিশ্রাম নাও। বৃকদর!

ভীম : আদেশ করুন ধর্মরাজ!

যুধিষ্ঠির : এদেরকে পারিতোষিক প্রদান করো।

ভীম : যথা আজ্ঞা ধর্মরাজ! আসুন বৈতালিকগণ! (বৈতালিকদের সঙ্গে প্রস্থান করলেন)

যুধিষ্ঠির : হে ধনঞ্জয়!

তোমরা নিজেদের বলে সমস্ত রাজাদের পরাজিত করে তাদের রাজ্য নিয়ে সম্রাট উপাধি দিয়েছ। (২২)

অর্জুন : অগ্রজ!

আমরা যা করেছি তা আপনার কৃপায়, আপনার বলেই আমরা বলবান। (২৩)

যুধিষ্ঠির : ধনঞ্জয়! এই রকম বোলো না। আমাদের কোন কাজ করার শক্তি আছে।

সমস্ত কাজে যিনি সর্বদা প্রমাণ, তিনি বলদাতা ও মহান সহায়, দয়ার আশ্রয়, সকলজনের পালক, বিশ্বের ধারক তিনি হলেন মুরারি। (২৪)

অর্জুন : এতে কোন সন্দেহ নেই।

কৃষ্ণের শক্তি বিনা আমরা আর কি বা করতে সক্ষম? আমাদের পরম বল যে কৃষ্ণ, তাতে কোন সংশয় নেই।। (২৫)

তাছাড়া, কি আর বলার আছে, তিনি হচ্ছেন যন্ত্রী এবং আমরা হলাম যন্ত্র। তিনি আমাদের যেমনভাবে চালনা করেন, আমরা সেইভাবেই চালিত হই।। (২৬)

যুধিষ্ঠির : ধনঞ্জয়! হঠাত্ কেন আমরা বাম চক্ষু স্পন্দিত হল?

বামচক্ষু স্পন্দন দ্বারা অশুভ কোন ঘটনারই সূচনা হয়। সুতরাং ওহে ভ্রাতা! হঠাত্ আমার মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে।। (২৭)

অর্জুন : অগ্রজ! চিন্তা করছেন কেন?

যার স্মরণমাত্রে সমস্ত অশুভ বিনষ্ট হয়, তিনি যার হৃদয়ে থাকেন কীভাবে তার অশুভ হবে।। (২৮)

ভীম : (প্রবেশ করে) ধর্মরাজ! আপনার আদেশ পালিত হয়েছে। পরিতুষ্ঠ হয়ে বৈতালিকগণ এখন বিশ্রাম নিচ্ছেন।

যুধিষ্ঠির : আমিও পরিতৃপ্ত হলাম। উত্তমকার্য করেছ তুমি।

দৌবারিক : (প্রবেশ করে) মহারাজের জয় হোক। মহারাজ! কৌরবেশ্বর দুর্যোধনের বার্তাপ্রেষিত এক দূত এসেছে।

যুধিষ্ঠির : সম্মানের সহিত তাকে নিয়ে এসো।

দৌবারিক : মহারাজের যেমন আদেশ। (প্রস্থান)

যুধিষ্ঠির : হঠাত্ দুর্যোধন এভাবে দূতকে প্রেরণ করল কেন?

ভীম : নিশ্চিত ভাবেই কোন অভিসিদ্ধি করেই দূত পাঠিয়েছে।

দৌবারিক : (দূতসহ প্রবেশ) এদিকে এদিকে মহাশয়! এই যে ধর্মনিষ্ঠ মহারাজ যুধিষ্ঠির (সিংহাসনে) উপবিষ্ট রয়েছেন। আপনি এগিয়ে যান।

দূত : (নিরীক্ষণ করে)

এই সেই বীর কীর্তিমান রাজা যুধিষ্ঠির যিনি পৃথিবীপতি শুধু নন, ধর্মে একনিষ্ঠ পুরুষ, গুণসম্পন্ন, নীতিজ্ঞ, সত্যধর্মে ব্রতী এবং অসহায় ব্যক্তিগণের আশ্রয়স্বরূপও বতে।। (২৯)

(কাছে গিয়ে) মহারাজের জয় হোক।

যুধিষ্ঠির : এসো। আসন পরিগ্রহণ করো। ওহে দূত! কৌরবেশ্বর কুশলে আছেন তো?

দূত : হ্যাঁ মহারাজ! সমস্তই কুশল বটে। কৌরবেশ্বরও আপনার কুশল এবং স্বাস্থ্য জিজ্ঞাসা করেছেন।

যুধিষ্ঠির : সকলই কুশল বলে জানাবে। আর কী বলেছেন কৌরবেশ্বর?

দূত : মহারাজ! তিনি আপনাকে দ্যূতক্রীড়ায় আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

যুধিষ্ঠির : কৌরবেশ্বরের সাদর আমন্ত্রণ অবশ্যই রক্ষা করব। কৌরবেশ্বরকে জানান অচিরেই আমি উপস্থিত হবো।

দূত : অনুগৃহীত হলাম। এরকমই জানাবো মহারাজকে। আমাকে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দিন।

যুধিষ্ঠির : পুনরায় দেখা হবে। এখন প্রত্যাবর্তন কর। (প্রস্থান)

অর্জুন : নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করাই সমীচীন ছিল।

যুধিষ্ঠির : ভ্রাতা! ক্ষত্রিয়ের কাছে যুদ্ধের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান যেমনভাবে অধর্ম, ঠিক তেমনি দ্যূতক্রীড়া প্রত্যাখ্যানও।

অর্জুন : আচ্ছা! কেশবের (কৃষ্ণের) মনে যা আছে, তাই হোক।

যুধিষ্ঠির : এখন আমরা বিশ্রাম নিতে যাব।

উভয় মিলে : বেশ।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয়াঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য

দুর্যোধন : তাত! আপনাকে অভিবাদন করি।

ধৃতরাষ্ট্র : কে তুমি?

দুর্যোধন : তাত! আমি দুর্যোধন।

ধৃতরাষ্ট্র : এস এস বত্‌স! দীর্ঘজীবী হও। বসো। বৎস! সমস্ত কুশল তো?

দুর্যোধন : তাত! আপনার আশীর্বাদে সমস্তই কুশল। তাত! আপনার আশীর্বাদ পার্থনা করতেই আমি এসেছি।

ধৃতরাষ্ট্র : বত্‌স! সর্বদাই আশীর্বাদ করি। বিশেষ আশীর্বাদের প্রসঙ্গ জানতে পারি?

দুর্যোধন : তাত! যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হয়ে সেখানেই গিয়েছিলাম।

ধৃতরাষ্ট্র : তা জানি। কী হয়েছে সেখানে?

দুর্যোধন : সম্পদের অহংকারে উন্মত্ত পাণ্ডবেরা আমাকে উপহাস করেছে।

ধৃতরাষ্ট্র : কী বলছ? যুধিষ্ঠিরও তোমাকে উপহাস করেছে?

দুর্যোধন : না তাত! যুধিষ্ঠির আমাকে সাক্ষাত্‌ উপহাস করেনি। কিন্তু ভীমাদি পাণ্ডবদের দ্বারা তো উপহাস করেছে।

সেই অপমানে এখনও আমার হৃদয় চঞ্চল হয়ে পরেছে, কিছুতেই স্থির হতে পারছে না, বরং সর্বদাই ভীষণভাবে জ্বলছে।। (৩০)

যতক্ষণ না সেই অপমানের প্রতিশোধ নিচ্ছি, ততক্ষণ পর্যন্ত মনে শান্তি আসবে না, আর অপমানের জ্বালা সর্বদাই থাকবে।। (৩১)

ধৃতরাষ্ট্র : বত্‌স! তুমি কী করতে চাইছ?

দুর্যোধন : আমি যুধিষ্ঠিরের রাজ্য আক্রমণ করতে চাই।

ধৃতরাষ্ট্র : না না, সেটা এই মুহূর্তে সমীচীন মনে করি না।

দুর্যোধন : মাতুলও নিষেধ করলেন।

ধৃতরাষ্ট্র : তাহলে কি করবে মনে করেছ?

দুর্যোধন : দ্যূতক্রীড়ার দ্বারা পরাজিত করে পাণ্ডবদের রাজ্য অধিকার করে নেব। ধনাহংকারী পাণ্ডবদেরকে সর্বতোভাবে চূর্ণ করব আমি।। (৩২)

ধৃতরাষ্ট্র : দ্যূতক্রীড়ায় বহু দোষ বর্তমান, যা ব্যসন নামে পরিচিত। তাই দ্যূতক্রীড়ার আশ্রয় নেওয়া আমি সমীচীন মনে করছি না।। (৩৩)

আচ্ছা কে খেলবে?

দুর্যোধন : আমার প্রতিনিধি করে মাতুল খেলবে।

ধৃতরাষ্ট্র : কে? দুর্মতি শকুনি খেলবে?

দুর্যোধন : হ্যাঁ।

ধৃতরাষ্ট্র : (স্বগত)

পিত্রাদির হত্যার প্রতিশোধগ্রহণের ইচ্ছাতেই (দুর্মতি শকুনি) কৌরবপক্ষে মিত্রতা প্রদর্শন করতে এসেছে।। (৩৪)

দুর্যোধন : তাত! আপনি কী চিন্তা করছেন?

ধৃতরাষ্ট্র : বত্‌স! এটাই চিন্তা করছি যে, এই শকুনি ক্রুরবুদ্ধি এবং পাপকর্মে সদা রত।ধর্মহীন কর্ম দ্বারা কীভাবে তোমার প্রেয় বস্তু লাভ হবে।। (৩৫)

ধর্মপথে যারা থাকে, তাদের কখনও অশুভ কিছু হয় না, ধর্মই পুরুষের পরম বন্ধু।। (৩৬)

দুর্যোধন : পিতা! দ্যূতক্রীড়া কি ক্ষত্রিয়ের কাছে অধর্ম হয়?

অক্ষক্রীড়া এবং যুদ্ধ এই পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়দের কাছে সর্বদাই তুল্যধর্মস্বরূপ। তাহলে আপনি কেন অধর্মের আশঙ্কা করছেন।। (৩৭)

ধৃতরাষ্ট্র : দ্যূতক্রীড়ার দ্বারাই রাজা নল কঠিন দুঃখ ভোগ করেছিলেন। দ্যূতক্রীড়ায় বুদ্ধিলোপ হয়। সুতরাং দ্যূতক্রীড়া পরিত্যাগ করাই উচিত। (৩৮)

দুর্যোধন : এটি সাধারণ ব্যক্তিগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না।

ধৃতরাষ্ট্র : হ্যাঁ, দুষ্টবুদ্ধি শকুনি ভালোই প্রভাবিত করেছে তোমাকে। না জানি বিধাতার কী অভিপ্রায়। তবুও বত্‌স! কিছু বলতে চাই তোমাকে।

ধর্মের দ্বারাই পৃথিবীকে পরিরক্ষণ করা উচিত। ধর্মই শ্রেষ্ঠ আশ্রয় বলে পরিগণিত হয়। ধর্মযুক্ত ব্যক্তিই মনুষ্যত্ব অর্জন করে, ধর্মহীন ব্যক্তি এই পৃথিবীতে পশুতুল্য হয়ে বাস করে।। (৩৯)

সুতরাং এগুলি যথাযথ বিবেচনা করে তবেই কার্যসাধন করো। বত্‌স! সর্বদা কল্যাণ লাভ করো এই আশীর্বাদই সবসময় করি।

দুর্যোধন : পিতা! কৃতার্থ হলাম।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয়াঙ্কে প্রথমদৃশ্য

সত্যভামা : স্বামী! আপনাকে কেন এরকম উন্মনা মনে হচ্ছে?

কৃষ্ণ : প্রিয়ে! অতীব অশুভ ব্যাপার ঘটে গেছে।

সত্যভামা : কার?

কৃষ্ণ : পাণ্ডবদের।

সত্যভামা : কী হয়েছে?

কৃষ্ণ : রাজ্যহীন হয়ে গেছে তারা।

সত্যভামা : কীভাবে হল?

কৃষ্ণ : দ্যূতক্রীড়ায় ভ্রাতা যুধিষ্ঠির পরাজিত হয়েছেন।

সত্যভামা : কার সঙ্গে ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ করেছিলেন তিনি?

কৃষ্ণ : পাণ্ডবদের ঐশ্বর্য দেখে ঈর্ষাবশত দুর্মতি দুর্যোধন কপটতার দ্বারা এখন তাদের রাজ্য দখলের চেষ্টা করছে।। (৪০)

সত্যভামা : নাথ! আপনি সমস্ত জেনেও প্রতীকার করছেন না কেন?

কৃষ্ণ : প্রিয়ে! আরম্ভের খণ্ডন এই পৃথিবীতে কেউই করতে পারে না। আরম্ভ বিনা কখনই ভোগের সমাপ্তি হয় না।। (৪১)

আরও কি প্রিয়ে!

এই ধরণীতে মনুষ্যরূপ ধারণ করেই আমি ধরণীর ভার লাঘব করার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছি। সেই কার্যে সিদ্ধিলাভ করার জন্য কিছু অবলম্বন করা অবশ্যই মঙ্গলজনক হবে।। (৪২)

সত্যভামা : নাথ! আপনার অভিপ্রায় সম্যকরূপে বুঝতে সমর্থ হলাম না।

কৃষ্ণ : প্রিয়ে! পাণ্ডব ও কৌরবদের মধ্যে বিরোধ ব্যতীত আমার কার্য সিদ্ধ হবে না।

সত্যভামা : প্রিয় এবং আশ্রিতজনের দুঃখবিধান করে আপনি কার্যসাধন করতে চান।

কৃষ্ণ : বহ্নি ব্যতীত স্বর্ণের বিশুদ্ধি আর কীভাবে হতে পারে প্রিয়ে। শোক এবং দুঃখব্যতীত চিত্তের শুদ্ধতা কীভাবে সম্ভব।। (৪৩)

প্রিয়ে! তুমি সত্যই বলেছ।

পাণ্ডবেরা সকলেই আমার অতি প্রিয়, তেমনি প্রিয় সখী দ্রৌপদীও। এরা সর্বদাই আমার আশ্রিত এবং সর্বতোভাবে শরণাগত হয়ে থাকে।। (৪৪)

এদের কল্যাণের জন্যই কখনও কখনও আমি দুঃখ দিয়ে থাকি। নতুবা এই পৃথিবীতে বিষয়ভোগে রত হয়ে এরা আমাকে বিস্মৃত হবে।। (৪৫)

আর্তব্যক্তিগণ আমার শরণ নেয় দুঃখের বিষয় থেকে মুক্তির কামনায়।

ভূতলে এটাই সদা নিয়ম বলে জানবে।। (৪৬)

যাই হোক, বিপদে নিমজ্জিত হয়ে এরা যাতে ধৈর্য্যহীন হয়ে না পড়ে, সেজন্যই আমার এরকম বিধান। সুতরাং প্রিয়ে! কিছু সময় একান্তে কাটাতে চাই।

সত্যভামা : যথা ইচ্ছা আপনার।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয়াঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য

দুর্যোধন : যুধিষ্ঠির! মুখ নিচু করে বসে আছো কেন? এখন কী করবে?

যুধিষ্ঠির : কী ই বা করতে পারি? দ্যূতক্রীড়ার পণে আমার রাজ্য চলে গেছে। রাজ্যহীন আমি এখন ভিক্ষুক মাত্র।

দুর্যোধন : যুধিষ্ঠির! আর খেলবে না?

যুধিষ্ঠির : কীভাবে খেলব আর? পণ রাখার মতো আমার কাছে আর কোন দ্রব্যই বা আছে?

দুর্যোধন : মাতুল! শুনুন যুধিষ্ঠিরের কথা। ইনি বলেছেন পণস্বরূপ রাখার জন্য নাকি কিছুই নেই।

শকুনি : নেই বলছ কেন? এখনও তো দ্রৌপদী রয়েছে।

ভীম : অনার্য্য! এরকম বলতে জিহ্বা কাঁপছে না একটুও?

দুর্যোধন : মাতুল! ভিক্ষুকের তো বেশ বীরত্ব দেখা যাচ্ছে।

ভীম : ধূর্ত! কপট! এই উপহাসের প্রতীকার করব আমি।

যুধিষ্ঠির : বৃকোদর! শান্ত হয়।

দুর্যোধন : ওহে ক্ষত্রিয়াভিমানী!

যুদ্ধে বা দ্যূতক্রীড়ায় আমন্ত্রিত হয়ে ক্ষত্রিয় যদি আমন্ত্রণ রক্ষা না করে তাহলে তার ক্ষত্রিয়নামধারণ নিস্ফল।। (৪৭)

মাতুল! চলুন আমরা যাই। রাজ্যহীন অতিদুর্বল ক্ষত্রিয়ধর্মহীন এরা (পাণ্ডবেরা) দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হয়ে এখন আপনার সঙ্গে খেলতে ভয় পাচ্ছে।। (৪৮)

দুর্বল, ভীত এবং ধর্মহীন ব্যক্তির সঙ্গে ক্ষত্রিয়ের কদাপি দ্যূতক্রীড়া করা উচিত না।। (৪৯)

অতএব দ্যূতক্রীড়া পরিহার করুন। চলুন আমরা যাই।

যুধিষ্ঠির : আঃ, কে ভীত অথবা ধর্মহীন, যুধিষ্ঠির কখনও কারোর থেকে ভয় পায় না।। (৫০)

বসো। আমি খেলব।

দুর্যোধন : মাতুল! যুধিষ্ঠির খেলবে বলছে।

যুধিষ্ঠির : হ্যাঁ আমি খেলব।

শকুনি : তাহলে পণ কী থাকবে?

যুধিষ্ঠির : আচ্ছা? দ্রৌপদীই পণ থাকবে?

দুর্যোধন : ভীম! অগ্রজের কথা শুনে নাও।

যুধিষ্ঠির : দেরি করছ কেন? ক্রীড়া আরম্ভ করো।

শকুনি : এই তো আরম্ভ হচ্ছে।

(উভয়ের ক্রীড়া চলছে। যুধিষ্ঠির পরাজিত হলেন)

যুধিষ্ঠির! তুমি নিশ্চয়ই বুঝেছ যে, ক্রীড়াতে কী ফল হয়েছে।

যুধিষ্ঠির : (মাথা নিচু করে) হ্যাঁ আমি পরাজিত হয়েছি।

দুর্যোধন : তাহলে এখন পণ গ্রহণ করা যাক । দুঃশাসন!

দুঃশাসন : আদেশ করুন কৌরবরাজ।

দুর্যোধন : শীঘ্রই পাণ্ডব-অন্তপুরে যাও। দ্রৌপদীকে সভায় নিয়ে এস।

দুঃশাসন : মহারাজ যা আদেশ করেন। এই আমি যাচ্ছি। (প্রস্থান)

ভীম : আঃ পাপিষ্ঠ!

অর্জুন : মধ্যম অগ্রজ! শান্ত হন। ব্যাকুল হওয়া উচিত নয়। জনার্দন বাসুদেব কৃষ্ণ আমাদের স্মরণ। সেই দামোদর থাকতে আমরা কেন ব্যাকুল হব।। (৫১)

দুর্যোধন : মাতুল! দুঃশাসন যতক্ষণ না দ্রৌপদীকে আনছে, ততক্ষণ একটু বিশ্রাম নিতে চাই।

শকুনি : বত্‌স! যথা ইচ্ছা তোমার। তাই কর। এই কে, কে আছো এখানে?

দৌবারিক : আদেশ করুন।

শকুনি : সাময়িকভাবে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করো। এখন আমরা কিঞ্চিত্‌ বিশ্রাম নেব।

দৌবারিক : মহাশয় যা আদেশ করেন। শুনুন, সবাই শুনুন আপনারা। কৌরবেশ্বর মহারাজ দুর্যোধন বিশ্রামে যাচ্ছেন। সেজন্য কিছু সময় সভাভবন বন্ধ থাকবে। মহারাজের বিশ্রাম সমাপ্ত হলে পুনরায় সভাভবন উদ্ঘাটিত হবে। আপনারাও বিশ্রাম গ্রহণ করুন।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থাঙ্কে প্রথমদৃশ্য

সত্যভামা : নাথ! নিবিষ্টমনে আপনি কী চিন্তা করছেন?

কৃষ্ণ : সত্যভামা! দেখো, পাণ্ডবদের দুর্দশা দেখো।

সত্যভামা : কী হয়েছে স্বামী।

কৃষ্ণ : অধোবদন হয়ে অনাথের মতো এরা বসে রয়েছেন।

সত্যভামা : আপনার আশ্রিত এনাদের কেন এমন দশা?

কৃষ্ণ : প্রিয়ে! পৃথিবীপতিগণ আজ দাসত্বের গ্লানি বহন করছে।

সত্যভামা : নাথ! কেন এমন হচ্ছে?

কৃষ্ণ : প্রিয়ে! এই অবস্থায় আমারও কিছু করার ক্ষমতা নেই।

সমস্ত জগত্ যেমন মহাকালের অধীন, তেমনই দেবতাগণও। এই চরাচরের সমস্ত প্রাণীই মহাকালের বশবর্তী।। (৫২)

জগতের সমস্ত প্রাণীর সৃষ্টি স্থিতি সংহার এবং ভাগ্য মহাকালের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়।। (৫৩)

ব্রহ্মা, মহেশ্বর এবং আমিও সর্বদাই মহাকালের নিয়ন্ত্রণাধীন।

মহাকালের শক্তিকে উল্লঙ্ঘন করার শক্তি কারোরই নেই।। (৫৪)

সত্যভামা : দেব! যদি এরকমই হয় তাহলে আপনাকে ভজন করে কী ফল লাভ হবে?

কৃষ্ণ : প্রিয়ে! যথার্থ প্রশ্নই করেছ তুমি। শোন।

মহাকালরূপ ধারণ করেই আমি ত্রিভুবনে নিত্য বিরাজ করি এবং সর্বদা আমার ভক্তগণকে কালরূপেই রক্ষা করি। (৫৫)

এখন এই কালই ব্যাসনরূপ ধারণ করে পাণ্ডবদেরকে গ্রাস করেছে। কালের এই করাল গ্রাস থেকে কীভাবে রক্ষা পাওয়া যাবে সেই চিন্তাই করতে হবে।। (৫৬)

হা ধিক্! হা ধিক! পাপিষ্ঠ দুঃশাসন দ্রৌপদীকে বলপূর্বক নিয়ে আসতে যাচ্ছে।

সত্যভামা : প্রভো! দ্রৌপদী এখন কী করছে।

কৃষ্ণ : রজস্বলা একবস্ত্রা দ্রৌপদী এখন নিশ্চয়ই অন্তঃপুরে রয়েছে। সে এই দ্যূতক্রীড়া বৃত্তান্তের কিছুই জানে না।

যে এই পৃথিবীর সম্রাজ্ঞী, অভিমানিনী, পতিগর্বিতা সেই ভাগ্যবীড়ম্বিতা দ্রৌপদীই তার নিজের ভাগ্য এখনও জানতে পারেনি।। (৫৭)

প্রিয়ে! আমি কোথাও স্থির হয়ে থাকতে পারছি না।

আমার শরণাগত, সদাভক্তিমতী এবং ভক্তিতৎপরা প্রিয়সখী দ্রৌপদীকে সর্বদাই আমি যত্নের সঙ্গে রক্ষা করব।। (৫৮)

সত্যভামা! আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না। এই আমি হস্তিনাপুর চললাম। হস্তিনাপুর গমনের জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে পড়েছি।

সত্যভামা : নাথ! শীঘ্র যান! দ্রৌপদীর সম্মান রক্ষা করুন। আমিও দ্রৌপদীর সম্মানহানীর আশঙ্কায় ব্যাকুল হয়ে পড়েছি। সুতরাং হে নাথ!

হতভাগিনী দ্রৌপদীকে রক্ষা করুন।

কৃষ্ণ : ভদ্রে! এই আমি যাচ্ছি।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থাঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য

দুঃশাসন : সুন্দরি! এসো এসো। মহারাজ কৌরবেশ্বর দুর্যোধন তোমাকে আমন্ত্রণ করেছেন।

দ্রৌপদী : ওরে পাপিষ্ঠ! মহিলাদের অন্তঃপুরে কেন প্রবেশ করেছ? শীঘ্র দূরে হয়ে যাও।

দুঃশাসন : দূরে কোথাও যাব? আমাদের শাসনের বাইরে কোন স্থান আছে নাকি?

দ্রৌপদী : পাপিষ্ঠ! পাণ্ডবদের শাসনাধীন স্থানে প্রবেশ করেছ কেন?

দুঃশাসন : সুন্দরি! সে কথা ভুলে যাও। এখন পাণ্ডবদের শাসনে কিছুই নেই।

দ্রৌপদী : কী? সত্য বলছ?

দুঃশাসন : হ্যাঁ সত্যই বলছি। মিথ্যে কথায় কাজ কী?

দ্রৌপদী : কীভাবে এটা সম্ভব?

দুঃশাসন : দ্যূতক্রীড়ার পণে পাণ্ডবরা সবকিছু হারিয়েছে। এখন তারা কৌরবেশ্বরের দাসমাত্র।

দ্রৌপদী : হা ধিক! এটাও শুনতে হল!

দুঃশাসন : সুন্দরি! দেরি করছ কেন? তোমাকে দেখার জন্য মহারাজ দুর্যোধন উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছেন।

দ্রৌপদী : আঃ পাপিষ্ঠ! কুকুর কি কখনও গব্যঘৃত খেতে সমর্থ হয়?

অথবা শৃগাল কি কখনও সিংহীর দেহ স্পর্শ করতে পারে? শীঘ্র বেরিয়ে যাও।

দুঃশাসন : আঃ সুন্দরি! কেন অশান্তি সৃষ্টি করছ? আমরা শান্তিপ্রিয় লোক।

কোনোরকম অশান্তি করতে আমরা চাই না। অতএব বিলম্ব পরিত্যাগ করে শীঘ্র মহারাজের কাছে চলো।

দ্রৌপদী : মূর্খ! আবার বলছি। শোন।

শৃগাল যতই শক্তিশালী হোক, সে কখনও সিংহ্ীর দেহ স্পর্শ করতে পারে না। এই পৃথিবীতে মূষিক কি কখনও সিংহকে বিনাশ করতে পারে।। (৫৯)

দুঃশাসন : কে সিংহ আর কে শৃগাল সেটা সভাতে গিয়েই দেখে নেবে।

দেখেই সেটা জানবে, বৃথা বাক্যব্যয়ে কাজ কী? শীঘ্র চলো।

নাহলে বলপূর্বক নিয়ে যাব।

দ্রৌপদী : আমি রজস্বলা, তাও আবার একবস্ত্রে রয়েছি। কীভাবে আমায় সভায় নিয়ে যেতে পারো?

দুঃশাসন : আমি কিছুই শুনতে চাই না। শুধুমাত্র মহারাজের আদেশ পালন করছি।

দ্রৌপদী : ভদ্র! ভাতৃজায়াকে অবমাননা করতে তোমার কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ হচ্ছে না?

দুঃশাসন : ভাতৃজায়া! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ

পঞ্চপুরুষ যাকে কামনাবশতঃ ভোগ করে, সে কীভাবে পত্নী নামে অভিহিত হতে পারে।। (৬০)

দ্রৌপদী : মূর্খ! জানো না?

মাতৃভক্ত পাণ্ডবেরা জননীর আদেশেও শাস্ত্রানুসারেই আমাকে বিধিসম্মতভাবে বিবাহ করেছেন।। (৬১)

দুঃশাসন : তাহলে শাস্ত্রের বিধান অনুসারেই পুনরায় বিবাহ করাই যায়।

সুতরাং তোমার পুনরায় বিবাহ হবে। এতে কোন বাধা নেই। (৬২)

দ্রৌপদী : আঃ পাপিষ্ঠ! ভাতৃজায়াকে এরকম বলতে লজ্জা করছে না?

দুঃশাসন : সুন্দরি! রেগে যাচ্ছে কেন? চল তুমি সেই তো ভাতৃজায়াই হবে।

দ্রৌপদী : আঃ পাপিষ্ঠ! আমার ঘর থেকে শীঘ্র দূর হয়ে যাও।

দুঃশাসন : শান্তভাবে কিছুই হবে না দেখেছি। আচ্ছা, বলপ্রয়োগ করেই নিয়ে যাব তাহলে। (দ্রৌপদীকে ধরল)

দ্রৌপদী : আঃ ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও।

দুঃশাসন : ছেড়ে দেব, মহারাজের কাছে নিয়ে গিয়েই ছেড়ে দেব।

দ্রৌপদী : হে জনার্দন! বাসুদেব! মধুসূদন! আমাকে রক্ষা করো। ভগবন্ শরণাগতের পালনকারী! আমি তোমার শরণ নিয়েছি। অনুগ্রহ করে রক্ষা করো।

দুঃশাসন : চলো, কৃষ্ণ তোমাকে রক্ষা করবেন। চলো চল।

(বলপূর্বক দ্রৌপদীকে নিয়ে গেলেন)

পঞ্চমাঙ্কে প্রথম দৃশ্য

গান্ধারী : মহারাজ! সমস্ত বৃত্তান্ত শুনেছেন?

ধৃতরাষ্ট্র : রাণী! কী হয়েছে?

গান্ধারী : দুষ্টশকুনির পরামর্শে আপনার পুত্র দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে কপট দ্যূতক্রীড়ায় প্রবর্তিত হয়েছে।

ধৃতরাষ্ট্র : তা আমি জানি। কিন্তু তারপর কি হল?

গান্ধারী : ধূর্ত দুর্যোধনের ছলে যুধিষ্ঠির পরাজিত হয়েছে।

ধৃতরাষ্ট্র : রাণী! কেন এটাকে ছল বলছ?

ক্রীড়া বা যুদ্ধে জয় যেমন আছে, পরাজয় আছে। কোন একজন জয়লাভ করলে অন্যজন নিশ্চিতভাবে পরাজিত হবেই। এতে কোন সংশয় নেই।। (৬৩)

গান্ধারী : মহারাজ যা বললেন তা অযথার্থ নয়। কিন্তু মহারাজ তো এটাও নিশ্চিত জানেন যে।

এই পৃথিবীতে যেমন নিয়তই ধর্মযুদ্ধ প্রবর্তিত হয়, তেমনভাবেই অধর্মযুদ্ধও তো হতে পারে।। (৬৪)

ধৃতরাষ্ট্র : হ্যাঁ, তুমিও অযথার্থ কিছু বলোনি।

গান্ধারী : দ্যূতক্রীড়াতেও তেমনভাবেই অধর্মপথ গ্রহণ অসম্ভব নয়।

ধৃতরাষ্ট্র : হ্যাঁ, সেরকম হতেই পারে।

গান্ধারী : শকুনির মাধ্যমে কপটতার দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করে দুর্যোধন পাণ্ডবদের রাজ্য অধিকার করে নিয়েছে।

ধৃতরাষ্ট্র : কি! এরকম করেছে সে?

গান্ধারী : হ্যাঁ মহারাজ! এতেও তার দুর্বৃত্তি নিবৃত্তি হয় নি।

দ্যূতপণের দ্বারা পাণ্ডবগণ তার দাসত্বে আবদ্ধ হয়েছে।

ধৃতরাষ্ট্র : আচ্ছা।

গান্ধারী : মহারাজ! তারপরের দুর্যোধন যা করেছে তা বলতে আমরা লজ্জায় মাথা নত হয়ে যাচ্ছে।

ধৃতরাষ্ট্র : গান্ধারী! কী করেছে দুর্যোধন? শীঘ্র বলো। আমার শুনতে কৌতূহল হচ্ছে।

গান্ধারী : শুনুন তাহলে মহারাজ।

পাণ্ডবদের বধূ তথা আমাদের কুলবধূ রজস্বলা একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে সে রাজসভামধ্যে আনিয়েছে।। (৬৫)

ধৃতরাষ্ট্র : না না, এ কখনোই হতে পারে না।

গান্ধারী : মহারাজ! যদি এর প্রতিরোধ না করা হয়, তাহলে আপনার বংশলোপ অবশ্যম্ভাবী এতে কোন সংশয় নেই।

নারীর অপমানে মহাশক্তি কুপিত হন। তার ক্রোধ থেকে রক্ষা করতে কেউই সক্ষম হয় না।। (৬৬)

ধৃতরাষ্ট্র : রাণী! চিন্তা করো না। অবশ্যই এর প্রতিরোধ করব।

গান্ধারী : মহারাজ! এই যদি আপনার সিদ্ধান্ত হয়, তাহলে বিলম্ব করছেন কেন?

শীঘ্রই সেখানে গিয়ে দুর্যোধনকে এই দুষ্কর্ম থেকে নিবারণ করুন।

ধৃতরাষ্ট্র : গান্ধারি! তুমি আমাকে সেখানে নিয়ে চলো।

গান্ধারী : চলুন মহারাজ! আমি আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি।

(উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চমাঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য

দুর্যোধন : দুঃশাসন! দ্রৌপদীকে আনতে এত দেরি করলে কেন?

দুঃশাসন : এই সতী সাধ্বী মর্যাদাহানীর ভয়ে সভায় কিছুতেই আসতে চাইছিল না।

দুর্যোধন : আচ্ছা।

দুঃশাসন : আমরা শৃগাল হয়ে কীভাবে সিংহকে স্পর্শ করব?

দুর্যোধন : চুলের মুঠি ধরে বলপূর্বক আনলে না কেন?

দুঃশাসন : যখন শান্তভাবে আসতে চাইল না, তখন বলপূর্বক চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে আপনার কাছে নিয়ে এসেছি। অতঃপর যা বিধান করার আপনি নিজেই করুন।। (৬৭)

ভীম : আঃ পশু! তোমার বুক চিরে সেই রক্ত দিয়ে যদি না আমি দ্রৌপদীর কেশ রঞ্জিত দিই, তাহলে আমি মধ্যম পাণ্ডব ভীম নই।

দ্রৌপদী : আমিও প্রতিজ্ঞা করছি, যতদিন না এই দুঃশাসন নামক পশুর বক্ষো রক্তে আমার কেশ রঞ্জিত হয়, ততদিন আমি বেণীবন্ধন করব না।

দুর্যোধন : সুন্দরি! রেগে যাচ্ছ কেন?

আমার ঊরুতে উপবেশন করো, আমি তোমাকে রাজভোগ প্রদান করব। তুমি এই সমগ্র রাজ্যে সর্বরাজ্যেশ্বরী হয়ে থাকবে। কেনই বা এই পৃথিবীতে ভিক্ষুপত্নী হয়ে থাকবে? তোমার কোন ভয় নেই, কারণ পাণ্ডবেরা এখন আমার দাস।। (৬৮)

দৌপদী : পতিগণ থাকতে কেনই বা আমি পশুর কাছে অনাথ হতে যাব?

এই পৃথিবীর ধর্ম কেউ কখনোই লুপ্ত করতে পারে না।। (৬৯)

ভীম : না না সাধ্বি!

ধর্ম লুপ্ত হয়ে যায়নি, আমরাও অনাথ হয়ে যায়নি, কিন্তু সঠিক সময়ের জন্য সর্বদাই একটু অপেক্ষা করতে হয়। সেই সময় উপস্থিত হলে এই দুষ্ঠের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ হবে।। (৭১)

আরও বলছি শোন

সূর্যদেব এবং চন্দ্রদেবকে আমি প্রত্যক্ষভাবে সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা করছি যে, দুর্যোধনের উরু আমিই ভঙ্গ করব।। (৭২)

দুঃশাসন : সুন্দরি! কেন অকারণে সময় নষ্ট করছ? মহারাজের কাছে যাও।

তোমার সমস্ত দুঃখের অবসান হবে।

দ্রৌপদী : আঃ পশু! (পদাঘাত করলেন)

দুর্যোধন : কি! এতবড় স্পর্ধা? আমার সামনে আমার ভ্রাতাকে পদাঘাত?

দুঃশাসন! এই পাপিষ্ঠাকে বিবস্ত্র করে দাও। (দুঃশাসন সেরকম করতে চেষ্টা করলেন)

দ্রৌপদী : ভগবন্ মধুসূদন! জনার্দ্দন! হে শরণাগতের রক্ষাকারী! তোমার আশ্রিত দীন ভক্ত আমাকে রক্ষা করো। রক্ষা করো এই পশুর আক্রমণ থেকে। (দুঃশাসন যখন দ্বিগুণ উৎসাহে দ্রৌপদীকে বিবস্ত্র করতে চেষ্টা করলেন তখন অপরিমিত বস্ত্র আসতে আরম্ভ করল।)

দুঃশাসন : (ব্যাকুল এবং বিষণ্ণ হয়ে) হা ধিক! কীভাবে এত পরিমান বস্ত্র আসছে।

দ্রৌপদী : জনার্দ্দন! কীভাবে এই দুষ্ঠ পশুর হাত থেকে তোমার ভক্ত পরিত্রাণ পাবে। জগৎপতে তোমার ভক্তের সম্মান রক্ষা করো।

দুর্যোধন : আশ্চর্য! কীভাবে সম্ভব এটা? যতই টানছে ততই বস্ত্র আসছে? বস্ত্রের শেষ কোথায়?

(গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের প্রবেশ)

গান্ধারী : আঃ কী করছ তোমার? শীঘ্র এই কার্য থেকে বিরত হও। দুঃশাসন!

এখনও বস্ত্র ধরে আছো? শীঘ্র ছেড়ে দাও।

ধৃতরাষ্ট্র : দুর্যোধন! কী করছ তোমরা? যুধিষ্ঠির! পাণ্ডবগণ! মাতা দ্রৌপদী!

তোমরা সসম্মানে নিজভবনে যাও।

দুর্যোধন : দ্যূতক্রীড়ার পণে এরা আবদ্ধ হয়েছে।

ধৃতরাষ্ট্র : আমার কথায় মুক্ত হল এরা। যাও, তোমরা সসম্মানে নিজ ভবনে যাও।

কৃষ্ণ : (প্রবেশ করে) মহারাজ! আপনার বংশ আজ ধ্বংসের হাত থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেল।

ধৃতরাষ্ট্র : গান্ধারি! ইনি কে কথা বলছেন?

গান্ধারী : মহারাজ! ভগবান বাসুদেব উপস্থিত হয়েছেন।

ধৃতরাষ্ট্র : ভগবন্! জানার্দ্দন! বাসুদেব! সপত্নীক বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্রের প্রনাম নেবেন।

কৃষ্ণ : হা ধিক্! এ কি করেছেন? আপনি প্রণম্য, গুরুজন। আপনিই আমার প্রণাম গ্রহণ করবেন।

ধৃতরাষ্ট্র : ভগবন্! আপনি এটা কী করলেন? আমরা কি জানি না যে আপনি কে? ভগবন্! প্রসন্ন হোন।

প্রভু! আমার দুষ্ট পুত্রের পরামর্শে যা করা হয়েছে, পুত্রের অপরাধ ক্ষমা করতে পারেন।। (৭২)

হে দেবেশ! বিভু! কৃপা করে আপনি যদি না জানাতেন তাহলে এই বিশ্বে আপনার মহিমা জানার ক্ষমতা কারই বা ছিল।। (৭৩)

হে প্রভু! অনুগ্রহ করে আমার পুত্রদের ক্ষমা করুন। আপনার চরণে শরণ নিলাম, আপনি যেমন ইচ্ছা করুন।। (৭৪)

কৃষ্ণ : হে রাজন! আমি যদি ক্ষমা না করতাম তাহলে কি এরা পৃথিবীতে থাকত। আমি পূর্বেই এদের ক্ষমা করে দিয়েছি, আপনি সর্বতোভাবে শান্তিলাভ করুন।। (৭৫)

ধৃতরাষ্ট্র : ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে কৃতার্থ হলাম।

কৃষ্ণ : মহারাজ! আর কি প্রিয় কাজ আপনার জন্য করতে পারি।

ধৃতরাষ্ট্র : ভগবন্! এর পরেও আরও পার্থনার কি প্রয়োজন আছে? যদি তাই হয় তাহলে এরকম হোক এই পৃথিবীতে সর্বদা ঈর্ষাবিহীন হয়ে এবং পরম শান্তিপূর্ণভাবে ধর্মে বিরাজ করে, নিজ নিজ কার্যে সদা নিরত থাকুন, যাতে মনুষ্যগণ সর্বদা সুখে বসবাস করেন।। (৭৬)

ইতি ভরদ্বাজগোত্রোদ্ভব রামগোপালস্মৃতির পুত্র নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় বিরচিত

"দ্রৌপদীমানরক্ষণম্" নামক নাটক ১৩৯৩ বঙ্গাব্দে সৌরফাল্গুনমাসের ১৮ দিবসে সমাপ্ত।

৬.২ কাহিনী-নাট্যরূপ-নাট্যনির্মাণবিধি-নাট্যতত্ত্বানুসারে বিচার

যে কোন নাটকসমীক্ষার ক্ষেত্রে নাট্যতত্ত্ব-সমীক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। 'নাট্যতত্ত্ব' বলতে এখানে প্রাচীন নাট্যতত্ত্ব বোঝানো হয়েছে, প্রাচীন নাট্যতত্ত্ব কীভাবে আধুনিক কবিদের লেখনীতে অনুস্যূত হয়েছে, সেটি বিচার্য বিষয়।

❖ ৬.২.০ বিষয়বস্তু–

বৈয়াসিক-মহাভারত অবলম্বনে নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় বিরচিত বারোটি নাটকের মধ্যে *দ্রৌপদীমানরক্ষণ* নাটকটি অন্যতম। ১৩৯৩ বঙ্গাব্দে রচিত *দ্রৌপদীমানরক্ষণ* নাটকটি *বৈয়াসিক-মহাভারতে*র সভাপর্বের ৫৬তম আধ্যায় থেকে শুরু করে ৭৩তম আধ্যায় পর্যন্ত বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত হয়েছে। নাটকের শুরুতে দুর্যোধন ও শকুনির কথোপকথন দেখা যায়। দুর্যোধন, শকুনিকে বলেন পাণ্ডবদের অতুল সম্পদ দেখে তিনি বড়ই চঞ্চল হয়ে উঠেছেন এবং তা হরণ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন–

> পাণ্ডবানাং তথা দৃষ্টা সম্পদঞ্চাতুলাং পরাম্।
> ব্যাকুলশ্চঞ্চলশ্চাস্মি হন্তুমিচ্ছামি সর্ব্বতঃ।।[১]

শকুনি সব কথা শুনে দুর্যোধনকে বলেন বিচক্ষণবুদ্ধির দ্বারা সঠিক উপায় নিরূপণ করতে না পারলে কার্যহানি হয়। বল ছল আশ্রয় করতে হয় কার্যসিদ্ধির জন্য। তুমি নিশ্চিন্ত হও যা করার আমিই করছি–"নিশ্চিন্তো ভব বৎস ত্বং যৎকার্য্যং করবাণ্যহম্।"[২] দুর্যোধন, শকুনির অভিপ্রায় জানতে চাইলে তিনি বলেন–

> দ্যুতেনৈব পরাজিত্য পাণ্ডবানাং হি সম্পদম্।
> সর্ব্বামহং হরিষ্যামি বৎস চিন্তাং পরিত্যজ।।[৩]

অর্থাৎ, পাশার (অক্ষক্রীড়া) দ্বারা পরাজিত করে ঐ পাণ্ডবদের সমস্ত সম্পদ আমি হরণ করে নেব বৎস! তুমি চিন্তা পরিত্যাগ করো। দ্বিতীয়াঙ্কের শুরুতে যুধিষ্ঠির ও অর্জুনের কথোপকথন দেখা যায়। সেই সময় দৌবারিক প্রবেশ করে জানান কৌরবেশ্বর দুর্যোধনের বার্তাপ্রেষিত এক দূত এসেছে। দূত প্রবেশ করে জানায় মহারাজ দ্যূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। যুধিষ্ঠির আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং অচিরেই উপস্থিত হবেন তা জানান। দূত প্রত্যাবর্তনের পর অর্জুন নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যানের কথা বলেন। যুধিষ্ঠির জানান ক্ষত্রিয়ের কাছে যুদ্ধের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান যেমনভাবে অধর্ম, ঠিক তেমনি দ্যূতক্রীড়া প্রত্যাখ্যানও। পরে দেখা যায় দুর্যোধন, ধৃতরাষ্ট্রের কাছে প্রার্থনার জন্য যায় এবং তাঁকে পাণ্ডবদের উপহাসের কথা জানাচ্ছেন। সাথে এও বলেন যুধিষ্ঠিরের রাজ্য হরণ করতে চাইছেন দ্যূতক্রীড়ার মাধ্যমে। ধৃতরাষ্ট্র বলেন দ্যূতক্রীড়ায় বুদ্ধিলোপ হয়, রাজা নল কঠিন দুঃখ ভোগ করেছিলেন তাই এর আশ্রয় নেওয়া সমীচীন নয়। আরও বলেন, ধর্মহীন কর্ম দ্বারা কীভাবে তার শ্রেয় বস্তু লাভ হবে। ধর্মযুক্ত ব্যক্তি মনুষ্যত্ব অর্জন করে। সুতরাং এগুলি যথাযথ বিবেচনা করে তবেই কার্যসাধন করো এই প্রার্থনা করি[৪]। তৃতীয়াঙ্কের শুরুতেই দেখা যায় সত্যভামা ও কৃষ্ণের কথোপকথন। কৃষ্ণকে উৎকণ্ঠিত দেখে সত্যভামা এর কারণ জানতে চায়। কৃষ্ণ বলেন পাণ্ডবদের ঐশ্বর্য দেখে ঈর্ষাবশত দুর্যোধন কপটতার দ্বারা দখল

করার চেষ্টা করছেন। সত্যভামা বলেন আপনি সব জেনেও প্রতিকার করছেন না কেন। কৃষ্ণ উত্তরে বলেন আরম্ভের খণ্ডন এ পৃথিবীতে কেউ করতে পারে না। আরম্ভ বিনা কখনোই ভোগের সমাপ্তি হয় না। আরো বলেন এই ধরণীতে মনুষ্যরূপ ধারণ করেই আমি এই ধরণীর ভার লাঘব করার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছেন তিনি। সেই কার্যে সিদ্ধিলাভ করার জন্য কিছু অবলম্বন করা অবশ্যই মঙ্গলজনক হবে। অর্থাৎ, পাণ্ডব কৌরবদের মধ্যে বিরোধ ব্যতীত কার্য সিদ্ধ হবে না। পরে দেখা যায় দুর্যোধনের কাছে যুধিষ্ঠির দ্যুতক্রীড়ায় পরাজিত হয়ে মুখ নিচু করে বসে আছেন। দূর্যোধন জানতে চান তিনি আর খেলবেন কি না? যুধিষ্ঠির বলেন পণ রাখার মতো তাঁর কাছে কোন দ্রব্য নেই। শকুনি প্রত্যুত্তরে উপহাস করে বলেন ‘নেই বলছো কেন এখনো তো দ্রৌপদী রয়েছে’। ভীম একথা শুনে অত্যন্ত রেগে যায় এবং এই উপহাসের প্রতিকার করার প্রতিজ্ঞা করেন। দুর্যোধন বলেন যুদ্ধে বা দ্যুতক্রীড়ায় আমন্ত্রিত হয়ে ক্ষত্রিয় যদি আমন্ত্রণ রক্ষা না করে তাহলে **তাঁর** ক্ষত্রিয় নাম ধারণ নিষ্ফল। যুধিষ্ঠির একথা শুনে খেলার জন্য প্রস্তুত হন এবং পণ হিসেবে দ্রৌপদীকে রাখে। উভয়ের ক্রীড়া শুরু হয় এবং যুধিষ্ঠির পুনরায় পরাজিত হনও। দুর্যোধন দুঃশাসনকে আদেশ করেন শীঘ্রই পাণ্ডব অন্তঃপুরে গিয়ে দ্রৌপদীকে সভায় নিয়ে আসার জন্য। চতুর্থ অঙ্কের শুরুতেই দেখা যায় সত্যভামা ও কৃষ্ণের কথোপকথন। সত্যভামা জানতে চান আপনার আশ্রিত হয়েও এনাদের কেন এমন দশা। কৃষ্ণ বলেন এই অবস্থায় তাঁরও কিছু করার ক্ষমতা নেই। সমস্ত জগত যেমন মহাকালের অধীন তেমনি দেবতাগণও। মহাকালের শক্তিকে উল্লঙ্ঘন করার শক্তি কারোরই নেই। এই কথোপকথন কালে কৃষ্ণ জানতে পারেন পাপিষ্ঠ দুঃশাসন দ্রৌপদীকে বলপূর্বক নিয়ে আসতে যাচ্ছে। কৃষ্ণ অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে ওঠেন এবং দ্রৌপদীকে বাঁচানোর জন্য হস্তিনাপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। ওদিকে দুঃশাসন মহিলাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে দ্রৌপদীকে দুর্যোধনের কাছে যাবার আমন্ত্রণ জানান। তিনি বলেন দ্যুতক্রীড়ায় পাণ্ডবরা সব কিছু হারিয়ে এখন দাস মাত্র। দ্রৌপদী জানান সে রাজস্বলা, তাও এক বস্ত্রে আছেন কীভাবে সভায় নিয়ে যেতে পারেন তাঁকে? দুঃশাসন অপমানিত করেন এবং বলপূর্বক সভায় নিয়ে যেতে থাকেন। দ্রৌপদী রক্ষা পাবার জন্য কৃষ্ণকে স্মরণ করতে থাকেন। পঞ্চম অঙ্কে গান্ধারী, ধৃতরাষ্ট্রকে দ্যুতক্রীড়ায় দুর্যোধনের জয়লাভের কথা জানান এবং সাথে বলেন শকুনির কপটতার দ্বারা পাণ্ডবদের রাজ্য অধিকার করে নিয়েছেন। তাছাড়া দুর্যোধন আর যা করেছেন তা বলতে আমার লজ্জায় মাথা নত হয়ে যাচ্ছে। ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত কৌতূহল হয়ে জানতে চায় গান্ধারী বলেন পাণ্ডবদের বধূ তথা আমাদের কূলবধূ দ্রৌপদীকে রাজসভায় আনিয়েছে। গান্ধারী বলেন মহারাজ যদি এর প্রতিরোধ না হয় তাহলে তাদের বংশলোপ অবশ্যম্ভাবী। তাই তারা ঠিক করেন শীঘ্রই সেখানে গিয়ে দুর্যোধনকে এই দুষ্কর্ম থেকে নিবারণ করবেন। পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা যায় দুঃশাসন দ্রৌপদীর বলপূর্বক চুলের মুঠি ধরে সভায় নিয়ে আসেন। ভীম তা দেখে প্রতিজ্ঞা করেন দুঃশাসনের বুক চিরে দ্রৌপদীর কেশ রঞ্জিত করবেন। দুর্যোধন বলপূর্বক ঊরুতে বসানোর চেষ্টা করেন তা দেখে ভীম সূর্যদেব ও চন্দ্রদেবকে সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা করে দুর্যোধনের ঊরু ভঙ্গ করবেন। দুর্যোধনের আদেশে দুঃশাসন দ্রৌপদীকে বিবস্ত্র করার চেষ্টা করেন কিন্তু ব্যাকুল ও বিষণ্ণ হয়ে দেখেন অপরিমিত বস্ত্র আসতে আরম্ভ করেছে। গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের সেই সময় প্রবেশ করে শীঘ্রই এই দুষ্কর্ম থেকে বিরত করেন এবং আদেশ করেন মুক্ত করার জন্য।

সেই সময় কৃষ্ণের প্রবেশ। ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কৃষ্ণ জানান তিনি পূর্বেই ক্ষমা করেছেন। নাটকটি এখানেই ধৃতরাষ্ট্রের ভরতবাক্যের দ্বারা সমাপ্ত হয়। নাটকটিতে পাঁচটি অঙ্ক আছে এবং প্রতিটি অঙ্কে দুটি করে দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়।

নাটকের নাম	প্রণেতা	উৎস	রচনাকাল	প্রধান চরিত্র	হস্তলিখিত পুঁথিতে পৃষ্ঠাসংখ্যা	অঙ্ক সংখ্যা	দৃশ্য	শ্লোকসংখ্যা
দ্রৌপদীমান-রক্ষণ	নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়	*বৈয়াসিক-মহাভারতের* সভাপর্ব	১৩৯৩ বঙ্গাব্দ	কৃষ্ণ, অর্জুন, দুর্য্যোধন, যুধিষ্ঠির, শকুনি, ধৃতরাষ্ট্র, সত্যভাম, দ্রৌপদী, দুঃশাসন, গান্ধারী	৩০	প্রথম-অঙ্ক	প্রথম দৃশ্য	৭
							দ্বিতীয় দৃশ্য	১৩
						দ্বিতীয়-অঙ্ক	প্রথম দৃশ্য	৯
							দ্বিতীয় দৃশ্য	১০
						তৃতীয়-অঙ্ক	প্রথম দৃশ্য	৭
							দ্বিতীয় দৃশ্য	৫
						চতুর্থ-অঙ্ক	প্রথম দৃশ্য	৭
							দ্বিতীয় দৃশ্য	৫
						পঞ্চম-অঙ্ক	প্রথম দৃশ্য	৪
							দ্বিতীয় দৃশ্য	১০
							মোট শ্লোকসংখ্যা–	৭৭

❖ ৬.২.১ নামকরণ

দ্রৌপদীমানরক্ষণ নাটকে দেখা যায় যে, যুধিষ্ঠির অক্ষক্রীড়ায় পরাস্ত হয়ে রাজ্য সম্পদ সব হারিয়ে ফেলেন। শেষে শকুনি ও দুর্যোধনের প্ররোচনায় দ্রৌপদীকে পণ হিসাবে রাখেন এবং তাতেও তিনি পরাস্ত হন। এরপর দুর্যোধনের নির্দেশে দুঃশাসন দ্রৌপদীকে একবস্ত্রা অবস্থায় বলপূর্বক কেশ আকর্ষণ করে সভা মধ্যে নিয়ে আসেন। তারপর আরও কিছু অসম্মানজনক আচরণের পর তাঁর বস্ত্রহরণে প্রবৃত্ত হয়। এতেই দ্রৌপদীর মান হৃত হয়। কিন্তু নারীর মানহরণ নাটকের মূল লক্ষ্য হতে পারে না। তাই নাট্যকার শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা তাঁর বস্ত্রের সঙ্কুলান করে তাঁর চূড়ান্ত অসম্মান থেকে তাঁকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছেন। তারপরও ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে সভামধ্যে প্রবেশ করিয়ে তাঁদের দ্বারা দুর্যোধন ও দুঃশাসনকে এই অপকর্ম থেকে নিবৃত্ত করার ব্যবস্থা করিয়েছেন। এর ফলে নাট্যকার বোঝাতে চেয়েছেন যে নারীর অর্থাৎ দ্রৌপদীর মান হরণের যথেষ্ট ঘটনা ঘটলেও তার চেয়েও অনেক বড়

গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা এবং ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর ভূমিকা। কারণ তাঁরা এই নীতিবিগর্হিত কাজকে বন্ধ করেছেন। সেই কারণে এই নাটকের নাম *দ্রৌপদীমানরক্ষণ* সার্থক হয়ে উঠেছে।

❖ ৬.২.২ নান্দী

বৈয়াসিক-মহাভারত অবলম্বনে নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় বিরচিত *দ্রৌপদীমানরক্ষণ* নাটকের প্রারম্ভে দেখা যায়–

নবজলধরকান্তিঃ পীতবাসা বরেণ্যঃ
সকলভুবনপাতা চক্রহস্তঃ সুবেষঃ।
শরণগতজনানামাশ্রয়ো যঃ কৃপালু
র্বপনয়তু স দুঃখং সর্ব্বতো বো মুরারিঃ।।[৫]

অর্থাৎ, বর্ষার নতুন মেঘের মতো দেহ, হলুদ বসন পরিধানকারী, বরণীয়, সকল (চতুর্দশ/তিন) ভুবনেরপালক, চক্রধারী, সুন্দরবেশধারী, শরণাগত ব্যক্তিবর্গের আশ্রয়স্থল, যিনি কৃপালু সেই মুরারি (শ্রীকৃষ্ণ) সর্বতোভাবে তোমাদের দুঃখ দূর করুন। *নাট্যশাস্ত্রের* লক্ষণ অনুসারে এখানে বিষ্ণুর অষ্টম অবতার কৃষ্ণের আশীর্বাদ প্রার্থনা দ্বারা নান্দী নির্মিত হয়েছে। নান্দীর বৈশিষ্ট্য অনুসারে এখানে 'নবজলধরকান্তিঃ', 'পীতবাসা' ইত্যাদি অষ্ট বা ততোধিক পদের ব্যবহার লক্ষিত হয়েছে। *নাট্যপ্রদীপে* বলা হয়েছে–

শ্লোকপাদঃ পদং কেচিৎসুপ্তিঙন্তমথাপরে।
পরেঽবান্তরবাক্যৈং চ পদমাহুর্বিশারদঃ।।[৬]

অর্থাৎ, স্থানবিশেষে সুবন্ত-তিঙন্ত, স্থানবিশেষে শ্লোকের এক-চতুর্থাংশ এবং লক্ষণানুসারে অবান্তর বাক্য যে কোন অর্থই হতে পারে। এখানে নান্দী সুপ্ বিভক্তি ও তিঙ্ বিভক্তিযুক্ত পদের মাধ্যমেই হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ যে শরণাগতের আশ্রয় তা সূচিত হয়েছে এই নান্দী শ্লোকের মাধ্যমে। এছাড়া 'সুবেষ' বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে এটি খুব তাৎপর্যবহ। কারণ এই নাটকে শরণাগত দ্রৌপদীর রক্ষা করেছেন বস্ত্র অর্থাৎ বেষ দিয়ে। অতএব উক্ত নান্দীটি কেবল মঙ্গলশ্লোক নয়, এটি নাটকের পরিণতিজ্ঞাপকও।

❖ ৬.২.৩ প্রস্তাবনা

নাট্যশাস্ত্রে উদ্ঘাত্যক, কথোদ্ঘাত, প্রয়োগাতিশয়, প্রবৃত্তক ও অবলগিত এই পাঁচটি আমুখের অঙ্গ বলা হয়েছে–

উদ্ঘাত্যকঃ কথোদ্ঘাতঃ প্রয়োগাতিশয়স্তথা।
প্রবৃত্তকাবলগিতে আমুখাঙ্গানি পঞ্চবৈ।।[৭]

বৈয়াসিক-মহাভারত অবলম্বনে নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় বিরচিত *দ্রৌপদীমানরক্ষণ* নাটকের প্রথম অঙ্কে প্রস্তাবনা লক্ষিত হয়েছে। প্রথমাঙ্কের প্রথম দৃশ্যে নান্দী পাঠের পরই সূত্রধার রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে আর্যবর্গকে অভিবাদন করেন এবং মারিষ অর্থাৎ পারিপার্শ্বিককে মঞ্চে আহ্বান জানান। সূত্রধার জানতে চান আর্যবর্গের চিত্তবিনোদনের

জন্য কোন নাটক উপস্থাপন করবেন তিনি সেই বিষয়ে পরামর্শের জন্য আহ্বান করেছেন। এরপর তাঁদের কথোপকথন থেকে নাট্যকারের নাম, নাটকের নাম জানা যায়–

রামগোপালপুত্রেণ নিত্যানন্দেন শর্ম্মণা।
রচিতং নাটকং নাম *দ্রৌপদীমানরক্ষণম্*।।[৮]

অর্থাৎ, রামগোপাল শর্মা মহোদয়ের পুত্র নিত্যানন্দ শর্মার দ্বারা বিরচিত নাটকের নাম *দ্রৌপদীমানরক্ষণ*। সূত্রধার নাটক শুরু করার কথা বলতেই নেপথ্য থেকে–

পাণ্ডবানাং তথা দৃষ্ট্বা সম্পদঞ্চাতুলাং পরাম্।
ব্যাকুলশ্চঞ্চলশ্চাস্মি হন্তুমিচ্ছামি সর্ব্বতঃ।।[৯]

অর্থাৎ, পাণ্ডবদের সেরকম অতুল সম্পদ দেখে আমি বড়ই চঞ্চল হয়ে উঠেছি। তাঁদের সর্বপ্রকারে তা হরণ করতে ইচ্ছা করি। একথা শুনে সুত্রধার বলেন মারিষ! এ কে প্রবেশ করেছেন? পারিপার্শ্বিক বলেন ইনি মহারাজ দুর্যোধন, মাতুল শকুনির সঙ্গে চঞ্চলমতি হয়ে রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হচ্ছেন–

সার্দ্ধ শকুনিনা রাজা দুর্যোধনো মহাবলঃ।
রঙ্গস্থলে সমাযাতি চঞ্চলমানসস্ত্বসৌ।।[১০]

এখানেই প্রথম দৃশ্যের সমাপ্তি হয়। প্রথমাঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে পুনরায় দুর্যোধনের এই উক্তি দিয়েই শুরু হয়। সুতরাং এখানে কথোদ্ঘাত শ্রেণীর প্রস্তাবনা হয়েছে বলে মনে হয়। কথোদ্ঘাত প্রস্তাবনার লক্ষণ করতে গিয়ে *নাট্যশাস্ত্র*কার ভরতাচার্য বলেছেন–

সূত্রধারস্য বাক্যং বা যত্র বাক্যার্থমেব বা।
গৃহীত্বা প্রবিশেত্ পাত্রং কথোদ্ঘাতঃ স কীর্তিতঃ।।[১১]

অর্থাৎ, যখন কোনো পাত্র সূত্রধারের বাক্য বা বাক্যার্থ গ্রহণ করে প্রবেশ করে, তখন তাকে কথোদ্ঘাত প্রস্তাবনা বলা হয়।

❖ ৬.২.৪ অর্থপ্রকৃতি

নাটকের প্রধান প্রয়োজন সিদ্ধির হেতু হল অর্থপ্রকৃতি। বীজ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী, কার্য এই পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়।

বীজ– *দ্রৌপদীমানরক্ষণ* নাটকে প্রথমাঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে দুর্যোধন, শকুনিকে জানায়–

পাণ্ডবানাং তথা দৃষ্ট্বা সম্পদঞ্চাতুলাং পরাম্।
ব্যাকুলশ্চঞ্চলশ্চাস্মি হন্তুমিচ্ছামি সর্ব্বতঃ।।[১২]

পাণ্ডবদের অতুল সম্পদ দেখে তিনি বড়ই চঞ্চল হয়ে তা হরণের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। সাথে আরও বলেন ভীমের পরিহাসের কথা যা স্মরণ করে হৃদয়ে ক্রোধ প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে। শকুনি তাকে যুদ্ধে না গিয়ে অক্ষক্রীড়া

দ্বারা পরাজিত করে পাণ্ডবদের সমস্ত সম্পদ হরণের কথা জানায়। নাটকের মুখ্য ফল সম্পদরূপী মান হরণ এবং তা থেকে রক্ষা। শকুনির এই ব্যক্তব্যে নাটকের বীজ প্রকাশিত হয়েছে।

বিন্দু– *দ্রৌপদীমানরক্ষণ* নাটকে দ্বিতীয়াঙ্কের প্রথম দৃশ্যে অর্জুন, যুধিষ্ঠির ও ভীমের কথোপকথন অবান্তর বৃত্ত। দৌবারিক প্রবেশ করে জানায় কৌরবরাজ দুর্যোধন দূত প্রেরণ করেছেন। দূতের প্রবেশ এবং দ্যুতক্রীড়ায় আমন্ত্রণের বার্তা নাটকের বৃত্তকে মুলস্রোতে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। তাই এখানে বিন্দু বর্ণিত হয়েছে বলে মনে হয়।

কার্য–*দ্রৌপদীমানরক্ষণ* নাটকে দুর্যোধন পাণ্ডবদের অতুল সম্পদ দেখে তা হরণ করার বিষয়ে শকুনির সাথে পরিকল্পনা, সম্পদরূপী মান হরণের দ্বারা দুর্যোধনের ক্রোধ শান্ত ইত্যাদি ঘটনাকে কেন্দ্র করে যুধিষ্ঠিরকে অক্ষক্রীড়ায় আমন্ত্রণ, যুধিষ্ঠিরের রাজ্যহীন হওয়া, দ্রৌপদীকে পণরূপে রেখে পুনরায় পরাজয়, দ্রৌপদীর অপমান, বস্ত্রহরণের চেষ্টা এবং অবশেষে তা থেকে রক্ষা পাবার মধ্য দিয়ে নাটকের মুখ্য কার্য লাভ হয়।

এই নাটকে পতাকা ও প্রকরী লক্ষ্য করা যায় না।

❖ ৬.২.৫ পঞ্চাবস্থা

ফলকামী ব্যক্তির আরব্ধ কার্যের পাঁচটি অবস্থা–আরম্ভ, যত্ন, প্রাপ্ত্যাশা, নিয়তাপ্তি ও ফলাগম। লক্ষণ পূর্বোক্ত।

আরম্ভ–*দ্রৌপদীমানরক্ষণ* নাটকে প্রথমাঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে দুর্যোধন, শকুনিকে জানায় যে পাণ্ডবদের অতুল সম্পদ দেখে তিনি বড়ই চঞ্চল হয়ে তা হরণের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। শকুনি তাকে যুদ্ধে না গিয়ে বল ছল আশ্রয় করে কার্যসিদ্ধির কথা জানায় সাথে আরও বলেন–

পাণ্ডবানাং তথা দৃষ্ট্বা সম্পদঞ্চাতুলাং পরাম্।
ব্যাকুলশ্চঞ্চলশ্চাস্মি হন্তুমিচ্ছামি সর্ব্বতঃ।।[১৩]

অর্থাৎ, অক্ষক্রীড়া দ্বারা পরাজিত করে পাণ্ডবদের সমস্ত সম্পদ তিনি হরণ করে নেবেন চিন্তা ত্যাগ করতে। নাটকের মুখ্য ফল সম্পদরূপী মান হরণ এবং তা থেকে রক্ষা। শকুনির এই বক্তব্যে প্রধান ফলের প্রতি ঔৎসুক্য বা অভিলাষ প্রকাশিত হয়েছে।

যত্ন–*দ্রৌপদীমানরক্ষণ* নাটকে দ্বিতীয়াঙ্কের প্রথম দৃশ্যে যুধিষ্ঠির, অর্জুন ও ভীমের কথোপকথন দেখতে পাওয়া যায়। সেই সময় দৌবারিক প্রবেশ করে জানায় কৌরবেশ্বর দুর্যোধনের বার্তাপ্রেষিত এক দূত এসেছে। যুধিষ্ঠির ভাবতে থাকেন হঠাত্ দূত প্রেরণের কারণ কি হতে পারে নিশ্চয়ই কোন অভিসন্ধি আছে। সেই সময় দূত প্রবেশ করে জানান মহারাজ! যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ায় আমন্ত্রণ জানিয়েছেন–"মহারাজ! দ্যূতক্রীড়ার্থং আমন্ত্রিতো ভবান্ কৌরবেশ্বরেণ।"[১৪] যুধিষ্ঠির আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং বলেন শীঘ্রই উপস্থিত হবেন। অর্জুন বলেন নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করাই সমীচীন ছিল–"নিমন্ত্রণপ্রত্যাখ্যানমেব সমীচীনমাসীৎ"[১৫]। যুধিষ্ঠির বলেন–

আমন্ত্রিতো হি যুদ্ধে বা দ্যুতে চ ক্ষত্রিয়ো যদি।

আমন্ত্রণং ন রক্ষেদ্ যঃ স বৃথা ক্ষত্রনামধৃক্।।[১৬]

ক্ষত্রিয়ের কাছে যুদ্ধের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান যেমনভাবে অধর্ম, ঠিক তেমনি দ্যূতক্রীড়া প্রত্যাখ্যানও। পাণ্ডবদের সম্পদ হরণরূপী ফললাভের উদ্দেশ্যে চেষ্টা প্রযত্ন নামক দ্বিতীয় অবস্থা ফুটে উঠেছে।

প্রাপ্ত্যাশা–*দ্রৌপদীমানরক্ষণ* নাটকের দ্বিতীয়াঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে দুর্যোধন, ধৃতরাষ্ট্রের কাছে আশীর্বাদ গ্রহণ করতে যান। যুধিষ্ঠিরের উপহাস, দ্যূতক্রীড়ায় আমন্ত্রণ করে ছল প্রয়োগ করে রাজ্য গ্রহণের বৃত্তান্ত ধৃতরাষ্ট্রকে জানান। ধৃতরাষ্ট্র তা শুনে বলেন দ্যূতক্রীড়ায় বহু দোষ বর্তমান, যা ব্যসন নামে পরিচিত। তাই এর আশ্রয় নেওয়া সমীচীন মনে হয় না–

দ্যূতে তু বহবো দোষাঃ ব্যসনং তত্ প্রকীর্ত্তিতম্।

তস্যাশ্রয়ঃ সমীচীনো ন মন্যতে ময়া তথা।।[১৭]

ধৃতরাষ্ট্রের বাধার দ্বারা নাটকের মুখ্য প্রয়োজন তিরোভাব ঘটে। অর্থাৎ দ্যূতক্রীড়ার দ্বারা ছলে পাণ্ডবদের সম্পদ হরণরূপী ফলে বিঘ্নের আশঙ্কা দেখা দেয় যা প্রাপ্ত্যাশা নামক অবস্থার উদাহরণ।

ফলাগম–*দ্রৌপদীমানরক্ষণ* নাটকের দ্বিতীয়াঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা যায় দুর্যোধনের আদেশে দুঃশাসন দ্রৌপদীকে বিবস্ত্র করার চেষ্টা করছেন কিন্তু কৃষ্ণের আশীর্বাদে অপরিমিত বস্ত্র আসতে আরম্ভ করে। সেই সময় গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের প্রবেশ করে শীঘ্রই এই দুষ্কর্ম থেকে বিরত করেন। এইভাবে দ্রৌপদীর মানহরণ থেকে রক্ষার মাধ্যমে নাটকের ফলপ্রাপ্তি ঘটে যা ফলাগম নামক পঞ্চম অবস্থার উদাহরণ।

এই নাটকে চতুর্থ অবস্থা নিয়তাপ্তির উদাহরণ স্পষ্ট লক্ষিত হয় না।

❖ ৬.২.৬ নাট্যবৈশিষ্ট্য:

নাটকের প্রারম্ভেই পারিপার্শ্বিক ও সূত্রধারের কথোপকথন থেকে জানা যায় *বৈয়াসিক-মহাভারত* অবলম্বনে নূতন নাটক উপস্থাপন হতে চলেছে। রামগোপাল শর্মা মহোদয়ের পুত্র নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় দ্বারা রচিত নাটকের নাম *দ্রৌপদীমানরক্ষণ*–

রামগোপালপুত্রেণ নিত্যানন্দেন শর্ম্মণা।

রচিতং নাটকং নাম দ্রৌপদীমানরক্ষণ।।[১৮]

কবি শুরুতেই ‘নাটক’ বলেছেন এই রূপকটিকে। নাট্যতত্ত্বানুসারে এই দৃশ্যকাব্যকে ‘নাটক’ আখ্যায় ভূষিত করা যায় কি না সেটি বিচার্য বিষয়। নাটকের লক্ষণে শুরুতেই নাটক খ্যাতবৃত্ত হতে হবে বলা হয়েছে। *দ্রৌপদীমানরক্ষণ* নাটকটি *বৈয়াসিক-মহাভারতের* সভাপর্বের ৫৬তম আধ্যায় থেকে শুরু করে ৭৩তম আধ্যায় পর্যন্ত বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত হয়েছে। সুতরাং নাটকটি ‘খ্যাতবৃত্ত’। নাটকের লক্ষণে পঞ্চসন্ধির কথা বলা হয়েছে। *দ্রৌপদীমানরক্ষণ* নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে দ্রৌপদীর মান রক্ষা এই নাটকের মূল বিষয়বস্তু বা ফল। নাটকের প্রথমাঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে দুর্যোধনের সাথে শকুনির কথোপকথন লক্ষিত হয়। দুর্যোধন বলেন শকুনিকে পাণ্ডবদের

অতুল সম্পদ দেখে তিনি বড়ই চঞ্চল হয়ে উঠেছেন, তাদের সমস্ত সম্পদ হরণ করার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়েছেন –

পাণ্ডবানাং তথা দৃষ্ট্বা সম্পদঞ্চাতুলাং পরাম্।
ব্যাকুলশ্চঞ্চলশ্চাস্মি হন্তুমিচ্ছামি সর্ব্বতঃ।।[১৯]

সাথে আরও বলেন ভীমের সেই পরিহাসের কথা[২০] যখনই স্মরণ করেন তাঁর হৃদয় ক্রোধে প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে। শকুনি তাকে আশ্বস্ত করে বল-ছল আশ্রয় করেই কার্যসিদ্ধি করার কথা বলেন। কীভাবে জানতে চাইলে বলেন–

দ্যূতেনৈব পরাজিত্য পাণ্ডবানাং হি সম্পদম্।
সর্ব্বামহং হরিষ্যামি বৎস চিন্তাং পরিত্যজ।।[২১]

অর্থাৎ, অক্ষক্রীড়া দ্বারা পরাজিত করে ঐ পাণ্ডবদের সমস্ত সম্পদ তিনি হরণ করে নেবেন চিন্তা ত্যাগ করতে। এখানেই নাটকের মুখসন্ধি পরিলক্ষিত হয়। সম্পদরূপী মান হরণের দ্বারা দুর্যোধনের ক্রোধ শান্ত হবে। এখানে এই ঘটনা স্বল্পভাবে প্রকাশিত হয়ে ক্রমশ বিস্তৃত হয়ে পরে মুখ্য উদ্দেশ্য পূরণ করেছে।

দ্রৌপদীমানরক্ষণ নাটকের দ্বিতীয়াঙ্কের প্রথম দৃশ্যে যুধিষ্ঠির ও ভীমের কথোপকথন দেখতে পাওয়া যায়। এখানে দেখা যায় কথোপকথন কালে যুধিষ্ঠিরের হঠাৎ বাম চক্ষু স্পন্দিত হয়ে ওঠে তিনি বলেন–

সূচয়ত্যশুভং কিনো বামাক্ষিস্পন্দনেন ভোঃ।
মনো মে চঞ্চলং ভ্রাতর্ভবতি সহসা কথম্।।[২২]

অর্থাৎ বামচক্ষু স্পন্দন দ্বারা অশুভ কোন ঘটনারই সূচনা হয়। সুতরাং হে ভ্রাতা হঠাৎ মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। মুখসন্ধিতে আবির্ভূত নাটকের প্রধান ফল কিছুটা প্রকাশিত আবার কিছুটা অনুমান প্রভৃতির দ্বারা বুঝে নিতে হয় প্রতিমুখসন্ধিতে। যুধিষ্ঠিরের বামচক্ষু স্পন্দনের ফলে দর্শকরা অনুমান করে নিতে পারে শকুনির পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে চলেছে। আবার পরে দেখা যায় কৌরবেশ্বর দুর্যোধনের বার্তাপ্রেষিত এক দূত এসে উপস্থিত হয়েছেন। দূত প্রবেশ করে জানায় দুর্যোধন দ্যূতক্রীড়ায় আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। নাটকের মুখ্য যে ফল অর্থাৎ সম্পদরূপী মান হরণের চেষ্টা এখানে কখন প্রকাশিত বা কখন অনুমানের দ্বারা প্রতিমুখসন্ধি লক্ষিত হয়েছে।

গর্ভসন্ধিতে নাটকের মুখ্যফল সম্যকভাবে প্রকাশিত হয় এবং পুনঃ পুনঃ বিঘ্নের আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটে। দ্বিতীয়াঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে দুর্যোধন, ধৃতরাষ্ট্রের কাছে আশীর্বাদ গ্রহণ করতে যান। যুধিষ্ঠিরের উপহাস, দ্যূতক্রীড়ায় আমন্ত্রণ করে ছল প্রয়োগ করে রাজ্য গ্রহণের বৃত্তান্ত ধৃতরাষ্ট্রকে জানান। ধৃতরাষ্ট্র তা শুনে বলেন দ্যূতক্রীড়ায় বহু দোষ বর্তমান, যা ব্যাসন নামে পরিচিত। তাই এর আশ্রয় নেওয়া সমীচীন মনে হয় না[২৩]। ধৃতরাষ্ট্রের বাধার দ্বারা নাটকের মুখ্য প্রয়োজন তিরোভাব ঘটে। আবার, তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে কৃষ্ণকে চিন্তিত দেখে সত্যভামা জানতে চান কি হয়েছে? কৃষ্ণ জানান অশুভ ব্যাপার ঘটেছে, পাণ্ডবরা রাজ্যহীন হয়েছে দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হয়ে –

পশ্যতা পাণ্ডবৈশ্বর্য্যমীর্ষিণা কপটেণ চ।

দুর্যোধনেন রাজ্যস্য লাভায় চেষ্ট্যতেঽধুনা।।[২৪]

সত্যভামা জানতে চান তিনি সব জেনেও প্রতীকার করছেন না কেন? কৃষ্ণ বলেন আরম্ভের খণ্ডন এই পৃথিবীতে কেউ করতে পারেন না। এই ধরণীতে মনুষ্যরূপ ধারণ করেই তিনি ধরণীর ভার লাঘব করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন, সেই কার্যে সিদ্ধিলাভ করার জন্য কিছু অবলম্বন করা অবশ্যই মঙ্গলজনক হবে। আরও বলেন পাণ্ডব ও কৌরবদের মধ্যে বিরোধ ব্যতীত তাঁর কার্য সিদ্ধ হবে না। তৃতীয়াঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা যায় যুধিষ্ঠির মাথা নিচু করে বসে আছেন দ্যূতক্রীড়ায় পণে রাজ্যহীন হয়ে। দুর্যোধন জানতে চান আর খেলবেন কি না তিনি? যুধিষ্ঠির বলেন পণ রাখার মত কোন দ্রব্যই তার কাছে নেই কীভাবে খেলবেন। শকুনি বলেন দ্রৌপদী এখনও রয়েছেন। দুর্যোধন বলেন যুদ্ধে বা দ্যূতক্রীড়ায় আমন্ত্রিত ক্ষত্রিয় যদি আমন্ত্রণ রক্ষা করতে না পারেন তাঁর ক্ষত্রিয় নামধারণ নিষ্ফল–

আমন্ত্রিতো হি যুদ্ধে বা দ্যুতে চ ক্ষত্রিয়ো যদি।
আমন্ত্রণং ন রক্ষেদ্ যঃ স বৃথা ক্ষত্রনামধৃক।।[২৫]

যুধিষ্ঠির একথা শুনে খেলতে সম্মতি দেন এবং পুনরায় পরাজিত হন। দুর্যোধন অত্যন্ত উল্লসিত হয়ে দুঃশাসনকে পাণ্ডব অন্তঃপুরে গিয়ে দ্রৌপদীকে নিয়ে আসার জন্য বলেন। দর্শকের বুঝতে বাকি থাকে না কি ঘটতে চলেছে। পাশা খেলার ছলে রাজ্য লাভ এবং অপমানের প্রতিশোধ উভয়ই ঘটতে চলেছে। তাই নাটকে এই জায়গায় গর্ভসন্ধি লক্ষিত হয়।

ক্রোধ, ব্যসন বা বিলোভনের দ্বারা যেখানে ফলপ্রাপ্তি বিষয়ে পর্যালোচনা দেখা যায় তা অবমর্শ সন্ধি বা বিমর্ষ সন্ধি। সাগরনন্দীর মতে বিমর্ষ সন্ধি তিন ভাবে হতে পারে প্রলোভন থেকে, ক্রোধ থেকে, বিপদ থেকে। চতুর্থাঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখতে পাওয়া যায় দুঃশাসন মহিলাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছে। দুঃশাসন, দ্রৌপদীকে দ্যূতক্রীড়ায় রাজ্যহীন হবার কথা জানান এবং দুর্যোধন রাজ্যসভায় আসার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তা জানান। দ্রৌপদী জানান তিনি রজস্বলা, তাও আবার একবস্ত্রে রয়েছেন। দুঃশাসন কিছুতেই শুনতে চান না বলপূর্বক তাঁকে সভায় নিয়ে যান। পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা যায় দ্রৌপদীকে সভা মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে। দুঃশাসন দ্রৌপদীর কাছে যেতে গেলে তিনি পদাঘাত করেন। এ দেখে দুর্যোধন ক্রুদ্ধ হয়ে আদেশ দেন দ্রৌপদীকে বিবস্ত্র করার জন্য। বিমর্ষ সন্ধিতে শাপাদি দ্বারা মুখ্য ফল অন্তরায় গ্রস্ত হবার কথা বলা হয়েছে। এই ঘটনা থেকে দর্শকের মনে দুঃখের উদ্বেগ হয় দ্রৌপদীর সম্মান আর রক্ষিত হল না। মুখ্য ফল অন্তরায়গ্রস্ত হল। তাই এখানে বিমর্ষ সন্ধি হয়েছে বলে মনে হয় কারণ অধিক মাত্রায় নাটকের মুখ্য ফল যেমন প্রকাশিত হয়েছে তেমনভাবে সম্মান রক্ষিত হবে না ভেবে দর্শকের মনে উদ্বেগ উৎপন্ন হয়েছে।

মুখসন্ধি প্রভৃতির মাধ্যমে ক্রমবিস্তৃত বিষয়গুলি যেখানে যথার্থভাবে ফলসিদ্ধিতে উপস্থিত হয় তা নির্বহণসন্ধি। পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে যখন দুর্যোধন আদেশ দেন দ্রৌপদীকে বিবস্ত্র করার জন্য তখন দ্রৌপদী কৃষ্ণকে স্মরণ করতে শুরু করে দেন। অন্যদিকে দুঃশাসন দ্বিগুন উৎসাহে বিবস্ত্র করার চেষ্টা শুরু করেন কিন্তু অপরিমিত বস্ত্র

আসতে শুরু করে ব্যাকুল ও বিষণ্ণ হয়ে যান। সেই সময়েই ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর প্রবেশ ঘটে এবং এই দুষ্কর্ম থেকে বিরত করেন। দ্রৌপদীর মান রক্ষিত হয় যা নাটকের প্রধান লক্ষ্য। তাই এখানে নির্বহণসন্ধি হয়েছে।

নাটকের লক্ষণে বলা হয়েছে সুখ দুঃখ থেকে উদ্ভূত কার্য নানারসে বর্ণিত থাকবে। *দ্রৌপদীমানরক্ষণ* নাটকের বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় পাণ্ডবদের অতুল সম্পদ দেখে দুর্যোধন, শকুনির চঞ্চল হয়ে ওঠা, দ্যূতক্রীড়ায় ছলনা করে তা হরণ করার ইচ্ছা, সুভদ্রা ও কৃষ্ণের কথোপকথন, দ্যূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরের রাজ্যহীন হওয়া, দ্রৌপদীকে পণরূপে রেখে পুনরায় পরাজয়, দ্রৌপদীর অপমান, বস্ত্রহরণের চেষ্টা এবং মানরক্ষণ ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে সুখ দুঃখরূপ নানারস দর্শকবৃন্দ আস্বাদিত হয়েছে।

অঙ্কের সংখ্যা নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলেও বিশ্বনাথ কবিরাজের মতে পাঁচ থেকে দশ অঙ্কের মধ্যে হতে হবে[২৬]। নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় বিরচিত *দ্রৌপদীমানরক্ষণ* নাটকে পাঁচটি করে অঙ্ক দেখতে পাওয়া যায় এবং প্রতিটি অঙ্কে দুটি করে দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়।

নাটকের নায়ক হলেন কৃষ্ণ। কৃষ্ণ প্রখ্যাতবংশজ্ভুত, রাজর্ষি, প্রতাপবান এবং দিব্য গুণযুক্ত। কারণ, কৃষ্ণ বসুদেব ও দেবকীর পুত্র। বসুদেব যদুবংশীয় শূরসেনের পুত্র এবং যদুরাজবংশের রাজা উগ্রসেনের পুত্র কংসের বোন হলেন দেবকী। শোকক্রোধাদিতে অবিকৃতচিত্ত, গম্ভীরপ্রকৃতি, ক্ষমাশীল, আত্মপ্রচারে বিমুখ, স্থির, বিনয়াদি দ্বারা অহঙ্কার গোপনকারী এবং কর্তব্যপালনে দৃঢ়চেতা নায়কই ধীরোদাত্ত পদবাচ্য। তাই আলোচ্য নাটকে কৃষ্ণ ধীরোদাত্ত নায়ক।

দ্রৌপদীমানরক্ষণ নাটকের বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় নাটকটির প্রধান রস করুণ। করুণ রস ছাড়া অঙ্গী রস রূপে শান্ত, বীর প্রভৃতি রস পরিলক্ষিত হয়েছে।

দ্রৌপদীমানরক্ষণ নাটকে দুর্য্যোধন, যুধিষ্ঠির, শকুনি, ধৃতরাষ্ট্র, দ্রৌপদী প্রভৃতি মুখ্যকার্যে সহায়ক চরিত্ররূপে দেখতে পাওয়া যায়। নাটকের বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় নাটকের মূল উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে গোপুচ্ছের ন্যায় নাটকের বন্ধন সাধিত হয়েছে।

নাট্যতত্ত্বানুসারে এই দৃশ্যকাব্যটিকে ‘নাটক’ আখ্যায় ভূষিত করা যেতে পারে। কারণ নাট্যতত্ত্বের প্রেক্ষিতে নাটকের যা যা মুখ্য গুণ তা প্রায় সবই এই দৃশ্যকাব্যে লক্ষ্য করা যায়। যদিও নাট্যতত্ত্বের বাইরেও আধুনিক সংস্কৃত নাটকের কৌশল এখানে গ্রহণ করা হয়েছে তথাপি নাট্যতত্ত্বানুসারে এটিকে ‘নাটক’ বলতে অসুবিধা হয় না।

❖ ৬.২.৭ ভরতবাক্য

দ্রৌপদীমানরক্ষণ নাটকের অন্তিমে ভরতবাক্য হল–

ঈর্ষ্যাবিহীনাঃ পরয়া চ শান্ত্যা
ধর্ম্মেস্থিতাঃ স্বে সততং ধরণ্যাম্।

স্বীয়ে চ কৃত্যে নিরতাঃ সদৈব

তিষ্ঠন্তু সর্ব্বে মনুজাঃ সুখেন।।[২৭]

অর্থাৎ, এই পৃথিবীতে সর্বদা ঈর্ষাবিহীন হয়ে এবং পরম শান্তিপূর্ণভাবে ধর্মে বিরাজ করে, নিজ নিজ কার্যে সদা নিরত থাকুন, যাতে মনুষ্যগণ সর্বদা সুখে বসবাস করেন। ধৃতরাষ্ট্র নাটকের পরিসমাপ্তিতে এই কল্যাণ কামনার দ্বারা রূপকটি শেষ করেছেন।

আলোচ্য নাটকে নাটক বিশ্লেষণের সময়ে এই সমস্যা এসেছে এই যে সভামধ্যে দ্রৌপদী বস্ত্রহরণের মধ্য দিয়ে তাঁর মাণ অপহৃত হয়েছে তা সত্ত্বেও এখানে মাণরক্ষণ নামকরণ কেন করা হয়েছে। এখানে নাট্যকার সামাজিক শিক্ষা হিসাবে এই ঘটনাকে আলোকিত না করে কৃষ্ণের দ্বারা তাঁর মানরক্ষণকে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। তার কারণ সমাজে নারীর অসম্মান কাম্য নয় তাই সেই অবাঞ্ছিত ঘটনাকে কম গুরুত্ব দিয়ে নাট্যকার নারীর সম্মানরক্ষাকে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই এই নাটকের নামকরণের মাধ্যমে নাট্যকারের মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

৬.৩ চরিত্র বিশ্লেষণ

এই নাটকে মুখ্য এবং গৌণ চরিত্র রূপে যেসকল চরিত্রের ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি হল–

নাটকের চরিত্র	**নাটকের অঙ্ক ও দৃশ্য**
দুর্যোধন	প্রথমাঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য, দ্বিতীয়াঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য, তৃতীয়াঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য, পঞ্চমাঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য
শকুনি	প্রথমাঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য, তৃতীয়াঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য
বৈতালিক	দ্বিতীয়াঙ্কে প্রথমদৃশ্য
যুধিষ্ঠির	দ্বিতীয়াঙ্কে প্রথমদৃশ্য, তৃতীয়াঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য
ভীম	দ্বিতীয়াঙ্কে প্রথমদৃশ্য, তৃতীয়াঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য, পঞ্চমাঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য
অর্জুন	দ্বিতীয়াঙ্কে প্রথমদৃশ্য, তৃতীয়াঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য
দৌবারিক	দ্বিতীয়াঙ্কে প্রথমদৃশ্য, তৃতীয়াঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য
দূত	দ্বিতীয়াঙ্কে প্রথমদৃশ্য
ধৃতরাষ্ট্র	দ্বিতীয়াঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য, পঞ্চমাঙ্কে প্রথমদৃশ্য, পঞ্চমাঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য
সত্যভামা	তৃতীয়াঙ্কে প্রথমদৃশ্য, চতুর্থাঙ্কে প্রথমদৃশ্য
কৃষ্ণ	তৃতীয়াঙ্কে প্রথমদৃশ্য, চতুর্থাঙ্কে প্রথমদৃশ্য, পঞ্চমাঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য
দুঃশাসন	তৃতীয়াঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য, চতুর্থাঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য, পঞ্চমাঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য
দ্রৌপদী	চতুর্থাঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য, পঞ্চমাঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য
গান্ধারী	পঞ্চমাঙ্কে প্রথমদৃশ্য, পঞ্চমাঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য

দুর্যোধন – *দ্রৌপদীমানরক্ষণ* নাটকে দুর্যোধনকে প্রথমাঙ্কের দ্বিতীয়দৃশ্যে, দ্বিতীয়াঙ্কের দ্বিতীয়দৃশ্যে, তৃতীয়াঙ্কের দ্বিতীয়দৃশ্যে, পঞ্চমাঙ্কের দ্বিতীয়দৃশ্যে দেখতে পাওয়া যায়। নাটকের শুরুতেই দেখা যায় পাণ্ডবদের অতুল সম্পদ দেখে দুর্যোধনের মন চঞ্চল উঠেছে তা হরণ করার জন্য ব্যাকুল হয়েছেন–

> পাণ্ডবানাং তথা দৃষ্টা সম্পদঞ্চাতুলাং পরাম্।
>
> ব্যাকুলশ্চঞ্চলশ্চাস্মি হন্তুমিচ্ছামি সর্ব্বতঃ।।[২৮]

এখান থেকে তাঁর ঈর্ষা ও লোভ বহিঃপ্রকাশ পেয়েছে। তাছাড়া ভীমের সেই পরিহাসের কথা তিনি স্মরণ করে বলেন–

> স্বচ্ছে চ প্রস্তরে শুভ্রে জলশঙ্কা মমাভবৎ।
>
> জলে প্রস্তরবুদ্ধিশ্চ পরাভ্রান্তিরজায়ত।।[২৯]
>
> এতাদৃশীং মমাবস্থাং দৃষ্ট্বা ভীমোঽহতি দুর্ম্মতিঃ।

উচ্চৈর্হাস্যং চকারাসাবুপহাসায মে তদা।।[৩০]

তস্য হাস্যং তথা দৃষ্ট্বা স্থিতাশ্চান্যে জনাস্তদা।

উপহসন্তি মাং সর্ব্বে নির্দয়াঃ ক্রূরবুদ্ধয়ঃ।।[৩১]

অর্থাৎ, স্বচ্ছ শ্বেতপ্রস্তরে জলের আশঙ্কা হয়েছিল আবার একইভাবে জলেও প্রস্তরবুদ্ধি হওয়ার মতো পরম ভ্রান্তি তৈরী হয়েছিল। এরকম অবস্থা দেখে অতিদুর্মতি ভীম উপহাস করার জন্য উচ্চৈস্বরে অট্টহাস্য করেছিল। তাঁর হাসি দেখে অন্য আরও যেসকল ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত ছিল, সেই নির্দয় ক্রুরবুদ্ধি ব্যক্তিগণও সবাই উপহাস করেছিল। তাই এর প্রতীকারের জন্য আক্রমণ করে হরণ করতে তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এখান থেকে তাঁর প্রতিশোধ ও স্পৃহা প্রকাশ পায়। শকুনি তাঁকে বাধা দিয়ে অক্ষক্রীড়ার দ্বারা পাণ্ডবদের সম্পদ হরণের কথা বলেন। তা শুনে দুর্যোধন আনন্দিত হয়ে ওঠেন এবং যুধিষ্ঠিরের কাছে একজন দূতকে পাঠান দূতক্রীড়ায় আমন্ত্রণের জন্য। তারপর দেখা যায় দুর্যোধন পিতা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে উপস্থিত হয়েছেন। সেখানে গিয়ে পিতাকে জানান পাণ্ডবেরা তাঁর উপর উপহাস করেছেন। সেই অপমানের প্রতিশোধ স্বরূপ যুধিষ্ঠিরের রাজ্য আক্রমণ করতে চান তিনি তা জানান। সাথে শকুনির অভিসন্ধির কথা বলেন। ধৃতরাষ্ট্র দূতক্রীড়ার কথা শুনে সমীচীন মনে করেন না। তা শুনে দুর্যোধন অক্ষক্রীড়া ও যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম এই বলে পিতার অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আশীর্বাদ গ্রহণ করে চলে যান। এখান থেকে পিতার প্রতি তাঁর আনুগত্য থাকলেও নিজের লক্ষ্যে অচল তা প্রকাশ পায়। তৃতীয়াঙ্কে দেখা যায় অক্ষক্রীড়ায় যুধিষ্ঠির রাজ্য হারিয়ে ফেলেছেন। রাজ্য হারানোর পরও দুর্যোধন ও শকুনি আরও খেলার জন্য বলতে থাকেন। পণ রূপে দ্রৌপদীকে রাখার কথাও বলেন। দুর্যোধন তখন বলেন যুদ্ধে বা দ্যূতক্রীড়ায় আমন্ত্রিত ক্ষত্রিয় যদি আমন্ত্রণ রক্ষা না করে তাহলে ক্ষত্রিয়নামধারণ নিষ্ফল–

আমন্ত্রিতো হি যুদ্ধে বা দ্যুতে চ ক্ষত্রিয়ো যদি।

আমন্ত্রণং ন রক্ষেদ্ যঃ স বৃথা ক্ষত্রনামধৃক।।[৩২]

তা শুনে যুধিষ্ঠির খেলায় রাজি হয়ে যান এবং পুনরায় পরাজিত হন। এখান থেকে প্রতিপক্ষকে ছোট করে নিজের অভীষ্ট সিদ্ধির মানসিকতা প্রকাশ পায়। দুর্যোধন আনন্দিত হয়ে পণ গ্রহণ করার জন্য দুঃশাসনকে আদেশ করেন দ্রৌপদীকে পাণ্ডব অন্তঃপুর থেকে এখনই নিয়ে আসার জন্য। দুঃশাসনের আসতে দেরি হলে দুর্যোধন জানতে পারেন মর্যাদা হানীর ভয়ে দ্রৌপদী আসতে চাইছিলেন না। তা শুনে দুঃশাসনকে কেশগুচ্ছ ধারণ করে বলপূর্বক আনার কথা বলেন তিনি। এখান থেকে দুর্যোধনের চরিত্রে আত্মস্বার্থ রক্ষায় কোনরূপ নিচতার আশ্রয় নিতে বাঁধা হয় না এই দিক ফুটে উঠেছে।

দ্রৌপদীকে তিনি বলেন রাগ না করে তাঁর ঊরুতে এসে উপবেশন করতে, তাকে রাজভোগ প্রদান করবেন। কেনই বা ভিক্ষুপত্নী হয়ে থাকবে, পাণ্ডবেরা এখন কৌরবদের দাস।[৩৩] এরূপ আচরণ তাঁর কামাতুর মনকে প্রকাশ করে। এই সময় দুঃশাসন দ্রৌপদীর কাছে গেলে তাকে পদাঘাত করেন। তা দেখে দুর্যোধন রেগে গিয়ে দ্রৌপদীকে বিবস্ত্র করার আদেশ দেন। এটি একই সঙ্গে তাঁর ভ্রাতার প্রতি মর্যাদাবোধ যেমন দেখা যায় সঙ্গে তাঁর চরিত্রে

ক্রোধী, প্রতিহিংসাপরায়ণ রূপটিও ফুটে উঠে। ক্রোধ যে কতটা অসামাজিক করতে পারে তা দুর্যোধনের চরিত্রে স্পষ্ট দেখা যায়।

এই নাটকে প্রথম থেকেই দুর্যোধনকে আত্মস্বার্থ মগ্ন, ঈর্ষাপরায়ণ, ক্রোধী, লোভী ও অসামাজিক রূপেই প্রস্ফুটিত হয়েছে। এই চরিত্রটি থাকার কারণেই নাটকটি অন্তিম পরিণতি অর্থাৎ দ্রৌপদীর মানহরণ পর্যায়ে পৌঁছান সম্ভব হয়েছে।

শকুনি– *দ্রৌপদীমানরক্ষণ* নাটকে শকুনিকে প্রথমাঙ্কের দ্বিতীয়দৃশ্যে এবং তৃতীয়াঙ্কের দ্বিতীয়দৃশ্যে দেখতে পাওয়া যায়। নাটকের শুরুতে পাণ্ডবদের অতুল সম্পদ দেখে দুর্যোধনের হরণ করার ইচ্ছা হলে শকুনি বলেন এটাই স্বাভাবিক, শত্রুর অভ্যুদয় দেখে কোন ব্যক্তি সহ্য করতে পারে না–

> শত্রূণামুদযং দৃষ্ট্বা সোঢুং শক্তো ভৱেজ্জনঃ।
> অচিন্ত্যনীয়মেতদ্ধি সর্ব্বতোঽস্মিন্ ধরাতলে।।[৩৪]

এখান থেকে তাঁর লোভ ও ঈর্ষা প্রকাশিত হয়েছে। দুর্যোধনকে পাণ্ডবরাজ্য আক্রমণ করতে বাধা দেন তিনি। কারণ তিনি বলেন সবেমাত্র যজ্ঞ করেছেন যুধিষ্ঠিরাদি, এখন আক্রমণ করলে সমস্ত বীর পাণ্ডুপক্ষ অবলম্বনই করবে। এখান থেকে তাঁর উপস্থিত বুদ্ধির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তিনি আরও বলেন বল ছল আশ্রয় করতে হয় কার্যসিদ্ধির জন্য। পাশার (অক্ষক্রীড়া) দ্বারা পরাজিত করে পাণ্ডবদের সমস্ত সম্পদ হরণ করার পরিকল্পনা দেন–

> বলাচ্ছলং সমাশ্রেযং কার্য্যসিদ্ধৌ তু কুত্রচিৎ।
> নিশ্চিন্তো ভব বৎস ত্বং যৎকার্য্যং করবাণ্যহম্।।[৩৫]
> দ্যূতেনৈব পরাজিত্য পাণ্ডবানাং হি সম্পদম্।
> সর্ব্বামহং হরিষ্যামি বৎস চিন্তাং পরিত্যজ।।[৩৬]

এমন অভিসন্ধির দ্বারা তাঁর তীক্ষ্ণবুদ্ধি, যথাযথ যুদ্ধনীতি এবং বাস্তববোধের পরিচয় মেলে। অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত হয়ে রাজ্যহীন হয়ে থাকা যুধিষ্ঠিরকে পুনরায় খেলার জন্য পণ স্বরূপ দ্রৌপদীকে রাখার কথা বলেন শকুনি। এখান থেকে নারীর প্রতি অমর্যাদা সুলভ আচরণ প্রত্যক্ষ হয়। পুনরায় তিনি যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করেন তাঁর শঠতার দ্বারা।

আলোচ্য নাটকে শকুনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। বিহ্বল দুর্যোধনকে কেবল মৌখিক আশ্বাস নয় কার্যত সম্পূর্ণভাবে সহায়তা করেছেন। নাটকের প্রথম দিকেই তিনি জানিয়েছেন ছল বল এবং কৌশলেই লক্ষ্য পূরণ করবেন। এখানে ছলনাই তাঁর বল এটা প্রমাণ করেছেন। তাঁর কৌশল যে সুচিন্তিত ছিল তা বেশ বোঝা যায় এবং তাতেই তাঁর বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা অনুভব করা যায়। এই কৌশল অত্যন্ত নিম্নরুচির হলেও লক্ষ্য পূরণের জন্য তাঁকে কোন দ্বিধা করতে দেখা যায় নি।

যুধিষ্ঠির–*দ্রৌপদীমানরক্ষণ* নাটকে যুধিষ্ঠিরকে দ্বিতীয়াঙ্কের প্রথমদৃশ্যে এবং তৃতীয়াঙ্কের দ্বিতীয়দৃশ্যে দেখতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়াঙ্কের প্রথমদৃশ্যে দেখা যায় অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে বলছেন তাঁর কৃপায় ও বলের দ্বারাই সমস্ত রাজাদের

পরাজিত করে আজ কৌরবরাজ্য বলবান। যুধিষ্ঠির একথা শুনে বলেন সমস্ত কাজে যিনি সর্বদা প্রমাণ, তিনি বলদাতা ও মহান সহায়, দয়ার আশ্রয়, সকলজনের পালক, বিশ্বের ধারক তিনি হলেন মুরারি–

সর্ব্বেষু কৃত্যেষু সদা প্রমাণং
বলপ্রদাতা চ মহান্ সহায়ঃ।
দয়াশ্রযঃ সর্ব্বজনপ্রপাতা
বিশ্বস্য ধাতা ভগবান্ মুরারিঃ।।[৩৭]

এখান থেকে কৃষ্ণের প্রতি তাঁর ভক্তি প্রকাশিত হয়। হঠাৎ যুধিষ্ঠিরের বাম চক্ষু স্পন্দিত হয়ে ওঠে। তাঁর মনে হয় অশুভ কিছু ঘটতে চলেছে। মনে যে আশংকা দেখা যায় তার মধ্য দিয়ে প্রচলিত সংস্কারের প্রতি বিশ্বাসের মনোভাব প্রকাশ পায়। ঠিক সেই সময় দৌবারিক প্রবেশ করে বলেন কৌরবেশ্বর দুর্যোধনের বার্তাপ্রেষিত এক দূত আসেছেন। যুধিষ্ঠির ভাবতে থাকেন হঠাৎ এভাবে কেন দূত প্রেরণ করলেন। দূত প্রবেশ করে জানান কৌরবেশ্বর দূতক্রীড়ায় আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। যুধিষ্ঠির বলেন অচিরেই উপস্থিত হয়ে আমন্ত্রণ অবশ্যই রক্ষা করবেন তিনি। দূত চলে গেলে অর্জুন বলেন নিশ্চয়ই কোন অভিসন্ধি আছে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করা সমীচীন ছিল। যুধিষ্ঠির বলেন ক্ষত্রিয়ের কাছে যুদ্ধের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান যেমন ভাবে অধর্ম, ঠিক তেমনি দূতক্রীড়া প্রত্যাখ্যানও–"ক্ষত্রিয়াণাং যথা যুদ্ধাযামন্ত্রণপ্রত্যাখ্যানম্ অধর্ম্মঃ, তথা দ্যূত-ক্রীড়াযামপি।"[৩৮]এখান থেকে যুধিষ্ঠিরের ন্যায় ধর্মজ্ঞ ব্যক্তির রাজধর্মে উল্লিখিত ব্যসনের প্রতি আসক্তি বিসদৃশ মনে হয়। পরে দেখা যায় দ্যূতক্রীড়ায় রাজ্যহীন হয়ে যুধিষ্ঠির মাথা নিচু করে বসে আছেন। দুর্যোধন তাঁকে আরও খেলার জন্য বললে পণ রাখার মতো তাঁর কাছে কিছুই নেই জানান। তা শুনে শকুনি পণরূপে দ্রৌপদীর কথা বলেন। দুর্যোধন তাঁকে নিচু দেখানোর জন্য বলেন যুদ্ধে বা দূতক্রীড়ায় আমন্ত্রিত ক্ষত্রিয় যদি আমন্ত্রণ রক্ষা না করেন তাহলে ক্ষত্রিয়নামধারণই নিষ্ফল। তা শুনে যুধিষ্ঠির পণরূপে দ্রৌপদীকে রেখে খেলার জন্য প্রস্তুত হন। যুধিষ্ঠিরের ন্যায় বিবেচক ব্যক্তির পক্ষে এই আচরণ কোনভাবে সমর্থন যোগ্য নয়। কারণ তিনি তাঁর রাজ্যের রাজা হলেও উপস্থিত ভ্রাতাদের সঙ্গে পরামর্শ না করে রাজ্য পণ রাখা সুবিবেচনার পরিচয় ছিল না। দ্বিতীয়ত দ্রৌপদী তাঁর স্ত্রী হলেও তাঁর সম্পদ নয়। তাছাড়াও দ্রৌপদী তাঁর একার স্ত্রী নয় তাই কোনোভাবে একক সম্পত্তি হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না। এখানে যুধিষ্ঠিরের চরিত্রে বিশেষ দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। মূল *বৈয়াসিক-মহাভারতে*ও এই ভাবে ঘটনা বিন্যস্ত হলেও যুধিষ্ঠিরের পক্ষে এটি একটি সমালোচনা যোগ্য আচরণ। খেলা পুনরায় শুরু হয় এবং পুনরায় যুধিষ্ঠির পরাজিত হয়। তারপর তাঁরই সামনে দ্রৌপদীকে সম্মানহানি এবং পরে বস্ত্রহীন করার চেষ্টা করা হলেও যুধিষ্ঠির চুপ থাকেন কিছু করেন না। এখানেও তাঁর এই আচরণ সমর্থন করা যায় না।

এই নাটকেতে যুধিষ্ঠির একটি দুর্বল চরিত্র রূপে উপস্থিত। ভাইদের সুপরামর্শ গ্রহণ না করা এবং প্রতিপক্ষের ছলনায় বারবার নিজেকে পরাস্ত করা কোন চারিত্রিক দৃঢ়তা প্রকাশ করে না। নাটকের প্রয়োজনেই তাঁকে এমন দুর্বল চরিত্র রূপে দেখা যায়। কারণ তাঁর চরিত্রে এই দুর্বলতা না থাকলে এমন পরিণতি সম্ভব ছিল না।

ধৃতরাষ্ট্র – *দ্রৌপদীমানরক্ষণ* নাটকে ধৃতরাষ্ট্রকে দ্বিতীয়াঙ্কের দ্বিতীয়দৃশ্যে, পঞ্চমাঙ্কের প্রথমদৃশ্যে এবং পঞ্চমাঙ্কের দ্বিতীয়দৃশ্যে দেখতে পাওয়া যায়। দুর্যোধন পিতাকে এসে জানান সম্পদের অহংকারে পাণ্ডবেরা কীভাবে উপহাস করেছেন তাঁকে। তাই তিনি যুধিষ্ঠিরের রাজ্য আক্রমণ করতে চাইছেন। তা শুনে ধৃতরাষ্ট্র বলেন এই মুহূর্তে তা সমীচীন নয়। তখন দ্যূতক্রীড়ার মাধ্যমে রাজ্য অধিকারের কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্র বলতে থাকেন দ্যূতক্রীড়ায় বহু দোষ বর্তমান, যা ব্যসন নামে পরিচিত। তাই দ্যূতক্রীড়ার আশ্রয় নেওয়া সমীচীন না–

> দ্যূতেনৈব পরাজিত্য রাজ্যমধিকরোম্যহম্
>
> ধনাভিমদমেতেষাং চূর্ণযামি হি সর্ব্বতঃ।।[৩৯]

এখান থেকে তাঁর নীতিবোধ সম্পর্কে জ্ঞান প্রকাশিত হয়। দ্যূতক্রীড়া শকুনি খেলবে শুনে ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে বলেন শকুনি ক্রূরবুদ্ধি এবং পাপকর্মে সদা রত। ধর্মহীন কর্ম দ্বারা কোন প্রেয় বস্তু লাভ হয় না। ধর্মপথে যারা থাকে, তাদের কখনও অশুভ কিছু হয় না, ধর্মই পুরুষের পরম বন্ধু।[৪০] দ্যূতক্রীড়ার দ্বারাই রাজা নল কঠিন দুঃখ ভোগ করেছিলেন। দ্যূতক্রীড়ায় বুদ্ধিলোপ হয়। সুতরাং দ্যূতক্রীড়া পরিত্যাগ করাই উচিত।[৪১] ধর্মের দ্বারাই পৃথিবীকে পরিরক্ষণ করা উচিত। ধর্মই শ্রেষ্ট আশ্রয় বলে পরিগণিত হয়। ধর্মযুক্ত ব্যক্তিই মনুষ্যত্ব অর্জন করে, ধর্মহীন ব্যক্তি এই পৃথিবীতে পশুতুল্য হয়ে বাস করে। সুতরাং এগুলি যথাযথ বিবেচনা করে তবেই কার্যসাধন করা উচিত–

> ধর্মেণ পৃথ্বী পরিরক্ষিতা হি
>
> শ্রেষ্ঠাশ্রযো ধর্ম ইহ প্রকীর্ত্তিতঃ।
>
> ধর্মেণ যুক্তা নরতাং প্রযান্তি
>
> ধর্মেণ হীনাঃ পশুবদ্ধরণ্যাম্।।[৪২]

এখান থেকে তাঁর নৈতিকতা এবং পুত্রের মঙ্গলের জন্য ভুল পথে যেতে বাঁধা দেবার মাধ্যমে স্নেহ প্রকাশিত হতে দেখা যায়। সাধারণভাবে ধৃতরাষ্ট্রের চরিত্রের সঙ্গে এই নাটকের নাট্যকারের চিত্রিত ধৃতরাষ্ট্রের চরিত্র একটু ভিন্ন মাত্রায় প্রকাশ পেয়েছে। এই নাটকে ধৃতরাষ্ট্রের মধ্যে ধর্মবোধ যেভাবে জাগরূক তা নাট্যকারের বিশেষত্বের পরিচয় দেয়। পরে দেখা যায় গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন ধূর্ত দুর্যোধন ছলে যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করেছেন অক্ষক্রীড়ায়। ছল বলায় ধৃতরাষ্ট্র বলেন ক্রীড়া বা যুদ্ধে জয় যেমন আছে, পরাজয়ও আছে। কোন একজন জয়লাভ করলে অন্যজন নিশ্চিতভাবে পরাজিত হবেই। এতে কোন সংশয় নেই।[৪৩] গান্ধারী যখন বলেন শকুনির কপটতার দ্বারা পাণ্ডবদের রাজ্য দখল করেছেন এবং পাণ্ডবদের বধূ রজস্বলা একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে রাজসভামধ্যে বলপূর্বক নিয়ে গেছেন। একথা শুনে ধৃতরাষ্ট্র তখনই সেখানে যাবার কথা বলেন এর প্রতিরোধ করার জন্য। এখান থেকে নীতিবিরুদ্ধ কাজে যে তিনি সমর্থন করেন না তা ফুটে উঠেছে। সেখানে উপস্থিত হয়ে তৎক্ষণাৎ দুর্যোধনকে বাঁধা দিয়ে দ্রৌপদীকে নিজভবনে যাবার কথা বলেন। পারিবারিক প্রধান রূপে যে ভূমিকা হওয়া উচিত সেটিই তিনি করে দেখিয়েছেন। সেই সময় কৃষ্ণের প্রবেশ দেখে ধৃতরাষ্ট্র দুষ্ট পুত্রের অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা করেন। পিতারূপে পুত্রের ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়ে তাঁর এই আচরণ একটি অন্যমাত্রা সংযোজন করেছে।

এই নাটকে ধৃতরাষ্ট্র একজন কর্তব্যপরায়ণ, যথাযথ বিবেচক, আদর্শ পারিবারিক রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। নাটকের করুণ পরিণতি তিনি মেনে নিতে পারেন নি যেমন তেমনই পুত্র স্নেহাতুর পিতারূপে নমনীয় হতেও দেখা গিয়েছে। দুর্যোধনকে অসামাজিক নীতিবিরুদ্ধ আচরণ থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছেন। যারফলে নাটকে ধৃতরাষ্ট্রের চরিত্রটি মহনীয় রূপ পেয়েছে।

কৃষ্ণ–*দ্রৌপদীমানরক্ষণ* নাটকে কৃষ্ণকে তৃতীয়াঙ্কের প্রথমদৃশ্যে, চতুর্থাঙ্কের প্রথমদৃশ্যে এবং পঞ্চমাঙ্কের দ্বিতীয়দৃশ্যে দেখতে পাওয়া যায়। আলোচ্য নাটকে কৃষ্ণকে ধীরোদাত্ত নায়ক। কৃষ্ণকে উন্মনা দেখে সত্যভামা কারণ জানতে চাইলে কৃষ্ণ বলেন পাণ্ডবরা রাজ্যহীন হয়ে গেছেন। পাণ্ডবদের ঐশ্বর্য দেখে দুর্যোধন কপটতার দ্বারা দ্যূতক্রীড়ার মাধম্যে রাজ্য দখল করেছেন। সত্যভামা বলেন আপনি সব জেনেও প্রতীকার কেন করছেন না? কৃষ্ণ বলেন আরম্ভের খণ্ডন এই পৃথিবীতে কেউই করতে পারে না। আরম্ভ বিনা কখনই ভোগের সমাপ্তি হয় না।[৪৪] সত্যভামা বলেন প্রিয় আশ্রিতজনের দুঃখবিধান করে কার্যসাধন করতে চান? কৃষ্ণ উত্তরে বলেন পাণ্ডবেরা সকলেই অতি প্রিয়, তেমনি প্রিয় সখী দ্রৌপদীও। তারা সর্বদাই আশ্রিত এবং সর্বতোভাবে শরণাগত হয়ে থাকে।[৪৫] তাদের কল্যাণের জন্যই কখনও কখনও দুঃখ দিয়ে থাকেন। নতুবা এই পৃথিবীতে বিষয়ভোগে রত হয়ে তারা বিস্মৃত হবে কৃষ্ণকে।[৪৬] এই অবস্থায় কিছু করার ক্ষমতা কারও নেই। সমস্ত জগত্ যেমন মহাকালের অধীন, তেমনই দেবতাগণও। সত্যভামা প্রশ্ন করেন তাহলে আপনাকে ভজনা করে কী ফল লাভ হবে? উত্তরে বলেন মহাকালরূপ ধারণ করেই তিনি ত্রিভুবনে নিত্য বিরাজ করেন এবং সর্বদা ভক্তগণকে কালরূপেই রক্ষা করেন।[৪৭] সত্যভামার সঙ্গে কৃষ্ণের এই কথোপকথন থেকে প্রতিভাত হয় যে কৃষ্ণ শরনাগতের প্রতি দয়াশীল হলেও প্রত্যেকের নিজ কৃত কর্মের ফল যে ভোগ করতেই হয় সেটি বোঝাতে নিরাসক্ত ভাব দেখান। সেইসময় কৃষ্ণ জানতে পারেন দ্রৌপদীকে দুঃশাসন বলপূর্বক নিয়ে আসতে যাচ্ছে তা দেখে কৃষ্ণ অস্থির হয়ে পরেন এবং দ্রুত হস্তিনাপুরের উদ্দেশ্যে গমন করেন। অন্তিমে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময় কৃষ্ণ প্রবেশ করেন যদিও নাটকে উল্লেখ নেই তবুও তাঁরই প্রভাবে দ্রৌপদী বস্ত্রহরণ থেকে রক্ষা পায় ধৃতরাষ্ট্রের উক্তি থেকে তা বোঝা যায়। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে দয়াশীল শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃত বিপদে তাঁর শরণাগতের পাশে দাঁড়াতে বাধ্য হন। ধৃতরাষ্ট্র তার দুষ্ট পুত্রের কুকর্মের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চান। কৃষ্ণ তাদের ক্ষমা করে দেন। এখান থেকে তাঁর ক্ষমাশীলতা গুণের প্রকাশ পায়।

এই নাটকে কৃষ্ণ প্রথম থেকে তেমন সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন নি। সত্যভামা বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি সক্রিয় হন নি। কিন্তু একেবারে শেষ পর্যায়ে তাঁর সক্রিয়তায় দ্রৌপদী চূড়ান্ত লাঞ্ছনা থেকে নিবৃত্তি পান। নাটকের প্রয়োজনেই শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রটি এমন নিষ্ক্রিয়তা আরোপ করা হয়েছে। কারণ তিনি সক্রিয় হলে এই নাটকের যে মূল লক্ষ্য দ্রৌপদীর মানহরণ তা সম্ভব হত না। কিন্তু কৃষ্ণের চরিত্রের মাধুর্যকে নষ্ট না করার জন্যই নাট্যকার শ্রীকৃষ্ণই যে দ্রৌপদীর সহায়ক রূপে মঞ্চে এনেছেন। অসীম ক্ষমাশীল শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মহানুভবতায় এতবড় কুকীর্তিকারক দুর্যোধনকে ক্ষমা করতে পারেন।

দ্রৌপদী–যজ্ঞবেদী সমুত্থিতা, পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের কন্যা এবং পাণ্ডবগণের মহিষী[৪৮]। দ্রোণবধার্থে যজ্ঞসেন পুত্রলাভের জন্য যে যজ্ঞ করেছিলেন সেই যজ্ঞের অনল থেকে প্রথমে ধৃষ্টদ্যুম্নের উৎপত্তি হয়, পরে সেই যজ্ঞাগ্নি থেকে এক কুমারীর আবির্ভাব হয়। তাঁর আবির্ভাবের মুহূর্তে দৈববাণী হয় যে, নারীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা এই কৃষ্ণা ক্ষত্রিয়গণকে ধ্বংস করার জন্য আবির্ভাব হয়েছেন[৪৯]। *দ্রৌপদীমানরক্ষণ* নাটকে দ্রৌপদীকে নায়িকা বলা যায়। বিশ্বনাথ-কবিরাজ *সাহিত্যদর্পণে* নায়িকার ভেদ প্রসঙ্গে বলেছেন–"অথ নায়িকা ত্রিবিধা স্বাঽন্যা সাধারণী স্ত্রীতি"[৫০] অর্থাৎ স্বীয়া, পরকীয়া ও সাধারণী স্ত্রী। দ্রৌপদীকে স্বীয়া নায়িকা বলা যায়। স্বীয়া নায়িকার লক্ষণে বলা হয়েছে "বিনয়ার্জ্জবাদিযুক্তা, গৃহকর্ম্মপরা পতিব্রতা স্বীয়া।"[৫১] স্বীয়া নায়িকা আবার ত্রিবিধ মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্ভা–"সাপি কথিতা ত্রিভেদা, মুগ্ধা মধ্যা পেগল্ভেতি।"[৫২] এর মধ্যে দ্রৌপদী মধ্যা শ্রেণীর মধ্যে পড়ছে। মধ্যার লক্ষণে বলা হয়েছে–

মধ্যা বিচিত্রসুরতা প্ররূঢ়স্মরযৌবনা।
ঈষৎ প্রগলভবচনা মধ্যমব্রীড়িতা মতা।।[৫৩]

দ্রৌপদীমানরক্ষণ নাটকে দ্রৌপদীকে চতুর্থাঙ্কের দ্বিতীয়দৃশ্যে এবং পঞ্চমাঙ্কের দ্বিতীয়দৃশ্যে দেখতে পাওয়া যায়। দ্যূতক্রীড়ায় পণরূপে দ্রৌপদীকে যখন যুধিষ্ঠির হারায় তখন দুর্যোধন দুঃশাসনকে বলেন পাণ্ডব অন্তঃপুরে গিয়ে দ্রৌপদীকে নিয়ে আসার জন্য। দুঃশাসন কথামত অন্তঃপুরে প্রবেশ করে দ্রৌপদীকে জানান দুর্যোধন তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তা দেখে দ্রৌপদী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং তাকে তখনই অন্তঃপুর থেকে বেড়িয়ে যাবার জন্য বলেন। দুঃশাসন জানান দ্যূতক্রীড়ায় পাণ্ডবরা রাজ্যহীন হয়েছেন এখন সবই কৌরবদের। তাই শীঘ্রই দুর্যোধনের সম্মুখে যাবার কথা বলেন। দ্রৌপদী বলেন কুকুর কি কখনও গব্যঘৃত খেতে সমর্থ হয়? অথবা শৃগাল কি কখনও সিংহীর দেহ স্পর্শ করতে পারে? এই বলে শীঘ্রই চলে যাওয়ার কথা বলেন – "কুক্কুরঃ কিং গব্যং ঘৃতং খাদিতুমর্হতি? অথবা জম্বুকঃ কিং সিংহীদেহং স্প্রষ্টুং সমর্থো ভবতি?"[৫৪] এখান থেকে তাঁর চরিত্রে তেজস্বিনী মনোভাব প্রকাশ পায়। সাথে প্রশ্ন করেন তিনি রজস্বলা, তাও আবার একবস্ত্রে আছেন তাই সভায় নিয়ে যেতে পারেন না তাঁকে। দ্রৌপদীর চরিত্রে এখানে আত্মমর্যাদাসুলভ সচেতনতা, স্বামীদের প্রতি অটল আস্থা, দুবৃত্তের প্রতি চরম ক্রোধ প্রভৃতি গুণ প্রকাশ পায়। পঞ্চপুরুষের পত্নী নিয়ে দুঃশাসনের উপহাস শুনে দ্রৌপদী জানায় মাতৃভক্ত পাণ্ডবেরা শাস্ত্রানুসারেই বিধিসম্মতভাবেই তাঁকে বিবাহ করেছেন–

আদেশেন জনন্যা হি মাতৃভক্তাস্তু পাণ্ডবাঃ।
যথাবিধিবিবাহং তে কৃতবন্তশ্চ শাস্ত্রতঃ।।[৫৫]

এই উক্তির মধ্য দিয়ে দ্রৌপদীর শাস্ত্রের প্রতি, মাতা কুন্তীর প্রতি ও পঞ্চ স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ও নির্ভরশীলতা প্রকাশিত হয়েছে। দুঃশাসন এই সময় তাঁকে বলপূর্বক ধরে নিয়ে যেতে থাকলে দ্রৌপদী কৃষ্ণকে স্মরণ করে রক্ষা করার জন্য অনুগ্রহ করতে থাকেন। এখান থেকে তাঁর অসহায়তা সাথে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। পরে দেখা যায় রাজসভায় বলপূর্বক দ্রৌপদীকে নিয়ে দুঃশাসনের প্রবে। দ্রৌপদী প্রবেশ করেই প্রতিজ্ঞা করেন যতদিন না এই দুঃশাসন নামক পশুর বক্ষো রক্তে কেশ রঞ্জিত হয়, ততদিন তিনি বেণীবন্ধন

করবেন না–'দুঃশাসনপশো বক্ষোরক্তেন মম কেশা রঞ্জিতা ন ভবেযুস্তাবদ্ নাহং বেণীং বধ্নামি।'[৫৬] এখান থেকে নারীসুলভ আত্মমর্যাদা ও প্রতিহিংসা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর চরিত্রে। দুর্যোধন তাঁকে ঊরুতে এসে বসতে বলেন ভিক্ষুপত্নী হয়ে না থেকে। দ্রৌপদী উত্তরে বলেন পতিগণ থাকতে কেনই বা তিনি পশুর কাছে অনাথ হতে যাবেন? এই পৃথিবীর ধর্ম কেউ কখনোই লুপ্ত করতে পারে না–

স্থিতেষু নাথেষু কথং নু তাবৎ
দনাথতাং যামি পশোঃ সমীপে।
কথং নু কশ্চিৎ কুরুতে ন কিঞ্চিৎ
ধর্মো নু লুপ্তঃ সহসা ধরণ্যাঃ।।[৫৭]

এখান থেকে চরম বিপদেও ধর্মের প্রতি তাঁর অটুট আস্থা প্রকাশ পায়। দুঃশাসন তাঁকে ধরতে এলে তিনি পদাঘাত করেন। তা দেখে দুর্যোধন আদেশ দেন বস্ত্রহরণের।

দ্রৌপদীর চরিত্রটি নাটকে একটি মিশ্র চরিত্রের অবতারণা করে। একাধারে তেজস্বিনী আবার অন্যদিকে অনাথা রূপেও দেখা দিয়েছে। পঞ্চস্বামীর উপর পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্তা থাকা সত্ত্বেও তিনি চরম লাঞ্ছনায় শোকে ভেঙে পড়েন। স্বামীদের উপস্থিতি থাকা সত্বেও তিনি শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হতে বাধ্য হন কিন্তু নিজের মর্যাদাকে কোন প্রলোভনের কাছে সমর্পণ করেন নি।

দুঃশাসন–ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর দ্বিতীয় পুত্র হল দুঃশাসন[৫৮]। কিন্তু দাসীর গর্ভে জাত যুযুৎসুকে গণনা করলে দুঃশাসন ধৃতরাষ্ট্রের তৃতীয় পুত্র। দুর্যোধনের অতিপ্রিয় পাত্র ইনি। জ্যেষ্ঠভ্রাতার সহচররূপে থাকার জন্য তাঁর মধ্যে দুর্যোধনের সমস্ত দোষের প্রভাব পড়েছে। আলোচ্য নাটকে দুঃশাসন তৃতীয়াঙ্কের দ্বিতীয়দৃশ্যে, চতুর্থাঙ্কের দ্বিতীয়দৃশ্যে ও পঞ্চমাঙ্কের দ্বিতীয়দৃশ্যে দেখতে পাওয়া যায়। তৃতীয়াঙ্কের দ্বিতীয়দৃশ্যে অক্ষক্রীড়ায় যুধিষ্ঠির পণ রূপে দ্রৌপদীকে হেরে যাওয়ায় পর দূঃশাসনকে পান্ডবদের অন্তঃপুরে গিয়ে দ্রৌপদীকে সভায় নিয়ে আসার জন্য আদেশ দেন। দুঃশাসন সেই কথা মত পাণ্ডবদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন। এখান থেকে বোঝা যায় যে দুঃশাসন অনুগত ভ্রাতা। চতুর্থাঙ্কের দ্বিতীয়দৃশ্যে দেখা যায় দুঃশাসন মহিলাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে দ্রৌপদীকে সভায় আসার জন্য বলছেন। দ্রৌপদীকে ক্রুদ্ধ হতে দেখে দুঃশাসন জানায় পাণ্ডবদের শাসনে আর কিছু নেই অক্ষক্রীড়ায় পাণ্ডবরা সবকিছু হারিয়েছেন। এখন তারা কৌরবেশ্বরের দাসমাত্র–"দ্যূতপণেন সর্ব্বং বিনষ্টং পাণ্ডবানাম্। অদ্য তে কৌরবেশ্বরস্য দাসাঃ।"[৫৯] এখান থেকে তাঁর অহংকার ও কাণ্ডজ্ঞানহীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। দ্রৌপদী রজস্বলা, একবস্ত্রে আছেন একথা শুনেও দুঃশাসন নীচতা করতে পিছু পা হন নি। দ্রৌপদী সভায় যেতে না চাইলে তাঁকে বলপূর্বক সভায় নিয়ে যান দুঃশাসন। এখানে দ্রৌপদীর প্রতি অসহনশীলতা সাধারণভাবে নারীর প্রতি অমর্যাদা সুলভ আচরণ এবং অশালীনতাই প্রকাশ করে। অন্তিম দৃশ্যে দেখা যায় দুঃশাসন বলপূর্বক কেশগুচ্ছ

ধরে দ্রৌপদীকে সভায় নিয়ে এসেছেন। দুর্যোধনের আদেশ না মানায় দুঃশাসন কাছে গেলে পদাঘাত করেন দ্রৌপদী। তা দেখে দুর্যোধনের আদেশে বিবস্ত্র করার চেষ্টা করেন দ্রৌপদীকে কিন্তু অপরিমিত বস্ত্র আসতে থাকলে ব্যাকুল বিষন্ন হয়ে পরেন তিনি। এই নাটকে দুঃশাসনের এই আচরণ প্রতিপক্ষে থাকলেও পরোক্ষে নাটকের মূল লক্ষ্য পূরণে সহয়তা করেছে। কারণ দুঃশাসন যদি শালীনতার সীমা না ছাড়াতেন তাহলে নাটকের পরিসমাপ্তি এভাবে নাও ঘটতে পারত।

এই নাটকে দুঃশাসনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ দুর্যোধনের পাশে এই ভাবে সক্রিয় না থাকলে দ্রৌপদীর মানহরণ হয়ত এইভাবে করা যেত না। কেবল জ্যেষ্ঠভ্রাতার আদেশ পালনের জন্য তিনি যে আচরণ করেছেন তা ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর চরিত্রে কলঙ্কিত করলেও নাটকের প্রয়োজনে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে দ্রৌপদীর প্রতি তাঁর যে আচরণ তা সামাজিক হিসাবে মেনে নেওয়া যায় না কিন্তু তিনি ব্যক্তিগত ভাবে যে খুব কামাতুর ছিলেন তা প্রকাশ পায় নি।

৬.৪ আলঙ্কারিক বিচার

নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়কৃত *দ্রৌপদীমানরক্ষণ* নাটকের আলঙ্কারিক বিচারে অলঙ্কার, রস, ছন্দ, গুণ ও রীতির ব্যবহার এখানে আলোচিত হয়েছে।

❖ ৬.৪.০ অলঙ্কার বিচার

স্বভাবোক্তি অলঙ্কারের প্রয়োগ–

সাহিত্যদর্পণে স্বভাবোক্তি অলঙ্কারের লক্ষণ বিষয়ে বলা হয়েছে–"স্বভাবোক্তি র্দুরুহার্থস্বক্রিয়ারূপবর্ণনম্।"[৬০] এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে "দুরূহযোঃ কবিমাত্রবেদ্যযোঃ, অর্থস্য ডিম্বাদেঃ, স্বয়োস্তদেকাশ্রযযোশ্চেষ্টাস্বরূপযোঃ।"[৬১] পদার্থের যথাযথ সূক্ষ্ম ও হৃদয়গ্রাহী বর্ণনাই স্বভাবোক্তি অলঙ্কার। অর্থাৎ বস্তুস্বভাবের সেই বর্ণনাই স্বভাবোক্তি অলঙ্কার সৃষ্টি করে যে বস্তুস্বভাবে স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন সাধারণ ব্যক্তির দুরধিগম্য কিন্তু রসিকজনের জ্ঞেয়। নিত্যানন্দ-মুখোপাধ্যায়কৃত *দ্রৌপদীমানরক্ষণ* নামক নাটকের দ্বিতীয়াঙ্কের প্রথমদৃশ্যে দেখা যায়–

জয়তি জয়তি রাজা ধার্মিকঃ শুদ্ধবুদ্ধিঃ
নিখিল গুণনিবাসঃ পাণ্ডবঃ সত্যমূর্তিঃ।
জনগণপরিপালে সর্ব্বদা মগ্নচেতাঃ
বিহিতকৃতিরতোঽসৌ দানশীলো মহাত্মা।।[৬২]

অর্থাৎ, ধার্মিক মহারাজ, পবিত্রচেতা, সমস্তগুণের আধারস্বরূপ, মূর্ত্তিমান্ সত্যধর্ম, প্রজাপালনে সর্বদা সজাগ, কল্যাণ কর্মসমূহে সদা নিরত দানশীল মহাত্মা জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবের জয় হোক। উক্ত শ্লোকে বৈতালিক কর্তৃক যুধিষ্ঠিরের যে বর্ণনা করা হয়েছে তাতে যে কয়টি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে তার সব কয়টিই যুধিষ্ঠিরের চরিত্রে বর্তমান। সুন্দরভাবে এই গুণ বর্ণিত হওয়ায় এখানে স্বভাবোক্তি অলঙ্কার হয়েছে বলা যায়।

উপমা অলঙ্কারের প্রয়োগ–

বহ্নিতাপং বিনা হেম্নঃ শুদ্ধিঃ কিন্নু প্রজায়তে।
বিনা শোকেন দুঃখেন চিত্তশুদ্ধিঃ কথং ভবেৎ।।[৬৩]

অর্থাৎ, বহ্নি ব্যতীত স্বর্ণের বিশুদ্ধি আর কীভাবে হতে পারে প্রিয়ে। শোক এবং দুঃখব্যতীত চিত্তের শুদ্ধতা কীভাবে সম্ভব। উপমা অলঙ্কারের লক্ষণে বলা হয়েছে–"সাম্যং বাচ্যমবৈধর্ম্যং বাক্যৈক্য উপমা দ্বয়োঃ।"[৬৪] *সাহিত্যদর্পণ*কার বিশ্বনাথের এই লক্ষণকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, একটিমাত্র বাক্যে দুইটি পদার্থের অর্থাৎ উপমান ও উপমের বৈধর্ম্যরহিত সাম্যই উপমা। 'একটি বাক্যে' না হলে উপমা হয় না একথাই বলা হয় সাধারণভাবে কিন্তু পরস্পর সাকাঙ্ক্ষ একাধিক বাক্য মিলিতভাবে একটি ভাবের প্রকাশক হলে সেক্ষেত্রে একবাক্যরূপেই গ্রহণ করা হয়।

আলোচ্য নাটকের এই শ্লোকে দুইটি বাক্যে যে সাম্য স্থাপিত হয়েছে সেখানে সাধারণধর্ম ‘শুদ্ধি হেম্ন’ অর্থাৎ সোনা এবং চিত্ত উপমেয়, বহ্নিতাপ ও শোক উপমান রূপে বর্ণিত হয়েছে। এখানে উপমান, উপমেয় ও সাধারণধর্ম উল্লিখিত হলেও সাদৃশ্যবাচক পদের উল্লেখ না থাকায় পূর্ণোপমা হয় নি।

এই অলঙ্কারটি এই নাটকে দ্রৌপদীর শুদ্ধ চরিত্রের দিকে ইঙ্গিত স্থাপন করেছে। ক্রোধ, শোক ও লোভ তাঁর চরিত্রের শুদ্ধতাকে নষ্ট করতে পারে নি। এই অলঙ্কার যে পারস্পরিক তুলনা স্থাপিত হয়েছে তাতে নাটকটি একটি বিশেষ সুষমা লাভ করেছে।

শ্লেষ অলঙ্কারের প্রয়োগ–

“শব্দৈঃ স্বভাবাদেকার্থৈঃ শ্লেষোঽনেকার্থবাচনম্”[৬৫] *সাহিত্যদর্পণ*কার বিশ্বনাথ এই লক্ষণের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন একার্থবাচক শব্দের প্রয়োগে অভিধা ও লক্ষণার দ্বারা অনেকার্থ প্রকাশিত হলে শ্লেষ অলঙ্কার হয়ে থাকে। নিত্যানন্দ-মুখোপাধ্যায় বিরচিত *দ্রৌপদীমানরক্ষণ* নাটকের চতুর্থাঙ্কের দ্বিতীয়দৃশ্যে দেখা যায়–

> কো বা সিংহঃ শিবাঃ কা বা সভায়াং গমনে খলু।
> জানীয়া দর্শনেনৈব বৃথাবাক্কথনেন কিম্।।[৬৬]

অর্থাৎ, কে সিংহ আর কে শৃগাল সেটা সভাতে গিয়েই দেখে নেবে। দেখেই সেটা জানবে, বৃথা বাক্যব্যয়ে কাজ কী। আলোচ্য নাটকের উক্ত শ্লোকে শ্লেষ অলঙ্কারের প্রয়োগ দেখা যায়। ‘সিংহ’ ‘শিবা’ পদগুলির ব্যঞ্জনা উপলব্ধি করলে শ্লেষ অলঙ্কার হয়েছে তা স্পষ্ট হয়।

এই শ্লেষ অলঙ্কারের দ্বারা প্রতিপক্ষ যতই প্রবল হোক পাণ্ডবপক্ষের কাছে তাঁরা যে দুর্বল তা জ্ঞাপিত হয়েছে। কারণ পাণ্ডবপক্ষের প্রধান শক্তি শ্রীকৃষ্ণ। শ্লেষ অলঙ্কারটি নাটকের দ্বন্দ্বকে বুঝতে সাহায্য করে। দ্রৌপদীর চারিত্রিক দৃঢ়তা প্রকাশিত হয়েছে।

কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কারের প্রয়োগ–

কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কারের লক্ষণ করতে গিয়ে বিশ্বনাথ-কবিরাজ বলেছেন – “হেতোর্বাক্যপদার্থত্বে কাব্যলিঙ্গং নিগদ্যতে।”[৬৭] অর্থাৎ, কোন বাক্যার্থ অথবা কোন পদার্থ ব্যঞ্জনাবশত কোন বিষয়ের হেতুরূপে প্রতীয়মান হলে, তাকে কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার বলে। আলোচ্য নাটকের পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা যায়–

> স্থিতেষু নাথেষু কথং নু তাবতৎ
> দনাথতাং যামি পশোঃ সমীপে।
> কথং নু কশ্চিৎ কুরুতে ন কিঞ্চিৎ
> ধর্মো নু লুপ্তঃ সহসা ধরণ্যাঃ।।[৬৮]

অর্থাৎ, পতিগণ থাকতে কেনই বা আমি পশুর কাছে অনাথ হতে যাব? এই পৃথিবীর ধর্ম কেউ কখনোই লুপ্ত করতে পারে না। এখানে কৃষ্ণের উপস্থিতি সত্ত্বেও ব্যঞ্জনার দ্বারা তাঁর নিষ্ক্রিয়তাকে উল্লেখ করে অনাথ হওয়ার কারণরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। সেই কারণে এখানে কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার হয়েছে।

কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কারের ব্যবহারের ফলে মূল শক্তির নিয়ন্ত্রক শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত কার্যেরই সাধক তা জানা যায়। এই অলঙ্কারটি স্বার্থক ব্যবহারের দ্বারা একটি অন্য মাত্রা লাভ করেছে।

বিষম অলঙ্কারের প্রয়োগ–

*সাহিত্যদর্পণ*কার বিশ্বনাথ দশম পরিচ্ছেদে বিষম অলঙ্কারের লক্ষণ করতে গিয়ে বলেছেন–

গুণৈ ক্রিয়ে বা যেত্ স্যাতাং বিরুদ্ধে হেতুকার্য্যয়োঃ।
যদ্বারব্ধস্য বৈফল্যমনর্থস্য চ সম্ভবঃ।।
বিরূপযোঃ সঙ্ঘটনা যা চ তদ্বিষমং মতম্।।[৬৯]

অর্থাৎ, কারণের গুণ হতে কার্যের গুণ অথবা কারণের ক্রিয়া হতে কার্যের ক্রিয়া অন্য জাতীয় হলে অথবা কোনও আরব্ধ কর্ম অভীষ্ট ফল উৎপাদন না করে অনিষ্ট ফল উৎপাদন করলে অথবা পরস্পর বিরুদ্ধে পদার্থ দুটির এক অধিকরণে মিলন হলে, তাকে বিষম অলঙ্কার বলা হয়। *দ্রৌপদীমানরক্ষণ* নাটকের প্রথমাঙ্কের দ্বিতীয়দৃশ্যে দেখা যায়–

বলেন হীনাঃ কিমু দুর্বলা বয়ম্
ন সাহসং কিং ময়ি বর্ত্ততে ননু।
ভয়েন ভীতো ন চ পাণ্ডুপুত্রতঃ
সদা সমর্থোঽস্মি ধরাজয়ে পুন।।[৭০]

অর্থাৎ, আমাদের কি শক্তি নেই? আমরা কি দুর্বল? নাকি আমার মধ্যে সাহস নেই? তাছাড়া পাণ্ডুপুত্রের ভয়ে ভীতও নই আমি। পৃথিবীজয় করতেও আমি সদা সমর্থ। ‘বিষম’ অলঙ্কারের এই লক্ষণ দেখলে মনে হয় আলোচ্য নাটকের উক্ত শ্লোকটি বিষম অলঙ্কার হয়েছে। কারণ এখানে দুর্যোধনের ভীতি রূপ কার্যের প্রতি পাণ্ডুপুত্রের ভীতি কারণ হলেও তার বৈষম্য ঘটিয়ে ধরাজয়ে সমর্থ এইরূপ বিপরীত কার্যকে সূচনা করা হয়েছে।

বিষম অলঙ্কারের ব্যবহার এই নাটকে দুর্যোধনের চরিত্র বুঝতে সাহায্য করে এবং এই নাটকটি যেভাবে অগ্রসর হয়েছে তাতে এই অলঙ্কারটির একটি বিশেষ ভূমিকা আছে।

❖ ৬.৪.১ রস বিচার

রস্ ধাতু থেকে রস শব্দের নিষ্পত্তি হয়েছে, যার অর্থ আস্বাদন করা। সহৃদয় চিত্তে আস্বাদ্যমানতার কারণেই এমন নামকরণ হয়েছে। বিশ্বনাথ-কবিরাজের মতে সত্ত্বগুণের উদ্রেক হেতু এই রস অখণ্ড, স্বপ্রকাশক, আনন্দচিন্ময়, জ্ঞেয় বিষয়ের স্পর্শলেশশূন্য ও ব্রহ্মাস্বাদতুল্য–

সত্ত্বোদ্রেকাদখণ্ডস্বপ্রকাশানন্দচিন্ময়ঃ।

বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্যো ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ।

লোকোত্তরচমৎকার-প্রাণঃ কৈশ্চিৎ প্রমাতৃভিঃ।

স্বাকারবদভিন্নত্বেনায়মাস্বাদ্যতে রসঃ।।[৭১]

দ্রৌপদীমানরক্ষণ নাটকের অঙ্গীরস করুণ। কিন্তু *সাহিত্যদর্পণের* ষষ্ঠপরিচ্ছেদে নাটকের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বিশ্বনাথ-কবিরাজ বলেছেন–"এক এব ভবেদঙ্গী শৃঙ্গারো বীর এব বা।"[৭২]

অর্থাৎ, নাটকের প্রধান বা অঙ্গীরস রূপে শৃঙ্গার বীর অথবা শান্ত রস হবে। কিন্তু *দ্রৌপদীমানরক্ষণ* নাটকে অঙ্গীরস করুণ হয়েছে। রসমাত্রই আনন্দদায়ক হলে করুণরসের কীভাবে রসত্ব সম্ভব? *সাহিত্যদর্পণে* এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে

করুণদাবপি রসে জায়তে যৎ পরং সুখম্।

সচেতসামনুভবঃ প্রমাণং তত্র কেবলম্।।[৭৩]

একমাত্র সহৃদয়ের পক্ষেই করুণাদি রস থেকে পরম সুখ উপলব্ধি করা সম্ভব। করুণ রসের স্থায়ীভাব শোক। আলোচ্য নাটকের শেষে দ্রৌপদীকে বলপূর্বক সভায় নিয়ে আসা এবং বস্ত্রহরণের চেষ্টার দ্বারা করুণ রস দ্যোতিত হয়েছে। *নাট্যশাস্ত্রে* করুণরস প্রসঙ্গে বলা হয়েছে–

অথ করুণো নাম শোকস্থায়িভাবপ্রভবঃ।[৭৪]

করুণরসের বিভাব হল শাপগ্রস্থ প্রিয়জন, প্রিয়বিয়োগ, মৃত্যু বা মৃত্যুসংবাদ, বন্ধন(বন্দী), বিদ্রব, রোদন, প্রলাপ ইত্যাদি। *নাট্যশাস্ত্রে* করুণরস প্রসঙ্গে বৃত্তিতে ব্যসনের কথা বলা হয়েছ – "স চ শাপক্লেশ-বিনিপাতেষ্টজনবিপ্রয়োগবিভবনাশবধবন্ধবিদ্রবোপঘাতব্যসনসংযোগদিভির্বিভাবৈঃ সমুপজায়তে।"[৭৫] এই ব্যসন দ্বিবিধ–কামজ ও ক্রোধজ। কামজ ব্যসন দশপ্রকার–মৃগয়া, অক্ষক্রীড়া, দিবানিদ্রা, পরিবাদ, স্ত্রীসংসর্গ, মদ, নৃত্য, গীত, বাদ্য ও বৃথা ভ্রমণ[৭৬]। অন্যদিকে ক্রোধজ ব্যসন আটপ্রকার–পৈশূন্য, সাহস, দ্রোহ, ঈর্ষা, অসুয়া, অর্থদূষণ, বাকপারুষ্য ও দণ্ডপারুষ্য[৭৭]। করুণরসের অনুভাব হল অশ্রুপাত, তিরস্কার, বৈবর্ণ্য, স্মৃতিলোপ ইত্যাদি। নির্বেদ, চিন্তা, ঔৎসুক্য, আবেগ, ভ্রম, মোহ, শ্রম, ভয়, গ্লানি, উচ্ছ্বাস, ত্রাস, আলস্য, বিষাদ প্রভৃতি হল করুণরসের ব্যভিচারীভাব। করুণা বা দয়া করে যম পাপকে সংযত করে বলেই করুরসের দেবতা যম। বর্ণ কপোত অর্থাৎ অনুজ্বল ধূসর। করুণ রসের লক্ষণ প্রসঙ্গে *নাট্যশাস্ত্রে* বলা হয়েছে–

ইষ্টবধদর্শনাদ্বা বিপ্রিয়বচনস্য সংশ্রবাদ্বাপি।

এভির্ভাববিশেষৈঃ করুণরসো নাম সংভবতি।।

সস্বনরুদিতৈর্মোহাগমৈশ্চ পরিদেবিতৈর্বিলোপিতৈশ্চ।

অভিনেয়ঃ করুণরসো দেহায়াসাভিঘাতৈশ্চ।।[৭৮]

দ্রৌপদীমানরক্ষণ নাটকে কৌরবদের অতুল সম্পদ দেখে দুর্যোধনের ঈর্ষা, ভীমাদির অপমান এখানে বিভাব। সম্পদ হরণের জন্য শকুনির সাথে পরিকল্পনা, অক্ষক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরকে আমন্ত্রণ, যুধিষ্ঠিরের পরাজয়, দুর্যোধন ও শকুনির তিরস্কার, দ্রৌপদীকে পণরূপে রেখে পুনরায় পরাজয় প্রভৃতি এখানে অনুভাব। পরাজয়ের পর দ্রৌপদীকে বলপূর্বক সভায় নিয়ে এসে বস্ত্রহরণের চেষ্টা, দ্রৌপদী ভয়ে কৃষ্ণকে স্মরণ প্রভৃতি ব্যভিচারীভাব। এই ত্রিবিধ ভাবের সঙ্গে শোকের সংযোগের ফলে করুণরস অভিব্যঞ্জিত হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে উদ্ধৃত নাটকের শ্লোক নিম্নে উল্লেখ করা হল–

পাণ্ডবানাং তথা দৃষ্ট্বা সম্পদঞ্চাতুলাং পরাম্।
ব্যাকুলশ্চঞ্চলশ্চাস্মি হন্তুমিচ্ছামি সর্ব্বত।।[৭৯]
দ্যূতেনৈব পরাজিত্য পাণ্ডবানাং হি সম্পদম্।
সর্ব্বামহং হরিষ্যামি বৎস চিন্তাং পরিত্যজ।।[৮০]

আলোচ্য নাটকের শকুনির ছলনায় অক্ষক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরের পরাজয় থেকে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা পর্যন্ত করুণ সুরই বাজতে থাকে। তাই এটি অঙ্গীরস। নাটকের নামকরণেই করুণ রসের অনুভূতি জ্ঞাপিত হয়।

করুণরস ব্যতীত আলোচ্য নাটকে অঙ্গরস রূপে বীর, শান্ত, অদ্ভুত রসের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বলপূর্বক দ্রৌপদীকে সভায় এনে অপমান দেখে ভীমের কথোপকথনে বীররস পরিলক্ষিত হয়। বীর রসের উদাহরণ যথা–

ধর্ম্মো ন লুপ্তো ন চ নাথহীনা
হ্যপেক্ষণীযঃ সময়ঃ সদৈব।
অপেক্ষতাং তেন স এব কালঃ
দুষ্টস্য পাশাদ্ ভবিতা হি মুক্তিঃ।।[৮২]
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ দেবৌ প্রত্যক্ষৌ সাক্ষিণৌ ময়া
প্রতিজ্ঞা ক্রিয়তে চাদ্য দুর্য্যোধনোরুভঞ্জনম্।।[৮৩]

অর্থাৎ, ধর্ম লুপ্ত হয়ে যায়নি, আমরাও অনাথ হয়ে যায়নি, কিন্তু সঠিক সময়ের জন্য সর্বদাই একটু অপেক্ষা করতে হয়। সেই সময় উপস্থিত হলে এই দুষ্টের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ হবে। সূর্যদেব এবং চন্দ্রদেবকে আমি প্রত্যক্ষভাবে সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা করছি যে, দুর্যোধনের ঊরু আমিই ভঙ্গ করব। সত্যভামার সাথে কৃষ্ণের কথোপকথনে শান্তরস ও বস্ত্রহরণের সময় অপরিমিত বস্ত্র আসতে থাকলে অদ্ভুত রস লক্ষ্যিত হয়েছে।

নাটকের অঙ্গীরস করুণরসের সুরকে সুরায়িত করতে বীর, শান্ত ও অদ্ভুত রস যেন অনুষঙ্গ রূপেই উপস্থিত হয়েছে। একটি সঙ্গীত যেমন যন্ত্রাণুষঙ্গ ছাড়া সুগীত হয় না, তেমনই এই নাটকে অঙ্গ রসের অনুষঙ্গ ছাড়া অঙ্গীরস সুচারু রূপে অনুভূত হয় না।

❖ ৬.৪.২ ছন্দ বিচার

নাটকটিতে ৭৭টি শ্লোক দেখতে পাওয়া যায়। নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় বিরচিত *দ্রৌপদীমানরক্ষণ* নাটকে অন্যান্য ছন্দের প্রয়োগ থাকলেও অনুষ্টুভ্ ছন্দের বাহুল্য দেখা গিয়েছে। নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় বিরচিত *দ্রৌপদীমানরক্ষণ* নাটকে যেসকল ছন্দের প্রয়োগ করেছেন সেগুলি হল- মালিনী, অনুষ্টুভ, বংশস্থবিল, ইন্দ্রবজ্রা, উপজাতি, উপেন্দ্রবজ্রা। মালিনী ছন্দের উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেছেন–

> নবজলধরকান্তিঃ পীতবাসা বরেণ্যঃ
> সকলভুবনপাতা চক্রহস্তঃ সুবেষঃ।
> শরণগতজনানামাশ্রয়ো যঃ কৃপালু
> র্পনয়তু স দুঃখং সর্ব্বতো বো মুরারিঃ।।[৮৪]

আবার কিছু পরে,

> জয়তি জয়তি রাজা ধার্মিকঃ শুদ্ধবুদ্ধিঃ
> নিখিল গুণনিবাসঃ পাণ্ডবঃ সত্যমূর্ত্তিঃ।
> জনগণপরিপালে সর্ব্বদা মগ্নচেতাঃ
> বিহিতকৃতিরতোঽসৌ দানশীলো মহাত্মা।।[৮৫]

শ্লোকের প্রতিপাদে ন-ন-ম-য-য গণগুলি থাকায় মালিনী ছন্দ হয়েছে। গঙ্গাদাস *ছন্দোমঞ্জরী* গ্রন্থে মালিনী ছন্দের লক্ষণ করতে গিয়ে বলেছেন–"ননমযযযুতেয়ং মালিনী ভোগলোকৈঃ।"[৮৬] ভোগী অর্থাৎ ৮ এবং লোক অর্থাৎ ৭, সুতরাং এখানে প্রথমে অষ্টম অক্ষরের পর এবং পরবর্তী সপ্তম অক্ষরের পর যতি হয়েছে।

ইন্দ্রবজ্রা ছন্দের প্রয়োগ করে বলেছেন–

> ঈর্ষ্যাবিহীনাঃ পরয়া চ শান্ত্যা
> ধর্মে স্থিতাঃ স্বে সততং ধরণ্যাম্।
> স্বীয়ে চ কৃত্যে নিরতাঃ সদৈব
> তিষ্ঠন্তু সর্ব্বে মনুজাঃ সুখেন।।[৮৭]

উক্ত শ্লোকের প্রতিপাদে ত-ত-জ-গ-গ গণগুলি থাকায় ইন্দ্রবজ্রা ছন্দ হয়েছে। ইন্দ্রবজ্রা ছন্দের লক্ষণ করতে গিয়ে *ছন্দোমঞ্জরী* গ্রন্থকার গঙ্গাদাস বলেছেন – "স্যাদিন্দ্রবজ্রা যদি তৌ জগৌ গঃ।"[৮৮]

উপজাতি ছন্দের প্রয়োগ করে বলেছেন–

> সর্ব্বেষু কৃত্যেষু সদা প্রমাণং
> বলপ্রদাতা চ মহান্ সহায়ঃ
> দয়াশ্রয়ঃ সর্ব্বজনপ্রপাতা

বিশ্বস্য ধাতা ভগবান্ মুরারি।।[৮৯]

উক্ত শ্লোকে ইন্দ্রবজ্রা এবং উপেন্দ্রবজ্রার মিলিত রূপ দেখতে পাওয়ায় উপজাতি ছন্দ হয়েছে। উপজাতি ছন্দের লক্ষণ করতে গিয়ে গঙ্গাদাস বলেছেন–

অনন্তরোদীরিতলক্ষ্মভাজৌ
পাদৌ যদীয়া(বুপজাতয়)স্তাঃ।
ইত্থং কিলান্যস্বপি মিশ্রিতাসু
বদন্তি জাতিষ্বিদমেব নাম।।[৯০]

উপেন্দ্রবজ্রা ছন্দের উদাহরণ–

অয়ং স রাজা ধরণীশ্বরো হি
ধর্মৈকনিষ্ঠো গুণবান্ নয়জ্ঞঃ।
সত্যব্রতী দুঃখিজনাশ্রয়শ্চ
যুধিষ্ঠিরো বীরবরঃ সুকীর্ত্তিঃ।।[৯১]

উপরি উক্ত শ্লোকের প্রতিপাদে জ-ত-জ-গ-গ গণগুলি থাকায় উপেন্দ্রবজ্রা ছন্দ হয়েছে। উপেন্দ্রবজ্রা ছন্দের লক্ষণ করতে গিয়ে *ছন্দোমঞ্জরী* গ্রন্থকার গঙ্গাদাস বলেছেন – "উপেন্দ্রবজ্রা প্রথমে লঘৌ সা।"[৯২]

বংশস্থবিল ছন্দের প্রয়োগ করতে গিয়ে বলেছেন–

বলেন হীনাঃ কিমু দুর্বলা বয়ম্
ন সাহসং কিং ময়ি বর্ত্ততে ননু।
ভয়েন ভীতো ন চ পাণ্ডুপুত্রতঃ
সদা সমর্থোঽস্মি ধরাজয়ে পুন।।[৯৩]

উক্ত শ্লোকে জ-ত-জ-র গণ প্রতি পাদে দেখতে পাওয়া যায়। গঙ্গাদাস তাঁর ছন্দোমঞ্জরী গন্থে বংশস্থবিল ছন্দের লক্ষণ করতে গিয়ে বলেছেন–"বদন্তি বংশস্থবিলং জতৌ জরৌ।"[৯৪]

অনুষ্টুভ্ ছন্দের প্রয়োগ করে নাট্যকার বলেছেন–

দ্যূতেনৈব পরাজিত্য পাণ্ডবানাং হি সম্পদম্।
সর্ব্বামহং হরিষ্যামি বৎস চিন্তাং পরিত্যজ।।[৯৪]

আবার কিছু পরে,

সূচয়ত্যশুভং কিনো বামাক্ষিস্পন্দনেন ভোঃ।
মনো মে চঞ্চলং ভ্রাতর্ভবতি সহসা কথম্।।[৯৫]

উক্ত শ্লোকের প্রতিচরণের পঞ্চমবর্ণ লঘু ও ষষ্ঠবর্ণ গুরু হওয়ায় অনুষ্টুভ্ ছন্দ হয়েছে, অনুষ্টুভ্ ছন্দের লক্ষণ করতে গিয়ে *ছন্দোমঞ্জরী* গ্রন্থকার বলেছেন–

পঞ্চমং লঘু সর্বত্র সপ্তমং দ্বিচতুর্থয়োঃ।
গুরু ষষ্ঠঞ্চ জানীযাৎ শেষেষ্বনিয়মো মতঃ।।[৯৬]

ছন্দের ব্যবহারে নাটকের অভিব্যক্তির স্বচ্ছতা স্পষ্ট এবং অর্থপূর্ণ করে তোলে, দর্শকদের বুঝতে সাহায্য করে। ছন্দের লালিত্য নাটকের নাটকীয়তা বাড়ায়, ফলে দর্শকদের আকর্ষণ করে। আলোচিত নাটকে ছন্দের যেভাবে ব্যবহার হয়েছে তাতে নাটকীয়তা সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। নাট্যকার সহজ সরল সুবোধ্য ছন্দের ব্যবহারে দর্শকের রসাস্বাদনে সহায়তা করেছেন। নিম্নে আলোচ্য নাটকের ছন্দের একটি সূচী প্রস্তুত করা হল–

নাটকের নাম	**অঙ্ক সংখ্যা**	**দৃশ্য**	**ছন্দ এবং অঙ্ক সংখ্যা**
দ্রৌপদীমানরক্ষণ	প্রথম-অঙ্ক	প্রথম দৃশ্য	মালিনী– ১ অনুষ্টুভ্– ২,৩,৪,৫,৬,৭
		দ্বিতীয় দৃশ্য	অনুষ্টুভ্ – ৮,৯,১০,১১,১২,১৩,১৪,১৭,১৮,১৯,২০ বংশস্থবিল–১৫, ইন্দ্রবজ্রা–১৬
	দ্বিতীয়-অঙ্ক	প্রথম দৃশ্য	মালিনী– ২১,২২, অনুষ্টুভ্– ২৩,২৫,২৬,২৭,২৮ উপজাতি–২৪ উপেন্দ্রবজ্রা–২৯,
		দ্বিতীয় দৃশ্য	অনুষ্টুভ্ – ৩০,৩১,৩২,৩৩,৩৪,৩৫,৩৬,৩৭,৩৮ ইন্দ্রবজ্রা–৩৯
	তৃতীয়-অঙ্ক	প্রথম দৃশ্য	অনুষ্টুভ্– ৪০,৪১,৪৩,৪৪,৪৫,৪৬ উপজাতি–৪২,
		দ্বিতীয় দৃশ্য	অনুষ্টুভ্– ৪৭,৪৮,৪৯,৫০,৫১
	চতুর্থ-অঙ্ক	প্রথম দৃশ্য	অনুষ্টুভ্– ৫২,৫৩,৫৪,৫৫,৫৬,৫৭,৫৮
		দ্বিতীয় দৃশ্য	উপজাতি– ৫৯ অনুষ্টুভ্– ৬০,৬১,৬২,৬৩
	পঞ্চম-অঙ্ক	প্রথম দৃশ্য	অনুষ্টুভ্– ৬৪,৬৫,৬৬,৬৭
		দ্বিতীয় দৃশ্য	অনুষ্টুভ্– ৬৮,৭২,৭৩,৭৪,৭৫,৭৬ মালিনী–৬৯ উপেন্দ্রবজ্রা–৭০

নাটকের নাম	অঙ্ক সংখ্যা	দৃশ্য	ছন্দ এবং অঙ্ক সংখ্যা
			উপজাতি–৭১ ইন্দ্রবজ্রা–৭৭
			মোট শ্লোক সংখ্যা–৭৭ অনুষ্টুভ্ – ৬৩ উপজাতি – ৪ মালিনী– ৪ ইন্দ্রবজ্রা– ৩ উপেন্দ্রবজ্রা–২ বংশস্থবিল–১

❖ ৬.৪.৩ গুণ-রীতি বিচার

সাহিত্যদর্পণে গুণগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে মাধুর্য, ওজঃ এবং প্রসাদ–"মাধুর্য্যমোজোঽথ প্রসাদ ইতি তে ত্রিধা।"[৯৭] বিশ্বনাথ-কবিরাজ আরও কিছু গুণের উল্লেখ করলেও সেগুলি কম বেশী এই তিনটি গুণের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত। সাধারণত নবরসের মধ্যে শৃঙ্গার, করুণ ও শান্তরস মাধুর্যগুণ বিশিষ্ট, রৌদ্র, বীর ও বীভৎসরস ওজঃগুণ বিশিষ্ট এবং হাস্য, অদ্ভুত ও ভয়ানকরস প্রসাদগুণ বিশিষ্ট হয়ে থাকে।

দ্রৌপদীমানরক্ষণ নাটকটির অঙ্গী রস হল করুণ। অতএব নাটকটিতে মাধুর্যগুণ হয়েছে বলতে পারি। মাধুর্যগুণ প্রসঙ্গে *সাহিত্যদর্পণে* বলা হয়েছে–"চিত্তদ্রবীভাবময়ো হ্লাদো মাধুর্য্যমুচ্যতে"[৯৮] অর্থাৎ, চিত্তের দ্রব্যতা স্বরূপ আনন্দের নাম মাধুর্য। লক্ষণে বলেছেন– "সম্ভোগে করুণে বিপ্রলম্ভে শান্তেঽধিকং ক্রমাৎ"[৯৯] অর্থাৎ ক্রমানুসারে সম্ভোগ, করুণ, বিপ্রলম্ভ ও শান্তরসে মাধুর্যগুণ বৃদ্ধি পায়।

রসভেদে গুণের বিভেদ স্বীকৃত হলেও নিত্যানন্দ-মুখোপাধ্যায়ের নাটকে প্রসাদগুণেরও ব্যবহার লক্ষিত হয়। প্রসাদগুণের লক্ষণ করতে গিয়ে বিশ্বনাথ-কবিরাজ বলেছেন–

> চিত্তং ব্যাপ্নোতি যঃ ক্ষিপ্তং শুষ্কেন্ধনমিবানলঃ।
> স প্রসাদঃ সমস্তেষু রসেষু রচনাসু চ।।[১০০]

অর্থাৎ, অগ্নি যেমন শুষ্ক কাষ্ঠকে আত্মসাৎ করে তেমনই যে গুণ শীঘ্র চিত্তকে আকর্ষণ করে তাকে প্রসাদগুণ বলে যা সমস্ত রস ও রচনায় থাকে। কাব্য শ্রবণমাত্র অর্থবোধ হলে প্রসাদগুণ হয়ে থাকে। নিত্যানন্দ-মুখোপাধ্যায়ের *দ্রৌপদীমানরক্ষণ* নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল ভাষার সরলতা। নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় এই নাটকে প্রসাদগুণের বাহুল্য দেখিয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ আলোচ্য নাটকের একটি শ্লোক উল্লেখ করা হল–

> আমন্ত্রিতো হি যুদ্ধে বা দ্যুতে চ ক্ষত্রিয়ো যদি।
> আমন্ত্রণং ন রক্ষেদ্ যঃ স বৃথা ক্ষত্রনামধৃক্।।[১০১]

বিশ্বনাথ-কবিরাজ রীতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন অঙ্গের সংস্থাপনের মতো পদগুলির যোজনাবিশেষকে রীতি বলে। এই রীতি রসাদির উপকার সাধন করে। বিশ্বনাথের মতে দেহের মুখ, চোখ প্রভৃতি অঙ্গের সংস্থাপনের ন্যায় কাব্যের শব্দার্থরূপ শরীরে পদগুলির যথাযথ যোজনাবিশেষকে রীতি বলে। বামনাচার্য এই রীতিকে কাব্যের আত্মা বলেছেন–"রীতিরাত্মা কাব্যস্য"[১০২]। বিশ্বনাথ-কবিরাজ *সাহিত্যদর্পণে* রীতির চারপ্রকার ভেদ করেছেন–"সা পুনঃ স্যাশ্চতুর্বিধা। বৈদর্ভী চাথ গৌড়ী চ পাঞ্চালী লাটিকা তথা।"[১০৩] বৈদর্ভী রীতির লক্ষণ করে বলেছেন–

মাধুর্য্যব্যঞ্জকৈর্বর্ণৈ রচনা ললিতাত্মিকা
আবৃত্তিরল্পবৃত্তির্বা বৈদর্ভীরীতিরিষ্যতে[১০৪]

অর্থাৎ, মাধুর্য গুণের প্রকাশক বর্ণদ্বারা মনোহর আবৃত্তি অর্থাৎ সমাসহীন বা অল্পবৃত্তি অর্থাৎ অল্পসমাসবিশিষ্ট রচনাকে বৈদর্ভীরীতি বলে। বৃত্তিতে তিনি রুদ্রটের মত উল্লেখ করেছেন

অসমস্তৈকসমস্তা যুক্তা দশভির্গুণৈশ্চ বৈদর্ভী।
বর্গদ্বিতীয়বহুলা স্বল্পপ্রাণাক্ষরা চ সুবিধেয়া।।[১০৫]

অর্থাৎ, সমাসহীন বা অল্প সমাসযুক্ত, দশগুণের দ্বারা যুক্ত, বর্গের দ্বিতীয় বর্ণের বর্ণের বহুল প্রয়োগ শোভিত এবং অল্পপ্রাণ অক্ষরের দ্বারা সমন্বিত রচনাকে বৈদর্ভী রীতি বলে।

নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় বিরচিত *দ্রৌপদীমানরক্ষণ* নাটকটি মাধুর্য গুণযুক্ত এবং অল্পসমাসযুক্ত রচনা। তাই কবি বৈদর্ভী রীতির প্রয়োগ করেছেন বলা যায়। উদাহরণ স্বরূপ নাটকটির একটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হল–

সূচয়ত্যশুভং কিনো বামাক্ষিস্পন্দনেন ভোঃ।
মনো মে চঞ্চলং ভ্রাতর্ভবতি সহসা কথম্।।[১০৬]

কাব্যের গুণ ও রীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই আলঙ্কারিকগণ মনে করেছেন। সেইকারণেই আলোচ্য নাটকেও গুণ-রীতির যথাযথ ব্যবহারের ফলে মনোহারী কাব্য রূপে এটি রসজ্ঞ ব্যক্তির মনোহরণ করতে পেরেছে। কারণ যখন যে রসটি স্ফুট হয়েছে তখন তার অনুকূল গুণ এবং রীতিকে ব্যবহার করেছেন। তা সত্ত্বেও পাঠক এবং শ্রোতার কথা বিবেচনা করে প্রসাদ গুণকেই অধিক ব্যবহার করা হয়েছে। রীতির ব্যবহারের ক্ষেত্রেও নাট্যকারের অভিনবত্ব দেখা যায়। কারণ শ্রবণসুখহেতু এবং বোধগম্যের প্রয়োজনে তিনি বৈদর্ভী রীতিকেই অধিক মাত্রায় ব্যবহার করে ভাষাকে সরল এবং বহুজনবোধ্য করে তুলেছেন।

উল্লেখপঞ্জি

[১] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *দ্রৌপদীমানরক্ষণ*, শ্লোক ৭

[২] *তদেব*, শ্লোক ১৯

[৩] *তদেব*, শ্লোক ২০

[৪] *তদেব*, শ্লোক ৩৯

[৫] *তদেব*, শ্লোক ১

[৬] অমল শিব পাঠক (সম্পা), *নাট্যপ্রদীপ*, পৃষ্ঠা ২

[৭] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), *নাট্যশাস্ত্র*, ২২/৩০, পৃষ্ঠা ৭৪

[৮] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, শ্লোক ৫

[৯] *তদেব*, শ্লোক ৬

[১০] *তদেব*, শ্লোক ৭

[১১] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), *পূর্বোক্ত*, ২২/৩২, পৃষ্ঠা ৭৪

[১২] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, শ্লোক ৬

[১৩] তত্রৈব

[১৪] তদেব, দ্বিতীয়াঙ্কের প্রথম দৃশ্যে

[১৫] *তদেব*, দ্বিতীয়াঙ্কের প্রথম দৃশ্যে

[১৬] *তদেব*, শ্লোক ৪৭

[১৭] *তদেব*, শ্লোক ৩৩

[১৮] *তদেব*, শ্লোক ৫

[১৯] *তদেব*, শ্লোক ৭

[২০] *তদেব*, শ্লোক ১০-১১

[২১] তদেব, শ্লোক ২০

[২২] তদেব, শ্লোক ২৭

[২৩] তদেব, শ্লোক ৩৩

[২৪] তদেব, শ্লোক ৪০

[২৫] তদেব, শ্লোক ৪৭

[২৬] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *সাহিত্যদর্পণ*, ৬/৬, পৃষ্ঠা ২৬২

[২৭] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, শ্লোক ৭৭

[২৮] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, শ্লোক ৬

[২৯] *তদেব*, শ্লোক ১০

[৩০] *তদেব*, শ্লোক ১১

[৩১] *তদেব*, শ্লোক ১২

[৩২] *তদেব*, শ্লোক ৪৭

[৩৩] *তদেব*, শ্লোক ৬৮

[৩৪] *তদেব*, শ্লোক ৮

[৩৫] *তদেব*, শ্লোক ১৯

[৩৬] *তদেব*, শ্লোক ২০

[৩৭] *তদেব*, শ্লোক ২৪

[৩৮] *তদেব*, দ্বিতীয়াঙ্কের প্রথমদৃশ্য

[৩৯] *তদেব*, শ্লোক ৩৩

[৪০] *তদেব*, শ্লোক ৩৬

[৪১] *তদেব*, শ্লোক ৩৮

[৪২] *তদেব*, শ্লোক ৩৯

[৪৩] *তদেব*, শ্লোক ৬৩

[৪৪] *তদেব*, শ্লোক ৪১

[৪৫] *তদেব*, শ্লোক ৪৪

[৪৬] *তদেব*, শ্লোক ৪৫

[৪৭] *তদেব*, শ্লোক ৫৫

[৪৮] অমল কুমার দে (সম্পা), *মহাভারতের চরিত্র-পরিচিতি*, পৃষ্ঠা ২৪৩

[৪৯] *তদেব*, শ্লোক ৪২

[৫০] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *পূর্বোক্ত*, ৩/৬৯, পৃষ্ঠা ১০৫

[৫১] *তদেব*, ৩/৭০, পৃষ্ঠা ১০৬

[৫২] *তদেব*, ৩/৭১, পৃষ্ঠা ১০৬

[৫৩] *তদেব*, ৩/৭৩, পৃষ্ঠা ১০৮

[৫৪] নিত্যানিন্দ মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, চতুর্থাঙ্কের দ্বিতীয়দৃশ্য

[৫৫] *তদেব*, শ্লোক ৬২

[৫৬] *তদেব*, পঞ্চমাঙ্কের দ্বিতীয়দৃশ্য

[৫৭] *তদেব*, শ্লোক ৭০

[৫৮] অমল কুমার দে (সম্পা), *পূর্বোক্ত*, পৃষ্ঠা ২৩১

[৫৯] নিত্যানিন্দ মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, চতুর্থাঙ্কের দ্বিতীয়দৃশ্য

[৬০] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *পূর্বোক্ত*, ১০/১২১, পৃষ্ঠা ৬২৫

[৬১] *তদেব*, পৃষ্ঠা ৬২৫

[৬২] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, শ্লোক ২১

[৬৩] *তদেব*, শ্লোক ৪৩

[৬৪] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *পূর্বোক্ত*, ১০/১৭, পৃষ্ঠা ৫০৩

[৬৫] *তদেব,* ১০/৭৬, পৃষ্ঠা ৫৭৭

[৬৬] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত,* শ্লোক ৫৯

[৬৭] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *পূর্বোক্ত,* ১০/৮১, পৃষ্ঠা ৫৮৯

[৬৮] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত,* শ্লোক ৭০

[৬৯] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *পূর্বোক্ত,* ১০/৯১, পৃষ্ঠা ৬০১

[৭০] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত,* শ্লোক ১৫

[৭১] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *পূর্বোক্ত,* ৩/২, পৃষ্ঠা ৭২

[৭২] *তদেব,* ৬/৬, পৃষ্ঠা ২৬৩

[৭৩] *তদেব,* ৩/৩, পৃষ্ঠা ৭৭

[৭৪] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়(সম্পা), *পূর্বোক্ত* (প্রথম খণ্ড), বৃত্তি অংশ দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা ১৪৫

[৭৫] তত্রৈব

[৭৬] অন্নদাশঙ্কর পাহাড়ী (সম্পা), *মনুসংহিতা,* ৭/৪৭, পৃষ্ঠা ৯৩

[৭৭] *তদেব,* ৭/৪৮, পৃষ্ঠা ৯৫

[৭৮] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), *পূর্বোক্ত* (প্রথম খণ্ড), ৬/৬২-৬৩, পৃষ্ঠা ১৪৬

[৭৯] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত,* শ্লোক ৬

[৮০] *তদেব,* শ্লোক ২০

[৮১] *তদেব,* শ্লোক ৭১

[৮২] *তদেব,* শ্লোক ৭২

[৮৩] *তদেব,* শ্লোক ১

[৮৪] *তদেব,* শ্লোক ২১

[৮৫] রামতারণ শর্মা (সম্পা), *ছন্দোমঞ্জরী,* দ্বিতীয় স্তবক ১৫/৪, পৃষ্ঠা ৬৫

[৮৬] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত,* শ্লোক ৭৭

[৮৭] রামতারণ শর্মা (সম্পা), *পূর্বোক্ত,* দ্বিতীয় স্তবক ১১/১, পৃষ্ঠা ২৯

[৮৮] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত,* শ্লোক ২৪

[৮৯] রামতারণ শর্মা (সম্পা), *পূর্বোক্ত,* দ্বিতীয় স্তবক ১১/৩, পৃষ্ঠা ৩০

[৯০] *তদেব,* শ্লোক ২৯

[৯১] রামতারণ শর্মা (সম্পা), *পূর্বোক্ত,* দ্বিতীয় স্তবক ১১/২, পৃষ্ঠা ২৯

[৯২] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত,* শ্লোক ১৫

[৯৩] রামতারণ শর্মা (সম্পা), *পূর্বোক্ত,* দ্বিতীয় স্তবক ১২/২, পৃষ্ঠা ৪০

[৯৪] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত,* শ্লোক ২০

[৯৫] *তদেব,* শ্লোক ২৭

[৯৬] রামতারণ শর্মা (সম্পা), *পূর্বোক্ত,* চতুর্থ স্তবক, শ্লোক ৩, পৃষ্ঠা ১১৫

[৯৭] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *পূর্বোক্ত,* ৮/২, পৃষ্ঠা ৪৪৮

[৯৮] *তদেব*, ৮/৩, পৃষ্ঠা ৪৪৮

[৯৯] *তদেব*, ৮/৪, পৃষ্ঠা ৪৪৯

[১০০] *তদেব*, ৮/৮, পৃষ্ঠা ৪৫৩

[১০১] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, শ্লোক ৪৭

[১০২] বেচনা ঝা (সম্পা), *কাব্যালংকারসূত্র*, ১/২/৬, পৃষ্ঠা ১৫

[১০৩] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *পূর্বোক্ত*, ৯/২, পৃষ্ঠা ৪৬৫

[১০৪] *তদেব*, ৯/৩, পৃষ্ঠা ৪৬৫

[১০৫] *তদেব*, পৃষ্ঠা ৪৬৬

[১০৬] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, শ্লোক ২৭

উপসংহার

উপসংহার

এই তিনটি নাটক *বৈয়াসিক-মহাভারতের* ঘটনা থেকে গৃহীত হয়েছে। সাহিত্যে যেহেতু তৎকালীন সময়ের ঘটনার প্রতিরূপ দেখা যায় সেহেতু *বৈয়াসিক-মহাভারতের* যে ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে তা সেই সময়ের সমাজের প্রতিচ্ছায়া বলে অনুমান করা যায়। কিন্তু কয়েক সহস্র বৎসর পরে সমাজে বহু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বর্তমান সাহিত্যে পরিবর্তিত সমাজে প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হবে এটিই স্বাভাবিক। অতএব আলোচিত তিনটি নাটকে *বৈয়াসিক-মহাভারতের* ঘটনার ভিত্তিতে বর্তমান নাট্যকারের সমাজের প্রতিচ্ছায়া প্রভাব ফেলেছে একথা অনুমান করা যায়। আলোচিত তিনটি নাটকেই বর্তমান সময়ের যে ছায়া লক্ষ্য করা গেছে তা উপসংহার পর্বে উল্লেখ করা যায়।

জয়দ্রথবধ নাটকে অভুমন্যুবধ প্রতীক রূপে উল্লিখিত হলেও বর্তমান সমাজেও এমন ঘটনার প্রভাব নাট্যকারের উপর লক্ষ্য করা গেছে। অন্যায় হত্যা প্রতিবাদ রূপে শ্রীকৃষ্ণকে যে কৌশল অবলম্বন করতে দেখা গেছে তা বর্তমান সমাজে তথাকথিত বুদ্ধিজীবিদের স্মরণ করিয়ে দেয়।

একই ভাবে *ঘটোৎকচবধ* নাটকে ঘটোৎকচ বধকে কেন্দ্র করে শ্রীকৃষ্ণের ক্রিয়া কৌশল বর্তমান সময়ের রাজনীতিকদের কৌশলকে স্মরণ করিয়ে দেয়। যুগে যুগে ঘটোৎকচের মতো ব্যক্তিরা অন্যের স্বার্থে নিজের জীবন বলিদান করেন তা দেখা গেছে। দধীচী থেকে শুরু করে আজও পর্যন্ত এই রকম আত্মবলিদান চলে আসছে।

দ্রৌপদীমানরক্ষণ নাটকে দুর্যোধন দুঃশাসনাদির অমানবিক এবং সভ্যতা-বিবর্হিত আচরণ বর্তমান সময়ে নানরকম লজ্জাজনক ঘটনাকে মনে করিয়ে দেয়। *বৈয়াসিক-মহাভারতের* সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত নারীর সম্মান যে সুরক্ষিত নয় তা বারেবারে লক্ষ্য করা যায়। এমনকি শাসককুলের হাতেও নারীর মর্যাদা সুরক্ষিত নয় তা প্রতীকীরূপে এই নাটকে উদ্ভাসিত হয়েছে।

নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় ধর্মশাস্ত্রের পণ্ডিত তাই প্রত্যেক নাটকে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এবং অন্তিমে ভরতবাক্যে তার প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। *দ্রৌপদীমানরক্ষণ* নাটকে অক্ষক্রীড়াকে রাজার কর্তব্য বলে যুধিষ্ঠির বলেছেন। কিন্তু তার প্রতিবাদ করেছেন ভীম। কারণ রাজার যে সকল ব্যসনের কথা বলা হয়েছে রাজধর্মে তার মধ্যে অক্ষক্রীড়া অন্যতম। এই অক্ষক্রীড়া যে কি ক্ষতি করতে পারে তা এই নাটকে দেখানো হয়েছে। নারীর সম্মান সর্বত্র রক্ষা করা সমাজ ও রাজার অবশ্য কর্তব্য। সে কথাও এই নাটকে গান্ধারীর মাধ্যমে বলা হয়েছে। ব্যসন-বিলাস যুধিষ্ঠিরের ন্যায় বিজ্ঞ-ব্যক্তিকে যেভাবে বিচলিত করেছে তা দেখে বর্তমান সমাজে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের ভ্রষ্টাচার যে কেবল তাদের ক্ষতি করছে তা নয়, তাদের পরিবার ও সমাজকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে এই সমাজের প্রতীক রূপে তা উল্লিখিত হয়েছে।

ঘটোৎকচবধ নাটকের মূল যে চরিত্র ঘটোৎকচ, সে যেভাবে পিতৃগণের রক্ষায় এগিয়ে এসেছেন তা ধর্মশাস্ত্রের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এই নাটকেও ভরতবাক্যে ধর্মকে রক্ষা করার আবেদন রাখা হয়েছে।

জয়দ্রথবধ নাটকের মূল বক্তব্য ধর্মশাস্ত্রের রাজধর্মকে প্রকাশ করেছে। কারণ অভিমন্যুকে যেভাবে বধ করা হয়েছে তা ভারতীয় রাজধর্মের বিরুদ্ধে যায় এবং অধর্মের পথে গেলে যে ধর্ম তাকে রক্ষা করে না তা জয়দ্রথের মৃত্যুর মধ্যে দেখা যায়। জয়দ্রথবধের মৃত্যুর পন্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বোঝালেন অধর্ম করলে অধর্মের পথেই মৃত্যু হয়। অসহায় অভিমন্যুকে হত্যার ফল হিসাবে জয়দ্রথের সমস্ত সহায় থাকা সত্ত্বেও অসহায়ভাবে নিহত হতে হয়েছে।

আলোচিত তিনটি নাটকেই পরিবারের সুষ্ঠ বন্ধন চিত্রিত হয়েছে। *জয়দ্রথবধ* নাটকে প্রারম্ভেই অভিমন্যুর হত্যা যে সমস্ত পাণ্ডব পরিবারকে বেদনার দ্বারা গ্রথিত করেছে এবং ধৃতরাষ্ট্রের মাধ্যমে দুঃশলার পরিনতির কথা উচ্চারণ হয়ে কৌরবপক্ষেও সমস্ত পরিবারকে সূচিত করেছে। এইভাবে *ঘটোৎকচবধ* নাটকে যুধিষ্ঠিরের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ বন্ধন দেখা যায়। *দ্রৌপদীমানরক্ষণ* নাটকে দ্রৌপদীর লজ্জা যে সমস্ত পরিবারের লজ্জা একথা জ্ঞাপিত করেছেন গান্ধারী। এইভাবে পারিবারিক চিত্র এই তিনটি নাটকে দেখা যায়।

এই তিনটি নাটকে প্রধান সম্পদ যেন নীতিবাক্য। সেখানে পারিবারিক-নীতি, সমাজ-নীতি, যুদ্ধনীতি ও ধর্মনীতি পরিস্ফুট হয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। *জয়দ্রথবধ* নাটকে যেমন যুদ্ধনীতি নিয়ে, ধর্মনীতি নিয়ে আলোচিত হয়েছে তেমনই পারিবারিক নীতি নিয়েও আলোচনা দেখা যায়। যখন অর্জুন শোকে বিহ্বল হন তখন কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের কথা মনে করিয়ে শোক ত্যাগ করতে বলেন সেইকথায় অর্জুন নিজেকে সংযত করেন আবার যুধিষ্ঠিরের ক্ষেত্রেও একই ভাবে অর্জুনের কথা চিন্তা করে নিজেকে সংযত করতে দেখা যায়। এইভাবে পরিবারের পারস্পরিক সহানুভূতির নীতিকে ব্যক্ত হতে দেখা যায়। *ঘটোৎকচবধ* নাটকেও যুদ্ধনীতি, ধর্মনীতি বিশেষ ভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। ঘটোৎকচ যেভাবে পরিবারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন তা থেকে পারিবারিক নীতিও সুস্পষ্ট হয়েছে। *দ্রৌপদীমানরক্ষণ* নাটকটিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। কারণ এই নাটকটিতে রাজনীতি পরিবারনীতি এবং সামাজিকনীতি বিশেষ তাৎপর্য সহকারে স্থাপিত হয়েছে। অক্ষক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরের অংশগ্রহণ যে ভয়াবহ পরিণতি তৈরি করে দেয় তা আমাদের রাজনীতির কথাই মনে করিয়ে দেয়। পরিবারের প্রধান যুধিষ্ঠিরের আচরণ অন্যদের পছন্দ না হলেও তাঁরা নীরব থাকেন। দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা যে সামাজিক লাঞ্ছনা তা নাট্যকার সুস্পষ্ট রূপে গান্ধারীর মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন।

আধুনিক সময়ে অনেকে তাঁদের সংস্কৃত কাব্যে অনেক নূতন ছন্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু নাট্যকার নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় সেই পথে না হেঁটেও প্রাচীন ছন্দগুলিকে ব্যবহার করে কাব্যে কমনীয়তা এনেছেন।

তিনি প্রাচীন প্রন্থি হয়েও প্রাচীন আলঙ্কারিকদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আধুনিক সময়ের পরিবর্তিত বেশ কিছু বিশিষ্ট তাঁর নাটকে ব্যবহার করেছেন এবং প্রাচীন রীতি নীতি কিছু বর্জনও করেছেন। যেমন প্রাকৃতের ব্যবহার করেন নি, দৃশ্যের ব্যবহার করেছেন, বিদূষকের ব্যবহার নাটকে দেখতে পাওয়া যায় না। বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেও মূল ঘটনাকে এক রেখে চরিত্র এবং প্রয়োগে বিচিত্র এনেছেন।

গ্রন্থপঞ্জি

সবিমর্শ গ্রন্থপঞ্জি

Agnipurāṇa. Ed. with intro. Maitreyee Deshpande and Eng. trans. M.N. Dutt. *The Agni Mahāpurāṇam*. Vol. 3. Delhi: New Bharatiya Book Corporation, 2009. (1st ed.).

Ānandavardhana, *Dhvanyāloka* (akhanda). Ed. with exp. Bimalakanta Mukhopadhyay. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 2008.

Bandyopadhyay, Ashok Kumar. *Saṃskṛta Vāṅlā Abhidhāna.* Sadesh, 2011. (3rd ed.; 1st ed. 2001).

Bandyopadhyay, Dhirendranath. *Saṃskṛta Sāhityera Itihāsa*. Paschimbanga Rajya Pustak Parshad, 2012. (2rd ed.; 1st ed. 1988).

Banerji, S. C. A *Companion to Sanskrit Literature*. Delhi/Varanasi/Patna: MLBD, 1971.

Basu, Buddhadeb. *Mahābhāratera Kathā*. Kolkata: Granthalaya Pvt. Ltd., 1990. (*Buddhadeb Basur Rachanasangraha.* Vol. 11).

Basu, Ratna. *Methodology and Sanskritic Researches*. Kolkata: Rabindra Bharati University, 2012. (1st ed. 1998). (School of Vedic Studies Pamphlet Series 4).

Bhaduri, Nrisingha Prasad. *Mahābhāratera Kathā Amṛtasamāna*. Vols. 1, 2. Kolkata: Dey's Publishing House, 2012.

Bhāmaha, *Kāvyālaṃkāra* (paricchedas 1 to 6). Ed. with Eng. trans. C. Sankara Rama Sastri. Madras: The Sri Balamanorama Press, 1956.

Bharata. Nāṭyaśāstra. Ed. M. Ramakrishna Kavi. With Abhinavagupta's comm. vols. 1, 2. Baroda (now Vadodara): ORI, 1926, 1928 (GOS 36, 38).

_____. Ed. with Eng. trans. Manomohan Ghosh. *The Nāṭyaśāstra*. Vols. 1-2. Calcutta (now Kolkata): Manisha Granthalaya Pvt. Ltd., 1995. (2nd rev. ed.; 1st ed. 1961).

_____. Ed. and Beng. trans. Suresh Chandra Banerji and Chanda Chakraborty. Bharata. *Nāṭyaśāstra.* 4 vols. Kolkata: Navapatra Prakasan, 2014. (6th rpt. of 1st ed. 1980) (vol. 1); 2015 (4th rpt. of 1st ed. 1982) (vol. 2); 2015 (5th rpt. of 1st 1982) (vol. 3); 2014 (5th rpt. of 1st ed. 1995) (vol. 4).

Bhattacharya, Sukhamay. *Mahābhāratera Caritāvalī*. Kolkata: Ananda Publishers, 1404 BY. (3rd ed.; 1st ed. 1373 BY).

Bhoja. *Saraswatīkaṇṭhābharaṇa* (part 1, chapters 1 & 2). Ed. with Sans. comm. Ratneshwara's *Ratnadarpaṇam*. Hindi intro. Trans. *Swarūpānanda-Bhāṣya* comm. and appendices Kameshwarnath Mishra. Varanasi: Chaukhambha Orientalia, 1976.

Chattopadhyay, Rita. *Ādhunika Saṃskṛta Sāhitya*: (1910-2010). *Chotagalpa o Nāṭaka*. Kolkata: Progressive Publishers, 2012.

_____. *20th Century Sanskrit Literature. A Glimpse into Traditional and Innovation*. Kolkata: Sanskrit Sahitya Parishat and Sanskrit Pustak Bhandar, 2008.

Dandekar, R. N. (ed.). *The Mahābhārata Revisited*. New Delhi: Sahitya Akademi, 1990.

Daṇḍin, *Kāvyādarśa.* Ed. with *Prabhā* comm. Rangacharya Shastri. Poona (now Pune): Bhandarkar Oriental Research Institute, 1938.

Das, Abhishek. *An Analysis of the published Sanskrit works of Pandit Nityananda Mukhopadhyay*. Santiniketan: Visva-Bharati University, 2018.

Das Gupta, Surendranath / De, Sushil Kumar. *A History of Sanskrit Literature*. Classical Period. Calcutta (now Kolkata): University of Calcutta, 1977. (1st ed. Calcutta, 1947).

Dey, S. K. *History of Sanskrit Poetics*. Calcutta (now Kolkata): Firma KLM, 1960. (Rev. 2nd ed.; 1st ed. 1956).

Dhanaṃjaya. *Daśarūpaka*. Ed. with Eng. trans. and intro. George C. O. Hass. *The Daśarūpa A Treatise on Hindu Dramaturgy*. Gen. ed. A. V. Williams Jackson. New York: Columbia University Press, 1912. (Columbia University Indo-Iranian Series 7).

_____. Eds. Sitanath Acharya / Debkumar Das. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 2016. (4th ed.; 1st ed. 1997).

Dutt Tripathi, Kamlesh (Gen. ed.) / Upadhyaya, Baldev (Chief ed.). *Saṃskṛta Vāṅmaya kā Bṛhat Itihāsa* (saṣṭha khaṇḍa). Lucknow: Uttar Pradesh Sanskrit Sansthan, 2019.

Encyclopaedia of Indian Literature. Chief. ed. Amaresh Datta. Vols. 2, 3. Delhi: Sahitya Akademi, 2005. (4th rpt. of vol. 2; 1st ed. 1988), 2003 (3rd rpt. of vol. 3; 1st ed. 1989).

Gaṅgādāśa. *Chandomañjari.* Ed. With Sans. comm. *Mañjarī* by Rāmatāraṇa Śiromaṇi. Kalikata (now Kolkata), 1891.

_____.Ed. With Sans. exp. Gurunath Bhattacharya. With Beng. trans. and Beng. exp. Jagadīśa-Tarkatīrtha. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 1411 BY. (12th rev. ed.)

Ghosh, Amal Kumar. *Mahābhāratera Caritra Pariciti.* Kolkata: Sanskrit Book Depot, 2016.

Ghosh, Madhuri. *Bhāratavarṣa O Bāṃlādeśera Svādhīnatā Saṃgrāma Āśrayī Nirvācita Saṁskṛta Nāṭaka*; *Ekaṭi Samīkṣā*. Jadavpur: Jadavpur University, 2016-17.

Ghoshal, Banabihari. *Arvācīnā (Ādhunika) Saṃskṛta Sāhityera Itihāsa*: *1801*-*2020*. Kolkata: Parul Prakashani, 2022. (Rpt.; 1st ed. 2021).

Krishnamachariar, M. *History of Classical Sanskrit Literature*. Delhi/Varanasi/Patna: MLBD, 1974. (3rd ed.; 1st ed. Madras: Tirumalai-Tirupati Devasthanams Perss, 1937.

Kuntaka. *Vakroktijīvita.* Ed. Ravishankar Bandyopadhyay. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 2013. (4th ed.; 1st ed. 1986).

Macdonell, Arthur A. *A History of Sanskrit Literature*. New Delhi: Munshiram Mohanlal, 1972. (3rd ed.; 1st ed. 1899).

Mahābhārata. Ed. Haridāsa-Siddhāntavāgīśa-Bhaṭṭācārya with Beng. trans. and own Sans. comm. *Bhāratakaumudī* together with Nīlakaṇṭha's comm. *Bhāratabhāvadīpa*. Vol. 22. Kolkata: Bishwabani Prakashani, 1388 BY. (2nd ed.; 1st ed. 1345 BY).

_____. Crit. ed. *The Mahābhārata. Text as Constituted in its Critical Edition.* (Text only). Vols. 1, 2, 3, 4. Poona (now Pune): BORI, 1971, 1972, 1974, 1975.

_____. Beng. trans. Rajshekhar Basu. Kolkata: M. C. Sarkar and Son Pvt. Ltd., 1418 BY. (13th ed., 1st ed. 1356 BY).

Mahimabhaṭṭa. *Vyaktiviveka*. Ed. with Sanskrit comm. of Ruyyaka and Hindi comm. and Notes. Rewāprasāda Dwivēdī. Varanasi: Chaukhambha Sanskrit Sansthan, 1982. (3rd ed.).

Mammaṭa. *Kāvyaprakāśa* (part 1). Ed. Gopi Nath Kaviraj. Benares (now Varanasi): Saraswati Bhavanh Texts, 1933.

Manusaṃhitā (Adhyay 7). Ed. Annadashankar Pahari. Kolkata: Sanskrit Book Depot, 2008. (2rd ed.; 1st ed. 2004).

Miśra, Sundara. *Nāṭyapradīpa.* Ed. Amal Shib Pathak. Varanasi: Chaukhambha Sanskrit Sansthan, 2018.

Monier-Williams, Monier. *A Sanskrit-English Dictionary*. Delhi: MLBD, 1963. (Rpt. of 1st ed. Oxford University Press, 1899).

Mukhopadhyay, Debabrata. "Nityānanda-Barṇanam". In: *Śatabarṣe Nityānanda Prasūnāñjali*. Chief ed. Ratna Basu., Gen. ed. Debabrata Mukhopadhyay. Howrah: Howrah Sanskrit Sahitya Samaj, 2022.

Mukhopādhyāya, Nityānanda. *Kālidāsa*. Howrah: Howrah Sanskrit Sahitya Samaj, 1956.

_____. *Tapōvaibhavam*. Howrah: Howrah Sanskrit Sahitya Samaj, 1972.

_____. *Mahiṣāsura-lāñchanam*. Howrah: Howrah Sanskrit Sahitya Samaj. 1982.

______. *Sampatti-samarpaṇam*. Howrah: Howrah Sanskrit Sahitya Samaj, 1982.

______. *Nāṭaka-saṁgraha*. Howrah: Sreematya Jayanti Debya Prakasana, 2007.

______. *Dṛśyakāvya-Saṁkalanam*. (Part - 1). Howrah: Howrah Sanskrit Sahitya Samaj, 2009.

______. *Saṁskṛta-maulika-rabīndra-nāṭaka-saṁkalanam*. Howrah: Howrah Sanskrit Sahitya Samaj, 2011.

______. *Guptadhanam*. Howrah: Howrah Sanskrit Sahitya Samaj, 2012.

______. *Nāṭya-saṁgraha 2*. Howrah: Howrah Sanskrit Sahitya Samaj, 2020.

______. *Sītārāmābirbhavam*. Howrah: Howrah Sanskrit Sahitya Samaj.

______. *Draupadīmānarakṣanam*. Collection of Mukhopadhyay family. Manuscript.

______. *Ghaṭatkacavadham*. Collection of Mukhopadhyay family. Manuscript.

______. *Jayadrathavadham*. Collection of Mukhopadhyay family. Manuscript.

______. "Vyarthajīvana". In: *Samāja-Bhāratī*. Ed. Debabrata Mukhopadhyay. Howrah: Howrah Sanskrit Sahitya Samaj, 2009.

______. "Rōgīvāndhava". In: Rabīndra: Cintāsaṁkalana. Ed. Debabrata Mukhopadhyay. Howrah: Howrah Sanskrit Sahitya Samaj, 2012.

______. "Raghunandanavandana". In: *Samāja-Bhāratī*. Ed. Debabrata Mukhopadhyay. Howrah: Howrah Sanskrit Sahitya Samaj, 2018-20.

______. "Sādhak-rāmaprasāda" (1-2nd act). In: *Samāja-Bhāratī*. Chief Ed. Ratna Basu., Ed. Debabrata Mukhopadhyay. Howrah: Howrah Sanskrit Sahitya Samaj, August 2022.

______. (3-5th act). In: *Samāja-Bhāratī*. Chief Ed. Ratna Basu., Ed. Debabrata Mukhopadhyay. Howrah: Howrah Sanskrit Sahitya Samaj, January 2023.

New Catalogus Catalogorum. Vols. 1-19. Ed. K. Kunjunni Raja and others. Madras (now Chennai): University of Madras, 1974-2009.

Raghunāthāchārya, S.B. Ed. *Modern Sanskrit Literature: Tradition and Innovations*. New Delhi: Sahitya Akademi, 2009. (Rpt., 1st ed. 2002.)

Rāmacandra / Guṇacandra. *Nāṭyadarpaṇa*. Ed. with Hindi trans. G. K. Shrigondekar / L. B. Gandhi. Baroda: Oriental Institute, 1959.

Rūpagosvāmī. *Nāṭakacandrikā*. Ed. with *The Prakāśa* Hindi comm. and critical notes Bābūlāla Śukla Śāstrī. Varanasi: Chowkhamba Sanskrit Series office, 1964.

Sāgaranandin. *Nāṭakalakṣaṇaratnakośa*. Ed. with Beng. Trans. Siddheswar Chattopadhyaya. *Nāṭakalakṣaṇaratnakośa in the Perspective of Ancient Indian Drama and Dramaturgy.* Calcutta (now Kolkata): Punthi Pustak, 1974.

Shastri, Ashoknath. *Rasa o Bhāva.* Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 1998.

Sukthankar, V. S. *Critical Studies in the Mahābhārata*. Poona (now Pune): M. N. Kulkarni (for V. S. Sukthankankar Memorial Edition Committee), 1944.

Swami Gambhirananda. *Upaniṣad Granthāvalī*. Vol. 2. Kolkata: Udbodhan Karyalaya, 2007. (5th ed.).

Tagore, Rabindranath. "Chanda". In: *Ravīndra-Racanāvalī* (Ekadash khanda). Visva-Bharati, 1990.

Vāmana. *Kāvyālaṅkārasūtra*. With Sans. comm. *Kāvyālankārakāmadhenu* by Gopendra Tripurahara Bhūpāla. Ed. with Hindi trans. Bechana Jhā. Intro. Rewāprasāda Dwivedī. Varanasi: Chaukhambha Sanskrit Sansthan, 1941.

Viśvanātha. *Sāhityadarpaṇa*. Ed. E. Roer. *The Mirror of Composition*. With Eng. trans. Jemes R. Ballentyne / Pramadadasa Mitra. Calcutta (now Kolkata): Royal Asiatic Society of Bengal, 1851. (Bibliotheca Indica Series no. 9).

_____. Ed. Haridāsasiddhāntavāgīśa-Bhaṭṭācārya, with the Sans. comm. *Kusumapratimā*. Kolkata: Sanskrit Book Depot, 1875 ŚY. (5th ed.; Rpt. of 1st ed. 1841 ŚY).

_____. Ed. Kṛṣṇamohana Śāstrī. *Sāhityadarpaṇa of Śrī Viśvanātha Kavirāja*. With the Sans. comm. *Lakṣmī* and notes. Varanasi: 1967.

_____. Ed. Gurunāthavidyānidhi with Sans. comm. *Sāhityadarpaṇa-vivṛti* of Rāmacaraṇa-Tarkavāgīśa. Kolkata: Sanskrit Book Depot, 1371 BY. (1st ed. 1838 ŚY).

_____(vol. 2). Ed. Yogeshwar Dutta Sharma Parashar with the comm. *Vivṛti*, *Vivṛtipūrti*, *Vijñapriyā*, *Locana*, *Kusumapratimā*, *Vimalā*, *Lakṣmī*, *Rucirā*. Delhi: Nag Publication, 1999.

Winternitz, Maurice. *A History of Indian Literature*. Vol. 1, part 2. Calcutta (now Kolkata): University of Calcutta, 1978. (3rd ed.).

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ক

কবি নিত্যানন্দের প্রতি শ্রী-সীতানাথ আচার্যের প্রশস্তি[১]

নিত্যানন্দং ব্যপগতমলং যো জনেভ্যঃ প্রযচ্ছন্
নিত্যানন্দে নিজমপি মনো মজ্জযন্ যো ব্যরাজৎ।
নিত্যানন্দো বিমলহৃদযো যঃ সদা নিত্যকৃত্যৈ-
র্নিত্যানন্দেঽমরভুবনকে শাপ্রতং স প্রযাতঃ।। ১।।

শ্রৌতেস্মার্তে পথি সুকঠিনে লীলযা সঞ্চরন্তং
তন্ত্রস্থানে সুখবিচরণং সাধনোড্ডাসি বক্ত্রম্।
কাব্যোৎপাদে কবিকুলগুরুং শক্তিনৈপুণ্যরম্যং
নিত্যানন্দং বিরলবিবুধং শোকদীনাঃ স্মরামঃ।। ২।।

শাস্ত্রেঽসংখ্যে নিশিতনিশিতাং বুদ্ধিধারাং দধানং
বিদ্যাপীঠং নিখিলবিবুধৈঃ শ্রদ্ধযারাধ্যমানম্।
স্বান্তৈকান্তবিবহনপরং সংস্কৃতে র্ভারতস্য
নিত্যানন্দং বিরলবিবুধং শোকদীনাঃ স্মরামঃ।। ৩।।

আকৌমারাৎ শয়নসময়ে জাগৃতৌ চাপি যস্য
দৈবী বাণী হৃদয়কমলে সন্নিষণ্ণা সদাতাৎ।
শাস্ত্রাচারানুসরণবিধৌ যস্য নিষ্ঠা বিশিষ্টা
নিত্যানন্দং তমতিসুজনং শোকদীনাঃ স্মরামঃ।। ৪।।

বিদ্যাবংশ্যান্ সুতসমদৃশা সন্ততং পালযন্তং
দৈবং পৈত্রং নিরলসতযা কৃত্যমাপাদযন্তম্।
ইষ্টং দেবং হৃদয়গহনে নিত্যমালোকযন্তম্
নিত্যানন্দং বিরলবিধুধং শোকদীনাঃ স্মরামঃ।। ৫।।

কবি নিত্যানন্দের প্রতি তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের প্রশস্তি[২]

বাগ্দেব্যাঃ দুর্দশাং প্রেক্ষ্য প্রতিকারকৃতেস্তথা।

সর্বানেব গৃহীত্বা চ প্রতিবাদঃ কৃতঃ পথি।। ৩৭।।

আবাল্যং পরিষেবতে সুরবাগ্জননীপদম্।

তস্মাদেব প্রদত্তং হি জীবনমিহ সর্বতঃ।। ৩৮।।

শ্রীসীতারামদেবস্য সংস্কৃতসংসদশ্চ বৈ।

প্রতিষ্ঠাহেতুনা সদা চেষ্টা হি পরিদৃশ্যতে।। ৩৯।।

সমগ্রজীবনং ব্যাপ্য ঘোষিতস্তেন যোগিতা।

সুপুণ্যো মন্ত্র ইত্যেবং 'ভারতে ভাতু ভারতি'।। ৪০।।

গণিতপ্রভৃতীনাঞ্চ সংস্কৃতেন হি বিদ্যযা।

সম্মেলনেন বুদ্ধ্যা বৈ পাঠ্যঞ্চ নূতনং কৃতম্।। ৪১।।

বিদ্যাতীর্থাদি নূতনাস্তথা শাস্ত্রীতি চাপরাঃ।

সঞ্চালিতাঃ পরীক্ষাশ্চ সমাজে চৈব সংসদি।। ৪২।।

বিবিধৈরেব কার্যৈশ্চ সংস্কৃতচরণায হি।

জীবনং দত্তবান্ বিপ্রঃ মতিমান্ বুধসত্তমঃ।। ৪৩।।

এভিঃ সার্দ্ধ নিমজ্জিতৈঃ সাহিত্যরসসাগরে।

অষ্টাদশোত্তরারম্ভশতানি নাটকানি চ।। ৪৪।।

মহাকাব্যানি সপ্ত বা অনেকাঃ কবিতাস্তথা।

বিবিধা নু প্রবন্ধাশ্চ রচিতাঃ হি স্বমোদতঃ।। ৪৫।।

বঙ্গযা ভাষযা চাপি তৈরেব রচিতানি তু।

দৃশ্যকাব্যানি পদ্যানি নিবন্ধসহিতানি চ।। ৪৬।।

কবি নিত্যানন্দের প্রতি শ্রী-রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের প্রশস্তি[৩]

The credit of the talent of Pt. Nityananda Smrititirtha lies elsewhere. He is a profound literary artist having more than 200 books-and lyrics, dramas and short-stories to his credit and all these works bear testimony to the profound genius of the artist. The imagination of Pt. Smrititirtha is so powerful that it can trace new meanings in old themes and present them in a remarkable manner through poetical paintings, structured in a new manner. The poetic images curved out by the talent of Pandit Smrititirtha are resplendent in their own light, and they are able to retain their freshness for all time to come. The test of a political painting lies in its universality and freshness, and a living poetic image is in a position to reflect the universe in its small compass and retain its freshness for all time to come, so that it can be appreciated equally by connoisseurs of future times. Thus, the poetical paintings curved out by Kalidas are

fresh and universal and are appreciated equally by conno- isseurs of modern times in the manner they had been experienced by connoisseurs of the time of Kalidasa. This truth is capable of being asserted in the case of the poetical paintings structured by Pt. Smrititirtha who, thus, had contributed significantly to the arena of Sanskrit lyric poetry.

But, the talent of Pandit Nityananda Smrititirtha has come out in flying colours in dramas and one act plays. He has chosen themes from the contemporary life and society. He knows fully well that simply by drawing episodes from ancient historical and legendary works enchanting dramas cannot be composed for appreciation of the modern reader; for this new themes are to be selected from the contemporary life and society. He also knows that by adhering to the views projected by the ancients that only by presenting the erotic and heroic a drama cannot be composed, and that in order to create enchantment of the modern reader for the drama it is required to present all types of emotional moods including the Quietistic and Comic, which is regarded as a pseudo-aesthetic concept. Pt. Smrititirtha, thus, has compoased a number of dramas in which lasty lashes of satire have been hurled at the deficiencies of a particular agency or society, which has accepted the Untruth as the Truth and has instralled lie on the throne occupied by Truth. This message this lusty lashes of satire, - this penetrating remark on the deficiency of the society has inducted fresh enchantment in his plays as a result of which they have been accepted as new types of play, creating a new genere. Fine satire was rather unknown in Sanskrit literature, the Bhana presenting only coarse type of satire. Pandit Nityananda Smrititirtha is the first literary artist who has presented fine satire and humour creating, thus, a new genere in the field of Sanskrit literature.

Pandit Nityananda Smritirtha, thus, represents a combination of scholarship in Juridical sciences and all systems of philosophy, as also a compendium of talent in composing diverse farms of Sanskrit literature, like lyric and play, like Wit and Satire, like Comic and Humour, in the last type of which tears and smiles mingle together in a single cup of play, and the Comic and the Tragic are presented, leading to profound astonishment in the mind of the connoisseurs.

---

[১] দেবব্রত মুখোপাধ্যায় (সম্পা), *সমাজ ভারতী* (শ্রাবণ-আশ্বিন), ২০০৯, পৃষ্ঠা ৮-১৭

[২] *দেবব্রত মুখোপাধ্যায় (সম্পা), শতবর্ষে নিত্যানন্দে প্রসূনাঞ্জলি*, ২০২২, পৃষ্ঠা ৫১

[৩] দেবব্রত মুখোপাধ্যায় (সম্পা), *সমাজ ভারতী* (শ্রাবণ-আশ্বিন), ২০০৯, পৃষ্ঠা ৫-৭

পরিশিষ্ট খ

হাতে লেখা সূচীপত্রের অংশ এবং প্রকাশিত সূচীপত্র

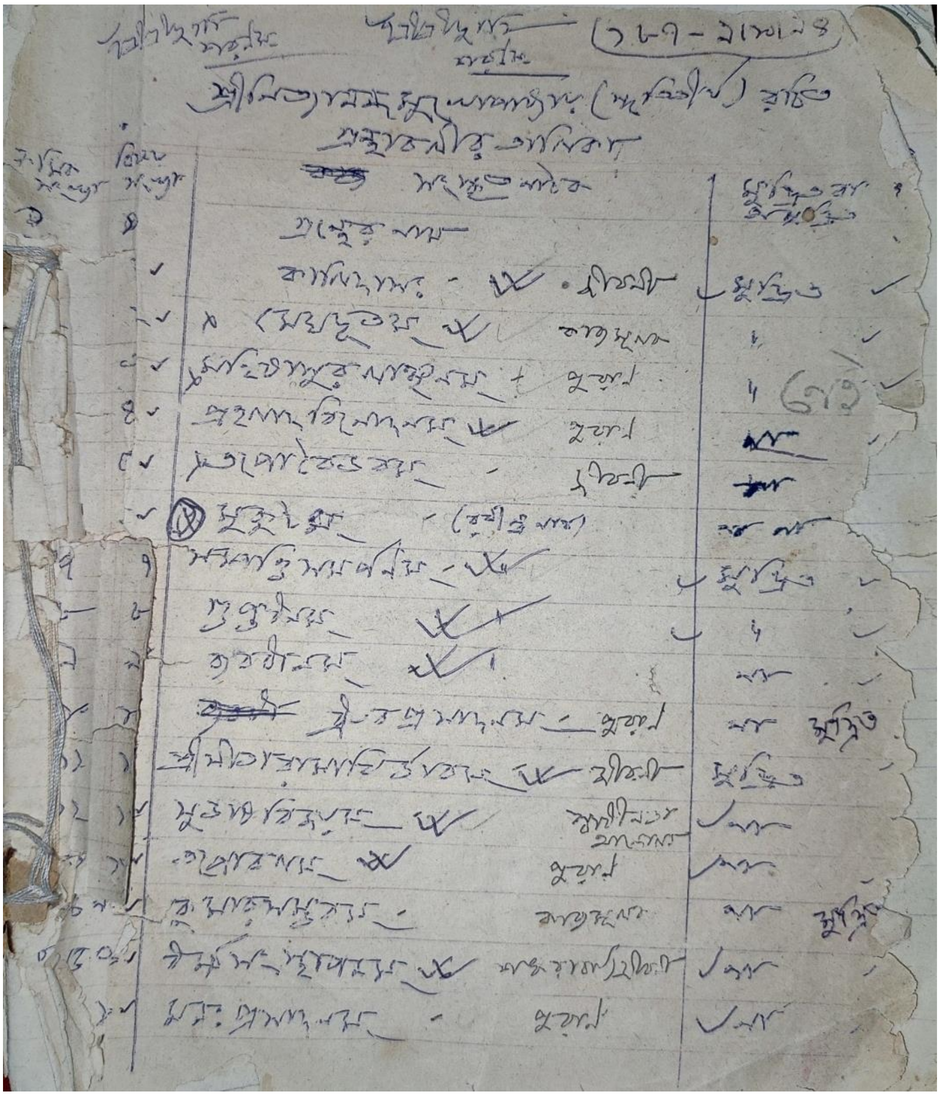

হাতে লেখা সূচীপত্রের অংশ

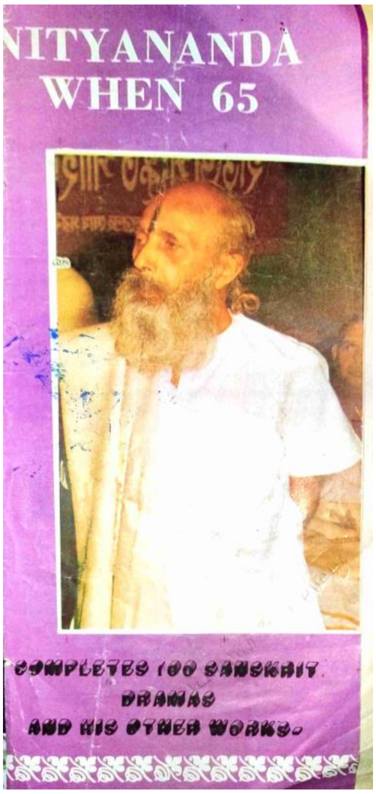

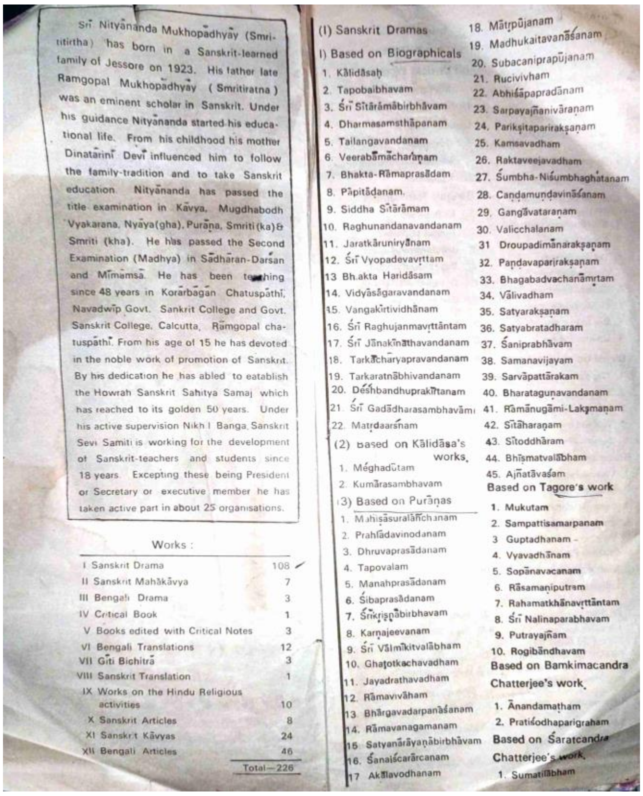

Sri Nityānanda Mukhopādhyāy (Smrititirtha) has born in a Sanskrit-learned family of Jessore on 1923. His father late Ramgopal Mukhopādhyāy (Smritiratna) was an eminent scholar in Sanskrit. Under his guidance Nityānanda started his educational life. From his childhood his mother Dinatārinī Devī influenced him to follow the family-tradition and to take Sanskrit education. Nityānanda has passed the title examination in Kāvya, Mugdhabodh Vyakarana, Nyāya(gha), Purāṇa, Smriti (ka) & Smriti (kha). He has passed the Second Examination (Madhya) in Sādhāran-Darśan and Mīmāmsā. He has been teaching since 48 years in Korārbāgān Chatuspāthī, Navadwīp Govt. Sankrit College and Govt. Sanskrit College, Calcutta, Rāmgopal chatuspāthī. From his age of 15 he has devoted in the noble work of promotion of Sanskrit. By his dedication he has abled to eatablish the Howrah Sanskrit Sahitya Samaj which has reached to its golden 50 years. Under his active supervision Nikhil Banga Sanskrit Sevi Samiti is working for the development of Sanskrit-teachers and students since 18 years. Excepting these being President or Secretary or executive member he has taken active part in about 25 organisations.

Works :

I Sanskrit Drama	108
II Sanskrit Mahākāvya	7
III Bengali Drama	3
IV Critical Book	1
V Books edited with Critical Notes	3
VI Bengali Translations	12
VII Gīti Bichitrā	3
VIII Sanskrit Translation	1
IX Works on the Hindu Religious activities	10
X Sanskrit Articles	8
XI Sanskrit Kāvyas	24
XII Bengali Articles	46
	Total—226

(I) Sanskrit Dramas

I) Based on Biographicals

1. Kālidāsaḥ
2. Tapobaibhavam
3. Śrī Sītārāmābirbhāvam
4. Dharmasamsthāpanam
5. Tailangavandanam
6. Veerabāmācharaṇam
7. Bhakta-Rāmaprasādam
8. Pāpitāḍanam.
9. Siddha Sītārāmam
10. Raghunandanavandanam
11. Jaratkāruniryānam
12. Śrī Vyopadevavṛttam
13 Bhakta Haridāsam
14. Vidyāsāgaravandanam
15. Vangakīrtividhānam
16. Śrī Raghujanmavṛttāntam
17. Śrī Jānakīnāthavandanam
18. Tarkācharyapravandanam
19. Tarkaratnābhivandanam
20. Deśhbandhuprakīrtanam
21. Śrī Gadādharasambhavāmı
22. Matṛdaarśnam

(2) Based on Kālidāsa's works.

1. Méghadūtam
2. Kumārasambhavam

(3) Based on Purāṇas

1. Mahiṣāsuralāñchanam
2. Prahlādavinodanam
3. Dhruvaprasādanam
4. Tapovalam
5. Manahprasādanam
6. Śibaprasādanam
7. Śrīkṛiṣṇābirbhavam
8. Karṇajeevanam
9. Śrī Vālmīkitvalābham
10. Ghaṭotkachavadham
11. Jayadrathavadham
12. Rāmavivāham
13 Bhārgavadarpanāśanam
14. Rāmavanagamanam
15 Satyanārāyaṇābirbhāvam
16. Śanaiścarārcanam
17 Akālavodhanam
18. Mātṛpūjanam
19. Madhukaitavanāśanam
20. Subacaniprapūjanam
21. Rucivivham
22. Abhiśāpapradānam
23. Sarpayajñanivāraṇam
24. Parikṣitaparirakṣaṇam
25. Kamsavadham
26. Raktaveejavadham
27. Śumbha-Niśumbhaghātanam
28. Caṇḍamuṇḍavināśanam
29. Gangāvataraṇam
30. Valicchalanam
31 Droupadimānarakṣaṇam
32. Paṇḍavaparirakṣaṇam
33. Bhagabadvachanāmṛtam
34. Vālivadham
35. Satyarakṣaṇam
36. Satyabratadharam
37. Śaniprabhāvam
38. Samanavijayam
39. Sarvāpattārakam
40. Bharataguṇavandanam
41. Rāmānugāmi-Lakṣmaṇam
42. Sītāharaṇam
43. Sītoddhāram
44. Bhīṣmatvalābham
45. Ajñatāvaśam

Based on Tagore's work

1. Mukutam
2. Sampattisamarpanam
3 Guptadhanam
4. Vyavadhānam
5. Sopānavacanam
6. Rāsamaṇiputram
7. Rahamatkhānavṛttāntam
8. Śrī Nalinaparabhavam
9. Putrayajñam
10. Rogibāndhavam

Based on Bamkimacandra Chatterjee's work.

1. Ānandamaṭham
2. Pratiśodhaparigraham

Based on Śaratcandra Chatterjee's work.

1. Sumatilābham

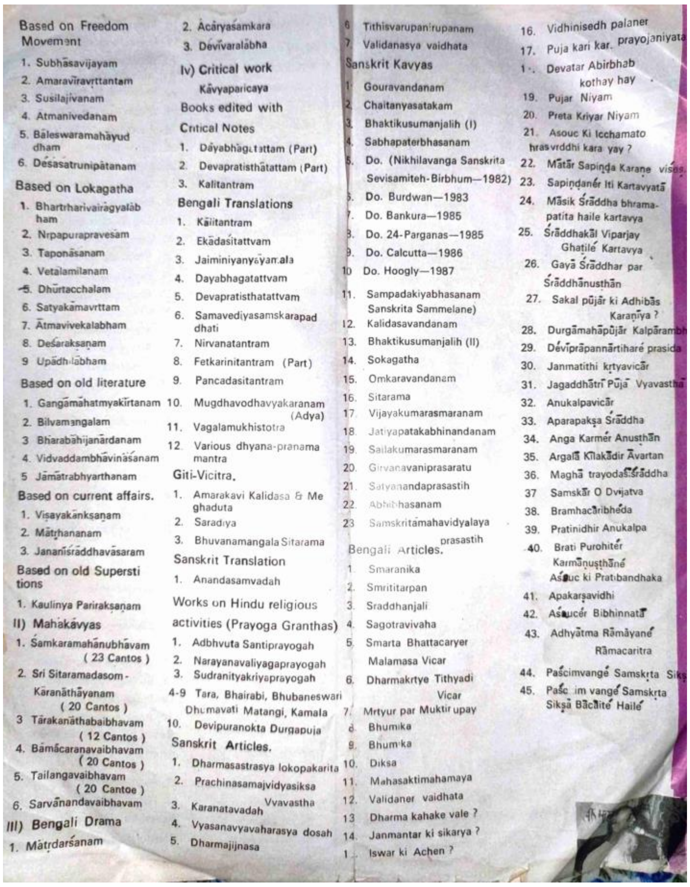

Based on Freedom Movement

1. Subhāsavijayam
2. Amaravīravṛttantam
3. Susilajivanam
4. Atmanivedanam
5. Bāleswaramahāyud dham
6. Deśasatrunipātanam

Based on Lokagatha

1. Bhartṛharivairāgyalābham
2. Nṛpapurapraveśam
3. Taponāsanam
4. Vetalamilanam
5. Dhūrtacchalam
6. Satyakāmavṛttam
7. Ātmavivekalabham
8. Deśarakṣaṇam
9 Upādhilābham

Based on old literature

1. Gangāmāhatmyakīrtanam
2. Bilvamangalam
3 Bharabāhijanārdanam
4. Vidvaddambhāvināśanam
5 Jāmātrabhyarthanam

Based on current affairs.

1. Viṣayakānkṣaṇam
2. Mātṛhananam
3. Jananīśrāddhavāsaram

Based on old Superstitions

1. Kaulinya Parirakṣaṇam

II) Mahākāvyas

1. Śamkaramahānubhāvam (23 Cantos)
2. Sri Sitaramadasom-Kāranāthāyanam (20 Cantos)
3 Tārakanāthabaibhavam (12 Cantos)
4. Bāmācaranavaibhavam (20 Cantos)
5. Tailangavaibhavam (20 Cantoe)
6. Sarvānandavaibhavam

III) Bengali Drama

1. Mātṛdarśanam
2. Ācāryaśamkara
3. Devīvaralābha

IV) Critical work

Kāvyaparicaya

Books edited with Critical Notes

1. Dāyabhāgatattam (Part)
2. Devapratisthātattam (Part)
3. Kalitantram

Bengali Translations

1. Kālitantram
2. Ekādaśitattvam
3. Jaiminiyanyāyamala
4. Dayabhagatattvam
5. Devapratisthatattvam
6. Samavediyasamskarapaddhati
7. Nirvanatantram
8. Fetkarinitantram (Part)
9. Pancadasitantram
10. Mugdhavodhavyakaranam (Adya)
11. Vagalamukhistotra
12 Various dhyana-pranama mantra

Giti-Vicitra.

1. Amarakavi Kalidasa & Meghaduta
2. Saradiya
3. Bhuvanamangala Sitarama

Sanskrit Translation

1. Anandasamvadah

Works on Hindu religious activities (Prayoga Granthas)

1. Adbhvuta Santiprayogah
2. Narayanavaliyagaprayogah
3. Sudranityakriyaprayogah

4-9 Tara, Bhairabi, Bhubaneswari Dhumavati Matangi, Kamala

10. Devipuranokta Durgapuja

Sanskrit Articles.

1. Dharmasastrasya lokopakarita
2. Prachinasamajvidyasiksa Vyavastha
3. Karanatavadah
4. Vyasanavyavaharasya dosah
5. Dharmajijnasa
6 Tithisvarupanirupanam
7 Validanasya vaidhata

Sanskrit Kavyas

1 Gouravandanam
2 Chaitanyasatakam
3 Bhaktikusumanjalih (I)
4. Sabhapaterbhasanam
5. Do. (Nikhilavanga Sanskrita Sevisamiteh-Birbhum—1982)
6. Do. Burdwan—1983
7. Do. Bankura—1985
8. Do. 24-Parganas—1985
9. Do. Calcutta—1986
10 Do. Hoogly—1987
11. Sampadakiyabhasanam Sanskrita Sammelane)
12. Kalidasavandanam
13. Bhaktikusumanjalih (II)
14. Sokagatha
15. Omkaravandanam
16. Sitarama
17 Vijayakumarasmaranam
18. Jatiyapatakabhinandanam
19. Sailakumarasmaranam
20. Girvanavaniprasaratu
21. Satyanandaprasastih
22. Abhibhasanam
23 Samskritamahavidyalaya prasastih

Bengali Articles.

1. Smaranika
2. Smrititarpan
3. Sraddhanjali
4. Sagotravivaha
5. Smarta Bhattacaryer Malamasa Vicar
6. Dharmakrtye Tithyadi Vicar
7. Mrtyur par Muktir upay
8. Bhumika
9. Bhumika
10. Diksa
11. Mahasaktimahamaya
12. Validaner vaidhata
13 Dharma kahake vale ?
14. Janmantar ki sikarya ?
1. Iswar ki Achen ?
16. Vidhinisedh palaner prayojaniyata
17. Puja kari kar.
1. Devatar Abirbhab kothay hay
19. Pujar Niyam
20. Preta Kriyar Niyam
21. Asouc Ki Icchamato hrasvrddhi kara yay ?
22. Mātār Sapiṇḍa Karaṇe viśes.
23. Sapiṇḍaner Iti Kartavyatā
24. Māsik Śrāddha bhramapatita haile kartavya
25. Śrāddhakāl Viparjay Ghaṭile Kartavya
26. Gayā Śrāddhar par Śrāddhānusthān
27. Sakal pūjār ki Adhibās Karaṇīya ?
28. Durgāmahāpūjār Kalpārambh
29. Dévīprāpannārtiharé prasida
30. Janmatithi kṛtyavicār
31. Jagaddhātrī Pūjā Vyavasthā
32. Anukalpavicār
33. Aparapakṣa Śrāddha
34. Anga Karmér Anusthān
35. Argalā Kīlakādir Āvartan
36. Maghā trayodaśī śrāddha
37 Samskār O Dvijatva
38. Bramhacāribhéda
39. Pratinidhir Anukalpa
40. Brati Purohitér Karmānuṣṭhāné Aśauc ki Pratibandhaka
41. Apakarṣavidhi
42. Aśaucér Bibhinnatā
43. Adhyātma Rāmāyané Rāmacaritra
44. Paścimvangé Samskṛta Sikṣ
45. Paśc im vangé Samskṛta Sikṣā Bācāité Hailé

প্রকাশিত সূচীপত্র

পরিশিষ্ট গ

চিত্রে কবি, সামাজিক, নিত্যানন্দ

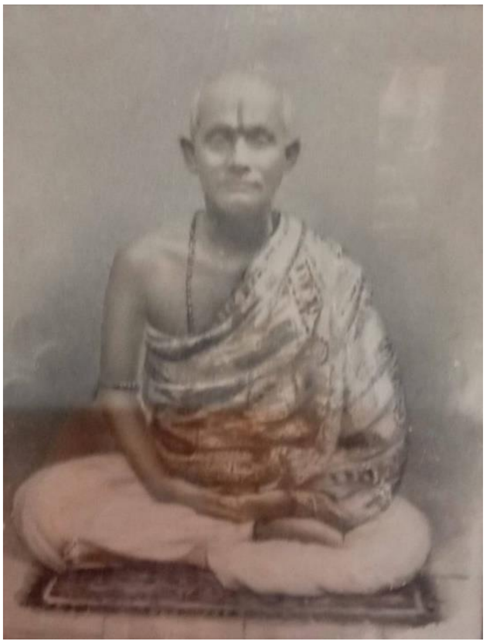

নাট্যকারের পিতা রামগোপাল মুখোপাধ্যায়

নাট্যকারের মাতা দীনতারিণী দেবী

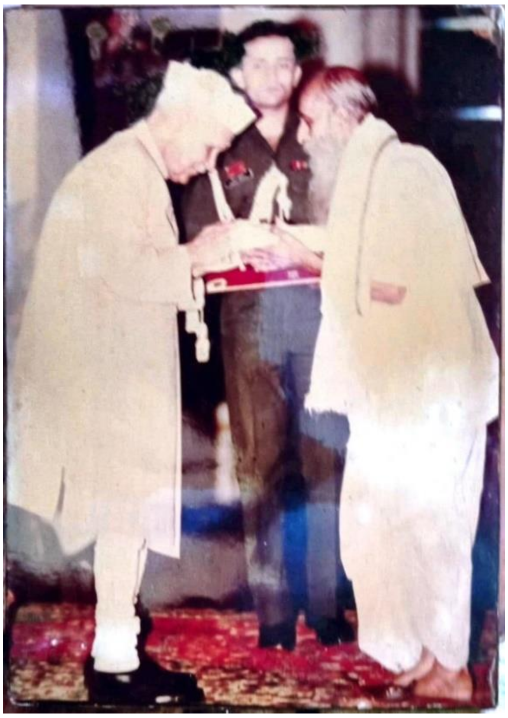

রাষ্ট্রপতি ড. শঙ্করদয়াল শর্মা কর্তৃক পুরস্কার প্রদান

सत्यमेव जयते

अहं भारतस्य राष्ट्रपतिः

डा० शंकरदयाल शर्मा

श्री नित्यानन्दमुखोपाध्यायमहोदयाय

संस्कृत-वाङ्मये पाण्डित्याय

शास्त्रे च वैशारद्याय

प्रमाणपत्रमेतत् प्रददामि ॥

दिल्ली, 10 अगस्त, 1996

दिनांक: 19 श्रावण, 1918 शक

राष्ट्रपतिः

রাষ্ট্রপতি পুরস্কারের শংসাপত্র

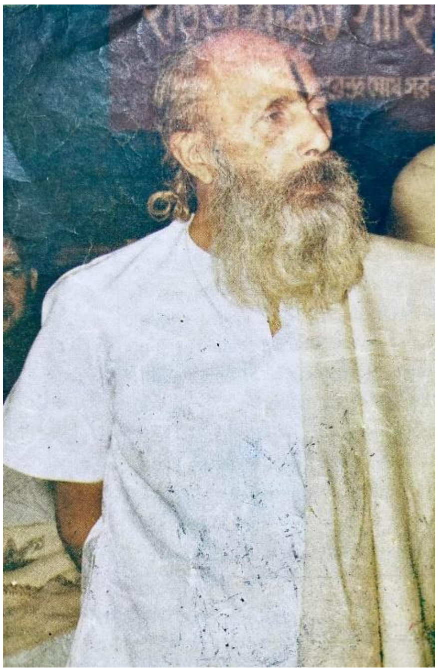
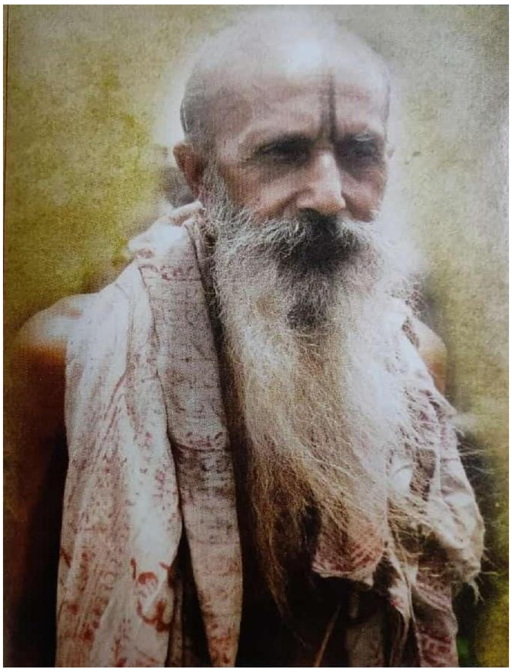

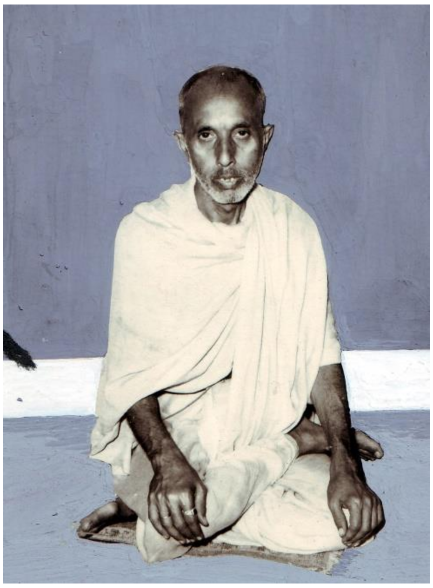
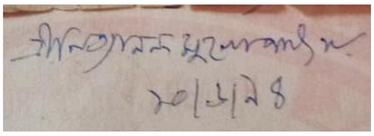

নাট্যকার নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়

বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রাপ্ত পদক

হাওড়া সংস্কৃত সাহিত্য সমাজের প্রবেশ পথ

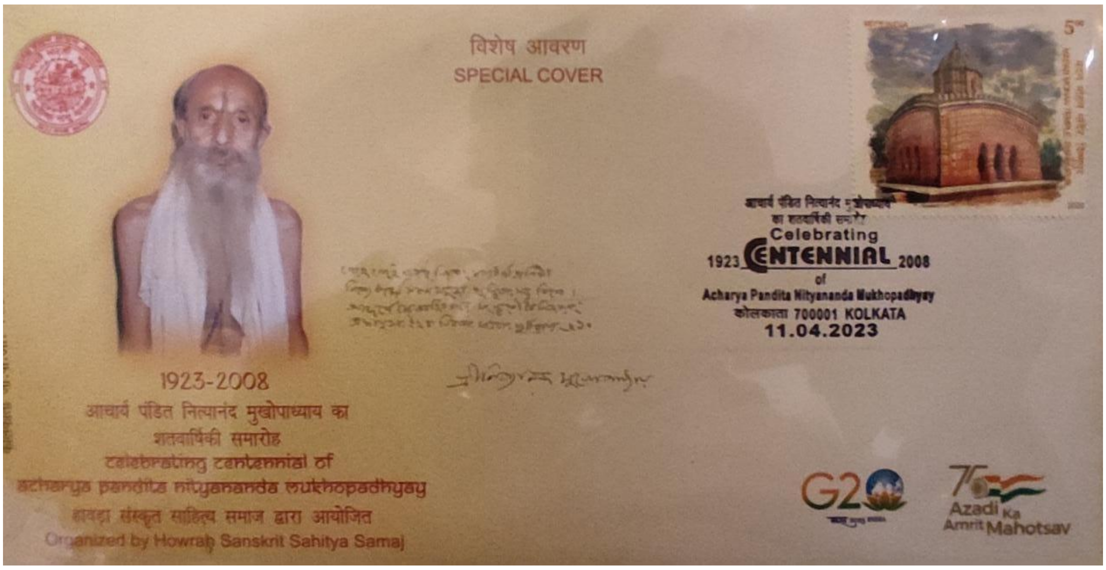

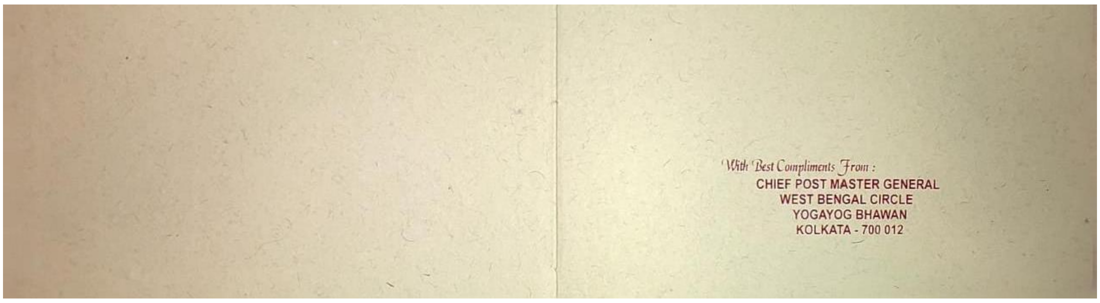

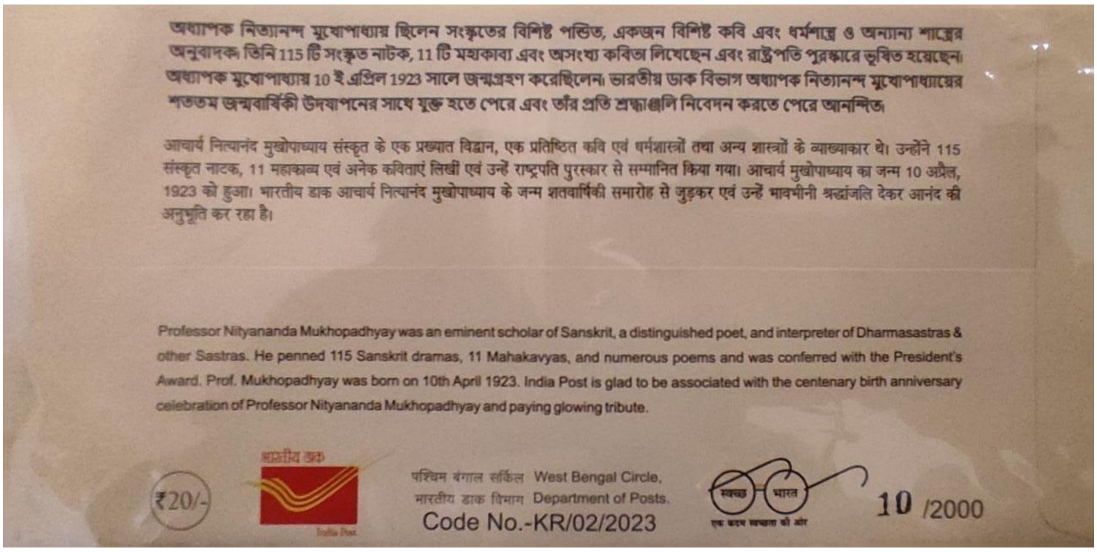

ভারত সরকারের ডাক ও তার বিভাগ কর্তৃক স্মারক প্রকাশ

ড. করণ সিং কে মাল্য প্রদান

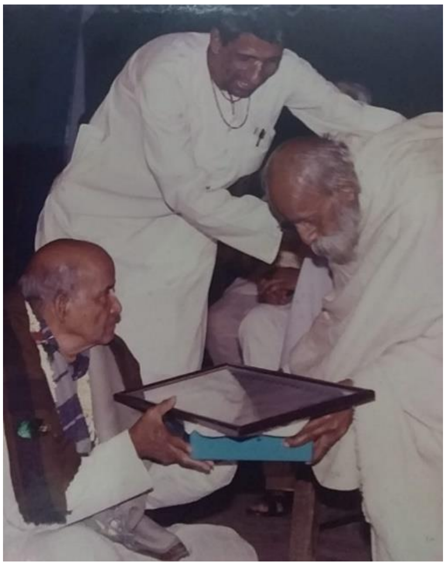

পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থের সাথে

বিচারপতি আনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সাথে

ভাষণরত

স্বদেশ চক্রবর্তী (মেয়র), বিক্রম সরকার(সাংসদ),
আলাপন বন্দোপাধ্যায় (জেলা শাসক),
সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় (বিশিষ্ট আইনজীবী)
নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়

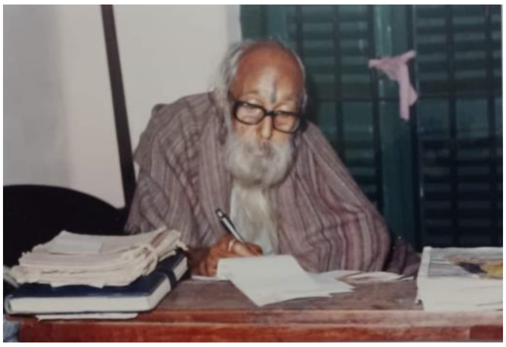

নাট্যকারের শেষবেলা

নবদ্বীপ গভর্নমেন্ট কলেজের প্রবেশ পথে পুত্রগণ

বঙ্গবিবুধ জননী সভার কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়ের পরিবারের সদস্যগণ

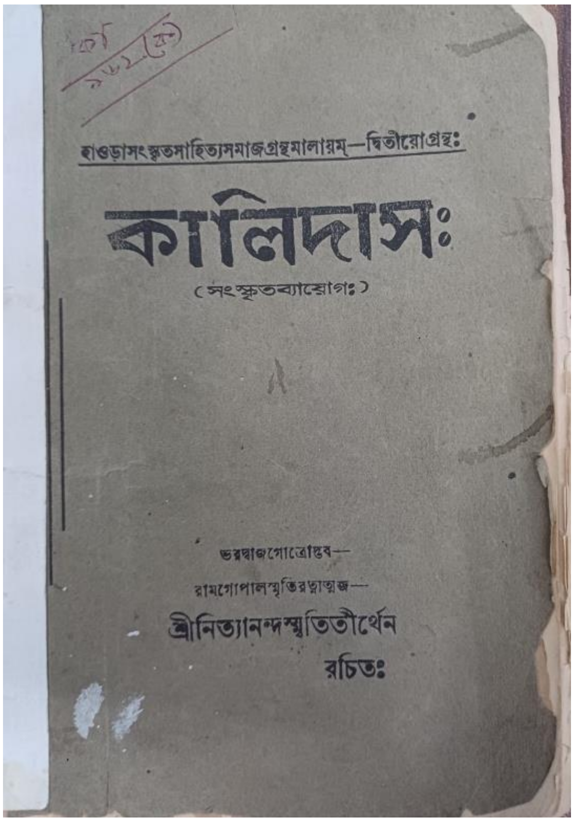

নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়ের প্রকাশিত প্রথম নাটক

প্রকাশিত পুস্তকের কিছু চিত্র

নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী জয়ন্তী দেবীকে কনভারজেন্স কর্তৃক সম্মান প্রদান

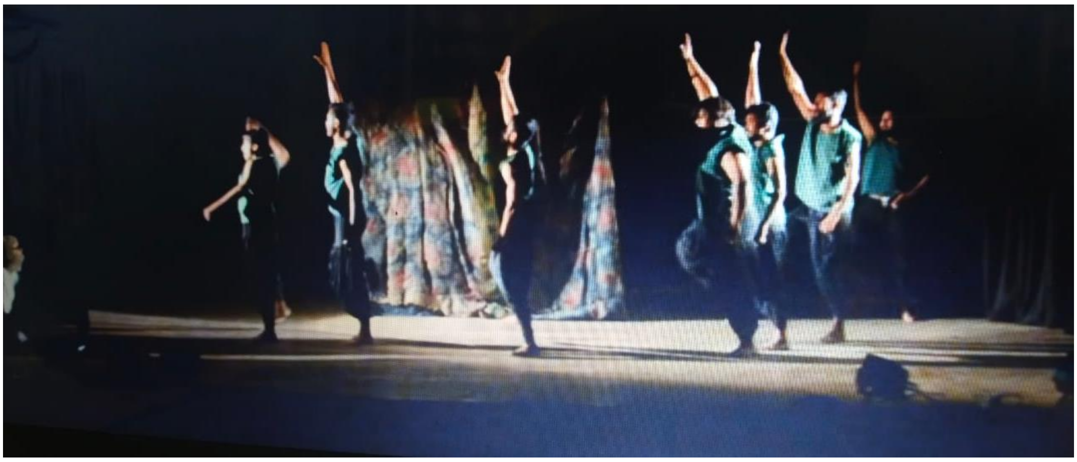

আলোচিত নাটক মঞ্চস্থ হবার কিছু দৃশ্য

পরিশিষ্ট ঘ

নিত্যানন্দের হস্তাক্ষরে আলোচ্য নাটকত্রয়ের প্রতিলিপি

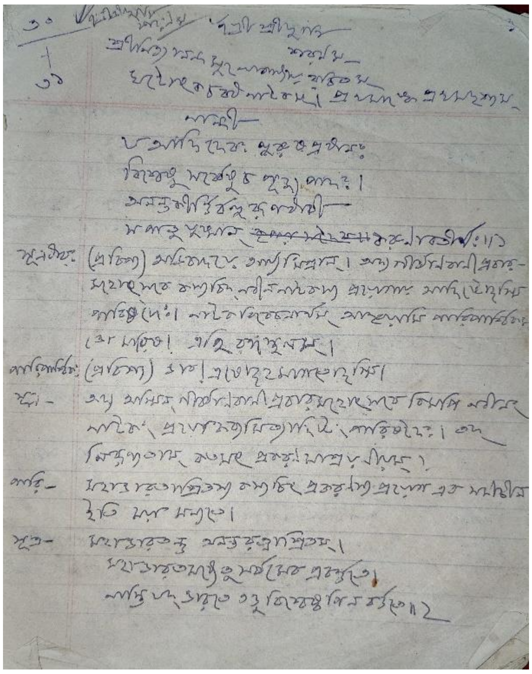

ঘটোত্কচবধ নাটক

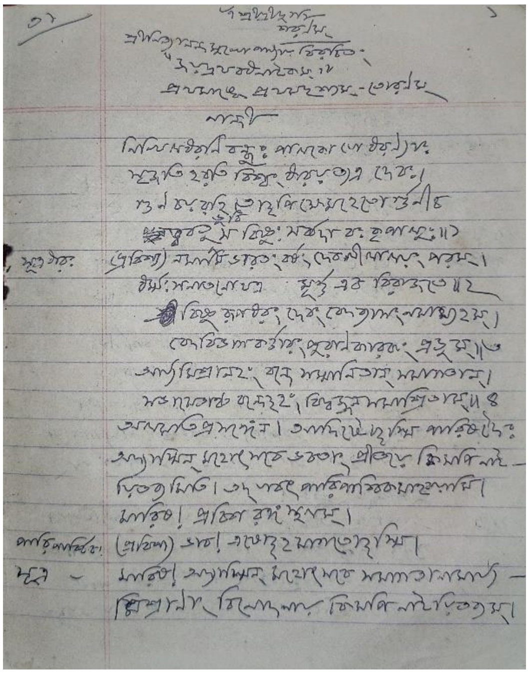

জয়দ্রথবধ নাটক

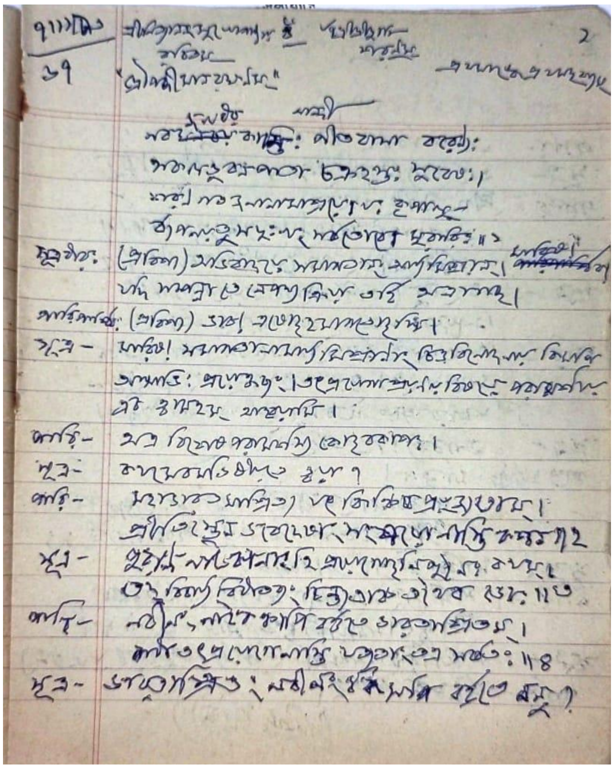

দ্রৌপদীমানরক্ষণ নাটক

পরিশিষ্ট ৬

নিত্যানন্দের অন্যান্য কিছু নাট্যাংশের হস্তাক্ষর প্রতিলিপি

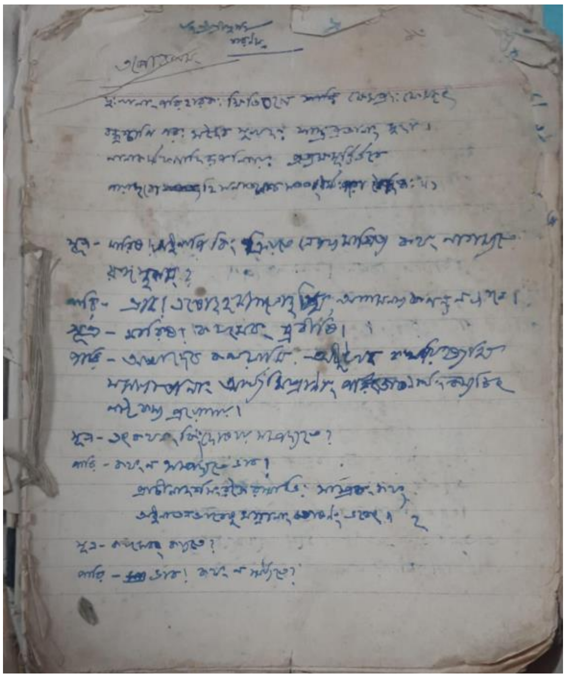

তপোবল

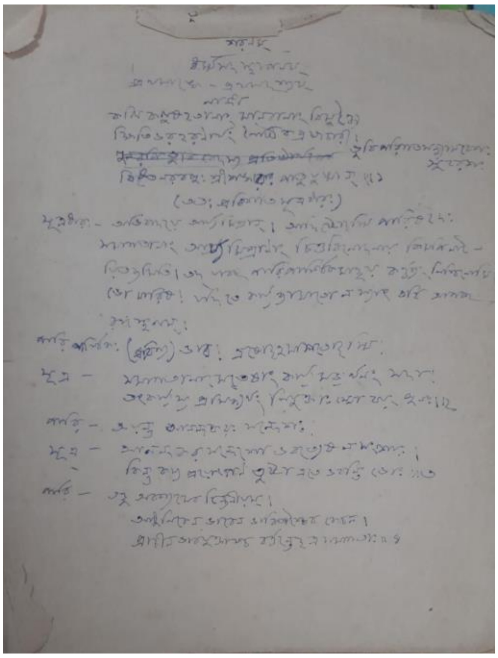

ধর্ম্মসংস্থাপন

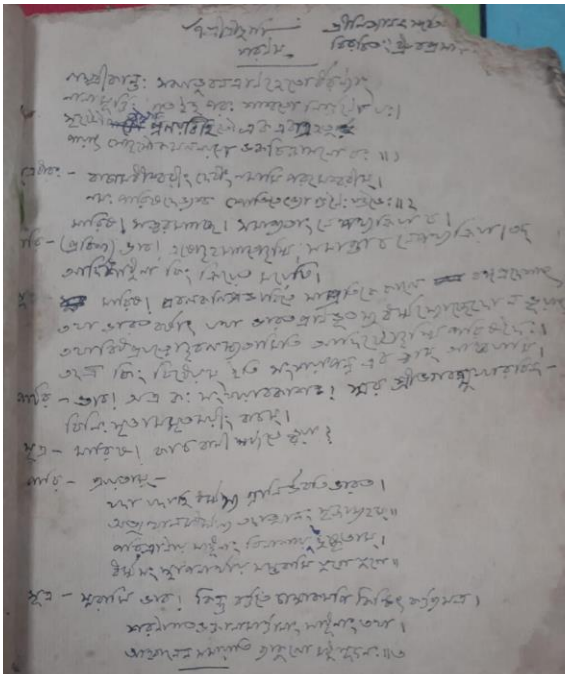

ধ্রুবপ্রসাদন

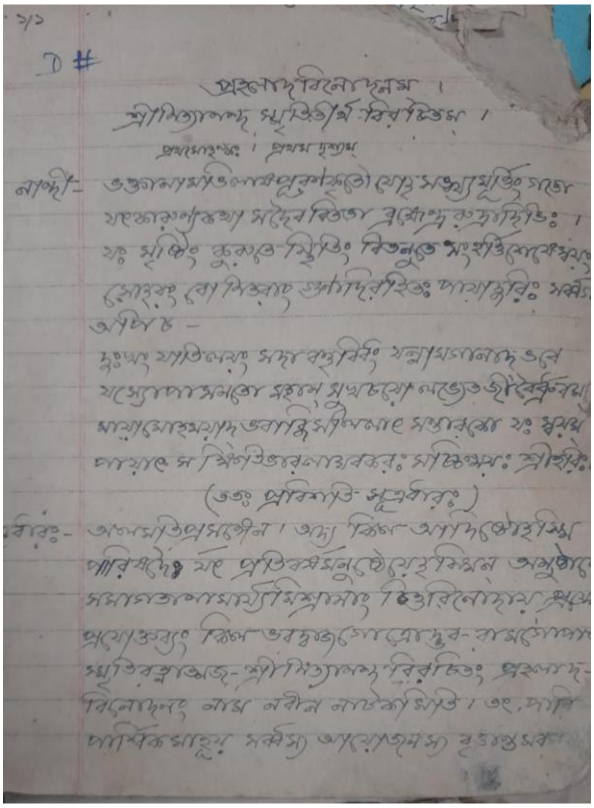

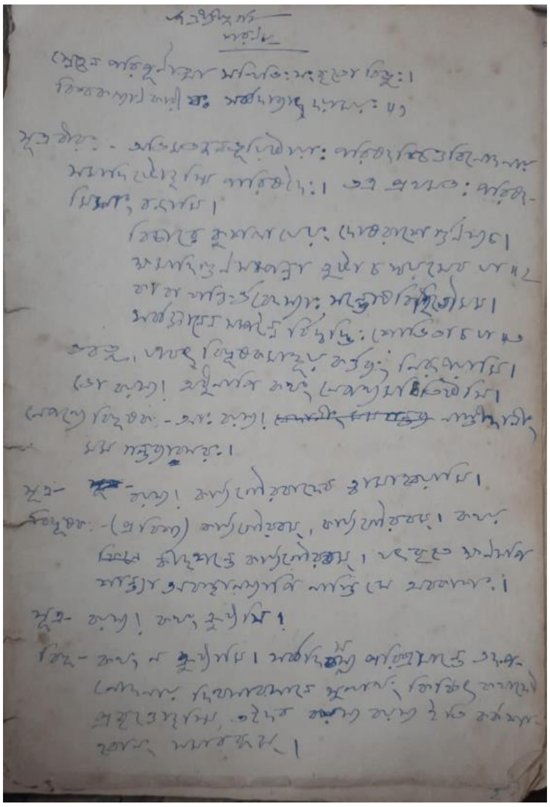

প্রহ্লাদবিনোদন

ব্যবধান

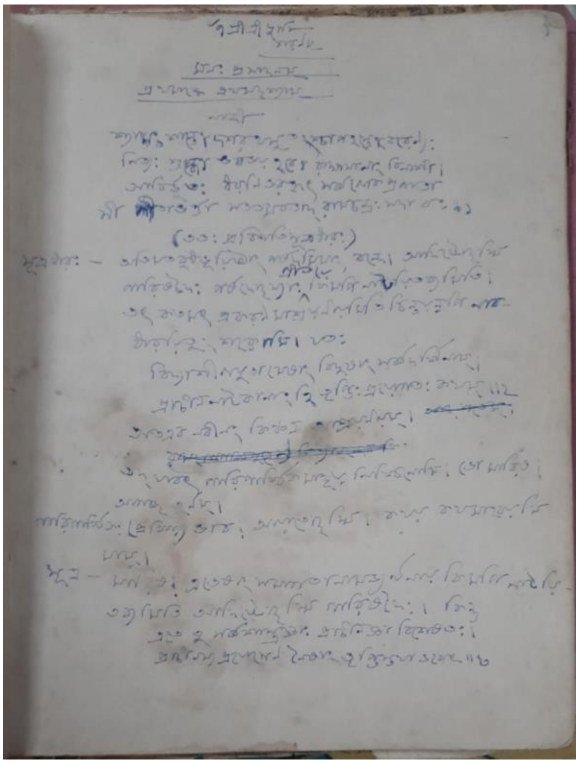

মনঃপ্রসাদন